

প্রতিবাদী চেতনার আলোকে বাংলা মহিলা গল্পকার
(একশ বছরের সময়সীমায়)

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের
পি. এইচ. ডি. (বাংলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা -
অভিসন্দর্ভ ২০১২



গবেষক
রীনা দে

তত্ত্বাবধায়ক
ড. সুবোধ কুমার যশ
অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Th 81.096
સેના/પ્રતિ.

250618

10 MAY 2013

প্রাক্কথা

‘প্রতিবাদী চেতনার আলোকে ^{কল্প}মহিলা গল্পকার (একশ’ বছরের সময়সীমায়)’ এই গবেষণার বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উৎসাহ দিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. সুবোধ কুমার যশ মহাশয়। তিনি গবেষণায় তত্ত্বাবধায়কের গুরুদায়িত্ব পালন করে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বলে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

মহিলা লেখিকাদের গল্পের প্রতিবাদ নিয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলায় কোনো পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। অথচ সমগ্র বিশ্বের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ ধরনের গ্রন্থ প্রণয়ন ছিল বিশেষ জরুরি। নারীরা যেখানে সমাজের ধারক ও বাহক, তাদের দ্বারাই সমাজের গতিপথ নির্মিত হয়, অথচ এই নারীরাই রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। সর্বসহা সীতা, দ্রৌপদী, শকুন্তলা তাঁরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকটাই অবহেলিত থেকে গেছেন। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদের বীজ রোপিত হয়েছিল কালে কালে তা মহীরুহে পরিণত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের নারীরা তাদের কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রতিবাদী ভাবনাকে সুদূর প্রসারী ভাবনায় রূপান্তরিত করেছেন। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে নারীরা তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন, শিক্ষা ও সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করে স্থাপন করে গেছেন নতুন দৃষ্টান্ত। বিশেষত, সাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নারীদের অবদানকে কোনো ভাবেই সুস্থ প্রগতিশীল দেশে ছোট করে দেখা উচিত হয় নি।

ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা কর্মসূত্রে স্বাস্থ্যবিভাগের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজ জীবনের অসংগতিক আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। নারীকল্যাণের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে মর্মে মর্মে অনুভব করেছি কি গ্রামে কি শহরে নারীরা কত অসহায়। যাদের ক্ষেত্রে ‘বিচারের বাণী নীরবে নিভূতে কাঁদে’ তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতিবোধ থেকেই আমার মনে বিদ্রোহিনী নারী লেখিকাদের কথা বারবার স্মরণে এসেছে। বাল্যাবস্থা থেকেই আমার মনে ‘কেন?’ এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আজ পরিণত বয়সে আমার গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই বাঙময় রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছি। এছাড়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়ন কালে বিভিন্ন মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে গবেষণা করবার ইচ্ছে জাগে সেই প্রয়াস গবেষণার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ছোটবেলা থেকে পাঠাভ্যাস যার সাহচর্যে তৈরী হয়েছিল তাঁর উল্লেখ করতেই হয়। সপ্তম শ্রেণিতে আমার পড়ার সময়েই সাহিত্যপ্রেমী আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় সরোজ কুমার দে স্থানীয় লাইব্রেরীতে কার্ড করে দিয়ে বিভিন্ন লেখকদের বই পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কল্যাণময়ী আমার মাতৃদেবী স্বর্গীয়া শ্রীমতী রানু দে যিনি আমার অবসর সময়টুকুতেও কোন কাজের সাংসারিক

দায়িত্ব না দিয়ে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আজ মনে পড়ে সেই সময় নবম-দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়েই রবীন্দ্র, নজরুল, শরৎ, বঙ্কিম, গিরিশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন ও আরও অনেকের বই পড়া শেষ করে ফেলি। না বুঝলে পিতার সাহায্যে বুঝে নিতাম।

বিশেষভাবে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রদ্ধেয় ড. সুজল আচার্য ও জ্যেষ্ঠা ভগ্নীপ্রতিম ড. সতী চক্রবর্তী মহাশয়াকে। যারা আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য করেছেন তাদের অফুরন্ত বইয়ের ভান্ডারের অব্যাহত দ্বার আমার জন্য খোলা রেখেছেন ও উৎসাহ প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি থেমে গেলেও তারা আমাকে থামতে দেননি।

আমার পরিবারের আমার ভাই সঞ্জয় দে ও চঞ্চল দে, ভ্রাতৃবধূ দোলা ও কুছ আমার সংসার সামলিয়ে বিভিন্নভাবে গবেষণা কর্মে সহায়তা দান করেছে। ওদের কাছে আমি ঋণী। এদের সকলকে জানাই আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। নানাভাবে উৎসাহ দিয়েছেন মাননীয় মন্দিরা যশ মহাশয়া। যার হাতের এক পেয়ালা চা এক নিমেষে আমাকে ক্লান্তিমুক্ত করেছে। তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া আমার একান্তই আপনজন যিনি আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন ডঃ দিলীপ কান্তি দে, তাঁকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

আমার গবেষণা গ্রন্থে একশ' বছরের সময়সীমার মধ্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গল্পকারদের গল্পগ্রন্থগুলি সংগ্রহ করা ছিলো অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। অথচ এই দুর্লভ গ্রন্থগুলি সংগ্রহের জন্য পাহাড় থেকে সমুদ্র বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, শহর ও গ্রামীণ লাইব্রেরী, বিভিন্ন বইমেলা থেকে অক্লান্ত শ্রম করে আমাকে গ্রন্থগুলি সংগ্রহ করতে হয়েছে। সর্বোপরি, আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক বহু মূল্যবান গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সহযোগিতা না করলে, হয়তো আমার এই গবেষণা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হত না। এজন্য আমি তাঁর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাজ্ঞান। তার প্রতি রইল আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এছাড়া আরো বহু ব্যক্তির রয়েছেন যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে, সাহায্য ও সহযোগিতায় এই অভিনব গবেষণা গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাঁদের কাছেও আমি ঋণপাশে আবদ্ধ।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রুফ দেখা ও প্রিন্টিং -এর কাজ করা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বানান ভুল থেকে যেতে পারে, সেজন্য আগাম ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

বিনয়াবনত -

স্বীমা দে,
(গবেষিকা)

স্থান : কোচবিহার

তাং : ২২/৫/০২

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা :	১-৫
প্রথম অধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত বাংলা গল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনা।	৬-৭১
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও রচিত গ্রন্থসমূহ।	৭২-১৬০
তৃতীয় অধ্যায় : প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু।	১৬১-২৫০
চতুর্থ অধ্যায় : প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক।	২৫১-৩৫২
পঞ্চম অধ্যায় : তুলনার আলোকে মহিলা গল্পকার।	৩৫২-৩৯৬
ষষ্ঠ অধ্যায় : উপসংহার।	৩৯৭-৪০৯
গ্রন্থপঞ্জি :	৪১০-৪২৫

ভূমিকা

সম্প্রতি নারীবাদী সত্তার চূড়ান্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা গেলেও এর বীজ রোপিত হয়েছিল সুদূর অতীতে। পুরুষ-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় নারীর অধিকার হয়ে পড়েছিল সঙ্কুচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তুলনামূলক বিচারে পুরুষের অবস্থানের চেয়ে নারীর অবস্থান ছিলো অনেকটাই নগণ্য। মার্কসবাদী চিন্তায় নারীভাবনার এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। সেখানে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা বলা হয়েছে। একে একে ফ্রান্স, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও নারীর অধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

এদেশের নারীরা ব্রাহ্মণ্য শাসনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার কঠোর অনুশাসনগুলি নারী প্রগতির অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি নারীরা কোনো প্রতিষ্ঠা পায়নি। তাদের ইতিহাস ছিল মূলত লাঞ্ছনার ইতিহাস। তারা ছিল পুরুষদের ভোগ্য সম্পত্তির একটা অংশমাত্র। এই নারীরা ছিল অজ্ঞ, শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ঘোমটা বন্দী ও বোরখা পরিহিতা। নারীরা ছিলো জন্তুর মতো, নিজেদের অনুভূতিকে প্রকাশ করবার কোনো ক্ষমতা তাদের ছিল না। সতীদাহ প্রথা, পুনঃবিবাহরোধ, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, ক্রীশিক্ষা প্রসারে বাধা, পণপ্রথা — এই দুষ্ট ক্ষতগুলি নারীর অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

পরবর্তীকালে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে মল্লিকা সেনগুপ্তের কথা স্মরণীয় —

“আমি স্বপ্নদেখি নতুন নারীর।

নতুন এক ভেনাসের,

যে লক্ষ লক্ষ ডুবে যাওয়া মেয়ের সম্মিলিত শক্তির পুঁজি নিয়ে উঠে আসবে।

পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করবে চোরাবালির দুরভিসন্ধি।”

লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে জন্মগ্রহণ করে নারীরা বুঝতে পেরেছে তাদের নিজস্ব কোনো সত্তা নেই, তাদের দেহটাই সম্বল। তারা সন্তান ধারণ করে, তাদের লালন পালন করে। এইরকম গতানুগতিক জীবনধারায় তারা অভ্যস্ত। অথচ নারী সমাজ বহির্ভূত অংশ নয়। তাদের আত্মিক মুক্তি একান্ত প্রয়োজন। সুস্থ মন, সমৃদ্ধ চেতনা, স্বতঃস্ফূর্ততা সবই সহজাত। তবেই তো নারী শক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটবে। কাজেই নারী ও পুরুষের সমতা এবং উভয়ের সম্মিলিত অখণ্ড রূপ একমাত্র কাম্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধির প্রয়োজনে লেখনী ধারণ করেছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, গৌড়মোহন বিদ্যালঙ্কার,

রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও এবং পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবনাথ শাস্ত্রী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যিক গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নারী মুক্তির বিষয়গুলি নারী সমাজকে সচেতন করে তোলে। বিদ্যাদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, বেঙ্গল স্পেকটেটর, সর্বশুভকরী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ, মাসিক পত্রিকা, বামাবোধিনী পত্রিকা, অবলাবান্ধব, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকাগুলির লক্ষ্য ছিল মহিলাদের অবস্থার উন্নতি সাধন। তারই ফলস্বরূপ কৈলাশবাসিনী দেবী তাহেরম্মেসা, সৌদামিনী দেবী, মধুমতী গাঙ্গুলী, কৃষ্ণকামিনী, কামিনীসুন্দরী প্রমুখ নারী ব্যক্তিত্ব লেখনী ধারণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দিতে নারীমুক্তির আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। Womans Indian Association, All India womans conference প্রভৃতি দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৮ই মার্চ ১৯১৩ সাল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের স্বীকৃতি পায়। এইরকম কোনো বিশেষ দিবস কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নেই। সমগ্র বিশ্বব্যাপী নারীদের অবস্থান সম্পর্কে মনের মধ্যে আলোড়ন ওঠে এই দিনটির প্রেক্ষিতে। নারীকে বলা হয় অর্ধমানুষ।

অথচ স্বাধীনতার ৬৪ বৎসর পরও নারী পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। যে দেশে রাষ্ট্রপতি একজন নারী, কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে দেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সমানাধিকার থাকলেও জন্মের আগেই মৃত্যু পরোয়ানা নেমে আসে কন্যাজন্মের উপর। তিনমাসের শিশুকন্যা আফরিন ব্যাঙ্গালোরে বেসরকারী হাসপাতালে মারা যায় পিতার অত্যাচারে শুধুমাত্র কন্যা হওয়ার অপরাধে। ২০১০ সালের জনগণনা অনুসারে প্রতি হাজারে পুরুষ ৫১৭ ও নারী ৪৮৩ অর্থাৎ পুরুষ প্রতি নারী কম। পণপ্রথা নামক সামাজিক ব্যাধির কারণে গৃহবধূ হত্যা থেকে রেহাই পায়না এ যুগের নারীরাও। ২০১০ সালে গৃহবধূ হত্যার পরিসংখ্যান ৮৩৯১। ৬০ থেকে ৬৫ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের নিচে। বাল্যবিবাহ একটা সামাজিক সমস্যা। বাল্যবিবাহ বন্ধের আইন আছে কিন্তু সেই আইনের বাণী অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর কাছে পৌঁছায় না। আবার আমরা দেখতে পাই এই নিম্নশ্রেণীর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরাই বাল্য বিবাহ বন্ধে প্রতিবাদ করছে। তারমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কয়েক জনকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কৃতও করেছেন। এ যুগেও মেয়েরা যে কতটা অসহায়, অরক্ষিত তা আমরা দেখতে পাই ৫ই ফেব্রুয়ারী পার্কস্ট্রীটে একজন মহিলা নাইটক্লাব থেকে বাড়ী ফেরার পথে ধর্ষিত হন। বর্ধমানের কেতুগ্রামে কাটোয়া আহমেদপুর ন্যারো গেজ লাইনের ট্রেন থেকে নামিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতি একজন মহিলাকে ধর্ষণ করে। বরানগরে কাগজ কুড়ুনিকে গণধর্ষণের পর নিবেদিতা সেতুতে ফেলে পালায়। যখন অধিকাংশের অভিমত আদৌ কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটেনি বা প্রমাণ মেলেনি। সেই সময় এই দুই নারী শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হলেও প্রতিবাদ করতে ছাড়েনি। প্রশাসন বা আইন তাদের পাশে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে।

সভ্য সমাজও মেয়েদের সহজে স্বীকৃতি দিতে চায় না। আমরা দেখতে পাই প্রথম মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর ক্ষেত্রে মেডিকেল কলেজের বিলেত ফেরত শিক্ষক বরাবরই কাদম্বিনীর বিপক্ষে ছিলেন। তাকে ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করান নি। সেই কারণে এম. বি. পড়ার পরিবর্তে সেনেট 'লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যান্ড সার্জারি' পড়ার অনুমতি দিল। দুই বছর পর ফাইনাল পরীক্ষায় আবারও একজন পরীক্ষক তাকে ফেল করালেন, পুনর্মূল্যায়ন হলেও পাশ করালেন না।

তৎকালীন অধ্যক্ষ ড. কোটস তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাদম্বিনীকে 'গ্রাজুয়েট অব দ্য মেডিকেল কলেজ অব বেঙ্গল' উপাধি দিলেন। কাদম্বিনীকে ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করার লাইসেন্স দিলেন। ডাক্তারি প্র্যাক্টিস করায় মেডিকেল কলেজে তার চাকরিও হয়েছিল এই উপাধির ভিত্তিতে। কাদম্বিনী দেবীর তিন দশক আগে ইংরেজ মেয়ে এলিজাবেথ ব্ল্যাকওয়েল ইউরোপে কোথাও মেডিকেল পড়তে না পেয়ে আমেরিকার একটা অখ্যাত কলেজে থেকে পাশ করেন। এলিজাবেথ আভারসন ব্রিটেনের প্রথম মহিলা ডাক্তার কিন্তু কোনো কলেজ তাকে ক্লাস করতে দেয়নি। প্রাইভেট পড়ে তিনি ডাক্তারি পাশ করেন। ছাত্রদের সঙ্গে একই পরীক্ষা দিলেও এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেয়েরা পেতেন সার্টিফিকেট, ছেলেরা পেতেন ডিগ্রি। এই সার্টিফিকেট দিয়ে রেজিস্ট্রেশন জুটত না। কাদম্বিনীর আগে চন্দ্রমুখী বসু ১৮৭৬ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত ছিল, তার খাতায় নম্বর দেওয়া হলেও উত্তীর্ণদের তালিকায় নাম উঠবে না, পাশ করেও তাই সার্টিফিকেট পাননি চন্দ্রমুখী।

নারীদের সামাজিক অবস্থান পুরুষের থেকে অনেক স্বতন্ত্র হলেও একে একে তারা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। যদিও প্রথম দিকে তাদের আত্মপ্রকাশ পুরুষের সহায়তায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পুরুষ তার স্বামী, পিতা এবং অন্য কোনো পুরুষ। এই সমস্ত অন্তঃপুরিকারা যখন কলম ধরলেন তা প্রায় লুকিয়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাই স্বামীরা সাহস জুগিয়েছেন আবার কোথাও বিরুদ্ধতা। তবুও এর মধ্যেই চলেছে সাহিত্য চর্চা। এ সমস্ত লেখিকাদের বেশিরভাগই সাধারণ গল্প বা আত্মজীবনী রচনা করেছেন। কিন্তু এই সব গল্পের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও যে প্রতিবাদ ধরা পড়েছে এটাই যেন মনে হয়েছে, লেখিকার মনের কথা।

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণ। সমাজজীবনের কথা কাব্যে, উপন্যাসে, ছোটগল্পে, নাটকে, প্রহসনে ও প্রবন্ধে লেখা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফসল ছোটগল্পে সমাজের কথা আরো সার্থকভাবে তুলে ধরা যায়। সাহিত্যের এই জনপ্রিয় শাখাটির সমৃদ্ধি রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রাক্ রবীন্দ্র যুগেও এর উপাদান বহু লেখনীতে প্রকাশ পেয়েছে, সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রোত্তর যুগে বিষয়-বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নিয়ে এই শাখার আরো সমৃদ্ধি ঘটেছে। যুগে যুগে সমাজসচেতন গল্পকারগণ সমাজের কথা বলতে গিয়ে সমাজ জীবনের অসঙ্গতি গুলো তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি প্রতিবাদী চেতনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ধারা প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। এই ধারা পথেই বাংলা সাহিত্যে নারীবাদী লেখিকাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তারা প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের ভাষা দিয়েছেন এবং জনসমক্ষে প্রতিবাদী চেতনাকে সাহিত্যের অঙ্গনে এনেছেন।

আমার গবেষণার বিষয় ‘প্রতিবাদী চেতনার আলোকে বাংলা মহিলা গল্পকার (একশ বছরের সময়সীমায়)’ একশ বছরের সময়সীমায় বলতে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন পর্যন্ত সময়সীমাকে আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছি। এই সময়কার মহিলা গল্পকারদের গল্পের প্রতিবাদ দেখানোই আমার মূল প্রতিপাদ্য। একারণে আমি আমার গবেষণা কর্মকে পূর্ণরূপ দেবার জন্য ছ’টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। এজন্য প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর বিশিষ্ট ছোটগল্পকারদের ছোটগল্পে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই এসেছে মহিলা গল্পকারদের প্রসঙ্গ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরসীবালা দেবী প্রমুখ স্বাধীনতা উত্তর পর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা গল্পকাররা হলেন পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সাবিত্রী রায়, ছবি বসু, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন প্রমুখ। বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে তাঁদের গল্পের আত্মপ্রকাশ ঘটলেও আমি শুধু নির্বাচিত প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলিরই উল্লেখ করেছি। সেজন্যই আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে বারে বারে ছোটগল্পের কথা উঠে এলেও আমরা বিশেষভাবে গল্পকেই ব্যবহার করতে চেয়েছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিলা গল্পকারদের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রকৃত পরিচয় এবং তাদের গল্পসৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণার বিষয়টি আলোচনায় এনেছি। তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণারূপে দেশ, কাল ও সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি তাঁদের রচিত গ্রন্থগুলি কোন কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে সে তথ্য তুলে ধরতে ভুলে যাই নি।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এতে তৎকালীন সমাজ সমস্যা এবং সংকটের বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। লেখিকারা সেই সমস্যা থেকে উত্তরণের কোনো পথ নির্দেশ দিয়ে থাকলে, সেই নির্দেশিকা ব্যক্ত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলাগল্পকারদের গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। গল্পের বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণের সঙ্গে আঙ্গিক নৈপুণ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি, আয়তন, নামকরণের সার্থকতা, গল্পকথনরীতি, বর্ণনা নৈপুণ্য, নাটকীয়তা, কাব্যগুণ, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ইতিহাস চেতনা, পুরাণ চেতনা, প্রকৃতি চেতনা, রূপ বিশ্লেষণ, উপমা, চিত্রকল্প, সংলাপ নৈপুণ্য, সময় বিন্যাস, দেশী-বিদেশী শব্দের

ব্যবহার ও খন্ডের মধ্যে সমগ্রের প্রতীতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে গল্পগুলির শিল্পরূপ ও আঙ্গিক বিচার এবং মহিলা গল্পকারদের গল্পে আঙ্গিক পরিবর্তন কতটা ঘটেছে সে বিষয়টি তুলে ধরেছি।

আমার গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে তুলনার আলোকে মহিলা গল্পকারদের কথা। তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়েই গল্পকারদের স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। আমার গবেষণায় রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুবোধ ঘোষ প্রমুখ স্বনামধন্য গল্পকারদের ছোটগল্পে যেভাবে প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে তাদের সঙ্গে মহিলা ছোটগল্পকারদের গল্পের সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য কতদূর তা তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেছি।

সবশেষের অধ্যায়টির নাম উপসংহার। এই অধ্যায়ে একশ বছরের সময়সীমায় বিধৃত লেখিকাদের বাংলা গল্পে প্রতিবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের স্থান কতটা এবং তাঁরা ছোটগল্পে কোন অভিনবত্ব রেখে যেতে পেরেছেন কিনা ও শিল্পরূপের বিচারে গল্পগুলি কতটা রসোত্তীর্ণ এবং তাঁরা গল্পরচনার সময় অন্যান্য সাহিত্যিকদের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছেন তার যথাযথ মূল্যায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

গবেষণার কাজ করতে গিয়ে গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজো করেছে। গল্পকারদের গল্পের বহু লাইন দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছি। বলাবাহুল্য উল্লেখপঞ্জীতে সেগুলোর সবটা তুলে ধরে ভারাক্রান্ত করিনি। অনুরাগী পাঠকগণ গল্পগুলি পাঠ করে অতি সহজেই বুঝে নিতে পারবেন।

পরিশেষে বলতে হয়, উপরিউক্ত বিষয় অবলম্বনে খন্ডিত ও বিক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ত পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ হিসেবে এই গবেষণা প্রকল্পটি বিশেষ মাত্রা এনে দেবে আশা করি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গবেষণার বিষয়টি নিঃসন্দেহে একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম হিসেবে চিহ্নিত হবে বলে বিশ্বাস করি। অনালোকিত এই দিকটি নিয়ে গবেষণা কর্মটি একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আমার প্রত্যাশা।

પ્રથમ અધ્યાય

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত বাংলা গল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনা

যুগে যুগে মানুষ ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এসেছে। প্রতিবাদ শব্দের অভিধানিক অর্থ হলো আপত্তি। আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক দুর্নীতি, শোষণ দমন-পীড়ন-অনাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোই হল প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ। এর মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ বা আন্দোলন সংগঠিত হয়। সমাজের বিরোধী শক্তির পরাজয় হয়। সমাজের সংস্কার ঘটে। সমাজ সুস্থ-সুন্দর হয়। সমাজবদ্ধ মানুষ সুখী হয় স্বচ্ছন্দ হয়। আর 'বিদ্রোহ' শব্দটির অর্থ হল বশ্যতা বা আনুগত্য অস্বীকার, শাসন বা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতির বিরুদ্ধাচরণ করা। এই প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ আদিম যুগ থেকে শুরু করে আদ্যাবধি চলে আসছে। একটা সুস্থ শান্তিকামী উন্নত দেশে এর প্রবণতা কম। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রতিটি শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই কম বেশি প্রতিবাদ দেখা যায়। এই প্রতিবাদের জন্ম হল বৈষম্য থেকে ও অসংগতি থেকে। সত্য ও সুন্দরের পূজারী প্রতিটি মানুষ সত্য-সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যখন সত্য-সুন্দর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পদে পদে বাধার সৃষ্টি হয় তখনই মানুষ সেই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং তা থেকেই বিদ্রোহের সূচনা ঘটে। সেই সুদূর আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সবলরা দুর্বলের উপর অত্যাচার চালিয়ে আসছে সে পুরুষ বা নারী যাই হোকনা কেন।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজের সুস্থতা ও সৌন্দর্যেই সমাজবদ্ধ মানুষের মঙ্গল। সমাজের প্রতিটি মানুষের সম অধিকার থাকাটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম ঘটে। তখনই রূপ নেয় সমাজ বিদ্রোহের। সমাজ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ নূতন নূতন ভাবে রূপ নেয়। অত্যাচার শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য, কুসংস্কার থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটে। শোষকশ্রেণি ও শোষিত শ্রেণি, শ্রেণি বিভক্ত সমাজের ধারায় এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ জীবনে আমরা দেখি পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা ও বর্ণ বৈষম্য ও জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি নানা প্রতিবাদের জন্ম দিয়েছে। অন্যদিকে জোতদার ও জমিদার শ্রেণি কৃষকদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এর ফলে জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধছে। শিল্পপতিরা শ্রমিকদের উপর শোষণ যন্ত্র চালিয়ে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। ফলে শ্রমিকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

অন্যদিকে রক্ষণশীলদের সঙ্গে প্রগতিশীলদের দ্বন্দ্ব সংগঠিত হচ্ছে। রাজনৈতিক ভাষামি সমাজ জীবনকে যখন বিপথে পরিচালিত করে, তখন তার বিরুদ্ধে রাজনীতি সচেতন মানুষ রুখে দাঁড়ায়। অপরপক্ষে প্রশাসনিক দুর্বলতা যখন মানুষের জীবনকে বিষময় করে তোলে সে সময় প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়।

কোন ব্যক্তি যখন অন্যায় কাজ করে থাকে, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠে।

কোন পরিবারের কোন সদস্য যদি অন্যায় কাজে রত থাকে তখন সেই অন্যায় থেকে বিরত থাকবার জন্য অন্য সদস্যরা প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে।

সমাজের প্রচলিত প্রথা যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় তখন তার বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদ-মুখর হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক শোষণও প্রতিবাদের এক বৃহত্তর ক্ষেত্র। কিংবা ধর্মাত্মক মানুষ যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয় তখন সেই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এছাড়া রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে কিংবা প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি প্রবেশ করে ও শিক্ষার একটি বিচ্যুতিগুলো দূরীকরণের জন্য সচেতন মানুষ প্রতিবাদ জানায়।

প্রতিবাদের এই ক্ষেত্রগুলি যখন ভাষার মাধ্যমে রূপায়িত হয় তখনই তা প্রতিবাদী ভাষারূপে চিহ্নিত হয়। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাগুলির মধ্যে গল্পই হল প্রতিবাদী ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ দলিল এবং প্রকাশের মাধ্যম। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রথম সার্থক প্রকাশ ঘটেছিল। এই ধারাতেই বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত গল্পেরও সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

প্রতিবাদী চেতনার স্বরূপ বিশ্লেষণের পর আমরা এগিয়ে যাবো প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত বাংলা গল্পের ধারাবাহিক পর্যালোচনার দিকে যার মধ্য দিয়ে প্রাক্ স্বাধীনতা ও উত্তর স্বাধীনতা পর্বের মহিলা গল্পকারদের চিন্তা চেতনা ধরা পড়েছে।

নিম্নে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলি উল্লেখ করা চলে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের অন্যতম কথাকার। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্য নিয়ে তিনি গল্প রচনায় ব্রতী হন। তিনি তাঁর পরিচিত সমাজের মানুষের মধ্যে যে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা ও নিমর্মতা লক্ষ করেছেন, মানবতাবাদী লেখক হিসেবে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পশুবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের মুখোশ তিনি খুলে দিতে চেয়েছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের অসংগতিগুলি দূর করবার জন্য তিনি ব্যঙ্গ গল্পগুলো রচনা করেছেন। যে গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন হিসেবে বিবেচিত। সমাজজীবনের শূচিতা ও সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার জন্য তিনি সচেষ্টি ছিলেন। অপরাধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বিরুদ্ধে তিনি ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছেন এবং তাদের লঘু শাস্তি দিয়ে চারিত্রিক সংশোধনের ব্যবস্থা করেছেন। ‘কঙ্কাবতী,’ ‘বাঙাল,’ ‘নিধিরাম,’ ‘রূপসী,’ ‘হিরন্ময়,’ ‘ময়না কোথায়,’ ‘সে কালের কথা,’ ‘পাপের পরিণাম,’ ‘ফোকলা দিগম্বর’ প্রভৃতি উপন্যাসে উদ্দেশ্যমূলক দিক থাকলেও হাস্যরসের তুলিতে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের রঙে এসবকে রাঙিয়ে দিয়েছেন।

‘মুক্তমালা’, ‘ভূত ও মানুষ,’ ‘মজার গল্প’ ও ‘ডমরু’ চরিত্র প্রভৃতি গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে রূপকের আবরণে দেশকাল ও সমাজের প্রেক্ষিতে সরস মন্তব্যের ছোঁয়া রয়েছে। ‘ভূত ও মানুষ’ গল্পগ্রন্থে কিছু কল্পিত ভূত রয়েছে, যে ভূতগুলি রূপকের আড়ালে মানুষ। মানুষের অসংগতি দেখানোর উদ্দেশ্যে নিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ এই ভূত চরিত্রগুলিকে স্থাপন করেছেন।

প্রমথনাথ বিশীর মতে – “মানুষের অসংগতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের মানব সমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহুল প্রচলিত। কাজেই তাঁহাকে ত্রৈলোক্যনাথকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সঙ্গে সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।”^১

‘নয়ন চাঁদের ব্যবসা’ গল্পে নয়নচাঁদ কিভাবে ব্যবসাবাগি জ্য করে লাভবান হয়েছে তা দেখিয়েছেন। এটি একজন গুলিখোর নেশার আড্ডার গল্প। এই আড্ডা বসতো সন্ধ্যাবেলা। নয়নচাঁদ, লম্বোদর, গগন ও আরও কয়েকজন মিলে বসতো আড্ডার আসরে। মা শীতলার প্রতি যাতে আড্ডাধারীদের ভয় ও ভক্তি দুটোই জাগ্রত হয় সেই উপলক্ষে নয়নচাঁদ শীতলার স্বপ্নাদেশের গল্প শুনিতে যায়। কলকাতায় যখন বসন্ত রোগের হিরিক পড়ে তখন নয়নচাঁদ, খাঁটি মালমশলা দিয়ে একটি শীতলা মূর্তি তৈরী করে। কলকাতায় সে পাণ্ডা হিসেবে শীতলামূর্তি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষেতে বের হয়ে অর্থ রোজগার শুরু করে। একদিন মাতাল মিত্তিরদার বাড়িতে ভিক্ষে করতে গিয়ে নয়নচাঁদের যা অবস্থা হল - “মাতালের এক একটি কিলে” নয়নচাঁদের পিঠের “ছাল খুলিয়া গেল।” মাতাল নয়নচাঁদের সাধের শীতলা কেড়ে নিল। নয়নচাঁদ পালাল। মনে মনে সে শীতলাকে বলল-“মা! আর তোমার গান করিতে চাই না, তোমার চাল পয়সা আর চাইনা। পিঠের হাড়গুলি যে চুরমার হইয়া গিয়াছে। এখন তাই তুমি রক্ষা কর।”^২

নয়নচাঁদ মার খেয়ে পালিয়ে আসে। তার কিছুদিন পর মাতালটি নয়নচাঁদকে শীতলা নিয়ে আসবার জন্য একটি চিঠি দিল। মাতালটি ইতিমধ্যে মরে ভূত হয়ে গেছে। কর্তা ভূতটি নয়নচাঁদকে তার পরিণতি ও মর্ত্যে আগমনের গল্প শোনা। এই গল্পে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের অসাড়তা, দেব

আরাধনায় ভঙামি, ধর্ম ব্যবসায়ীদের বুজরুকির প্রতি গল্পকার ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন। ‘বিদ্যাধরীর অরুচি’ গল্পে আছে ব্যঙ্গ। এটি একটি কৌতুক রসের গল্প। নীলাম্বর ঘোষ এক ধনী গৃহস্থ। তার ঝি ও চাকরের অভাব নেই। তারা প্রত্যহ ভাঁড়ার লুঠ করে। এই নিয়ে কখনো কখনো নিজেরাই বিবাদে লিপ্ত হয়। বিদ্যাধরী ভালো জিনিসগুলো খেয়ে নিয়ে পুরুষোত্তমকে দোষী সাজায়। এরপর গিন্নীকে লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয় পুরুষোত্তমের হাতে। অতঃপর পুরুষোত্তমের বিতাড়ন ঘটে।

ত্রৈলোক্যনাথ চাকর, ঝি, ব্রাহ্মণদের উপর বেশী ক্ষমতা আরোপ করলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হয়, একথাই বলতে চেয়েছেন। ‘পূজার ভূত’ একটি মজার গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি জগমোহন রায়চৌধুরী ঘরজামাই করে রাখতে চেয়েছিল তার জামাতাকে। কিন্তু জামাই এতে অসম্মতি প্রকাশ করলে জগমোহন তার জামাই ও কন্যা রাসমণিকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং তার মুখদর্শন করবে না এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। দশ বছর পর পুজো উপলক্ষে বিধবা রাসমণি তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ফিরে আসে তার পিতৃগৃহে। মহাষ্টমীর দিনে কন্যা ও নাতনিকে জগমোহন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। বাড়ি থেকে যাবার সময় বিতাড়িত রাসমণি দুঃখে বাবাকে অভিশাপ দেয় তার বাবার গৃহ লক্ষ্মীশূন্য হবে। রাসমণির অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। পক্ষাঘাতে তার পিতার মৃত্যু হওয়াতে জমিদারের সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ত্রৈলোক্যনাথ ধর্মীয় ভঙামির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করেছেন। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য নিম্নলিখিত দুটি গল্প থেকে সার্থক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — “লুলু যখন বলে, আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা, যেরূপ অপকৃ মৃত্তিকাতাণ্ড জলস্পর্শে গলিয়া যায়” — তখন তত্ত্বকে সরিয়ে দিয়ে উপহাসটি সামনে চলে আসে। ‘পাপের পরিণাম’ কাহিনীর ধনুকধারী সনাতন হিন্দুধর্মের বিকৃত রূপটির কথা সুরালোকে এই ভাষায় জানায়, ‘মানুষকে ঘৃণা কর, ইহাই আমাদের ধর্মের সার, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম ইহা নহে, ইহা পাপ।’”^৩

‘ডমরুচরিত’ ত্রৈলোক্যনাথের অনবদ্য সৃষ্টি। মানুষের ভঙামি ও অসাধুতাকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন লেখক। কোথাও বা স্বদেশী মোহগ্রস্ত হুজুগ প্রিয় বাঙালিদের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। দেশের রাজনীতির অসাড়তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুযোগসন্ধানী নেতাদের ব্যক্তিত্বের অসাড়তা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, অকপট দেশভক্তিকে লেখক বিদ্রূপ করেছিলেন। যাদের মধ্যে স্বদেশ প্রেম নেই শুধু আছে অসৎ উপায়ে আখের গুছানোর চিন্তা, এমনই এক চরিত্র হল ডমরুধর। ডমরুধর অতি অসৎ। সে দুর্নীতিগ্রস্ত ধুরন্ধর ব্যবসায়ী। এঁটেল মাটি দিয়ে কাগজ প্রস্তুত হবে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বদেশী কোম্পানী খুলে শেয়ার বিক্রি করে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছে কোষাধ্যক্ষ ডমরুধর। পরে ব্যবসায় লোকসান দেখিয়ে টাকাগুলো সে আত্মসাৎ করে। এমনকি পার্টনার শংকর ঘোষকেও সে বঞ্চিত করে।

‘চিত্রগুপ্ত-যম-যমনী-পুঁইশাক’ এই গল্পে এক সন্ন্যাসীর প্রতারণায় ডমরুধরের মৃত্যু হয়। স্বর্গলোকে যাবার সময় দুজন যমদূত ডমরুধরকে যমরাজের বিচারসভায় নিয়ে আসে। বিচার চলাকালে যম ডমরুধরের কাছে শুনতে পেলেন সে একাদশীর দিনে পুঁইশাক খায়নি। সেই পুণ্যাত্মার আগমনে যমালয় পবিত্র হয়, শঙ্খবাজে, পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। ডমরুধরের জন্য একটি স্বর্গ নির্মাণ করেছেন বিশ্বকর্মা। যম যখন চিত্রগুপ্তের কাছে জানতে পারেন পৃথিবীতে তার আয়ু শেষ হয়নি। তখনই যম জ্রুন্ধ হয়ে আদেশ করেন তার মাথায় দশ ঘা ডাঙ্গস-মেরে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিতে। যমদূতের আঘাত খেয়ে ডমরুধর পৃথিবীতে আসে। ‘চঞ্চলার গাই গরু’ গল্পে ডমরুধর শঙ্কর ঘোষ ও ভিখু ডাক্তারকে প্রতারণা করে। এর ফলে তারা প্রতিশোধ নিতে আসে। তাঁরা চঞ্চলার গাই গরুর দেহের সঙ্গে ডমরুধরের দেহ বেঁধে রেখে যোগ্য শাস্তি দেন।

রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন —“বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র কথক ডমরুধরের জুড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কমলাকান্ত’ প্রমথচৌধুরীর ‘নীললোহিত’, ঘোষাল, পরশুরামের কৈদার চাটুজ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ কথক।।”। প্রসঙ্গত ‘কুস্তির বিভ্রাট’ গল্পটি উল্লেখ্য। মৃত কুমিরের পেটে সাঁওতাল রমণী ঝুড়ির উপর বসে বেগুন বিক্রী করছে এই আজগুবি গল্প শোনায় ডমরুধর। শঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করে সেখানে খোদেদে কোথায় পাবে। তার প্রমাণ দিতে গিয়ে কোমরে পড়ে থাকা কুমিরের দাঁত দেখিয়ে দেয়। এটি আজগুবি গল্প বললে ডমরুধর রেগে গিয়ে বলে- “আজগুবি গল্প কলির ধর্ম বটে।”৫

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন-“ডমরুধর বঙ্গসাহিত্যে একটি অপূর্ব সৃষ্টি। তাহার সমস্ত দুষ্ক্রিয়া শক্তি ও ঘোরতর নীচ স্বার্থপরতা সত্ত্বেও তাহার সপ্রতিভা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও আপনার সম্বন্ধে কাহিনী, নয়নচাঁদের ব্যবসা আমাদের সেই কথাই শোনায়।” ৬

ধারাবাহিকতার সূত্র ধরে এর পর এসেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথের জেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্র-সমকালে সাহিত্য চর্চা করে একটি নিজস্ব গল্পধারার প্রবর্তন করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত হন নি। স্বর্ণকুমারীর পূর্বে নারী সাহিত্যিকের প্রকাশ ঘটলেও তাঁদের লেখায় স্বর্ণকুমারীর মতো নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলার উল্লেখযোগ্য কোন ইঙ্গিত ছিল না। উনিশ শতকের নারী স্বাধীনতা উন্মেষের ঋণাত্মক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী পরিচিত। একদিকে পারিবারিক প্রভাব, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত সংস্কারমুক্ত চিন্তা স্বর্ণকুমারীকে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান করে দেয়। তাঁর গল্পে প্রগতিশীল মানসিকতার পরিচয় মেলে। নারী-পুরুষের সম-অধিকারের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাল-বিধবার বিবাহকে তিনি সমর্থন জানিয়েছেন। তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

নারীকল্যাণে নিবেদিত প্রাণা স্বর্ণকুমারী অনাথ ও অসহায় নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর রচিত গল্পে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মেলে। ডঃ ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন- “ব্যক্তি স্বর্ণকুমারীর অন্তরালে আত্মগোপন করেছিল একটি পারিপাট্য লব্ধ নারীমন। তাঁর শিল্পকর্মে সেই ‘নটনক্ষতর জবন’-রই জয়জয়কার।তিনি সমাজলাঞ্ছিত নারী ব্যক্তিত্বের বেদনা সমানভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন নিজের নারীসত্তার স্বভাব শক্তি দিয়ে। আর নারীত্বের এই রক্তক্ষরা গোপন বেদনার অনায়াস চিত্রণেই তিনি অভুলনীয় হয়ে উঠেছিলেন।” ৭

তাঁর গল্পে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ নেই কিন্তু সূক্ষ্ম প্রতিবাদ আছে। ‘কেন’, ‘রক্তপিপাসু’, ‘তিনটি দৃশ্য’, ‘যমুনা’, ‘পেনেপ্রীতি’, ‘লজ্জাবতী’, ‘ক্ষত্রিয় রমণী’, ‘নবডাকাতের ডায়েরী’, ‘চাবি চুরি’, ‘জীবন অভিনয়’, প্রভৃতি গল্পে সূক্ষ্মবোধ বিশ্লেষণের শক্তি ও মানবিকতার জয় ঘোষিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী যে সময় গল্প রচনা করেছেন তখন প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পের পূর্বসূরী হিসেবে কোন উল্লেখযোগ্য গল্পকারকে পান নি। ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যে ব্যঙ্গাত্মক উপাদান রয়েছে। স্বর্ণকুমারী তাঁর গল্পে ব্যঙ্গধর্মিতা পরিহার করেছেন।

এবার আসছি রবীন্দ্রনাথের কথায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সার্থক গল্পকার। তিনি তাঁর ‘গল্পগুচ্ছের’ চারটি খণ্ডে, ‘সে ও লিপিকা’ গল্পগ্রন্থে প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। নারীমুক্তি থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক পটভূমিতে তিনি তাঁর গল্পগুলি লিখেছেন। নারীমুক্তির ছবি আছে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-উপন্যাসে-গল্পে-নৃত্যনাট্যে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ঘরেবাইরে’ উপন্যাসে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন।

“স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার -সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।” ৮

এরূপ সমানাধিকারের কথা উল্লেখ করে নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে নারী, পুরুষের সমানাধিকারের কথা কেউ এভাবে জোর দিয়ে বলেন নি। তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। ঈশ্বরের প্রতি সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে।

“শুধু শূন্যে চেয়ে রব? কেন নিজে নাহি

চিনে লব সার্থকের পথ ?

.....

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার

কেন নাহি দিবে অধিকার

হে বিধাতা ?

.....

হে বিধাতা, আমারে রেখোনা বাক্যহীনা -

রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা

উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের পরে

জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে

কণ্ঠ হতে

নির্বীরিত স্রোতো।” ৯

সামাজিক অনুশাসনের রুদ্ররোষের শিকার নারীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে আর্জি জানিয়েছেন নারীর নিজ ভাগ্য জয় করবার জন্য সে দুটি হল -চৈতন্য, যা শিক্ষাসাপেক্ষ ও সংঘশক্তি, যা বর্তমানে শোষণভিত্তিক সমাজ পরিবর্তনের জন্য অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথকে নারীর দুঃখমোচনের ত্রাতা রূপে আমরা দেখি। মনের ভয় দূর করে আত্মরক্ষা করতে হবে নারীকে, শক্তি সঞ্চয় করে দুর্জনকে দমন ও দুর্বলকে রক্ষা করতে হবে নারীকে। তিনি একটি গানে লিখেছেন —

“সঙ্কোচের বিহুলতা নিজেরই অপমান।

সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না প্রিয়মান।

মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো

নিজেরে করো জয়.....।” ১০

নারীকে সবলা হওয়ার শক্তি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন- “গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সেদিন ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্য আলোচনার প্রাক্কালে বলেছেন,—

‘নারীর তপস্যা পুরুষের অনুকরণে নয়।’ আরও বলেছেন,

‘পৌরুষের ভারে চাপা পড়া নারীত্ব প্রেমের

পরশে আত্মোপলব্ধি করল’- চিত্রাঙ্গদার

এই কারিনী মানবধর্মের লীলা।” ১১

বহুদিন থেকে নারী-পুরুষ-এর সমানাধিকার নিয়ে চলে আসা বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে তিনি বললেন নারী পুরুষের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় তারই ফলস্বরূপ ‘চিত্রাঙ্গদা’ কাব্যে —

“পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি

হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।

যদি পার্শ্বে রাখি মোরে সঙ্কটে সম্পদে

সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে

পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।” ১২

এভাবে রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষের পায়ে-পা মিলিয়ে একই সাথে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়ে গেলেন। জীবনে গোধূলি লগ্নের কাব্য ‘আরোগ্য’তে রবীন্দ্রনাথ নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন-

“নারী তুমি ধন্যা,
আছে ঘর আছে ঘরকন্যা।
তারি মধ্যে রেখেছ একটুখানি ফাঁক।
সেথা হতে পশে কানে বাহিরের দুর্বলের ডাক।
নিয়ে এসো গুশুঘার ডালি,
স্নেহ দাও ঢালি।
সে জীবনলক্ষ্মীর মনে পালনের শক্তি বহমান
নারী তুমি নিত্য শোনো তাহারি আহ্বান।
সৃষ্টি বিধাতার
নিয়েছ কর্মের ভার,
তুমি নারী
তাহারি আপন সহকার।.....” ১৩

নারীর এই স্নেহময়ী, সেবাময়ী ও প্রেমময়ী রূপের উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ উচ্চভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। এই কল্যাণময়ী নারীর যখন অবমাননা ঘটে রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল মন তখন ব্যথিত হয়। তখন তিনি তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাব্যে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে ও ছোটগল্পে কবির প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুলি সম্পর্কে একসময় বলেছিলেন যে গল্পগুলিতে বাঙালি সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি প্রথম ধরা পড়েছে। পুরুষ তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক নারীদের শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অবমাননার রূপটি তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘দৈন্যপাওনা’ গল্পে। বঞ্চনা থেকেই নারীরা ক্রমে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

পণপ্রথা সমাজ জীবনের একটি দুষ্ট ক্ষত। এই প্রথার বিষময় ফল হিসেবে বঙ্গদেশের কতশত নারী অকালে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। একবিংশ শতাব্দীর দুরারোগ্য ভয়ঙ্কর ব্যাধির ভয়াবহতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের বলিষ্ঠ মতবাদ, ‘এমন লজ্জাকর ও অপমানকর প্রথা আর নেই। জীবনের সর্বপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দোকানদারী দিয়া আরম্ভ করা, যাহারা আজ বাদে কাল আমার আত্মীয় শ্রেণিতে গণ্য হইবে, আত্মীয়তার অধিকার স্থাপন লইয়া তাহাদের সঙ্গে নির্লজ্জভাবে, নির্মমভাবে

দরদাম করিতে থাকা এমন দুঃসহ নীচতা যে সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, সে সমাজের কল্যাণ নাই, সে সমাজ নিশ্চয়ই নষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছে”। ১৪

বিবাহ নামক পবিত্র সামাজিক সংস্কারটিকে কেন্দ্র করে ঘণ্যতম ব্যবসা-ফাঁদা এবং তার ভয়াবহ পরিণতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে ‘দেনাপাওনা’ গল্পে। এই গল্পের কেন্দ্রে আছে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উঠে আসা এক অসহায়া নারী চরিত্র, যার নাম নিরুপমা। বধু নির্যাতনের এটি একটি নির্মম চিত্র। দরিদ্র পিতা রামসুন্দর মিত্রের কন্যা নিরুপমার বিবাহ স্থির হয়েছে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত পাত্র হিসাবে রায়বাহাদুরের একমাত্র পুত্রকে হাত ছাড়া করতে চায়নি রামসুন্দর। অপেক্ষাকৃত অভিজাত বংশে বেশি পণ দেবার সম্মতি দিলেও বিবাহ বাসরে পণের টাকা জোগাড় করতে না পেরে নিরুপমার জীবনে শুরু হয় মানসিক বিড়ম্বনা। নিরুপমার মত মেয়েকে তার অর্থলোভী শ্বশুর-শাশুড়ি বুঝতে চেষ্টা করেনি। শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার-অনাদর-অন্যায়-উপেক্ষা ও অযত্ন পেয়েও পিতাকে দৃঢ়ভাবে পণ দিতে নিষেধ করেছে, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্না, নিরুপমা হয়ে উঠেছে বিদ্রোহিণী — “বাবা তুমি যদি আর এক পয়সাও আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পারবেনা, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।”

১৫

বাবার টাকার অঙ্কে মেয়ের মূল্য নির্ণয় করেছে রায়বাহাদুর। পণের টাকা সম্পূর্ণ দিতে পারেনি বলে নিরুপমার শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে পিতৃগৃহে যেতে দেয়নি। শেষে ভিটে বাড়ি সব বিক্রি করে শ্বশুরের সব ঋণ শোধ করে রামসুন্দর নিরুপমাকে নিতে এসেছিল। সেসময়ও নিরুপমার বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভাষা রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুনিয়েছেন —

“টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।”

নিরুপমার আরও জানিয়েছে — “আমার স্বামীতো এ টাকা চান না।”

পণপ্রথার বিরুদ্ধে নিরুপমার এই সংলাপগুলি আমাদের মনে রেখাপাত করে। ধীরে ধীরে বিনা চিকিৎসায় অবহেলায়, উপেক্ষায় ও নিজের শরীরের উপর যত্ন না নেওয়ায় অকালে ঝড়ে যেতে হল নিরুপমাকে।

তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে কত সমারোহ! চন্দনকাঠের চিতা সাজানো হল, ঘটা করে শ্রাদ্ধ হল। রায়বাহাদুর তার পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে মনস্থ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের চাবুক মেরেছেন নিম্নোক্ত সংলাপে —

“এবার বিশহাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।”

ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন — “আধুনিককালের ভদ্র বাঙালির ঘরের এই নির্মম

হৃদয়হীনতার পরিচয় সাহিত্যে এই প্রথম।” ১৬

এরূপ বধু নির্যাতনের আরেকটি গল্প হল- ‘শান্তি’। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি অত্যাচারের একটি জীবন্ত চিত্র ‘শান্তি’ গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এই গল্পের নায়িকা চন্দরা। চন্দরা এই গল্পে জানিয়েছে ভয়ঙ্কর বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। কুরি পরিবারের দুখীরাম ছিদাম ও তাদের দুই স্ত্রী রাধা ও চন্দরাকে নিয়ে অভাবের সংসার। পরিবারের নিত্যকলহের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং অশিক্ষা। একদিন দুখীরাম সারাদিন বেগার খেটে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসে। দুখীরাম বড় বৌ রাধাকে ভাত দিতে বলে কিন্তু তাদের ঘরে রান্নার উপযোগী এতটুকু চালও ছিল না। এজন্য রাধা দুখীরামকে ভাত দিতে পারে নি। দুখীরাম একথা সহ্য করতে না পেরে স্ত্রীর মাথায় দা দিয়ে আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে বড় বউ রাধার মৃত্যু ঘটে। এসময় রামলোচন খুড়ো বাড়িতে এলে ছিদাম দুখীরামকে বাঁচাবার জন্য রামলোচনকে বলে — “বাগড়া করিয়া ছোট বউ বড় বউ এর মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।”

এই সংবাদ রামলোচনের মাধ্যমে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ছিদাম স্ত্রী চন্দরাকে এই মিথ্যে অপবাদ ঘাড়ে নিতে বলে, এবং চন্দরাকে আশ্বাস দিয়ে বলে-“যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।” পুরুষশাসিত সমাজের একটি গর্হিত অপরাধ এইভাবে নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়া হল। অর্থাৎ নির্দোষ চন্দরাকে খুনী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে চন্দরার অন্তর অভিমানে ধিকারে ঘৃণায় প্রতিবাদে ভরে গেল। যে স্বামী তার স্বীকারোক্তি বিষয়ে চন্দরাকে শিখিয়েছিল যে সে তার বড় জা যখন বাঁট দা নিয়ে তাকে মারতে এসেছিল তখন দা দিয়ে তা ঠেকাতে গিয়ে কেমন করে লেগে গেছে তা বুঝতে পারে নি। অভিমানাহত চন্দরা একটি বারের জন্যও সেকথা বলেনি। পুলিশ দারোগা, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হাকিম ও জজকে সে বলেছে-“আমি খুন করেছি।”

তার কাছে তুচ্ছ জীবন রাখার ইচ্ছা প্রকাশ পায়নি বরং মৃত্যুই তার কাছে অনেকবেশি সম্মানের মনে করে বেছে নিয়েছে আত্মহত্যার পথ। ফাঁসীর আদেশ হবার পর স্বামীকে মৃত্যুর আগে দেখতে চায় কিনা, এর উত্তরে চন্দরা একটি কথাই বলেছিল-‘মরণ!’ এই শব্দের উচ্চারণের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই ‘শান্তি’ গল্পে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘অপরিচিতা’ রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে তিনি পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। গল্পটিতে আমরা লক্ষ করি বরপক্ষ বিয়ের আসরে পৌঁছে গেছে। পূর্ব চুক্তি মত কন্যাপক্ষ একাধিক যৌতুক ও দানসামগ্রী ঠিক-ঠাক মতো দিয়েছে কিনা তা যাচাই করতে গিয়ে বরের মামা পাত্রীর গায়ের স্বর্ণালঙ্কার খুলে নিয়ে ওজন করতে বসেছে। এই অবিশ্বাস্য

ঘটনায় পাত্রসহ বরপক্ষের কেউ-ই প্রতিবাদ জানায়নি বরং পরোক্ষভাবে তা সমর্থন করেছে। কন্যাপক্ষ তাদের শর্ত অনুযায়ী যতটুকু স্বর্ণালঙ্কার দেবার কথা ছিল তার এক রতিও কম দেয়নি বরং আরও বেশি দিয়েছিল। সেই অলঙ্কারগুলি ছিল প্রত্যেকটি খাঁটি সোণায় তৈরি। কিন্তু বরপক্ষ কন্যাকে আশীর্বাদের জন্য যে স্বর্ণালঙ্কার দিয়েছিল তাতে সোনার ভাগ ছিল খুবই কম। কনের বেলায় নকল সোনা দেওয়ায় কন্যাপক্ষ কোনোরূপ প্রতিবাদ জানায়নি। শম্ভুনাথবাবু তার কন্যার বিয়েতে বরপক্ষের এরূপ আচরণের জন্য প্রীত হননি বরং তাদের প্রতি ঘৃণা মনোভাব পোষণ করেছেন। তিনি বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নের কোনোরূপ ত্রুটি করেননি। কিন্তু বরপক্ষের বিশ্বস্ততার অভাবজনিত কারণে তিনি কন্যাকে সম্প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কল্যাণীও বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করতে পেরেছিল, —
“আমি বিবাহ করিব না।”

পণপ্রথার বিরুদ্ধে এরূপ প্রতিবাদ জানিয়ে শম্ভুনাথ যে সাহসের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা নিঃসন্দেহে অর্থলোভী বরপক্ষের শিক্ষার বিষয়।

‘হৈমন্তী’ নারী অবমাননার বিরুদ্ধে একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। পাত্রপক্ষের অমানবিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিতা হৈমন্তী প্রতিবাদ জানিয়েছে। বয়স একটু বেশি বলে কন্যার বিয়েতে গৌরীশংকর পণের টাকা বেশি দিয়েছেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূ হৈমন্তীর বেশি বয়সটাকেই ত্রুটি বলে ধরে নিয়ে তার ওপর অবিচার করেছে। হৈমন্তী ছিল গৌরীশংকরের একমাত্র কন্যা। সুতরাং চাকুরে হওয়ার সুবাদে তার বাবার ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত আছে এসংবাদ পেয়েছিল ছেলের বাবা। এসংবাদ শোনার পর হৈমন্তীকে আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি করেনি। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল কন্যার পিতা উচ্চসুদে ঋণ নিয়ে পণ মিটিয়েছে। লাখ টাকার গুজব যে সম্পূর্ণ ফাঁকিতে পরিণত হয়েছে এটা ভেবে শ্বশুর-শাশুড়ি পুত্রবধূর ওপর বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে। আত্মীয়রা হৈমন্তীর বয়স জিজ্ঞেস করলে হৈমন্তী সত্য কথাই জানিয়েছে। শাশুড়ির নির্দেশমতো কম বয়স বলে মিথ্যে কথা বলেনি। তার সুশিক্ষা, রূচিবোধ, সেবায়ত্ন ও সকলের প্রতি একটি স্নিগ্ধ মনোভাবের মূল্য শ্বশুরবাড়িতে দেয়নি।

হৈমন্তী পিতার কাছ থেকে মহৎ গুণগুলো শিক্ষা লাভ করেছিল। পিতার মতো সে হয়ে উঠেছিল বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, উদার ও সত্যবাদিতার প্রতীক। অথচ শ্বশুর-শাশুড়ির নীচতা, ক্ষুদ্রতা, যখন বেড়ে যাচ্ছিল হৈমন্তী তখন স্বৈচ্ছায় তিলে-তিলে আত্মহত্যার পথকেই বেছে নেয়। তার বর সবকিছু জেনেও এতটুকু প্রতিবাদ করেনি।

হৈমন্তীর স্বামীর মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গুনিয়েছেন, —

“স্ত্রীকে লইয়া জোর কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহু যুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জান তোমরা ? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। গুনিতেছি মা পাত্রীর সন্ধান



করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহাও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, আর কাজ কি?”

রবীন্দ্রনাথ এরূপ গৃহবধূর ওপর অত্যাচার বিষয়ে স্বামীর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এজন্য সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথ হৈমন্তীর নামটি পর্যন্ত গল্পে উল্লেখ করেননি। এরপর গৌরীশংকর তার কন্যাকে দেখতে এলে অভিমানবশত হৈমন্তী তার বাবাকে জানাল, —

“বাবা, আর যদি কখনো তুমি দেখিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়ীতে আসো তবে আমি ঘরে কপাট দিবা।”

— মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হৈমন্তীর এই বক্তব্যে ধরা পড়ে পিতার অপমান আসলে তারই অপমান।

‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে নারীর অপমান, অসম্মানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে। মৃণাল একটি বিদ্রোহিণী চরিত্র সে দীর্ঘ পনেরো বছরের দাম্পত্য জীবনকে হিন্ন করে দিতে চেয়েছে। কেননা পরিবারে তার অবস্থান শুধুমাত্র কর্তব্য ও দেনাপাওনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই দেনাপাওনার হিসাব একটু ভিন্ন প্রকারের। পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থপরতা থেকে মৃণাল মুক্তি চেয়েছিল। বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার পর তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। তখন সে বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বিন্দু মুক্তি পেতে চেয়েছে যন্ত্রণাময় এই সংসার থেকে। পরিশেষে পুরুষ সমাজকে ধিক্কার দিয়ে সে বলেছে,— “মেয়েদের কাপড়ে আগুন দিয়ে মরা একটা ফ্যাশন হয়েছে।”

বিন্দুর আত্মহনন কোনো পলায়ন মনোবৃত্তি নয়, নির্যাতিতা নারীর দৃষ্ট প্রতিবাদ। অসম্মান, করুণার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাকা মৃণালের অসহ্য মনে হয়েছে। একদিন সে তার স্বামী-সংসার ছেড়ে চলে গেছে শ্রীক্ষেত্রে। সেখান থেকে সে চিঠিতে লিখেছে— “আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।” এবং তাঁর শেষ উক্তি — “আমিও বাঁচব।” -এর মধ্যে নারীমুক্তির পরিচয় মেলে।

রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়’ গল্পেও আছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে উপেক্ষার প্রসঙ্গ। এ গল্পে ভূপতি একটি ইংরেজী সাময়িক পত্রের সম্পাদক। পত্রিকা সম্পাদনের কাজে সে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে। তার স্ত্রী চারুলতা সন্তানহীনা। ভূপতি স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করেনি। এজন্য চারুলতা নিজেকে প্রতিনিয়ত সঙ্গীহারা বলে মনে করত। অন্তঃপুরে বন্দিনী চারু নিঃসঙ্গতায় হাঁপিয়ে ওঠে। এই অবসরে অমলকে কেন্দ্র করে সে এক স্বপ্নের জগৎ গড়ে তুলেছিল। বাগান তৈরীর পরিকল্পনা, সাহিত্যচর্চা এগুলির মধ্যে দিয়েই অমল ও চারুলতার মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠেছিল। তাতে তাদের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ তৈরী হয়নি। চারুলতার অন্তরে দেওর অমলের

জন্য যতটুকু জ্ঞান ছিল অমলের স্বৈচ্ছাবিদায়ের দিনে তা এক দ্র্যাজিক পরিণতি বহন করে এনেছিল। চারুর সঙ্গে ভূপতির সামাজিক বন্ধন ঘটেছে, কিন্তু মানসিক বন্ধন ঘটেনি। ভূপতির বক্তব্যটি এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য —

“যে নারী অন্তরের মধ্যে মৃত প্রেমের মাধুরী বহন করে, সংসার তার পক্ষে কত দুঃসহ, স্বামী তার কত বড় বন্ধন, আর সেই নিপুঙ্ক শোক পরায়ণা নারীকে ভালবাসা স্বামীর পক্ষে কত কঠিন।”

— এক্ষেত্রে পুরুষকে চিরকাল — “যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছে তাহার ভাঙা হুঁট কাঠগুলো ফেলিয়া যাইতে পারিবনা। কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে।”

— এই গল্পে আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেমসমস্যা এবং তাকে কেন্দ্র করে জটিলতা দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে বিবাহিতা নারীর স্বাধীন প্রেম সমাজের চোখে নিন্দনীয়। এদিক থেকে ‘নষ্টনীড়’ গল্পটি একটি সমাজবিদ্রোহমূলক সার্থক গল্প।

‘পয়লা নম্বর’ রবীন্দ্রনাথের একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা অনিলা একটি বিদ্রোহিণী নারী। সে তার স্বামী অদ্বৈতচরণের কাছ থেকে কোনদিনও জীব মর্যাদা পায়নি। অদ্বৈত তার দল ও পড়াশুনা নিয়ে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত। জীব চাওয়া-পাওয়া। আনন্দ, হাসি, গানের প্রতি কোন দৃষ্টি তার ছিল না। জীব ভালো-মন্দের খবর সে কোনদিন রাখেনি। একদিকে স্বামীর অবহেলা, অন্যদিকে প্রতিবেশী সিতাংগুর লুন্ধ দৃষ্টি এই দুই অবমাননা থেকে মুক্তিলাভের জন্য দু’জনকেই চিঠি লিখে অনিলা স্বামীগৃহ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। চিঠির বক্তব্য —

“আমি চললুম। আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না, খুঁজে পাবে না।”

— অনিলার এই বন্ধনমুক্তির বাসনা নিঃসন্দেহে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে একটি প্রদীপ্ত প্রতিবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

‘পাত্রপাত্রী’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন। এই বন্ধনে আবদ্ধ হবার ব্যাপারে পাত্র ও পাত্রীর পছন্দ অপছন্দের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যখন পাত্রের বাবা পাত্রকে না জানিয়েই বিবাহ স্থির করে ফেলে তখনই শুরু হয় পিতা ও পুত্রের মধ্যে মতান্তর। গল্পের নায়ক সনৎকুমার। সে পণ্ডিত মশায়ের মেয়ে কাশীশ্বরীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। এর পেছনে বাল্যপ্রণয় প্রসঙ্গটি জড়িত। সনৎকুমারের মা আন্তরিকভাবে চেয়েছিল কাশীশ্বরীর সঙ্গেই ছেলের বিয়ে হোক। কিন্তু এই বিয়ের ব্যাপারে বাধ সাধলেন সনৎকুমারের বাবা। তিনি ছেলের বিয়ে তো ভেঙে দিলেনই এমনকি পণ্ডিত মশাইকেও দেশছাড়া করলেন। এরপর সনৎকুমার এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। তার বাবা এক সম্পন্ন পরিবারের গুচিবায়ুগ্রস্তা কন্যার সাথে তার বিবাহ স্থির করে। সনৎকুমার কিন্তু তার পিতার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। এতে পিতা পুত্রের মধ্যে বিরোধ

সৃষ্টি হয়। সনৎকুমার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। পরিশেষে সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য ব্যবসার কাজে নেমে পড়ে। এদিকে তার যৌবন অতিক্রান্ত। প্রৌঢ় বয়সে তার একটি সঙ্গিনীর প্রয়োজন অনুভব করে সে এক হেডমাস্টারের কন্যাকে বিয়ে করে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ‘পাত্রপাত্রী’ গল্পে আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বক্ষ্যমান গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের ‘ম্যানেজারবাবু’ একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পটি ‘গল্প-সল্প’ গ্রন্থ থেকে সংকলিত। ম্যানেজারবাবু হলেন জমিদারের নায়েব। তিনি অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৎকালে পুণ্যাহের দিনে প্রতিটি প্রজাকেই ভেট নিয়ে আসতে হত। যারা দরিদ্র প্রজা তাদের পক্ষে জমিদারদের বাৎসরিক খাজনা আদায়ের দিনে ভেট দেওয়া সাধ্যের অতীত ছিল।

ম্যানেজারবাবু পুণ্যাহের দিনে দুধ স্নান করবার ইচ্ছে প্রকাশ করল, সে নিজেকে প্রজাদের চেয়ে উর্ধ্বে এবং অসাধারণ ভাবত। এক গোয়ালী তার নির্দেশ মত ঘড়া ঘড়া দুধ এনে দেয়। ম্যানেজারের হুকুম সে অমান্য করেনি, আপাত দৃষ্টিতে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না থাকলেও পরোক্ষভাবে পাঠক মনে এধরনের দাম্ভিক ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

‘ত্যাগ’ গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পিতা হরিহর পুত্র হেমন্তকে কুসুম নামে একজন বাল্যবিধবার সঙ্গে বিয়ে দেয়। হরিহর কুলীন ব্রাহ্মণ, সে জানত না কুসুম বাল্যবিধবা শূদ্রকন্যা। এব্যাপারে প্যারীশঙ্করের সক্রিয়তা ছিল। এই সত্যঘটনা প্রকাশ হবার পর রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হরিহর রেগে যায়। ব্রাহ্মণের জাত নষ্ট করে সমাজের নীতি লঙ্ঘনের জন্য হরিহর তার পুত্রের উপর গর্জন করে জানাল —

“হেমন্ত বউকে এখনই বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।”

— হেমন্ত কিন্তু বাবার কথা রাখেনি কেননা হেমন্তের সঙ্গে কুসুমের ছিল বাল্য প্রণয়। আর বিয়েটাও হয়েছিল তার পিতার ইচ্ছাতেই। সুতরাং হেমন্ত উপলব্ধি করেছে, “সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর!” সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। ওদিকে পুনরায় হরিহর মুখুজ্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন— “অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারিনা। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।”

— “আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।”

হরিহর কুসুমকে পুত্রবধূর সম্মানসূচক ভাষা প্রয়োগ না করে তামিল্য ভাবে ‘মেয়েটা’ শব্দ উচ্চারণ করেছিল। কিন্তু হেমন্ত স্ত্রীকে সম্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করেছে। পিতা ও পুত্রের এখানেই বৈপরীত্য। হরিহরের তর্জন-গর্জন তখনো থামেনি। - জাত খোয়াইবি?

“.....আমি জাত মানিনা।”

পিতার বিরুদ্ধে ছেলের এই প্রতিবাদপ্রবণ মানসিকতার মধ্যে হেমন্তের ব্যক্তিত্বের পরিচয় মেলে। সে ভীৰু ও নিষ্ক্রিয় চরিত্র নয়। তার বিবেকবোধ ছিল বলেই পিতার অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তার কাছে জাতপাতের উর্ধ্বে উদার মানবতার ধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে। অন্তঃসারশূন্য এই সামাজিক রীতিকে সে মেনে নিতে পারেনি।

কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের লেখা সার্থক গল্প ‘মহামায়া’। মহামায়া কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যা। অকুলীন ব্রাহ্মণ রাজীব ছিল মহামায়ার বাল্য সঙ্গী। সে তার বংশগৌরবের অভিমানে যে রাজীবের প্রেমের মূল্য দেয়নি সেই মহামায়াই বংশগৌরবের কথা ভুলে গিয়ে বলেছে - “মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।”

কৌলীন্য অকৌলীন্যের প্রশ্ন মহামায়ার কাছে নিতান্ত গৌণ। তার রক্ষণশীল বড় ভাই ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায় রাজীবের সঙ্গে মহামায়ার বিয়ে না দিয়ে ঘাটের মরার মত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে মহামায়ার বিয়ে দিল। বিয়ের পরের দিনই মহামায়ার স্বামীর মৃত্যু হল। তৎকালীন নিয়মানুসারে বিধবা ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়। কাঠ, ঘি, দিয়ে মৃত স্বামীর পাশে জীবিত অবস্থায় মহামায়া কে তুলে দেওয়া হয়। চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। এই সময় প্রবল বর্ষণে চিতার আগুন যায় নিভে। সেই দক্ষ অবস্থায় মহামায়া সামাজিক নিয়মকে উপেক্ষা করে চলে আসে রাজীবের গৃহে।

আলোচ্য গল্পে রবীন্দ্রনাথ কৌলীন্য প্রথাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন।

‘মানভঞ্জন’ গল্পের নায়িকা গিরিবালা সে তার স্বামীর উপেক্ষার পাত্রী। স্বামী তাকে স্ত্রী হিসেবে কোন মর্যাদা দেয়নি। গিরিবালা পুরুষের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু স্বামীর এই প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিরিবালা প্রতিবাদ জানিয়েছে। গিরিবালা অভিনেত্রী হয়ে যখন যথার্থ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়ে বহু শ্রোতা ও দর্শকের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে তখন সে বুঝল সে স্বামীর উপেক্ষার পাত্র হলেও অপরের কাছে সে একান্ত প্রিয়। সমাজে তার মূল্য যথেষ্ট। অভিনেত্রী হয়ে সে বহু পুরুষকে বশীভূত করতে পারে। সে আপন ভাগ্য জয় করে নিতে পেরেছে। ব্যক্তির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ‘মানভঞ্জন’ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং সংসার নামক গভীর বাইরে বেরিয়ে এসে একজন নারী যে নিজ সত্তাকে বিকশিত করে সমাজের প্রিয় হয়ে উঠতে পারে সেটাও এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন।

‘দুরাশা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ জাত-পাতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন, ব্রাহ্মণ্য অহংকারকেও ভেঙে দিতে চেয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহকালে বদ্রাওনের নবাবের ফৌজের হিন্দু অধিনায়কের নাম ছিল কেশরলাল। কেশরলাল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তার আচার নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়েছিল নবাবপুত্রী। যখন নবাব ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেশরলালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার

করেছিল সে সময় কেশরলাল তা বুঝতে পেরে নবাব মহল ত্যাগ করে। নবাবপুত্রী পিতার এই আচরণকে ভালোচোখে দেখেনি। সে কেশরলালের কাছে তার সমস্ত গহনা পাঠিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে ইংরেজরা কেশরলালের বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। কেশরলাল বাহিনী অপ্রস্তুত যুদ্ধে পরাজিত হয়। নবাবপুত্রী তার পিত্রালয় ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। আহত অবস্থায় নবাবপুত্রী কেশরলালের মুখে জল দেয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এসে কেশরলাল নবাবপুত্রীকে বিধর্মী বলে তিরস্কার করে চলে যায়। গৃহত্যাগী নবাবপুত্রীও বের হয়ে পড়ে অজানার পথে। নবাবপুত্রী ছিল সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী। প্রেমের কাছে জাত-পাত মূল্যহীন বলে সে মনে করেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য সংস্কার বশত কেশরলাল এই প্রেমের মূল্য দেয়নি। দীর্ঘকাল পর নবাবপুত্রী যখন কেশরলালের সাক্ষাৎ পেয়েছিল তখন তার অবরুদ্ধ হৃদয় বাধা মানেনি, কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সে দেখলো কেশরলাল বিবাহিত একটি ভুটিয়া বস্তিতে স্ত্রীকে নিয়ে সংসারজীবন যাপন করছে। এই দৃশ্যটি নবাবপুত্রীর কাছে ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক, - “আমি জানিতাম ধর্ম অনাদি অনন্ত.....হায় ব্রাহ্মণ তুমিতো তোমার এই অভ্যাসের পরিবর্তে আরেক অভ্যাস লাভ করিয়াছ। আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আরেক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।” কেশরলালকে পাবার জন্য তার যে নিরলস সাধনা যার দ্বারা সে মুসলমান থেকে ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয়েছে তার সবটাই কেশরলালের পরিণতি দেখে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।

‘যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ’ একটি উৎকৃষ্ট প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্প। এই গল্পে কন্যাপক্ষের প্রতি বর পক্ষের নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যজ্ঞেশ্বরের সুরূপা কন্যা কমলা। বিভূতিভূষণ দরিদ্র যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এই বিয়েতে বিভূতিভূষণের পিতার সম্মতি ছিলনা। ধনগর্বে গর্বিত হয়ে তার পিতা যজ্ঞেশ্বরকে অপদস্থ করবার জন্য মতলব আঁটলো। বিয়ের দিনে বরযাত্রীসহ বরকর্তা যজ্ঞেশ্বরের গৃহে উপস্থিত। সাধ্যমত বরযাত্রীদের আদর, আপ্যায়ন করলেও প্রবল বর্ষণের ফলে বরযাত্রী সংবর্ধনায় কিছুটা ক্রটি থেকে যায়। যেখানে আহারের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সে স্থানটি হয় জলমগ্ন। খাদ্য পরিবেশনকালে পাত্রের পিতার অঙ্গুলি নির্দেশে বরযাত্রীদের খাদ্যবস্তুর মধ্যে কাঁদা ছিটিয়ে দিয়ে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠল একদল। এরূপ আচরণের জন্য যজ্ঞেশ্বরের চোখে এল জল। বিয়ে পণ্ড হয়ে যাবার উপক্রম হলে বিভূতি তার পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে - “বাবা আমাদের এ কিরকম ব্যবহার।”

এরপর খাদ্য পরিবেশনের কাজে বিভূতি নিজে অংশগ্রহণ করে। তার বাবাকেও সে খাদ্য পরিবেশন করে। বিভূতিভূষণের উদারতা ও দৃঢ় সংকল্পের জন্য কমলার সঙ্গে তার বিবাহের মিলন-মধুর পরিবেশ রচিত হয়। বিভূতির ব্যক্তিত্বের ফলে তার পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে

পেরেছে। পিতার মতের বিরুদ্ধে বিভূতির এই সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

‘পুত্রযজ্ঞ’ রবীন্দ্রনাথের একটি প্রথম শ্রেণির গল্প। নিরাপরাধী স্ত্রী বিনোদিনী এই গল্পের নায়িকা, নায়ক বৈদ্যনাথ। একে একটি নিষ্ঠুর কাহিনী বলা যেতে পারে। নারীজাতির অবমাননা মূলক গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বৈদ্যনাথ চেয়েছিল বিনোদিনীর গর্ভে একটি সন্তান আসুক। সন্তানসম্ভবা বিনোদিনীকে বৈদ্যনাথ চরিত্রদোষ দিয়ে তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নিরুপায় বিনোদিনী অন্তঃসত্তা অবস্থায় চলে যায়, এবং তার একটি পুত্র সন্তান হয়। এদিকে বৈদ্যনাথ একাধিক বার বিয়ে করেছে। কিন্তু তার ভাগ্যে পুত্রমুখ দর্শন হয়নি। পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টী যজ্ঞের আয়োজন করে। সাধু সন্ন্যাসীদের আহ্বাদির ব্যবস্থা করে। ইতিমধ্যে বৈদ্যনাথ গ্রাম থেকে শহরে এসে অবস্থাপন্ন হয়ে ওঠে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেসময় গ্রামের সাধারণ মানুষ খাদ্যের প্রত্যাশায় শহরে এসে ভিড় জমায়। বিনোদিনীও তার ক্ষুধার্ত শিশুপুত্রকে নিয়ে বৈদ্যনাথের গৃহের অভ্যন্তরে যাবার জন্য ঢুকেছিল। ক্ষুধায় কাতর স্ত্রী লোকটি অত্যন্ত করুণভাবে জানালো - “ওগো এই ছেলেটিকে দুটি খেতে দাও। আমি কিছু চাইনে।” বৈদ্যনাথের গৃহের গুরুদয়াল এসে সেই বালকটিকে এবং তার মাকে তাদের গৃহ থেকে বিতাড়িত করে দিল। আসলে এই ক্ষুধার্ত বালকটিই যে বৈদ্যনাথের পুত্র বুঝতে পারলো না। রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন —

“একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।”

যে পিতা পুত্র কামনায় পুত্রযজ্ঞের আয়োজন করেছিল তারই পুত্রকে নিতান্ত অবহেলায় বিতাড়িত করার মধ্যে যে অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণের পরিচয় দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের ‘মধ্যবর্তিনী’ গল্পটি মনস্তত্ত্বমূলক হলেও এর মধ্যে মিশ্রিত হয়ে আছে প্রতিবাদের সুর। বহুবিবাহের বিষয় ফল এই গল্পে প্রতিফলিত। এই গল্পে আমরা দেখি নিবারণ ও হরসুন্দরী দুই নায়ক নায়িকার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কোন সন্তানের আবির্ভাব হয়নি। পুত্র সুখে সুখী করতে হরসুন্দরী বালিকা শৈলবালার সঙ্গে তার স্বামীর বিয়ে দেয়। বিয়ের পর নিবারণ তার তরুণী ভার্যাকে নিয়ে বেশি সময় অতিবাহিত করে। দ্বিতীয় পত্নীর মন রাখার জন্য মিতব্যয়ী নিবারণ ঋণগ্রস্ত হয়। এই ঋণের টাকা মেটাতে সে অসৎপথে পা বাড়ায়, অফিসের টাকা আত্মসাৎ করে। এই অভিযোগে যদিও তাকে পুলিশে দেওয়া হয়নি কিন্তু দুদিনের মধ্যে সবটাকা ফেরৎ দিতে হবে একথা স্বীকার করিয়ে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় গহনা লোভী শৈলবালাকে পূর্বেই হরসুন্দরী সব গহনা দিয়ে দিয়েছিল। নিবারণের এই দুঃসময়ে হরসুন্দরী ও নিবারণ দুজনেই শৈলবালাকে অনুনয় বিনয় প্রার্থনা ও শেষে ভয় দেখালেও বিপদের দিনে একরতি সোনা দিয়েও নিবারণের সম্মান রক্ষায় সহযোগিতা করেনি।

তারপর বাড়ি বিক্রি করে নিবারণ সেই ঋণ পরিশোধ করে এবং আশ্রয় নেয় একটি ভাড়া বাড়িতে। ইতিমধ্যে শৈলবালা গর্ভবতী হয় এবং সে ভীষণভাবে অসুস্থ হয়, হরসুন্দরী তখন দিবারাত্রি শৈলবালাকে সেবা গুশ্রুষা করে বাঁচাতে চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। কিন্তু শৈলবালার মৃত্যু পর উভয়ের মধ্যে বিভাজন রেখা তৈরি হয়, তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরে, শৈলবালা মধ্যবর্তিনী হয়েই থেকে যায়। হরসুন্দরীকে যখন শৈলবালার দাসী হয়ে থাকতে হয়েছিল সেই বেদনা হরসুন্দরী কখনো ভুলতে পারেনি। যদিও শৈলবালার প্রতি হরসুন্দরীর কোন অভিযোগ ছিলনা। সারা জীবন ধরে নিবারণের গৃহে জাঁতাকলে পেশাই হয়েছে মাত্র। শৈলবালাকে নিবারণ যতটা ভালোবেসেছে তার সিকিভাগ ভালোবাসাও সে পায়নি, এটাই তার অভিমান। এভাবে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে অভিমানাহত হরসুন্দরীর পক্ষ অবলম্বন করে বহুবিবাহ নামক কুপ্রথার প্রতি ব্যঙ্গ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘হালদার গোষ্ঠী’ গল্পে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। বনোয়ারীলাল প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেছে যা অনেকটা বিদ্রোহের রূপ নিয়েছে। পিতা মনোহর দরিদ্র প্রজা মধু কৈবর্তের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মনোহরলালের বিশ্বস্ত ভৃত্য নীলকণ্ঠকে বিষয়-আশয় ও জমিদারের কাজের দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। কিন্তু তার পুত্রকে সে দায়িত্ব দেয়নি। বনোয়ারি ছিল প্রচলিত প্রথাধর্মের বিরোধী। সে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলেই কারো দাসত্ব স্বীকার করতে চায়নি। পিতা তাকে মাসোহারা দিতে চাইলে সে তা গ্রহণ করেনি। মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার স্ত্রী-কিরণ ও ভাই বংশধর পরগাহার মতো হয়ে বেঁচেছিল, যা বনোয়ারির পছন্দ হয়নি। একসময় কিরণ ও বংশীকে সে ভালোবাসত। কিন্তু বনোয়ারি দেখল কিরণ ও বংশী হালদার গোষ্ঠীর কেউ নয়। ব্যক্তি নয়, পরিবারের অংশ তারা। এই কারণে বনোয়ারি সেই পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমনকি সে তার পিতার মৃত্যু হলে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করেনি।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — “যে পরিবারের কথা উপস্থিত করিয়াছি তাহার মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য মানুষ যে বনোয়ারিলাল, তাহাতে সন্দেহ নাই.....”

‘সংসারের ছোটো কুনুকের মাপের বাঁধা বরাদ্দে বংশী, কিরণ ইত্যাদিদের বেশ চলিয়া যায়। কিন্তু বনোয়ারির মতো এক-একজন মানুষের কিছুতেই ইহাতে কুলায় না। তাহারা অজাত পক্ষীশাবকের মতো কেবলমাত্র ডিমের ভিতরকার সংকীর্ণ খাদ্যের রসটুকু লইয়া বাঁচে না, তাহারা ডিম ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে, নিজের শক্তিতে খাদ্য আহরণের বৃহৎ ক্ষেত্র তাহাদের চাই। বনোয়ারি সেই ক্ষুধা লইয়া জন্মিয়াছে।”

পারিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে তথা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বনোয়ারী তথা ব্যক্তির প্রতিবাদ

আধুনিক পরিচয় বহন করে।

‘রবিবার’ গল্পেও আমরা দেখি পারিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির প্রতিবাদ। এই গল্পের নায়ক অভীক। স্বাধীনচেতা অভীক তাদের বংশগত আচার মেনে নেয়নি। পারিবারিক কুলাচার ত্যাগ করে সে আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্রকর গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। এই গল্পের সত্যবতী একটি প্রধান নারীচরিত্র। সে ছিল বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। স্বামী মুকুন্দ তার চিত্র রচনায় প্রেরণা দিয়েছে। এর পর মুকুন্দের অকাল মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর আগে তার কাকা গোবিন্দর হাতে স্ত্রী পুত্রের দায়-দায়িত্ব উইল করে দিয়ে যায়। গোবিন্দ সত্যবতীর শিল্পচর্চা ভালো চোখে দেখেনি। তার চোখে শিল্পচর্চা সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়া কিছু নয়। পুত্র চুনিলালও ভালো ছবি আঁকত। পুত্রের আঁকা একটি সুন্দর ছবি কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেললে সত্যবতী প্রতিবাদ জানায়, — “কেন তুমি চুনির ছবি ছিঁড়ে ফেললে ?ও যদি পথের ভিক্ষুক হয় সেও ভালো। কিন্তু কোনদিন তোমার মত যেন না হয়। ভগবান ওকে যে সম্পদ দিয়েছেন তারই গৌরব যেন তোমার পয়সার গর্বের চেয়ে বেশি হয়, এই ওর প্রতি মায়ের আশীর্বাদ।”

সত্যবতী শিল্পের অমর্যাদা সহ্য করতে পারেনি বলেই পুত্রের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হবার অনুকূল পরিবেশ পায়নি বলে পুত্রকে নিয়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

‘বদনাম’ গল্পটি প্রতিবাদী চেতনার সাক্ষ্য বহন করে। এ গল্পের নায়িকা সৌদামিনী একটি প্রতিবাদী নারীচরিত্র। তার স্বামী পুলিশ অফিসার যিনি তৎকালীন স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্য সচেষ্ট। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল বিপ্লবী নেতা অনিল মিত্রকে গ্রেপ্তার করা। বিপ্লবী অনিল মিত্র যেদিন সৌদামিনীর গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন স্বামী সৌদামিনীকে বিপ্লবীর সম্মান দিতে বলেছিল। সৌদামিনী এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় — “আমি তোমার স্ত্রী হয়েছি তাই বলে কি পুলিশের চরের কাজ করব ?আমাদের দেশে দু-একজন সত্যিকারের পুরুষ দেখা যায়। তোমাদের একমাত্র চেষ্টা এঁদের একেবারে নির্জীব করে দেওয়া। আমরা দেশের মেয়েরা যদি এসব সম্মানদের আপন প্রাণ দিয়ে রক্ষা না করি তবে আমাদের নারীধর্মকে ধিক্।” সৌদামিনীর অসহযোগিতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

‘দুর্গন্ধি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মনুষ্যত্বহীন, শোষক, অত্যাচারী পুলিশরা সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র নয়। ঘৃণা নেওয়া তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। প্রতিনিয়ত এভাবে তারা অন্যায় করে যাচ্ছে। এই গল্পের অপ্রধান চরিত্র একজন নেটিভ ডাক্তার। দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্রে একদিন থানায় এসেছিল। সে দেখল সহায় সম্বলহীন, এক চাষী সর্পাঘাতে মৃত তার এক কন্যার দেহ নিয়ে এসেছিল থানায় রিপোর্ট করবার

জন্য। বেলা ১ টা থেকে থানায় এসে অপেক্ষা করছিল। দারোগাবাবুর দেখা সে পায়নি। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে সন্ধ্যা অবধি লোকটিকে বসে থাকতে দেখে ডাক্তার চাষীটির কাছে গুনতে পেল, - “একবার কনস্টেবল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাকে কিছু আছে কিনা। সে উত্তর করিয়াছিল সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই, কনস্টেবল বলিয়া গেছে, থাক্ বেটা, তবে এখন বসিয়া থাক্।”

ঘুষ দেবার অর্থনৈতিক ক্ষমতা দরিদ্র চাষীটির ছিলনা বলেই কনস্টেবল তার দায়িত্বটুকু পালন করেনি। ডাক্তারবাবু এর প্রতিবাদ জানায়, “বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছেন আপনারা মানুষ না পিশাচ? এই বলে ডাক্তারবাবু তার গোটা দিনের উপার্জনের টাকা ‘ঝনাৎ করিয়া’ দারোগাবাবুর সামনে ফেলে দেন। আর বলেন টাকা চান তো এই নিন, যখন মরিবেন সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক।” ডাক্তারবাবু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল বলে দারোগাবাবুর দৌরাভ্যে তাঁকে ভিটে ছাড়া হতে হয়েছিল। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলত দুর্বুদ্ধির ফল বহন করতে হল। এরূপ বাস্তবধর্মী ছোটগল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে আর নেই বললেই চলে।

‘মেঘ ও রৌদ্র’ রবীন্দ্রনাথের একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। সমালোচকের মতে, “আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা, সামন্তশাসিত গ্রামবাংলায় নায়েব-গোমস্তার অন্যায় অত্যাচার, ষড়যন্ত্র, স্বজাতির ইংরেজদের তাবেদার হয়ে ওঠার চেষ্টা, সাধারণ গ্রামবাসী শ্রমজীবী পল্লীমানুষের দুর্বলতা যা তিনি বাস্তবে চারপাশে দেখেছিলেন তারই শিল্পিত রূপায়ন ঘটেছে গল্পে।”^{১৬}

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, নায়েব, পুলিশ, দারোগা, ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনকে ভালো চোখে দেখেননি। অত্যাচারী ইংরেজ প্রতিনিধিরা গ্রামীণ মানুষদের ওপর কীভাবে অত্যাচার করত তার বিবরণ এই গল্পে। শশিভূষণ ও গিরিবালার প্রেমের পাশাপাশি আলোচ্য গল্পে বিদেশী শাসকের মুখোশ রবীন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছেন। এগল্পে আমরা দেখি গিরিবালার বাবা হরকুমারের ওপর অত্যাচারের চিত্র। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট শশিভূষণের গ্রামে এসে তাঁর ফেলে। ম্যাজিস্ট্রেট নায়েব হরকুমারকে চার সের ঘি সংগ্রহ করতে বলে। হরকুমার তাতে ব্যর্থ হলে আদেশ হয়, “এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারিধারে ঘোরদৌড় করাও।”

এধরনের লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে হরকুমারকে। শশিভূষণ গিরিবালার বাবার এরূপ অপমান সহ্য করতে না পেরে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে মামলা দায়ের করে। হরকুমার সাক্ষ্য দেবার সময় জানায়, মামলা করবার ইচ্ছা তার ছিল না। একমাত্র শশিভূষণই তাকে উৎসাহিত করেছে মামলা করতে। এম. এ. বি. এল. পাশ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শশিভূষণ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে মামলা মিটমাট করে নিতে বলেন। কিন্তু আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন শশিভূষণ তা অস্বীকার করে। গ্রাম ছেড়ে

যেদিন শশিভূষণ কোলকাতার দিকে যাত্রা করে সে সময় দেখল, নতুন স্টিমার লাইনে ম্যানেজার সাহেব কর্তৃক মহাজনের নৌকা ডুবানো এবং নদীর মোহনায় জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট কর্তৃক জেলেদের জাল নষ্টের চিত্র। এর বিরুদ্ধে শশিভূষণ প্রতিবাদ জানায়। এরপর পুলিশকর্তা শশিকে ইংরেজী ভাষায় গাল দিলে সে পুলিশকে আক্রমণ করে, এর ফলে শশিকে জেলে যেতে হয়। জেলে থাকাকালীন অবস্থায় শশিভূষণের বাবা পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে এলে শশিভূষণ বাবাকে কঠিন ভয়ঙ্কর নির্মম বাস্তব সত্য কথা বলে, “জেল ভালো। লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলেনা, কিন্তু জেলের বাইরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া ফেলে। আর যদি সৎ সঙ্গের কথা বলতো, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী, কৃতঘ্ন, কাপুরুষের সংখ্যা অল্প কারণ স্থান পরিমিত, বাইরে অনেক বেশি।”

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় বিচারের নামে প্রহসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সর্বোপরি মেঘ ও রৌদ্রের খেলার মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষের গভীর বেদনাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

‘নামঞ্জুর’ রবীন্দ্রনাথের একটি রাজনৈতিক গল্প। এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর দৃষ্টিতে গল্পটি লেখা হয়েছে। এক বিপ্লবীর দৃষ্টিতে অসহযোগ আন্দোলন বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মধ্যে রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করেছেন লেখক। রাজনৈতিক কর্মীর মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে লেখক এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘চোরাইধর্ম’ গল্পে নায়কের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছিল ঠিকুজি কৌষ্ঠীর বিরুদ্ধে। অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে নায়ককে লড়াই করতে হয়েছিল। যদিও এজন্য তাকে জালিয়াতির পথ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

হিন্দু ধর্ম ছিল আচার সর্বস্ব। এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদী গল্পের নাম ‘মুসলমানীর গল্প।’ হিন্দু সমাজের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে এই গল্পে। পাকীতে করে বংশীবদনের ভাইঝি কমলা যখন বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন ডাকাতরা তাকে অপহরণ করে। হবির খাঁ কমলাকে উদ্ধার করে কাকার ঘরে কমলাকে ফিরিয়ে দিতে আসে। কিন্তু তার কাকা কমলাকে আশ্রয় দেয়নি। হবির খাঁ কমলাকে মা বলে সম্বোধন করে তার গৃহে হিন্দু রীতি অনুসরণে থাকবার ব্যবস্থা করে। হবির খাঁর পুত্র কমলাকে বিয়ে করতে চাইলে কমলা এই বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে। হবির খাঁকে কমলা জানিয়েছেন, - “তোমার ছেলে করিম আমার আপত্তি হবে না। আমার না হয় দুই ধর্মই থাকলো।”

এরপর কমলার কাকার দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের সময় ডাকাতরা অপহরণ করলে কমলা তাকে উদ্ধার করে কাকাকে ফিরিয়ে দেয়। কাকা তাকে গ্রহণ করে। হিন্দুধর্মের এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে গল্পটিতে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

‘উলুখড়ের বিপদ’ গল্পে উদ্ধৃত শাসকগোষ্ঠী আইনের সাহায্য নিয়ে প্রজাপীড়ন করেছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। সত্যের পূজারী হরিহর প্রথমে হেরেছে, জিতেছে লম্পট নায়েব গিরিশ। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র জমি দখল করে গিরিশ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে জানিয়েছে সবই তার ইচ্ছে মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ নারী প্রগতির নামে যে নারীরা পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে প্রগতি সংহার গল্পে তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন। প্রগতিকে সংহার করা হয়েছে বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে।

‘তোতাকাহিনী’ রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ব্যঙ্গরূপক গল্প। ঔপনিবেশিক যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বাহ্যিক আড়ম্বর ও শিক্ষার অন্তঃসারশূন্যতাকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেন নি। প্রচলিত শিক্ষার আনন্দহীনতা ও মুখস্থ বিদ্যার উপর নির্ভরতাকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে মেনে নেন নি। গল্পটিতে আমরা দেখি এক রাজা মন্ত্রীকে ডেকে তোতা পাখিটিকে শিক্ষা দিতে বলেন। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখিটিকে মুখস্থ করানো হচ্ছে অসংখ্য বই এনে বই এর পাতা ছিঁড়ে কলমের ডগা দিয়ে পাখিটির মুখে ঠাসা হচ্ছে। দানা, পানি কিছুই নেই, আনন্দ নেই, গান নেই ও প্রাণ না থাকার ফলে পাখিটি মরে গেল। এই হ’ল ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ স্যাডলার কমিশনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাবুক মেরেছেন এই গল্পে।

‘ভুল স্বর্গ’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী শ্রমসর্বস্ব দেশের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কাজের ফাঁকে অবসর না থাকলে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - “এই স্বর্গে আর সবই আছে, কেবল অবকাশ নেই। এখানে পুরুষেরা বলছে, ‘হাঁফ ছাড়বার সময় কোথা।’ মেয়েরা বলছে, ‘বললুম ভাই, কাজ রয়েছে পড়ে।’ সবাই বলে ‘সময়ের মূল্য আছে।’ কেউ বলেন ‘সময় অমূল্য।’ ‘আর তো পারা যায় না’ বলে সবাই আক্ষেপ করে। আর ভারি খুশি হয়। ‘খেটে খেটে হয়রান হলুম।’ এই নালিশটাই সেখানকার সঙ্গীত।”

এই বিবরণে দাসত্বের কথা আছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম করিয়ে শোষণের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে তার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘গিনী’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি রবীন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা অবলম্বনে রচিত। নর্মাল স্কুলে হরনাথ নামে এক শিক্ষক ছিলেন। তার দুর্ব্যাহারে ছাত্ররা অতীষ্ট হয়ে যেত। রবীন্দ্রনাথও শিক্ষক হরনাথকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। তার পাঠদানের সময় রবীন্দ্রনাথ কোন কথা বলতেন না। এজন্য রবীন্দ্রনাথকে বহু শাস্তি পেতে হয়েছিল। গিনী ছোটগল্পে হরনাথই হলেন শিবনাথ। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হৃদয়হীন আচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘স্বর্ণমৃগ’ একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে অর্থলোভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়েছে। বৈদ্যনাথ তার স্ত্রীর স্বর্ণমৃগের তৃষ্ণা মেটাতে সন্ধ্যাসীর কাছে ঠকতে হয়েছিল। গুপ্তধনের সন্ধানে কাশীর একটি পুরনো বাড়িতে যেতে হয়েছিল। সব কিছুতে সে ব্যর্থ হল। পরিশেষে বৈদ্যনাথকে গৃহত্যাগ করতে হল স্ত্রীর স্বর্ণতৃষ্ণা মেটানোর জন্য।

‘পরীর পরিচয়’ রূপকধর্মী গল্প। সামাজিক শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিগত ঘৃণা এই গল্পে অন্তঃপুর পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে, এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানিয়েছেন। রাজপুত্র বিয়ে করেছিল কাজরী বনের মেয়েকে-কাজরীর বাবা শিকারী, মা তাঁতে কাপড় বুনত। কৃষ্ণবর্ণা কাজরীকে রাজা বিয়ে করে আনবার পর রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যেও কাজরী সুখী হয়নি। অরণ্যের প্রাচুর্য সেখানে নেই বলে সে আবার ফিরে এসেছিল পিতৃগৃহে। সহজ প্রাণের আনন্দই কাজরীর কাছে ছিল একান্ত প্রিয়।

‘দিদি’ গল্পে স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনস্কতার পরিচয় মেলে। নিজেদের স্বার্থে যা লাগলে ছেলে কিংবা স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতি দেখানো হয় না। এমনকি স্ত্রীকেও গুপ্তভাবে হত্যা করা হয়। এই নির্মমতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ - ‘দিদি’ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রতিহিংসা’ গল্পটিও প্রতিবাদী শ্রেণিভুক্ত। এই গল্পে জমিদারী দম্ভ ও বংশগৌরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জমিদারের কর্মচারীর স্ত্রীর নাম ইন্দ্রাণী। ইন্দ্রাণীর রূপ অভিজাত্যকে হিংসা করেছে জমিদার গিনী। পরে ইন্দ্রাণী জমিদারের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে প্রতিহিংসা পূরণ করেছে।

‘ব্যবধান’ গল্পে শরিকি গণ্ডগোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এটি একটি পারিবারিক বিরোধের কাহিনী। বনমালী ও হিমাংশু দুই ভাই। বনমালী বড়, হিমাংশু ছোট। মামাতো পিসতুতো এই দুই ভাই এর মধ্যে সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ সখ্যতা একটি বাগানকে কেন্দ্র করে যা গড়ে উঠেছিল সেই বাগানের মালিকানা নিয়ে শরিকি গণ্ডগোল দেখা দেয়। উভয় পক্ষের মামলা চলতে থাকে। সে মামলায় জয়ী হয় বনমালী। বাগানটি তাদের অধীনে চলে আসে। এরপর থেকে হিমাংশুর সাথে বনমালীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। উভয়ের ব্যবধান রচিত হয়।

‘দান প্রতিদান’ গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। নিজের আত্মীয়কে জাল-জুয়াচুরি করে পথে বসানো হয়েছে। এছাড়া নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে চড়ানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বার্থপর এই শ্রেণি চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘সমস্যা পূরণ’ রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক প্রতিবাদের গল্প। অহিমুদ্দিন এই গল্পের নায়ক, সে এককভাবে নিজের জমির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে। আইনের বিচারে অহিমুদ্দিন পরাজিত হলেও সে অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। তার সমস্ত সম্পত্তি ত্রোদক করবার চেষ্টা চালিয়েছে জমিদার। তাকে পথে বসানোর জন্য জমিদারের উপর তার প্রতিবাদ

হওয়াটাই স্বাভাবিক। একদিন সে একটি ধারালো দা নিয়ে প্রকাশ্য হাটে বিপিন বাবুকে হত্যা করতে যায়। এরমধ্যে সে খুনি আখ্যা পেলেও অছিমুন্দির মধ্যে শ্রেণি সংগ্রামের পরিচয় রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন।

‘গল্পসল্প’ বই-এর ‘বড়খবর’ গল্পটিতে শোষক শ্রেণি, শিল্পপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রমিক বিপ্লব ও শোষণ মুক্ত সমাজ গঠনের ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে যে সাম্য চিন্তা আছে তার সার্থক দৃষ্টান্ত এই ‘বড় খবর’ গল্পটি।

‘রাজটিকা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের ইংরেজ তোষণনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন।

‘সংস্কার’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের অপশাসন এবং সুকৌশলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কটাক্ষ করেছেন।

‘পণরক্ষা’ গল্পে চরকা কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা বয়কট, পিকেটিং এর প্রসঙ্গ আছে। কিন্তু যারা দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন, কথার সঙ্গে কাজের মিল রাখেননি, রবীন্দ্রনাথ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বিদূষক’ গল্পে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এটি ‘লিপিকা’ গল্পগ্রন্থের সার্থক ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ বিদূষক চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এই গল্পে —

“বিদূষক বললে, ‘আমি মরতেও পারিনে, কাটতেও পারিনে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি। মহারাজের সভায় থাকলে আমি হাসতে ভুলে যাব।”

— রাজা তার সাম্রাজ্যের লোভে নিষ্পাপ হাসিকে খুন করেছিল।

‘অনধিকার প্রবেশ’ গল্পে বিধবা জয়কালী নিষ্ঠাচারী, ধর্মপরায়ণ মহিলা। সে ডোমদের বলিদানের শূকরটিকে মন্দিরে স্থান দিয়েছে। ভীত ও তাড়িত শূকর ছানাটিকে স্থান দিয়ে নিরীহ মমত্ববোধের পরিচয় দিয়ে রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে উদারতার বাণীই প্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘বোষ্টমী’ গল্পে বংশগৌরবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বোষ্টমী সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে।

‘কর্তার ভূত’ গল্পে সমাজের একশ্রেণির রক্ষণশীল মানুষের ভয় ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘সুভা’ গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। সুভাষিনী প্রকৃতি প্রেমিক। গ্রাম্য প্রকৃতির মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে শান্তির বাতাবরণ। কিন্তু তার বাবা সুভাষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে দিয়েছিল

কলকাতার এক অর্থলোভী পাত্রের হাতে। কিন্তু যেদিন তারা জানতে পেরেছিল সুভা বোবা সেদিন তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল স্বামী গৃহ থেকে। এরপর বিয়ে হয়েছিল কথা বলতে পারা অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। স্বামীর এরূপ নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সুভার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ দেখিয়েছেন।

অতঃপর আসছে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের কথা। বাংলাসাহিত্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ফলে আরও জোড়ালোভাবে সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর সমাজ ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গল্পগুলির মধ্যে ‘পরেশ’ গল্পটির নাম উল্লেখ করা যায়। এই গল্পে জ্যাঠামশায়ের প্রতি পরেশের বাবার অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পরেশ ও জ্যাঠামশায়ের মধ্যে ছিল গভীর সম্পর্ক। সেই জ্যাঠামশাই যখন পরেশের বাবার দ্বারা অপমানিত হয় পরেশ তখন এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। জ্যাঠামশাই কারও সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে একথা যখন ভাবছিল, তখন পরেশ স্বেচ্ছায় জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে। চলে যাবার আগে জ্যাঠামশাই কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে পরেশ বলেছিল, জিনিসপত্র নেবার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি ও বাড়ীতে আর তারা ফিরবে না, এরপর গুরুচরণ পরেশের হাত ধরে জনহীন অন্ধকারের পথ বেয়ে রেলস্টেশনের দিকে যাত্রা করল। পুত্র হয়ে পিতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ সামাজিক পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত বহন করে।

‘মহেশ’ গল্পটি শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। ডঃ শিশিরকুমার দাশ এ গল্পটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন, - “কাহিনীর মধ্যে একটিও অনর্থক চরিত্র বা ঘটনা নেই।ঘটনাবিরলতা, কাহিনীর একমুখীনতা ও চরিত্র সৃষ্টির কুশলতা তিনদিকেই মহেশ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এই একটি মাত্র গল্পে শরৎচন্দ্র বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।”

১৭

এই গল্পে শরৎচন্দ্র সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্পের নায়ক গফুর। তার কন্যা আমিনা ও তার পুত্রতুল্য মহেশ নামে একটি গরু রয়েছে। হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় তাদের বাস। জমিদার শিবচন্দ্রের অন্যায় আচরণ, ব্রাহ্মণ তর্করত্নের হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ ও হিন্দু প্রতিবেশীদের অত্যাচার গফুর নীরবে সহ্য করেছে। তার ক্ষুধার্ত মহেশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এলে, ক্রোধবশতঃ মহেশকে মেরে ফেলে। অভাবের দিনেও গফুর মহেশকে বিক্রি করতে পারেনি তার প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে, মহেশের মৃত্যুর পর গফুর যখন তার স্বভূমি থেকে অন্যত্র চলে যায়, তখন বিধাতার কাছে রেখে যায় নালিশ,

“.....মহেশ আমার তেষ্ঠা নিয়ে মরেছে, তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি! যে তোমার দেওয়া তেষ্ঠার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি সেন কখনো মাপ

করোনা।”

জমিদারের অত্যাচার, ক্ষমাহীন সমাজ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নীতিহীন ধর্ম জাতিগত বিদ্বেষের ফলে একজন দরিদ্র কৃষক কীভাবে কারখানার শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে তার বাস্তব চিত্র শরৎচন্দ্র ‘মহেশ’ গল্পে তুলে ধরেছেন।

‘একাদশী বৈরাগী’ গল্পে শরৎচন্দ্র ক্ষমাহীন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একাদশী বৈরাগী। অত্যধিক কৃপণতার জন্যে তার এই নামকরণ হয়েছে। তার বৈমায়েয় এক বালবিধবা বোন ছিল যার নাম গৌরী। গৌরীর নির্বুদ্ধিতার জন্য ও চঞ্চল মতির জন্য লোভী মানুষের প্রলোভনে চারিত্রিক স্থলন ঘটে। এজন্য সমাজ তাকে ঘৃণার চোখে দেখলেও একাদশী তার বোনকে আশ্রয় দেয়। এই অভিযোগে সমাজপতি স্মৃতিরত্ন একাদশী বৈরাগী ও গৌরীকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দেয়। এধরনের সমাজপতির স্নেহের মূল্য কি, তা দিতে শেখেনি। সুযোগ বুঝে তারা অন্যের টাকা অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে। ধর্ম ও নীতি বলে তাদের কিছু নেই। সমাজের ক্ষতিকারক এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ করেছেন।

‘আলো ও ছায়া’ গল্পের মধ্যেও রয়েছে প্রতিবাদ। সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে। যজ্ঞ দত্তের সঙ্গে বিধবা সুরমার অবৈধ সম্পর্ক। কিন্তু তৎকালে বিধবাবিবাহ সমর্থিত ছিল না। বিধবা সুরমা যজ্ঞ দত্তের সংসারে আসে। তারপর সুরমা বাপ-মা মরা কায়স্থ কন্যা প্রতুলের সঙ্গে যজ্ঞ দত্তের বিয়ে দেয়। বিয়ের পর যজ্ঞ দত্তের মনে অপরাধবোধ জেগে ওঠে। সে হয়ত সুরমার প্রতি সদয় আচরণ করেনি। এই সূত্র ধরে, নরগণ ও রাক্ষসগণ এর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঠিক মিল হবে না তাই প্রতুলকে যজ্ঞ দত্ত রেখে আসে তার পিসিমার বাড়ীতে। পিসিমার মৃত্যুর পর প্রতুল যজ্ঞ দত্তকে নিয়ে যেতে বলে। প্রতুল যজ্ঞ দত্তের বাড়ীতে এলে তার নীচের ঘরে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। একদিকে প্রতুলের প্রতি অমর্যাদা, অন্যদিকে নিজের অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে যজ্ঞ দত্ত নিজে রক্তাক্ত হয়। প্রতুলের মৃত্যুর পর যজ্ঞ দত্ত বাইরে চলে যায় এবং সুরমা একাই থেকে যায় সেখানে।

সামাজিক বিধিনিষেধের কারণে সুরমা, প্রতুল ও যজ্ঞ দত্তের জীবনের এই করুণ পরিণতি ঘটেছে। শরৎচন্দ্র এভাবেই সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বোবা’ ও ‘কাশীনাথ’ দুটি গল্পেই কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। উভয় গল্পেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে।

‘অনুপমার প্রেম’ গল্পের ললিত ও বিধবা অনুপমার প্রেমের সম্পর্ক প্রীতি মধুর হয়নি। এর পেছনে ছিল সামাজিক অনুশাসন।

‘মামলার ফল’ গল্পে কেষ্ট ও কাদম্বিনী দুই ভাই-বোন, কিন্তু কাদম্বিনী কেষ্টর প্রতি

নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে।

‘দর্পচূর্ণ গল্পে’ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের অন্যতম কারণ হল স্ত্রীর অহংকার। যদিও স্ত্রী হিন্দুর অহংকার চূর্ণ হয়েছে ফলে স্বামী নরেন্দ্রের সঙ্গে পুনরায় গড়ে উঠেছে দাম্পত্য সম্পর্ক।

‘বিলাসী’ গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন শরৎচন্দ্র। কায়স্থ মৃত্যুঞ্জয় সাপুড়ের মেয়ে বিলাসীকে বিয়ে করেছিল। এই বিলাসীই মৃত্যুর হাত থেকে একদিন বাঁচিয়ে ছিল মৃত্যুঞ্জয়কে। কিন্তু এই বিবাহকে মৃত্যুঞ্জয়ের কাকা মেনে নিতে পারেনি। প্রেম কোন জাত বিচারকে মেনে চলে না এটাই গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য।

‘সতী’ গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্পে জমিদার শ্রেণির নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অভাগী অন্ত্যজ দুলে সম্প্রদায়ভুক্ত। তার সারা জীবন কেটেছে দুর্ভাগ্য, দুঃখ ও দারিদ্র্য নিয়ে। স্বামী রসিক রায় তাকে ফেলে রেখে অন্যত্র চলে যায়। একমাত্র পুত্র কাঙালীকে নিয়েই তার স্বপ্ন গড়ে উঠেছে। আর জীবনের সবচেয়ে সাধ ছিল স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে সে মারা যাবে, পুত্র কাঙালী তার মুখে আগুন দেবে। মুখুজ্যে বাড়ীর গিন্নির মতো রথে চড়ে সে স্বর্গে যাবে। মৃত্যুর আগে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে পেরেছিল। তার একটি আশা পূর্ণ হলেও দ্বিতীয় আশাটি অপূর্ণই থেকে যায়। অভাগীর দাহকার্য হয়নি। তার স্বামী তাদেরই পোতা বেল গাছ দাহ কার্যের জন্য কাটতে গেলে জমিদারের গোমস্তা বাধা দেয়। কাঙালী জমিদারের কাছে অনুমতি চাইতে গেলে ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ কাঙালীকে বলেছে, —

“তোদের জেতে কে কবে আবার পোড়ায় রে? যা, মুখে একটু নুড়ো জ্বলে দিয়ে নদীর চড়ায় মাটি দে গে। মুখুজ্যে মশায়ের বড় ছেলে চুড়ান্ত ব্যঙ্গ করে বলেছেন। দেখছেন ভট্টাচার্য মশায় সব ব্যাটারাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়।”

শরৎচন্দ্র এভাবে হিন্দু সমাজের জাত-পাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। দুলে জাতের দাহ কার্যে সামান্য কাঠ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। বরং কাঙালীচরণকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র উঁচু জাতি ও নীচু জাতিকে দুটো শ্রেণিকে দেখিয়ে উঁচু জাতের মিথ্যা অহংকার ও হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, এবং তাঁর সমর্থন ছিল অত্যাচারিতের প্রতি।

এভাবেই শরৎচন্দ্র সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে পাপাচার ভন্ডামী, দুর্নীতি ও নিষ্ঠুরতাকে দেখেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এবার রাজশেখর বসুর গল্প নিয়ে আলোচনা করছি। পরশুরাম ছদ্মনামধারী রাজশেখর

বসু রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়ে রবীন্দ্রোত্তর কালে বিশেষভাবে দ্বিতীয় মহাসময় পরবর্তী সময়ে যে মূল্যবোধের অপচয় দেখা দিয়েছিল তা তুলে ধরতে ব্রতী হয়েছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের যথার্থ উত্তরসূরী ছিলেন তিনি। সাতটি গল্পগ্রন্থে শতাধিক গল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘বাংলা গল্প বিচিত্রা’ গ্রন্থে লিখেছেন, — “চারিদিকে তখন মানুষের সর্বাত্মক বিকৃতি ফেটে পড়েছে-সমাজ, ধর্ম, সংস্কার এবং পারিবারিক জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠেছে, পুঞ্জীভূত গ্লানিতে জাতি তখন পঙ্কস্নান করছে, মানুষের লোভের ষড়যন্ত্রে পড়া দুর্ভিক্ষে সমস্ত বাংলাদেশ নরকে পরিণত হয়েছে আর কালোবাজারীরা মুন্ডশিকারীর ভূমিকা নিয়েছে। ওদিকে ইংরেজ সরকারের হৃদয়হীন উদাসীনতা, আগস্ট বিপ্লব দমন করবার জন্যে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, - আর দেশের সম্মান সম্বন্ধে ট্যাক্স-জীপ-লরীর তলায় দলিত করে বিদেশী ফৌজের তান্ডব-ভিতরে বাইরে এই অসহ্য যন্ত্রণার চাবুকে জর্জরিত হয়ে উঠে সেদিন বাঙালি লেখকরা কলমের মুখে ক্ষিপ্ত বেদনায় বজ্রদ্যুতি সঞ্চার করেছিলেন - পরশুরামও তখন যুগের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।” ১৮

তাঁর গল্পগুলি উদ্দেশ্যমূলক। তাঁর ভাষা এবং চিন্তাধারা নিজস্ব। সমকালীন সমাজের অসংগতি, ভন্ড রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থপরতা, পারিবারিক জীবনের সমস্যা লঘুহাস্যরসের মাধ্যমে তিনি উপস্থাপন করেছেন। মিথ্যাচার, ভভামি, ভাববিলাস ও অহং-কে শ্লেষ কৌতুকের মাধ্যমে পরিবেশন করে সমাজ সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী আন্দোলনের যোগ্য পথপ্রদর্শক।

‘গডালিকা’, ‘কজ্জলী’, ‘হনুমানের স্বপ্ন’, ‘গল্পকথা’ ‘ধুতুরী মায়া’, ‘কৃষ্ণকলি’, ‘নীলতারা’, ‘আনন্দী বাঈ’, ও ‘চমৎকুমারী’ প্রভৃতি গল্প গ্রন্থে সাধু, গুরু, ভবিষ্যত বক্তা থেকে গুরু করে প্রেম বিবাহ, রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি, সাহিত্যাদর্শন, অলৌকিক বিষয়, পুরাণ বিষয় ও কল্প বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে এক নতুন স্বাদের সাহিত্য রস সৃষ্টি করেছেন।

‘গডালিকা’ গল্পগ্রন্থে “শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড” ছোটগল্পে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে বহু লোকের কাছে শেয়ার বিক্রি করে যে লোক ঠকানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল তার বিরুদ্ধে পরশুরাম ব্যঙ্গ করেছেন। অন্যদিকে শ্যামলালের মতো চরিত্রেরা মন্দির প্রতিষ্ঠার নামে যে ধর্মীয় ভভামি গুরু করেছিল, লেখক তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এছাড়া অসাধু ব্যবসায়ী গণ্ডেরিরামের বিরুদ্ধে শাসিত ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করেছেন।

‘চিকিৎসা সঙ্কট’ গল্পে চিকিৎসার নামে যে আড়ম্বর দেখিয়ে রোগীদের রোগ নির্ণয় না করে প্রতারণা করা হয় তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মহাবিদ্যা’ গল্পে দুর্নীতিপরায়ণ শোষণকারী উচ্চস্তরের চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত তার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

‘ভূশাভীর মাঠে’ গল্পে স্ত্রী সতীত্ব বিষয়ে সমকালীন সাহিত্যে যে নীতির কথা বলেছেন লেখক সেই প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করেছেন।

পরশুরামের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ ‘কজ্জলী’। এই গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প ‘বিরিঞ্চিবাবা’। এই বিরিঞ্চিবাবার ধর্মীয় ভদ্ভামি ও সাধুবেশী অসাধুর মুখোশ খুলে দিয়েছেন লেখক। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের জন্য, পাশাপাশি অর্থ ও যশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অসৎ উপায় অবলম্বন করা রাজনৈতিক নেতাদেরও প্রতি ব্যঙ্গবাণ নিষ্ক্ষিপ্ত করেছেন লেখক।

‘স্বয়ম্বর’ গল্পে ইংরেজ অনুকরণের বিরুদ্ধে নগ্নভাবে আক্রমণ করেছেন। নবীন কবিদের প্রতি লেখক আক্রমণ করেছেন ‘কচি সংবাদ’ গল্পে।

‘উলটপুরাণ’ গল্পে ভারতবাসীদের ইংরেজ এবং ইংরেজদের ভারতবাসী এই বিপরীতধর্মী চিত্রের মাধ্যমে সুকৌশলে ভারতবাসীকে লেখক নিন্দা করেছেন।

‘গল্পস্বল্প’ গল্পগ্রন্থের ‘গাঁ মানুষ জাতির কথা’ গল্পে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লেখক আক্রমণ করেছেন।

‘পরশপাথর’ গল্পে পরশুরাম বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বর্ণমানের বিপর্যয়ের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে যে ভারসাম্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘রামরাজা’ গল্পে পরশুরাম রাজনৈতিক দলাদলি ও হাতাহাতির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছেন। এই গল্পে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী সাম্যবাদে বিশ্বাসী দলের সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বিখ্যাত মিডিয়ার যোগসূত্র তিনি লক্ষ করেছেন।

‘শোনা কথা’ গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর ক্ষমতালোভী নেতাদের সংঘর্ষ ও নীতিহীনতার পরিচয় রয়েছে।

‘ধুতুরীমায়া’ গল্পগ্রন্থে ‘রামধনের বৈরাগ্য’ গল্পে প্রগতিবাদী লেখকদের সাহিত্যে যৌনতাকে স্থান দিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অশ্লীল দিকটি তুলে ধরেছেন, তার বিরুদ্ধে পরশুরাম কটাক্ষ করেছেন। অত্যাধুনিক বিষয় নিয়ে তার এই ব্যঙ্গে সমাজ সচেতনতার পরিচয় মেলে।

‘ষষ্ঠীর কৃপা’ গল্পে অত্যধিক কামুক পুরুষের নারী লোলুপতার বিরুদ্ধে পরশুরাম প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘কৃষ্ণকলি’ গল্পগ্রন্থে ‘বালখিল্যগণের উৎপত্তি’ গল্পে যে রাজনৈতিক দল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মূল্যবোধ ভাঙার দিকে ঝুকেছিল তাদের বিরুদ্ধে রাজশেখর বসু তিরস্কার করেছেন।

‘নীলতারা’ গল্পে জমিদার শ্রেণির লাম্পট্য দোষ এবং দরিদ্র শ্রেণির প্রতি নির্মম অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

সর্বত্র ভেজাল এবং প্রতারণার ও স্বার্থপরায়ণদের মুখোশ লেখক খুলে দিয়েছেন
'নীলকণ্ঠ' ছোটগল্পে।

'দ্বান্দ্বিক কবিতা' গল্পে আধুনিক সাহিত্যে রোমান্টিক প্রেম ও যৌনতার বিষয়ে
লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিষ্কিণ্ড হয়েছে।

একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী শাসকগোষ্ঠীর শোষণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ কটাক্ষমূলক গল্প
'মাজলিক'।

'আনন্দীবাজি' গল্পগ্রন্থের 'আনন্দীবাজি' গল্পে আধুনিক স্বার্থপর নারীদের বিরুদ্ধে
বিদ্রূপ দেখানো হয়েছে।

'ডম্বর পন্ডিত' গল্পে বাস্তবজ্ঞানহীন অহংকারী পন্ডিতদের প্রতি লেখক ব্যঙ্গ করেছেন।

'গুপীসাহেব' গল্পে জাল জুয়াচুরি ও অসৎকাজে যারা লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে লেখক
ব্যঙ্গ করেছেন।

অতঃপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের প্রতিবাদ আলোচনা করেছি। রাঢ়
বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর গল্পে সামাজিক অবিচার, অর্থনৈতিক, বৈষম্য, সমাজের গ্লানি, বিকৃতি,
দাম্পত্য বিরোধ, জমিদার ও প্রজাদের দ্বন্দ্ব, মন্বন্তরসঞ্চারিত মহামারী, অন্ত্যজ শ্রেণির অসহায়তা, অন্ধ
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কথাসাহিত্যের মধ্যে অতীত ও বর্তমান, প্রবীন ও
নবীনের মধ্যে দ্বন্দ্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলির মধ্যে 'ময়দানব',
'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি', 'ছলনাময়ী', 'বেদেনী', 'ডাইনীরা বাঁশী', 'রাঠোর চন্দ্রেবৎ', 'রায়বাড়ী',
'তিনশূন্য', 'পৌষলক্ষী', 'বোবাকান্না', 'তাদের ঘর', 'সমুদ্রমহন', 'স্বাধীনতা', 'নুটমুক্তারের সওয়াল',
ব্যাধ, 'দেবতার ব্যাধি', 'আখড়াই দিঘী', 'জটায়ু', 'সত্যপ্রিয়ের কাহিনী', 'রাজারানী ও প্রজা' 'কুলীনের
মেয়ে', 'খাজাখীবারু', 'পুরোহিত', 'জায়া', 'জলসাঘর', 'রসকলি', 'তারিণী মাঝি', 'সোনার তলোয়ার',
'নবমহাপ্রস্থান উপাখ্যান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'ময়দানব' গল্পে রয়েছে পুরাতনের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্ব। একটি ফায়ার ব্রিক তৈরী ও
ফায়ার ক্লে'র কারখানার কর্মী ছিলেন ফণি মিস্ত্রী। তার কারখানার সঙ্গে যোগ ছিল গভীর। তার মালিক
ও ম্যানেজারের সঙ্গে সম্পর্কে কোন ক্ষোভ নেই। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে সে কোন উৎসাহ দেখায়নি।
মালিকের নিন্দা তার কাছে ছিল অসহ্য। সে মালিকের পক্ষে তর্ক যখন করছিলো তখন এক
স্বদেশপ্রেমিকের কাছে সে শুনেছে, -

"মালিক হলেও আমার মালিক সে নয়। সে আমাকে খেতে পরতে দেয়না। আমরা যা
খাই, ছাতু, নিমক, আটা-ডাল, ভাত-তরকারী তার একটা দানাও সে আমাকে মেহেরবানী করে
দেয়না। সেই আমার খানার ভাগীদার, আমার রোজগারের দানায় সে ভাগ বসায়, আমায় ভুল বুঝিয়ে

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তোমরা ভেবে দেখ, আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি হাড় ভাঙা খাটুনি খাঁটি! বয়লারে কয়লা ঠেলি, ইঞ্জিন চালু রাখি, মেশিনে মেশিনে কাজ করি। ভাটার আগুন তাতে ঝলসে যাই, পেট ভর্তি ধুলো খাই - সর্বাপেক্ষে কাদা মাখি, আমরাই এই কারখানায় খাটি তবে মাল তৈরী হয়। আর সেই মাল বিক্রি করে মুনাফা করে লাখো লাখো টাকা। সে খায় পোলাও, কালিয়া, পরে ফিনফিনে ধুতি, গলায় উড়োয় রেশমী চাদর। দামী জুতো পায়ে দিয়ে মস্‌মস্‌ করে চলে। মোটর গাড়িতে হাওয়া খেয়ে বেড়ায় দোতলায় শোয়, দিনদিন সিঁদুকে জমায় হাজার হাজার টাকা। সে সমস্তই তারা করে আমাদের দানা মেরে, অথচ আমরা কিছু বললেই ওরা আমাদের বলে বেইমান। ইমান আমাদের, ওদের কাছে কি আছে? নিমক আমরা ওদের খাইনা, ভগবানে, খোদাতালার দেওয়া আমার তাগদ্‌ সেই তাগদে আমি মেহন্নত করি, সেই মেহন্নতের রোজগার যারা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে নেয় — তাদের কাছে আমাদের কিসের ইমান? বেইমান তারা।”

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ‘ময়দানব’ গল্পের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন - “নতুন বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাবেই পুরানো কারখানার সর্বসর্বা ফণী মিস্ত্রীকে সহিতে হয় চূড়ান্ত অপমান, আর সেই অপমানের বেদনা ভুলতে ফণীকে কারখানার প্রাইডিং মেশিনের চাকার দাঁতে আত্মবলি দিতে হয়।”

১৯

“কারখানা তাকে ছেড়ে দেয়নি। সে তাকে গ্রাস করে নিয়েছে - তার দাঁতের দু’পাশে বেয়ে পড়েছে রক্তের ধারা। দাঁতের পাশে লেগে রয়েছে মাংসের টুকরো - পাশে মেঝের উপর পড়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাড়ের টুকরো।”

অকস্মাৎ অতি চঞ্চলভাবে খর্বাকৃতি মানুষটি বলিয়া উঠিল আঃ ছি, ছি, ছি! দুই হাত দিয়া সম্মুখের পটভূমি হইতে কি যেন সে মুছিয়া দিতে চেষ্টা করিতে ছিল। অবশেষে আপনার হাতখানা সজোরে ক্ষিপ্ত পশুর মত সে কামড়াইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে দাঁতের পাশ দিয়া বীভৎসভাবে রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িল। সভয়ে অমিয় ডাকিল - ম্যানেজারবাবু, ম্যানেজারবাবু। ক্ষত বিক্ষত হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া রক্তাক্ত মুখে একান্ত শ্রান্ত ক্লান্তভাবে তিনি বলিলেন, -অতি যত্নপায় সম্বিত ফিরে আসে — তাই। মানুষ তো আমি অমিয় বাবু।”

তারাক্ষরের ‘পিতা ও পুত্র’ গল্পে প্রবীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। এই গল্পের নায়ক শশিশেখর। সে ইংরেজিতে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী। তার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী টোল ও সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগী ন্যায়তীর্থের বিরোধ। গল্পের পরিণতি অত্যন্ত করুণ। শেষপর্যন্ত শশিশেখর আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছিল।

‘সন্তান’ গল্পটিতে রয়েছে প্রতিবাদ। গোবিন্দ এ গল্পের নায়ক। দেখতে সে কুৎসিত, এজন্য আত্মগ্লানিতে সে আচ্ছন্ন। সে কামনা করেছিল তার মতো কুৎসিত একটি ছেলে না হয়ে সুন্দর

একটি ছেলের জন্ম হোক। গোবিন্দ কঠোর পরিশ্রমী ও অমায়িক ব্যবহার তার। অথচ তাকে বিয়ে করেত হলে চাকুরী পেতে হবে। সে চাকুরী পেয়েছিল জমিদার বাড়িতে। জমিদারের বোনের একটি সুন্দর শিশুপুত্র ছিল। একদিন বিকৃত, কুটিলভাবে সে ছেলেটিকে আদর করে, সেই অভিযোগে তার চাকুরীও চলে যায়। এরপর সে চলে আসে তার বাড়িতে এবং বিয়ে করে বোষ্টমী মঞ্জরীকে। বিয়ের পর মঞ্জরী সন্তানসম্ভবা হলে গোবিন্দ তাঁকে পিত্রালয়ে রেখে আসে। পিত্রালয়ে মঞ্জরী একটি সন্তান জন্ম দেয়। এই সংবাদ শুনে আবেগে আপ্ত হয়ে সে শিশুর গৃহে চলে যায় ছেলেটিকে দেখবার জন্য। কিন্তু ছেলেটি অনিন্দ্যসুন্দর হয়নি। তারই মতো কুৎসিত দেখে রেগে গিয়ে ছেলেটিকে হত্যা করে। এরপর সে তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পুত্র খুনের ঘটনায় তার আশ্রয় হয় উন্মাদাগারে। সেখানে তাকে চিকিৎসাধীনে রাখতে হয়। তার থাকবার কক্ষে চারদেওয়ালে এক সুন্দর শিশুর ছবি টাঙিয়ে রাখা হয়। তারাশঙ্কর লিখেছেন, “গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে, নাচে। ছবিগুলির মানিক।”

‘বোবা কান্না’ গল্পে রয়েছে সংস্কার ও বিজ্ঞানের বিরোধ, অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষ। দেবী চণ্ডীর পূজারী দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের ও বর্তমান যুগের প্রতিনিধি তরুণ ডাক্তার মিহির মুখুজ্যের বিরোধ এ গল্পের বিষয়। মহামারীতে মৃত্যু হয়েছে অনুষ্ঠাকুরের। ঘরে তার বিধবা স্ত্রী। বিখ্যাত চোর শশী ডোম তার প্রতি আসক্ত হয়। অসহায় বোবা বধূটি তার স্বামীর জন্য শোকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শশী মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। একদিকে মনুষ্য, অন্যদিকে মৃত্যু তার পাশে অসংযত শশী ডোমের ভোগাকাজ্জ্বল্য সর্বত্রই নৈরাশ্যের দ্যোতক। এই অধঃপতিত সমাজের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তারাশঙ্কর অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘ডাইনী’ ও ‘ডাইনীর বাঁশী’ ছোটগল্পে। ডাইনী তাদেরই বলা হয়, যাদের অশুভ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, মানুষ অসুস্থ হয়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এ ডাইনীরা আসলে সাধারণ মানুষ। তাদের ওপর প্রেতাত্তারা ভর করেনা, তবুও ধর্মবিকারজনিত আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডাইনী চিহ্নিত নারীদের জীবন্ত দন্ধ হতে হয়। তাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়।

‘ডাইনী’ গল্পে সুরধনী জেনে এসেছে যে তার বিষদৃষ্টি মানুষের মৃত্যুর কারণ। তিন-চারটি গ্রাম ধ্বংস করে সুরধনী রামনগরে এসে বাস করছে। আকাশ পথে গাছ চালিয়ে ছাতিফাটা মাঠের নির্জনরূপে মুগ্ধ হয়ে সে ঘর বেঁধেছে। কামরূপের বিদ্যা তার জানা ছিল। সারাটা জীবন সে অপবাদে গ্লানি বহন করে চলেছে। ভগবানের কাছে তার এই লজ্জা নামিয়ে দেবার জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছেন। তার চোখের জল মুছতো কাপড়ের আঁচলে, যদি কখনো মাটিতে পড়ত তাহলে সে ভয়ে শিউরে উঠত। মা বসুমতী হয়ত জ্বলে উঠবে। তার বঞ্চিত জীবনে চেতনার অভাব ছিল না।

একদিন এক বাউড়ী ছেলে আর এক স্বামী পরিত্যক্তা উচ্ছল মেয়ের প্রণয়গুঞ্জন শুনে ডাইনীটির অতীত জীবনের কথা স্মরণে এসেছিল। তাদের প্রণয়ের সাফল্য কামনা করে যখন সে তার গচ্ছিত বালা জোড়া উপহারস্বরূপ দিতে চেয়েছে তখন তারা ভয়ে সেখান থেকে পালিয়েছে। স্বামীর জন্য কখনো সে কেঁদে উঠত। তার স্বামী ফিরে আসুক এটাই ছিল তার একান্ত কামনা। কিন্তু তার জীবনের এক করুণ রূপ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে একটি নারীকে ডাইনীরূপে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘ডাইনীর বাঁশী’ গল্পে স্বর্ণ ডাইনী বিশ্বাস করত সে ডাইনী। শুকনো কাঠের মতো তার চেহারা, নরুন চেরা চোখ, চোখের তারা তার খয়েরী রঙের। কাউকে স্নেহ করলে সে শিউরে উঠত, কাউকে চোখে দেখলে সে চোখ বন্ধ করত। তার নিঃসঙ্গ এবং মর্মান্তিক বেদনা নিয়ে সে জীবন অতিবাহিত করত। একদিন স্বর্ণের উপহার দেওয়া বাঁশিটি বাজাতে বাজাতে টুকু রাস্তা দিয়ে চলছে, স্বর্ণ তখন বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়েছিল। মানবিক গুণ থাকা সত্ত্বেও এধরনের অন্ধবিশ্বাস স্বর্ণের জীবনকে কতটা মর্মস্পর্শী করে তুলেছে তার জন্য তারাশঙ্কর সহানুভূতি জানিয়েছেন এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন।

তারাশঙ্কর অন্তর্জ্য শ্রেণির প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সচেষ্ট। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে সমাজে যারা অবহেলিত উচ্চকোটির কাছে যারা ছোটলোক হিসেবে চিহ্নিত তারাশঙ্কর অত্যন্ত মনযোগী দৃষ্টি নিয়ে তাদের ক্লেশাক্ত জীবনের ছবি আঁকেছেন। পঙ্কের মধ্যে থেকেও তিনি পঙ্কজের ছবি আঁকতেও ভোলেননি।

‘স্থলপদ্ম’ তারাশঙ্করের এমনিই একটি গল্প। বেলে ও হারা এই ছোটগল্পে বঞ্চিত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদের বঞ্চিত জীবনকথা সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন - “গ্রামের প্রান্তে পায়রার খুপির মতো ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা, কালিপড়া হাঁড়ির গাদ, ছাইএর রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী, অধিবাসীগুলো ওই আবর্জনার মতই নোংরা, কালিমাখা হাঁড়িগুলোর মতই গায়ের রং, দেহের কাঠামো খাপছাড়া রকমের দীর্ঘ, পায়ে মাংস নাই, মেয়েগুলোও তাই, তার উপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়, মাথায় খাটো চুলে যোগান দিয়া বিড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা, তাহাতে অগুনিত বনকুঁড়ির সারি, পরণে বাহারে পাড়-শাড়ি, কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি! ছোটলোকদের দল সব, সমাজে আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতই পড়িয়া আছে।”

রুশ বিপ্লব ও স্ক্যান্ডেনেভিয়ান সাহিত্যের প্রভাবে কল্লোল যুগের নতুন কিছু আবিষ্কারের প্রবণতা ‘স্থলপদ্ম’ গল্পে লক্ষণীয়। সমাজের এই শ্রেণিবৈষম্যের দিকে তারাশঙ্কর আলোকপাত করেছেন, এবং শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘প্রত্যাবর্তন’ গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। ট্যারা এই ছোটগল্পের নায়ক। দুঃখ তার জীবনসঙ্গী। অভাবের তাড়নায় ট্যারা সংসারচ্যুত হয়ে দেশান্তরী হয়েছিল। ফিরে এসে মোহন্তের সেবা ও গুশ্রুবা করতে করতে মোহন্তের তরুণী কন্যাকে নিয়ে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখে ট্যারা। ব্যর্থ মনোরথে সে আবার দেশান্তরী হয়।

‘নারী ও নাগিনী’ গল্পের নায়ক খোঁড়া শেখ। ঘরে তার স্ত্রী জোবেদা। খোঁড়া সাপ নিয়ে খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। একদিন একটি সাপ সে ধরে আনে। উদয়নাগকে সে শিরে সিঁদুর লাগিয়ে আদর করে আর চুম্বন দেয়। জোবেদাকে সতীন বলে পরিচয় করায়। জোবেদা এতে সন্তুষ্ট হয়নি। আসঙ্গলিপ্সা যখন সাপটির মনে জাগে তখন খোঁড়া সাপটিকে ছেড়ে দিয়ে আসে এক মাঠে। খোঁড়ার প্রতি টানে সে ফিরে এলে জোবেদা তাকে একটি ঘুঁটে দিয়ে আঘাত করে। তারপর রাতের অন্ধকারে উদয়নাগ জোবেদাকে দংশন করে - প্রতিশোধ নেয় - জোবেদা বিবির অপমানের। খোঁড়া সাপটিকে বধ করতে পারেনি। সে বলেছিল —

“শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।”

‘বেদেনী’ গল্পের নায়িকা রাধিকা। শম্ভু বাজিকরের স্ত্রী সে। সাপের খেলা, বান্দর ও ছাগল নিয়ে খেলা দেখায় রাধিকা। কেঁষ্টোও আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে খেলা দেখায় ঘুরে ঘুরে। তরুণ কেঁষ্টকে দেখে রাধিকা মুগ্ধ হয়-কেঁষ্ট তার বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। শম্ভু প্রতিদ্বন্দ্বী কেঁষ্টকে প্রতিহিংসাবশত পুলিশে ধরিয়ে দিতে চাইলে রাধিকা শম্ভুর পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। শম্ভু তা জানতে পেরে রাধিকাকে মারধোর করে। এর ফলে রাধিকা শম্ভুকে পরিত্যাগ করে শম্ভুর তাঁবুতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কেঁষ্টকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই গল্পেও প্রতিবাদ রয়েছে।

‘দেবতার ব্যধি’ গল্পে ডাক্তার গড়গড়ির বক্তব্যে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। সে প্রধান শিক্ষককে অনুরোধ করেছিল, “ছেলেদের দেবতা হবার উপদেশ দেবেন না। মানুষ শুধু হতে উপদেশ দেবেন। দেবতাকে পূজো করতেও উপদেশ দেবেন না। তার সঙ্গে লড়াই করার মত সাহস দেবেন তাদের।”

গ্রামের সাধারণ মানুষ ডাক্তারের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত দেবমন্দির বানিয়েছিল - নৈবেদ্য বলি দেওয়া হল মন্দিরে। কিন্তু ডাক্তার গড়গড়ির ছিল নারীমাংস লোলুপতা। সে একটি তরুণী মেয়েকে বিয়ে করেছিল, কিন্তু তাকে ভালোবাসেনি। রুদ্রতা ও নির্মমতার মুখোশধারী গড়গড়ি চরিত্রের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘কাত্যয়নী’ গল্পে কাত্যয়নী শিশু খুনের আসামী। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কাত্যয়নী তার জায়ের ছেলেকে মায়ের মতো আদর করত। স্নেহবশত সে পরজন্মে নিজের সন্তানরূপে শিশুপুত্রটিকে পাবার জন্য হত্যা করে। একরূপ নৃশংস চরিত্রের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ

জানিয়েছেন।

‘শুশান বৈরাগ্য’ ছোটগল্পের একই খীম রয়েছে।

‘তারিণী মাঝি’ গল্পে ময়ুরাঙ্গীর বন্যায় জলের ঘূর্ণিচক্রে পতিত হয় তারিণী ও তার স্ত্রী। অবচেতন মনে বাঁচার জন্য তারিণী সুখীর গলা টিপে ধরে জলের মধ্যে। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে প্রেমকে অস্বীকার করে। সুখীকে হত্যা মূলত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আকাঙ্ক্ষা। এর মধ্যে জীবনধর্মের পরিচয় মেলে।

লোভের অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে তারাশঙ্করের প্রতিবাদী ছোটগল্প ‘অগ্রদানী’। শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রীর সন্তান জন্ম হয়ে মারা যেত। একই সময়ে পূর্ণ চক্রবর্তীর স্ত্রীও শ্যামাদাস বাবুর স্ত্রী সন্তান প্রসব করে। অভাবের কারণে ও লোভবশত সকলের অজান্তে চক্রবর্তী নিজ পুত্র বদল করে। চক্রবর্তীর পুত্র শ্যামাদাসবাবুর বাড়িতে বড় হতে থাকে। তার নিজের স্ত্রী একটি ছেলে রেখে মারা যায়। শ্রাদ্ধের দিনে শ্যামাদাসবাবুর অনুরোধে চক্রবর্তী নিজ নাতির হাত থেকে পুত্রের পিণ্ড গ্রহণ করেছে। এক নিষ্ঠুর বিচারকের ভূমিকায় তারাশঙ্কর চক্রবর্তীর উপর দণ্ড বিধান করেছেন —

“শ্রাদ্ধের দিন। গোশালায় বসিয়া বিধবা বধূ পিণ্ডপাত্র চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিল। পুরোহিত বলিল, খাও হে চক্রবর্তী।” লোভের খর্গে এভাবেই চক্রবর্তী বলি হয়েছে। উদর সর্বস্ব নির্লজ্জ হীনচিত্ত পূর্ণ চক্রবর্তী কুৎসিত চরিত্রটির স্বরূপ এভাবেই লেখক তুলে ধরেছেন।

‘সমুদ্র মছন’ গল্পে পঞ্চাশের মন্বন্তরে সমুদ্র মছনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই সমুদ্র মছনের ফলে উঠে এসেছে কুৎসিত সর্বরিক্ত গ্লানির হলাহল। মন্বন্তর পীড়িতা মৃত্যুপথযাত্রিণী এক নিম্নশ্রেণির কঙ্কালসার তরুণীর দাম্পত্য প্রেম ইমানত ও রমার শেখার বিষয়। এই দম্পতির নিত্যকলহের বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্পের পরিণতিতে যদিও উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলে গল্পকার শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

‘কলকাতার দাঙ্গা ও আমি’ গল্পে লেখকের প্রতিবাদী মনের পরিচয় রয়েছে। ছেচল্লিশে কলকাতার বুকে যে নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে লেখকের আত্ম উন্মোচনের বিষয় অবলম্বনে এই গল্পের অবতারণা — “কলকাতার এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাপুরুষের মত ঘরে বসে শুধু অনুশোচনা করেছে, উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য কিছু করতে পারি নাই - প্রতিষ্ঠা হানির ভয়ে, নিজের প্রাণের মমতায়। আরও অনেক-অনেক পাপ। সেসব কথা কি এদের সামনে প্রকাশ করতে পারি? পারি না।”

‘নব মহাপ্রস্থান উপাখ্যান’ গল্পটিতে তারাশঙ্কর মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের নায়ক, নাথুরাম গডসের প্রতি ধিক্কার জানিয়েছেন। লেখকের একমাত্র আদর্শ ছিল জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী। তাঁরই আকস্মিক হত্যাতে তিনি মর্মান্বিত হয়েছেন।

‘বিলিতি মাস্টার’ গল্পে অতি সাধারণ ক্ষুদ্রতার জন্য বিলিতি মাস্টারের জীবনে মেধা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও জীবনের অসফল দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই নির্দোষ ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে।

‘শশীশেখর’ গল্পে রয়েছে ব্যক্তির প্রতিবাদ। এক জমিদারের পুত্রের অহংকার, দম্ভ এবং নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘মালাচন্দন’ গল্পের নায়ক কিশোর গৌসাই। সে মিথ্যের বেসাতি করত। বহুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করত। যেদিন তার প্রকৃত স্বরূপ স্থানীয় সকল শ্রেণির মানুষ উপলব্ধি করল তখন কিশোর গৌসাই এর মিথ্যের বেসাতি আর খাটলোনা। এই মিথ্যের বেসাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘রঙিন চশমা’ গল্পের নায়ক কিশোর গৌসাই। সে মিথ্যের বেসাতি করত। বহুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করত। যেদিন তার প্রকৃত স্বরূপ স্থানীয় সকল শ্রেণির মানুষ উপলব্ধি করল তখন কিশোর গৌসাইয়ের মিথ্যের বেসাতি আর থাকল না। এই মিথ্যের বেসাতির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বাউল’ গল্পে বাউলের আদর্শভ্রষ্ট এক বাউলের জীবনলিপি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন লেখক। যে বাউল জীবনের প্রথমদিকে কৃষ্ণচরণে নিবেদিত প্রাণ ছিল সর্পাঘাতে মৃত্যু পথযাত্রিনী একটি বালিকাকে বাঁচিয়ে তুলে তার মায়া বন্ধনে সে আবদ্ধ হল। কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত সেই বাউলটি এক মোড়লের অর্থানুকূলে একটি কুটির নির্মাণ করে সুখে দিন কাটাতে লাগলো। বালিকার প্রেমে আবদ্ধ হয়ে সে ভুলে গেল কৃষ্ণ পাদপদ্মের কথা। তার এই নৈতিক অধঃপতন মৃত্যুর কারণ রূপে দেখা দিল। মৃত্যু পথযাত্রিনীকে সে বাঁচাতে পারলেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি।

‘বিশ্বধর’ গল্পের নায়ক বিনয়কৃষ্ণ রায়। সে যখন আশি বছরে পদার্পণ করে তখন এক সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী শিষ্যার সঙ্গে প্রেমে আবদ্ধ হল। এনিয়ে গ্রামে শুরু হয়ে যায় শোরগোল। সমাজের হিতসাধনের জন্য যে প্রতিনিয়ত সচেতন ছিল, যার সম্পর্কে সমাজের সাধারণ লোকের মধ্যে উন্নত ধারণা ছিল বৃদ্ধ বয়সে বিনয়কৃষ্ণ রায়ের অবৈধ সন্তানের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে লেখক তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন। এভাবে তারাশঙ্কর ভণ্ডগুরু নৈতিক অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্করের ‘না’ একটি বিখ্যাত প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে কালীনাথ ও তার স্ত্রী ব্রজরাণী এবং পুত্র অনন্ত প্রধান তিনটি চরিত্র। অনন্তের বিবাহ ব্যাপারে কালীনাথের প্রবঞ্চনা এবং নতুন বউ এর প্রতি নির্দয় ব্যবহার অনন্তের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু করে, ফলস্বরূপ অনন্তের হাতে তার পিতার মৃত্যু ঘটে, অনন্তের মা ব্রজরাণী অনন্তের অপরাধ আদালতে প্রকাশ করবে এরূপ দৃঢ় অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও পুত্রের ভবিষ্যতের কথা মনে করে আদালতে হাজির হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল।

স্বামীর মৃত্যুর পর অনন্তর মা মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে চিৎকার করত। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার পর থেকে সে শান্তিতে ঘুমোতে পেরেছিল। সন্তান বাৎসল্যের কারণে ব্রজরাণীর অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার বিরুদ্ধে তারাশঙ্কর প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মরামাটি’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পটভূমিকায় লেখা একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। যুদ্ধের বাজারে দেশের অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়ছে, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সারা দেশ যখন আচ্ছন্ন, জাপানী বোমার আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য শহরের লোক গ্রামের দিকে যাত্রা করছে, এসময় লেখকের গৃহে এক মুখরা অপ্রিয়বাদিনী তুলসীর আগমন ঘটে। তুলসীর উপর বহু পুরুষের ভোগলিপ্সা তাকে প্রতিবাদী করে তুলেছিল। সে কাজ ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। তারাশঙ্কর একটি অসহায়া নারীর পক্ষ অবলম্বন করে তৎকালীন নারী সম্ভোগবিলাসী ব্যক্তিদের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

‘জায়া’ গল্পের নায়ক শিবনাথ। তার স্ত্রী উমা। কোন একটি সাংঘাতিক অপরাধের অভিযোগে শিবনাথের কারাবাস হয়েছিল। কারাবাসের ফলে তার শরীর ভেঙে পড়ে। শিবনাথের চেহারা কুশ্রীতার ভাব রয়েছে কারামুক্তির পর। স্ত্রী উমার অভিমান ও অনুযোগ তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়নি। তাকে দেখে অনেকে নায়েব ভেবে উৎকোচ দিতে চেয়েছে, কেউবা চাকর ভেবে তার কাছ থেকে পদসেবা করিয়ে নিতে চায়। কেউবা তার মাথায় চপেটাঘাত করে অপমানিত করে। সর্বোপরি স্ত্রীর অপমান তো আছেই, সংশোধনাগারে থেকে শিবনাথের চারিত্রিক সংশোধন ঘটলেও সমাজের চোখে সে নিন্দনীয়। তারাশঙ্কর নিন্দনীয় শিবনাথ চরিত্রের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। বহুজনখ্যাত গান্ধীজীর সেই অমর বাণী পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারাশঙ্কর জায়া গল্পটি লিখেছেন।

‘বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ গল্পে তারাশঙ্কর চীন-ভারত সংঘর্ষের পটভূমিকায় কমিউনিষ্ট পার্টির চীন ভজনা, এবং আগ্রাসী চীনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘সত্যপ্রিয়ের কাহিনী’ গল্পে সত্যপ্রিয় জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘তিনশূন্য’ গল্পটি রচিত হয়েছে এক ভিখিরির জীবনকে কেন্দ্র করে। কামনালুন্ধ ভিখিরি লালসা মেটানোর জন্য ব্যস্ত। আদর্শভ্রষ্ট এই ভিখিরির বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘পৌষলক্ষ্মী’ গল্পে রয়েছে মুকুন্দ পালের সঙ্গে যুবক চাষি কৃষ্ণ পালের বিরোধের কাহিনী। মুকুন্দপাল যুবক সাজতে মদ্যপান করেছে তারপর তার মৃত্যু, গল্পে ট্র্যাজিক পরিণতি বহন করেছে।

‘রায়বাড়ি’ গল্পে রাবণেশ্বর রায়ের গোমস্তাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে মুসলমান, বাগদি ও হাড়ি সম্প্রদায়ের মানুষদের জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পাপে রাবণেশ্বরের চরিত্রের

পরিবর্তন ঘটেছে। সে বাণে ভাসা প্রজাদের জন্য মহল খুলে দিয়ে মহৎ গুণের পরিচয় দিয়েছে। একদিকে নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে ঔদার্যে সার্থক এই চরিত্র।

অতঃপর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রতিবাদ আলোচনা করছি। — প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে রোমান্টিক জগৎ তথা প্রকৃতি প্রেম, অতীত প্রীতি ও অতীন্দ্রিয় জগৎ তথা অলৌকিক রহস্য মুখ্য স্থান অধিকার করে থাকলেও তার বহু গল্পে বাস্তবতা বোধের অভাব ঘটেনি। তিনি যে আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিলেন বহু গল্পে তার প্রমাণ মেলে।

বিভূতিভূষণ যে শ্রেণি সচেতন শিল্পী ছিলেন ‘সই’, ‘পার্থক্য’, ‘কয়লা ভাঁটা’, ‘পারমিট’, ‘হিঙের কচুরি’, ‘পুঁইমাচা’, ‘দুর্মতি’, ‘অভয়ের অনিদ্রা’, ‘মেঘমল্লার’, ‘বিপদ’, ‘বড় দিদিমা’, ‘কিন্নরদল’, ‘জন্মমৃত্যু’, ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’, ‘মৌরীফুল’, ‘তিরোলের বাল্য’, ‘কুয়াশার রঙ’, ‘ভঙুল আমার বাড়ি’, - এইসব ছোটগল্পে তার পরিচয় মেলে।

গ্রাম বাংলার তুচ্ছ অবহেলিত জীবনের ব্যর্থতা-বেদনা ও বঞ্চনার ছবি বিভূতিভূষণের বহু ছোটগল্পে থাকলেও ‘পুঁইমাচা’ ছোটগল্পটি একটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। সহায়হরি, অন্নপূর্ণা, ক্ষেত্তি ও কালীময় ঠাকুর চরিত্রগুলি বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা। ক্ষেত্তির পুঁই-এর ভাঁটা দিয়ে চিংড়ি মাছের চচ্চরি খাবার লোভের ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ক্ষেত্তির বিরোধ বিভূতিভূষণ অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ক্ষেত্তির যখন পূর্ণ যৌবন সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নেয়। তার বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হয়ে যাওয়ার পরেও চন্ডীমন্ডপে গ্রামের মোড়লের উপস্থিতিতে বিয়ে ভেঙে যায়। পণের টাকা যোগাতে হয়েছিল সহায়হরিকে। কিন্তু আড়াইশো টাকা অসহায় সহায়হরি দিতে পারেনি বলে শ্বশুর বাড়ির লোকেরা ক্ষেত্তিকে পিতৃগৃহে পাঠাতে চায়নি। ক্ষেত্তির নামে মিথ্যে নিন্দা ছড়ায়। এছাড়া তার বিয়ের আগে ক্ষেত্তির সঙ্গে যে পাত্রের বিবাহ প্রস্তাব এসেছিল সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলেন, পাত্রটির চারিত্রিক দোষের অভিযোগে। এক কুস্তকার বধূর সঙ্গে পাত্রটির অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এই সংবাদ জানবার পর বধূটির আত্মীয়স্বজন পাত্রটিকে প্রহার করে। এই চরিত্রহীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিলে সহায়হরিকে একঘরে করে রাখবে একথা শোনায় কালীময় ঠাকুর। বিয়ের আশীর্বাদ হলে হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারে বিবাহ বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম প্রধান ও কালীময় ঠাকুরের এরূপ সংস্কারের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো নিঃসন্দেহে প্রতিবাদের পরিচায়ক।

ক্ষেত্তির বিবাহের পর তাকে যেমন পিতৃগৃহে পাঠায়নি এমনকি ক্ষেত্তি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেও সে সংবাদ জানানো হয়নি পিতা-মাতাকে। এরপর ক্ষেত্তির গায়ের স্বর্ণালঙ্কার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা খুলে রেখে তাদেরই এক আত্মীয়র গৃহে ক্ষেত্তিকে রেখে যায়। শোকে-দুঃখে সেখানে

ক্ষেত্রের মৃত্যু ঘটে। বিভূতিভূষণ পুঁইমাচা গল্পে পণপ্রথার বিরুদ্ধে ও তৎকালীন সমাজ বিধান দাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘অভয়ের অনিদ্রা’ গল্পে নববধূ বকুল কৃপণ অভয়ের ঘরে এসেছে। অভয়ের হাতটান ছিল প্রবল। অভয় বকুলকে গুনিয়েছিল যে বকুলের মৃত্যু হলে সে তার মৃত্যুর স্মৃতি হিসেবে তাজমহল বানিয়ে দেবে। এই ব্যাপারে বকুল বিরূপতার কথা জানায় এবং তাকে আশ্বস্ত করে অভয় বলে-সবই তোমার। অভয়ের স্ত্রী সাবান নিয়ে আসবার অনুরোধ জানালে অভয় গম্ভীরভাবে বলে — “ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে?”

বকুল এরপর অসুস্থ হয়ে পড়ে। ডাক্তারের জন্য দশটাকা খরচ হয়, কিন্তু বকুল আর বাঁচেনি। তার মৃত্যুর পর রান্নার লোকের জন্য মাসে দশ টাকা করে বছরে একশত কুড়ি টাকা গুণতে হবে শুনে অভয় শিউরে ওঠে। একদিন অভয় মৃত পত্নীর গয়নার বাক্সগুলো খুলে দেখে এক আনা সোনার কানের দুল দুটি নেই। এতে অভয়ের প্রতিক্রিয়া - “সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ মিলাইয়া দেখিল। না সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয় ?গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলযতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধকধক করিয়া জুলিয়া ওঠে মাথায়। সারারাত্রি সে জাগিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না।”

‘সই’ বিভূতিভূষণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী গল্প। সই পাতিয়েছিল একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের সঙ্গে দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল সচ্ছল পরিবারে এবং দরিদ্র পরিবারের মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল এক গরিব পাত্রের সঙ্গে। গরিব মেয়েটি একদিন তার রক্ত ছেলেটিকে নিয়ে সই এর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সে আশা করেছিল সই হয়তো ছেলেটিকে মড়া মিঠাই খাওয়াবে। কিন্তু তা হয়নি একটু গুড় ও জল খেতে দিয়েছিল তাকে। সই-এর স্কুল ফেরৎ ছেলেটিকে ভালভাবে খাইয়ে বিছানায় বিশ্রাম করতে গিয়েছিল। সই-এর প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখায়নি সে। উপেক্ষিত সইকে বসতেও সে বলেনি। বারান্দায় সিঁড়িতে সে বসে ছিল। কর্তা গৃহে ফিরে আসবার সময় তাকে সিঁড়ি থেকে সরে বসতে বলেছিল। দরিদ্র মানুষের প্রতি সচ্ছল শ্রেণির এরূপ হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই ছোটগল্পে। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ অর্থকৌলীন্যকেই বড় করে দেখে - এই ছোটগল্পে সখিত্বের সম্পর্কও গোঁণ হয়, - একের প্রতি অপরের উদাসীনতায়।

বিভূতিভূষণের শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক গল্প ‘পার্থক্য।’ এক ভিথিরির

সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির পার্থক্য দেখানো হয়েছে ‘পার্থক্য’ ছোটগল্পে। মন্বন্তরের সময়ে এক ভিথিরি এসেছিল এক গৃহস্থের দ্বারে ভাত, ফ্যান, কিংবা চালের প্রত্যাশায়। সম্পন্ন গৃহস্থ ভিথিরিদের ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করলেও ক্ষুধার্ত ভিথিরিকে ভাত খেতে দেয় নি। তাদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ঐদিনই এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত একটি ছেলে জল খেতে এসেছিল। গৃহস্থটি তাকে খেতে দিয়েছিলেন। সে ছিল লেখকের জাতিভুক্ত। জাতিগত বা বংশকৌলীন্যের মধ্যে যে শ্রেণিবৈষম্য লক্ষ্য করা যায় লেখক এই গল্পে সেটাই দেখিয়েছেন।

শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিভূতিভূষণের এক প্রতিবাদী গল্প ‘কয়লাভাটা’। কুলি-কামিনদের বুড়ি পিছু কয়লার দাম ছিল ছয় টাকা। এটি ন্যয্য দাম নয় ভেবে তার দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল ঠিকাদার দেবেন মাইতির দল। দেখা গেল বেশি দাম পেয়ে নেশাতে আসক্ত হল কুলিরা। তখন আবার দাম কমিয়ে ছয় পয়সায় আনা হল। আসলে এরূপ কারসাজি করার কারণ হল মুনাফার জন্য। দাম বাড়লে মুনাফা কমবে, দাম কমালে মুনাফা বাড়বে এই ভেবে দাম কমিয়ে দিয়েছিল তারা। সর্বহারা শ্রেণিরা যদিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। তবে শ্রেণি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে লেখক এই গল্পটি লিখেছেন।

বিভূতিভূষণের ‘হিঙের কচুরি’ কিংবা ‘বিপদ’ গল্পে দালালদের কুচক্র পড়ে দেহজীবিনী রমণীদের জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন। লেখক তাদের স্বাভাবিক নারী চরিত্র হিসেবেই গড়ে তুলেছেন।

‘বিপদ’ গল্পে অভাবের তাড়নায় হাজু পতিতাদের খাতায় নাম লিখিয়ে স্বাভাবিক জীবন অতিবাহিত করে। এই জীবিকার জন্য বিন্দুমাত্র সংকোচ সে অনুভব করে নি। হাজু একদিন স্ব-গ্রামবাসী লেখককে ডেকে গৃহে আপ্যায়ন করে। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে —

“কাল ও ছিল ভিখারিণী, আজ এ পথে আসায় ওর অন্ন বস্ত্রের সমস্যা ঘুচিয়াছে, কাল যে পরের বাড়ি চাহিতে গিয়ে প্রহার খাইয়াছিল, আজ সে নিজের ঘরে বসিয়া গ্রামের লোককে চা খাওয়াইতেছে, নিজের পয়সায় কেনা পেয়ালা - পিরিচে - যার বাবাও কোনদিন শহরে বাস করে নাই বা পেয়ালায় চা পান করে নাই। ওর জীবনের এই পরম সাফল্য ওর চোখে। তাকে তুচ্ছ করিয়া নিন্দা করিবার ভাষা যোগাইল না।”

কোন নীতিত্ব কিংবা সতীত্বের চেয়ে মানীষের সত্তার বিকাশকেই বড় করে দেখে প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে লেখক পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বাসা’ গল্পে লেখক গ্রামীণ অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জেলের ছেলে কানাই খড়গপুরে রেলের চাকুরে। সে কোয়ার্টার পেয়েছে। একদিন কানাইয়ের মা দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে দিন অতিবাহিত করত। আজ তারা সচ্ছল। বিভূতিভূষণ খড়গপুরে

বক্তৃতা করতে এসেছিলেন। কানাই লেখককে নিয়ে যায় তার কোয়ার্টারে, সেখানে লেখককে আদর আপ্যায়ন করেন স্ব-গ্রামবাসী বলে। লেখক দেখেন তাদের সচ্ছল জীবন। গ্রাম বাংলার লেখক বিভূতিভূষণ দেখেছেন গ্রামের চেয়ে শহরের জীবনযাত্রা অনেক ভালো। গ্রামে বসে থাকলে কানাই-এর জীবনের একরূপ পরিবর্তন সম্ভব হত না।

ডঃ সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন - “গ্রাম সমাজ যেখানে আবদ্ধ করে রাখে মানুষের বিকাশ ও প্রতিষ্ঠার পথ - সেখানে তিনি সে সমাজ ত্যাগ করবার পক্ষে। কলকারখানা বাড়ছে বলেও এখানে কোনো আক্ষেপ নেই তার।”

‘দুর্মতি’ গল্পে আমরা দেখতে পাই যে ছোট একটি অন্যায়বোধ কিভাবে মানুষকে তার পরিবার - পরিজনদের থেকে, বিশ্বাসের জায়গাগুলো থেকে সরে আসতে বাধ্য করে এবং তার পরিণাম কি দুঃখজনক হতে পারে। দরিদ্র হরিচরণের ক্রী বীণাপাণি ও একটি শিশুপুত্র এই নিয়েই তার সুখী পরিবার। গল্পে বীণাপাণির বাড়িতে তার পিতৃবন্ধু ধনী কৃষ্ণলাল বারুর আগমন ঘটে এবং উপহার স্বরূপ বীণাপাণিকে দিয়ে গেলেন মূল্যবান একটি ব্রেসলেট। হরিচরণ লোভবশতঃ সেটিকে চুরি করে বসে এবং পত্নীর প্রশ্নের উত্তরে সে জানায় যে সে সারাদিন গ্রামেই ছিল না কাজেই সে কি করে জানবে। এদিকে বীণাপাণি স্বামীকে সন্ধ্যায় গ্রামেই দেখেছিল। তাই স্বামীর এই অসৎ আচরণ বীণাপাণি আর বিশ্বাস করলেন না। বিশ্বাস ভেঙে যাবার এবং স্বামীর ছলনার আশ্রয় নেবার ভঙ্গি দেখে তার ভেতরের চাপা দুঃখে জ্বর এসে বীণাপাণির মৃত্যু ঘটে এবং অনুশোচনায় ভরে যায় হরিচরণের মন। তাই বীণাপাণির স্মরণে দীর্ঘদিন পরেও হরিচরণের চোখে জল আসে। এইভাবে গল্পকার দুরাচারীর প্রতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘তিরোলের বালা’ গল্পে দেখা যায় ভ্রাতৃহত্যার বিষয়। এক সুন্দরী উন্মাদিনী বালিকা তার ভাইকে হত্যা করে। গল্পটিতে ভয়াবহতা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে এক শোচনীয় পরিণাম দেখা যায়। হত্যা যেভাবেই হোকনা কেন তা অপ্রত্যাশিত। এই ভাবনার প্রকাশে একটি প্রতিবাদের সুর ধনিত হয়েছে গল্পটিতে।

‘যা চাই, তা ভুল করে চাই, যা পাই তা চাই না।’ এই লাইনটির অনুরণন যেন ঘটেছে ‘কুয়াশার রঙ’ ছোটগল্পটিতে। প্রথম দর্শনেই নায়ক প্রতুলের প্রেম কিভাবে শুরুতেই শেষ হয়ে বাস্তবের ও স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দূরত্ব তৈরী করছে তা করুণ রসে সিক্ত।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ভড়ুল মামার বাড়ি’ একটু ভিন্নস্বাদের ছোটগল্প। গ্রামকে ভালোলাগা ও ভালোবাসার দৃষ্টান্তে গল্পটি পূর্ণ। ব্যক্তিত্বকে না হারিয়ে গ্রামকে ভালোবেসে গ্রামের মধ্যে থেকে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত এক প্রতিবাদী চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার।

সারাজীবনে অর্থ ব্যয়ে ভড়ুল মামা নির্জন জঙ্গলের মধ্যে যে বাড়ি তৈরি করলে তার

স্ত্রী, পুত্ররা কেউই সেখানে এলো না কারণ তারা শহুরে জীবনে অভ্যস্ত গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ, সরল জীবনে তাদের ভালো লাগেনা। তাই একাকী ভদ্রুল মামার স্বজনহীন অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। এখানে করুণ রসের সঞ্চর ঘটেছে ভদ্রুল মামার মৃত্যুতে এবং অবহেলিত গ্রামের প্রসঙ্গে।

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় ‘নদীর ধারে বাড়ি’ গল্পটিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন সুস্থ সম্পর্ক সব সময়েই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে তোলে এবং সেই সঙ্গে তিনি নাগরিক জীবনের নাগরিক বীভৎসতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কলকাতার বীভৎস ঝগড়া ও দুর্গন্ধযুক্ত পরিবেশ যদুনাথ ও শ্যামলীর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। যদুনাথ স্থির করে দূর গ্রামে একটি নদীর ধারে তারা বাড়ি কিনে চাষবাস করে জীবন কাটাবে। তাই সব টাকা পরসে নিয়ে বাড়িটি কিনে যদুকেরানি ও তার স্ত্রী শ্যামলী সেখানে চলে যায়। সেই খোলা মেলা পরিবেশে যেন তারা প্রাণ ফিরে পায়। আর তখন তাদের দুঃখ হয় পীতাম্বর লেনের সেই পচা ড্রেন ও কষ্টের মধ্যে থাকা মানুষগুলোর জন্য।

‘কিন্নর দল’ গল্পটিতে দেখা যায় গ্রাম্য জীবন ও প্রকৃতির বিপুল রোম্যান্টিক রূপের বিপরীত একটি রূপের। যেখানে আছে গ্রামের সংকীর্ণতা, দলাদলি, কুসংস্কার, ঈর্ষা, বিদ্বেষ এর কুফল। যা কিনা গ্রাম্য জীবনকে বাইরের জগৎ থেকে একেবারে আলাদা করে রেখেছে।

বিভূতিভূষণ লিখেছেন — “আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ, পরস্পর ঝগড়া, দ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারস্পরিক কলহ, জাতিগত বিরোধ, সন্দেহ এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্য বালাই নেই কারো।” ২০

গ্রামের একজন রূপসী সুগায়িকা কিভাবে, জীবনের মধ্যে বিশেষত নারীসমাজের মধ্যে ‘অকরণ কুটিল ভাবের’ রূপান্তর ঘটিয়েছিল, - মুখরা মেয়ে শান্তির জীবনে তারই প্রকাশ ঘটেছে উক্ত ছোটগল্পে। এখানে নাগরিক রুচি, শিক্ষা, সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে গ্রাম্য কালচারের নিরিখে।

‘জন্ম ও মৃত্যু’ গল্পে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ বাস্তবতার পরিচয় মেলে। জন্ম ও মৃত্যু এই দুটি অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিস্থিতিগত বৈপরীত্য রয়েছে। একদিকে ধনী বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনকে কেন্দ্র লেখকের নিজস্ব অনুভূতি অন্যদিকে গ্রামের বৃদ্ধা শশী ঠাকুরাণের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি আলোচ্য গল্পটি তারই অবতারণা।

লেখক গিয়েছিলেন বাড়িভাড়ার খোঁজে বিশ্বনাথবাবুর বাড়িতে। সে দিনটি ছিল বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিন। সাত ছেলে ও চার মেয়ে পুত্রবধূ, ভাই-ভাইবৌ, নাতি-নাতনী, নাতজামাই সকলেই উপস্থিত হয়েছিল এই আড়ম্বরপূর্ণ জন্মদিনে অংশগ্রহণ করতে। বিশ্বনাথবাবুর পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা হাতে ছিল। সকলেরই চোখ ছিল সেদিকে। বিশ্বনাথবাবুর টাকা ছিল বলেই সকলেই তার

বশ। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় তার অর্থ কৌলীন্যে, বিভূতিভূষণ এই শ্রেণির অর্থলোভী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এই অভিজ্ঞতা লাভ করার কিছুদিন পর লেখক ফিরে এসেছেন তার স্ব-গ্রামে। সেখানে গুনলেন বৃদ্ধা শশী ঠাকুরগুণের মৃত্যু সংবাদ। তার চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে বিদেশে কর্মরত। বড় ছেলে সামান্য কাজের সঙ্গে যুক্ত এজন্য তাকে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাতে হ'ত। রোজগেগে ভাইরা বড় ভাই ও মাকে দেখে না। অর্থলোভী ভাইরা মাকে টাকা পাঠায় না এমনকি মার খোঁজখবর রাখে না। সহায় সম্বলহীনা বৃদ্ধা থালা বাটি বিক্রয় করে বহু কষ্টে বড় ছেলের সংসার চালাবার পর মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে সব ছেলেরা উপস্থিত থেকে বিপুল অর্থব্যয়ে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে। মা জীবিতকালে যারা একটি টাকাও দেয়নি তাদের কাছে দামী হয়ে উঠেছিল আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। এই গল্পটি পাঠ করে আমাদের প্রাণ মন বিধিয়ে ওঠে, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি মূল্যবোধের চেহারাকে ভেবে দেখবার, উপভোগ করবার গল্প এটি। এর মধ্যে লেখক বড় মাপের জীবনদর্শনকে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। এই গল্পে আমরা দেখি লেখককে আত্মদানপন্থী জীবনের উপভোক্তা হিসেবে।

‘নাস্তিক’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র লোকনাথ। জৈন সন্ন্যাসী লোকনাথ পণ্ডিত হলেও সে ছিল নাস্তিক। বিশ্বরহস্যের কোন সন্ধান সে পায়নি এজন্য তার জীবনে এসেছে নৈরাশ্যবোধ - “সবদিকেই অন্ধকার, কোনো দিক থেকে কোনো আলোক আসার চিহ্ন দেখা যায় না।”

মৃত্যুর মুহূর্তে লোকনাথের জীবনের ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়েছে। একটি বালিকাকে সে নির্যাতন করেছে - এই গভীর বেদনায় সে মর্মাহত - “পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে সে কেঁদে কেঁদে ফুঁপিয়ে বলছে কেন তুমি মারবে ?কেন আমায় মারবে ?এ পাড়ায় আসি বলে ?আর ককখনো আসব না..... দেখে নিও, আর ককখনো যদি আসি.....”

এক অভিমান বঞ্চিতার কান্নার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ এই গল্পে ধ্বনিত হয়েছে।

‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ বিভূতিভূষণের অন্যতম ছোটগল্প, দ্রবময়ী বৃদ্ধা - গৃহে নাতি-নাতনীদেব দ্বারা উপেক্ষিত। সে তার জন্মভূমি ছেড়ে কাশীবাস করতে এসেছে। কাশীতে এসে সে দেখেছে জগন্নাথ বিগ্রহের মধ্যে অলাবু! কথকঠাকুর যখন দিব্যালোক প্রাপ্তির মাহাত্ম্য শোনাচ্ছেন তখন - “দ্রবঠাকুরগুণের মন অনেকদূরে চলে গেল। তাঁর গাছে কত কাঁঠাল হয়েছে এই আষাঢ় মাসে বড় কাঁঠাল ধরে গাছটাতে, শেকড়ে পর্যন্ত কাঁঠাল। তিনটে আমগাছে আমও নিশ্চয় খুব

ধরেছিল.....বারো ভূতে লুটে পুটে খাচ্ছে।” এরপর দ্রবময়ী কাশী ছেড়ে চলে এলো গ্রামে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন — “দ্রবময়ীর কাশীবাস হয়নি - কিন্তু সহজ জীবনের পুণ্যক্ষেত্রে স্বামীর ভিটায়, গরু-গাছপালা, লতাপাতার প্রীতিতে, প্রতিবেশীদের স্নেহ ভালোবাসাতেই তার মোক্ষলাভ ঘটেছে।”

বিভূতিভূষণ এই গল্পে এই সত্যই প্রকাশ করেছেন মুক্তি লাভ করতে গেলে জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করে যাবার প্রয়োজন হয় না। জীবন বিমুখতার বিরুদ্ধে ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’ ছোটগল্পে বিভূতিভূষণ প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘কুশল পাহাড়ী’ গল্পেও লেখক এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অসাম্প্রদায়িকতার সার্থক নিদর্শন হিসেবে বিভূতিভূষণের ‘আত্মন’ গল্পটি উল্লেখযোগ্য। বাৎসল্য রসযুক্ত এই গল্পে ধর্ম, সমাজ ও শ্রেণিগত বৈষম্যের কোন স্থান নেই। মানুষে মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন হল সবচেয়ে বড়।

আলোচ্য গল্পের বক্তা এক মুসলমান বৃদ্ধকে কৃপা করে কিছু অর্থ সাহায্য দিয়েছিলেন। দুঃসময়ে এই অর্থ পেয়ে বক্তার প্রতি বৃদ্ধার গভীর স্নেহের উদ্বেক হল, যদিও বক্তা বৃদ্ধার আচরণে খুব একটা প্রীতি ছিল না। মাঝে মাঝে রুঢ় ব্যবহারও করেছেন কিন্তু বুড়ির ‘আমার গোপাল’ বলে এই স্নেহপূর্ণ ডাক অপূর্ব পবিত্র মাতৃস্নেহ ধারায় অভিসিক্ত হয়েছিল। এই মুসলমান বৃদ্ধার প্রতি অলৌকিক আকর্ষণ বশতঃ তার মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে এসে সে বৃদ্ধার কবরে এক কোদাল মাটি ও কাফনের কাপড় কিনে দিয়েছেন। বক্তার সংবেদনশীল মন হাহাকার করে উঠেছিল ‘আমার গোপাল’ এই ডাক শোনার জন্য। স্নেহ ভালোবাসার কাছে জাতি-ভেদ, ঐশ্বর্য গৌণ। সাম্প্রদায়িক বিভেদও গৌণ এই সত্যটি আলোচ্য গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

এবার বলফুলের গল্পের আলোচনা করব। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম ‘বনফুল’, বাংলা গল্প জগতের এক সার্থক স্রষ্টা ও শিল্পী। তিনি জীবন রহস্য সন্ধানে এবং বাস্তব জীবনের সার্থক রূপকার। বৃত্তি সূত্রে চিকিৎসক হয়েও বিচিত্র স্বাদের গল্প রচনা করেছেন। তিনি সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, ভভামি নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার বৈচিত্র্যপূর্ণ ছোটগল্পে সমাজ সমস্যা ও ব্যঙ্গের অবস্থান পাশাপাশি। তাঁর প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলির মধ্যে ‘ছোটলোক’, ‘অনুবীক্ষণ’, ‘শ্রীপতি সামন্ত’, ‘বীরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী’, ‘ছুড়িটা’, ‘ব্যবধান’, ‘ভক্তিভজন’, ‘ঐরাবত’, ‘ছেলেমেয়ে’, ‘শালা’, ‘ক্যানভাসার’, ‘যুগান্তর’, ‘দোলের দিনে’ ‘অপূর্ব বিজ্ঞান’, ‘বর্ণে বর্ণে’, ‘সেকালের রায়বাহাদুর’,

‘পক্ষীপুরাণ’, ‘সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ’, ‘মাধব মুখুজ্যে’, ‘বুর্জোয়া প্রলেটারিয়েট’, ‘ঝুলনপূর্ণিমা’
‘ব্যাচারাম বাবু’, ‘নমুনা’, ‘ব্যতিক্রম’, ‘ট্রেনে’, ‘পাশাপাশি’ ও ‘উৎসবের ইতিহাস’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বনফুল সমাজসচেতন শিল্পী। সমাজের অসঙ্গতিগুলিকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন এবং তার বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ। তাঁর ‘ছোটলোক’ একটি প্রতিনিধি স্থানীয় প্রতিবাদী গল্প। কংগ্রেসী জাতীয়তাবোধে বিশ্বাসী অন্তঃসারশূন্য রাঘব সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত চরিত্র। তিনি শিক্ষিত ও পরোপকারী। পরণে তার খদ্দেরের পোশাক। গল্পের অপর চরিত্রটি হলো এক হত দরিদ্র নীচু তলার লোক। সে রাঘব সরকারকে ভাড়া পাবে বলে রিক্সা চাই কিনা জিজ্ঞেস করলে প্রথমে ‘না চাই না’ একথা বলে। এরপর রিক্সাওয়ালার প্রতি করুণা বশত রিক্সা ডেকে ভাড়া করে তাতে না চেপে হনহন করে হেঁটে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যান। তারপর রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিতে গেলে সে শ্রম ব্যতীত পয়সা নেয় নি। অহংকারী রাঘবসরকারের আচরণে নিচুতলার মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে। তার দান করবার মানসিকতার মধ্যে কোন শ্রদ্ধা বা সম্মান ছিল না, ছিল একমাত্র আত্মবোধ যা ভদ্রলোকের তুলনায় অনেক বেশি।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বনফুলের প্রতিবাদ বহু ছোটগল্পে থাকলেও ‘ভক্তিভাজন’ ছোটগল্পে নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণের বংশমর্যাদাকে বড় করে দেখেছেন। অর্থাৎ অনটন হতাশা থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্রের গৃহের অন্ন গ্রহণ করেন নি। তার কাছে বংশ মর্যাদাই ছিল বড়।

স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘ব্যবধান’ গল্পে। এই গল্পের নায়ক সুরথবাবু। সে আদর্শভ্রষ্ট যুবক, পিতার উপদেশ সে মেনে চলে না। কিন্তু পিতার অর্থের প্রতি তার লোভ ছিল বেশি। পিতা লটারীতে টাকা পেলে পুত্রকে সেই টাকা দিতে গিয়ে দেখে পুত্র মদ্যপান করে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় পড়ে আছে। পুত্রের এই অধঃপতনের জন্য পিতা উক্ত টাকা পুত্রকে না দিয়ে এক সং প্রতিষ্ঠানে দান করে দেয়। এই সংবাদ পাবার পর মদ্যপায়ী পুত্র পিতাকে খুঁজতে থাকে কেননা এতগুলো টাকার লোভ সে কোনভাবেই ছাড়তে পারেনি। অর্থলোভী, আদর্শভ্রষ্ট, স্বার্থপর, মদ্যপায়ী চরিত্রের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘ছুড়িটা’ গল্পে লম্পট দেশনেতার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এক চরিত্রহীন, ভল্ল, দেশনেতা কলকাতার মহাজাতি সদনে বক্তৃতা দিচ্ছেন - “আমাদের সকলকে চরিত্রবান হতে হবে, চরিত্রই আমাদের মূলধন।”

বাক্ সর্বস্ব দেশনেতার মুখে বলেন আদর্শের কথা কাজে করেন অন্যরূপ। দেশনেতার বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল তারই ব্যভিচারের ফসল অর্থাৎ তারই ঔরসজাত অবৈধ সন্তান মেয়েটি। -

সে ভিক্ষে করতে করতে ক্লান্ত হয়ে মহাজাতি সদনের দিকে গিয়েছিল। এ ধরনের

ভক্ত দেশনেতাদের মুখোশ বনফুল খুলে দিয়েছেন তাঁর রচিত গল্পে।

ভীষণ জৈবিক আকৃতির বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী গল্প ‘বুধনী’। বুধনীকে একদিন দেখতে পায় এক আদিবাসী ছেলে বিল্টু। তারপর উভয়ের মধ্যে প্রেম তা থেকে বিবাহ হয়ে যায়। দুবছর ধরে তারা বর্বর প্রণয়লীলা চালায়। একে অপরকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকে নি। সেই বুধনী যখন অন্তঃসত্ত্বা হল, পরে জন্ম দিল এক শিশুকে, তখন বিল্টু দেখল বুধনীর সঙ্গে তার জৈবিক প্রেমে ঘটিত পড়ে যাচ্ছে বরং বুধনী কোলের শিশুটিকে উজাড় করে দিয়েছে তার স্নেহ ভালোবাসা ও বাৎসল্য। বিল্টু ভাবছে বুধনী আগের মতো নেই, বুধনী তাকে ভালোবাসছে না। জৈবিক ক্ষুধায় তড়িত বিল্টু ছেলেটিকে ক্রোধবশত হত্যা করে বসল। বিল্টুর বিচার হল, বিচারে তার ফাঁসির দন্ডদেশ হয়। মৃত্যুর আগে সে বুধনীর নাম বারবার উচ্চারণ করেছিল। বুধনীর প্রতি তার একরকমের গভীর প্রেম থাকলেও বিল্টু কারোও সহানুভূতি পায়নি। নারীর সাফল্য মাতৃমূর্তিতে, বুধনী তারই প্রতিনিধি। বুধনী চরিত্রের গৌরব এবং বিল্টু চরিত্রের পশুসুলভ আচরণ, দুই বিপরীতধর্মী চরিত্র বনফুলের কলমে সার্থক হয়ে উঠেছে।

বনফুলের ‘চৌধুরী’ গল্পের নায়ক কংসারী চৌধুরী। সে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য সবই করতে পারে। ঘুস নেওয়া, জালিয়াতি, লোকঠকানো সব কাজে তার জুরি মেলা ভার। কংসারী চৌধুরী কখনও হার মানে নি। কিন্তু যেদিন সে অন্ধ হয়ে গেল, কোন চক্ষু চিকিৎসক তার চোখ ভালো করতে পারলো না সেদিন রিভলবার দিয়ে চোখে গুলিবিদ্ধ করে সে আত্মহত্যা করল। মৃত্যুর উপর এরূপ অপরায়ে পৌরুষ ও জেদি মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক। লেখক এরূপ চরিত্রকে ভালো চোখে দেখেন নি।

‘বীরেন্দ্রনারায়ণ’ বনফুলের একটি চরিত্র প্রধান গল্প। এই গল্পে বীরেন্দ্রনারায়ণের চরিত্রে পরস্পর বিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরেন্দ্রনারায়ণ জালিয়াতি, অত্যাচারী, নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন হীন কাজে অভ্যস্ত। একদিন জমিদার ডেকে আনতে বলে ডাক্তারকে। জমিদারের ছেলে ছিল সাংঘাতিক অপরাধে অপরাধী। ডাক্তারকে মিথ্যে সার্টিফিকেট দিতে হবে এ খবর জানালে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন। সত্যশ্রী ডাক্তার কোন ভয়ের কাছে মাথা নত করেন নি। এরপর জমিদার ডাক্তারকে সেই গ্রাম ছেড়ে দেবার হুমকি দেয়। নিজ সম্মান রক্ষার্থে ডাক্তার গ্রাম ছাড়তে প্রস্তুত। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এক গরুর গাড়ীতে তুলে যখন যাত্রা করবেন তেমন সময়ে বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘোড়ায় চেপে এসে ডাক্তারের গতি রুদ্ধ করে ডাক্তারকে গ্রাম ছেড়ে না যাবার অনুরোধ করল। বীরেন্দ্রনারায়ণ জানাল সে সার্টিফিকেট অন্য ডাক্তারের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছে কিন্তু এরূপ সৎ আদর্শবান ডাক্তার গ্রামে আর একটিও পাওয়া যাবে না। এইভাবে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান জানিয়েছে জমিদার।

বনফুলের ‘অনুবীক্ষণ’ একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পটি রচিত হয়েছে প্রধান তিনটি চরিত্র অবলম্বন করে। একজন সুদর্শন পণ্ডিত বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ বহু ভাষাবিদ - দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনীতি সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। তার রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল তিনি সিফিলিস ও গনোরিয়া নামে যৌন রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত। পাণ্ডিত্যের আড়ালে তার চরিত্রের নীচতা ও অসংযমীর পরিচয় মেলে। বনফুল ভদ্রবেশী, অসৎ, চরিত্রহীন পণ্ডিতের প্রতি ঘৃণা ও ধিক্কার প্রদর্শন করেছেন।

অন্যদিকে কুৎসিত চেহারার একটি লোক, যার নাম শশধর - বাইরে থেকে তাকে মনে হচ্ছিল যে সে সিফিলিস কিংবা গনোরিয়া রোগে আক্রান্ত। তার ঠোটে দগদগে ঘা। কিন্তু রক্তপরীক্ষা করে ডাক্তার দেখলেন তার রক্তে কোন দোষ নেই - সে কোন যৌন রোগেও আক্রান্ত নয়।

বাইরের পোশাক পরিচ্ছদে, চাকচিক্য কিংবা সুন্দর মনে হলেও তার মধ্যে অসুন্দর মন বিরাজ করে আর কুৎসিত, কদর্য বলে মনে হলেও সে যে চরিত্রবান হতে পারে এরূপ ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন এই গল্পে। বহিঃদেহে কাউকে মূল্যায়ন করা উচিত নয় এই সত্য কথাটিই লেখক ‘অনুবীক্ষণ’ গল্পে তুলে ধরেছেন।

উচ্চশিক্ষিত কিন্তু দুর্নীতিপরায়ণ আত্ম অহংকারী চরিত্রের প্রতি বনফুলের প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে ‘শ্রীপতি সামন্ত’ গল্পে। শ্রীপতি সামন্ত সাধারণ পোশাক পরিহিত একজন ট্রেনের যাত্রী। সে রেলের নির্দিষ্ট টিকিট করে ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠতে গেলে এক ইংরেজী বুলিওয়ালা যুবক শ্রীপতিকে ট্রেনের কামরায় উঠতে বাধা দিয়েছিল, অবজ্ঞা করেছিল এই নিরীহ লোকটিকে। কিন্তু রেলের টি.টি. যখন ট্রেনে টিকিট অনুসন্ধান করছিল তখন দেখা গেল যুবকটি রেলের টিকিট করেনি বিনা টিকিটের যাত্রী হয়ে প্রথম শ্রেণির কামরায় আরামে বসে ছিল। টি.টি. তাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বললে শ্রীপতি তাকে অপমান ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য টি.টি. কে নিজেই টাকা দিয়ে যুবকটির সম্মান রক্ষা করেছিল। অথচ এই যুবকটি শ্রীপতির প্রতি পশুর মতো আচরণ করেছিল, ট্রেনে উঠতে দিতে চায়নি, মানবিক মূল্যবোধের সামান্য পরিচয়ও সে দিতে শেখেনি, অথচ প্রৌঢ় শ্রীপতি তার প্রতি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার বিষয়।

‘অনির্বচনীয়’ গল্পে ক্ষণিকা দোজ বরের সঙ্গে বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, এমনকি এরূপ পাত্রের সঙ্গে বিবাহ করলে সে আত্মহত্যা করবে এরকম সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। তার বান্ধবী সুজাতাকে জানিয়েছিল — পুরুষরা সিগারেটের মত মনে করে মেয়েদের। একটি শেষ হতেই, না নিভতেই, আবার বিবাহের হোমের জন্য আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। কাজেই এরূপ বিবাহ আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এরপর জানা গেল, ক্ষণিকা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে তার

সঙ্গেই সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। তার কিছুদিন পর সুজাতা আত্মহত্যা করে। সেই ক্ষণিকাই আবার ‘লাভ ম্যারেজ’ করেছে অজয় বসুর সঙ্গে। নারী মনস্তত্ত্ব প্রধান অনির্বচনীয় ছোটগল্পে নারীর দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

অদম্য কামনা বাসনার বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় মেলে ‘ঐরাবত’ গল্পে। এই গল্পের দুটি নারী চরিত্র হল আন্না কালী ও নমিতা। তারা দুজনেই সন্তানসম্ভবা। বৈচিত্র্যহীন হাসপাতালের মুখোমুখি দুটি বেডে তারা শুয়ে থেকে পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক কথা বলে যাচ্ছে। পুরুষরা সব অপকীর্তির নায়ক, স্বৈচ্ছাচারী, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, অহংকারী এবং স্ত্রীর উপর নির্যাতনকারী। শুধু তাই নয় নিজের বউ থাকতেও পরনারীতে আসক্ত, মদ, আফিং, ভাঙ ও সিগারেট খেতেও তারা অভ্যস্ত। তারা আড্ডাবাজ মিথ্যেবাদী। পুরুষদের দৃষ্টি শুধু সুন্দরী মেয়েদের দিকে। পাশাপাশি নারীরা সর্বসহা, ত্যাগী, রান্না করা, সেবা করা এগুলো তাদের কাজ। অথচ পুরুষদের চোখে নারীর কোন দামই নেই।

আন্না কালী নমিতাকে বলেছে যে — “অমন নেমকহারাম জাত আর আছে নাকি। এই ধর না, যে ছেলেকে পেটে ধরে বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করি আমরা সেই ছেলেই বিয়ে করে একেবারে পর, মায়ের দিকে ফিরেও চায়না।” এভাবে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এরপর হাসপাতালে একই তারিখে আন্না কালী ও নমিতার সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। সাত কন্যা সন্তানের জননী আন্না কালীর হল একটি কন্যা সন্তান। নমিতার কোলে প্রথম পুত্রসন্তান এল। এই সংবাদ আন্না কালী জেনে আন্না কালীর মুখ হল বিবর্ণ, সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। নমিতার পুত্রসন্তান হয়েছে এই সংবাদ শুনে আন্না কালী জোরের সঙ্গে নার্সদের জানিয়েছে তার সন্তান অদল বদল হয়েছে। তার মেয়ে হতেই পারে না। কেননা জ্যোতিষ বলে দিয়েছিল তার ছেলে হবে। সে চিৎকার করে বলল — “আমার ছেলে এনে দাও নিশ্চই আমার ছেলে হয়েছে।” হাসপাতালে যখন নিপুণতা বিরাজ করছিল সেসময় নমিতা সভয়ে তার পুত্রকে কোলে তুলে নিল। এটি বনফুলের শ্রেষ্ঠ মনস্তাত্ত্বিক গল্প।

স্বামী ও স্ত্রীর মধুর প্রেমে যখন আঘাত আসে তখন নারী জীবনের গভীর যন্ত্রণা অনুভূত হয়। নারীজাতির প্রতি সহানুভূতি এবং পুরুষজাতির বিবাহ লোলুপতার বিরুদ্ধে বনফুল প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘অদ্বিতীয়া’ গল্পে। এই গল্পে প্রভাবতী দেবী ছ’টি পুত্র ও কন্যা সন্তানের জননী। সপ্তম সন্তান আসবার আগে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পিতৃগৃহে। তার পরেরটি পুত্র সন্তান হল। এদিকে তার শ্যালিকা জামাইবাবুকে জানালো সন্তান জন্ম দিয়ে প্রভাবতী দেবী মারা গিয়েছে। এ অবস্থায় শ্যালিকা দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব দেয়। শ্যালিকা দুমাস যেতে না যেতেই বিয়ের সব ব্যবস্থা

করে রাখে। বিয়ের দিন কৌশল করে শ্যালিকা একটি ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে এনেছিল। পাশের ঘরে প্রভাবতী তার সাতটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে সেজেগুজে বসে রয়েছে। স্বামীর এই বিড়ম্বনা আমাদের কাছে উপভোগ্য মনে হলেও নারীমনের বেদনাকে এবং পুরুষের নারী জাতির প্রতি অমর্যাদাকে লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘যুগান্তর’ গল্পে নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে, ‘দত্তমহাশয়’ ছোটগল্পে সুদখোর দত্ত মহাশয়ের বিরুদ্ধে, ‘দোলের দিনে’ গল্পে মেকি আভিজাত্যের বিরুদ্ধে ইংরেজভক্ত রায়বাহাদুরের বিরুদ্ধে, ‘অপূর্ব বিজ্ঞান’ গল্পে দৌল্যমান মেরুদণ্ডহীন লোকের বিরুদ্ধে, ‘পক্ষীপুরাণ’ গল্পে অপরিণামদর্শী বাঙালির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘সনাতন পুরের অধিবাসীবৃন্দ’ গল্পটিতে সংকীর্ণ জীবনে অভ্যস্ত পল্লী বাংলার চিত্র তুলে ধরেছেন। এক নির্দোষ প্রবীন লোকের চরিত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের মুখোরোচক গল্প কিভাবে তার মৃত্যু ঘটালো তারই একটি করুণ কাহিনী রয়েছে এই গল্পটিতে। বনফুল এই গল্পটির মধ্যদিয়ে নিক্ষেপা নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন গভীবদ্ধ পল্লীবাংলার মানুষগুলোর কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মাধব মুখুজে’ ‘বুর্জোয়া প্রোলেটারিয়েট’, ‘অমলা’ ‘বর্ণে বর্ণে’ প্রভৃতি গল্প পণপ্রথা, পাত্রী নির্বাচনের নাটক, মেয়েদের বিবাহ সমস্যা ও নিম্ন মধ্যবিত্ত কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুর্গতি এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে বনফুল এই গল্পগুলো রচনা করেছেন।

‘অমলা’ গল্পে অমলা চেয়েছিল স্বাস্থ্যবান, সুন্দর সুপুরুষ বর। কিন্তু মধ্যবিত্ত কন্যার এই চাওয়া টিকলো না কারণ দাম দরে ঠিত হওয়ারও একটা ব্যাপার ছিল। তাই তার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। সে মোটা, কালো সওদাগরী অফিসের এক কর্মচারীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ তার সাথে দরে বনেছিল। এই যে মেয়েদেরকে দরদাম করে পণ্যে পরিণত করবার ব্যবস্থা, এর বিরুদ্ধে লেখক ছিলেন সরব।

‘বর্ণে বর্ণে’ গল্পে লেখক ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তৃতীয় বিয়েতে ইচ্ছুক পাত্র কালো বর্ণের মেয়েদের নাকোচ করে নিজের জন্য নির্বাচন করলেন বাদামী বর্ণের পাত্রীকে। অর্থাৎ সমাজে মেয়েদের যে গাত্রবর্ণ পর্যন্ত চর্চার বিষয়, গাত্রবর্ণ ভেদে মেয়েদেরকে নির্বাচন করার এই যে প্রথা তাই লেখক দেখিয়েছেন।

‘বুলন পূর্ণিমা’ গল্পে দেখা যায় একজন পিতা অসবর্ণ পাত্র নিখিল অপেক্ষা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত প্রৌঢ় স্ববর্ণ মহেন্দ্র গাঙ্গুলীকে জামাই হিসেবে নির্বাচন করলে শিক্ষিত কথা আপত্তি জানায়। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে নিখিলের ভীর্ণতা দেখে তারা দুজনেই বুলন পূর্ণিমার দিনে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এখানে বর্ণবিদ্বেষকে লেখক তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন কথা ও নিখিলের আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। অসবর্ণ বিয়ে আমাদের সমাজে

কিভাবে আস্ত আস্তে গৃহীত হচ্ছে তার পরিচয় পাওয়া যায় ‘ভূত’ নামক গল্পে।

‘বেচারামবারু’ গল্পে মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং স্বল্প আয়ে সংসার চালানোর যে চিন্তা তা কিভাবে মানুষকে গ্রাস করে চলেছে তাই আলোচ্য গল্পে দেখানো হয়েছে।

আজকের দিনে বেকারত্ব যে এক মহাসমস্যা তার পরিচয় রয়েছে ‘পাশাপাশি’ ও ‘উৎসবের ইতিহাস’ গল্পে। এছাড়াও ‘দোলের দিনে’, ‘নমুনা’, ‘দর্জি’, ‘ব্যতিক্রম’, প্রভৃতি গল্পে বনফুল সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিবাদের সুরে।

‘ভোটের সাবিত্রীবালা’ গল্পে বনফুল সমাজের অন্যায় অবিচার ও ধনবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাবিত্রীবালা এই ছোটগল্পের প্রধান নারী চরিত্র। তার স্বামী পণ্ডিত হলেও স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। পুত্র তমোনাশ ও রিপুনাশ এই দুই নামকরণের মধ্যে ব্যঞ্জনা নিহিত। তমোনাশ অর্থাৎ অন্ধকার বিনাশকারী, রিপুনাশ অর্থাৎ শত্রু বিনাশকারী, এরূপ নামকরণ করলেও তারা সমাজের কোন হিতসাধন করতে পারেনি। তমোনাশ অর্থাভাবে পড়াশুনা করতে পারেনি। অসৎ সঙ্গে পড়ে তাকে মরতে হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। এমনকি সাবিত্রীবালা পুত্রের সৎকারের অর্থটুকুও দিতে পারে নি। স্বামীর মৃত্যুর পর ছোট পুত্র রিপুনাশ যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়। ডিম, মাছ, মাংস, ফল এগুলো ডাক্তার খেতে বলে কিন্তু মা সাবিত্রীবালা তার কিছুই ছেলের জন্য কিনে দিতে পারেনি।

ভোট যখন আসন্ন ভোটপ্রার্থীরা ভোট চাইতে এসেছিল সাবিত্রীবালার কাছে। সাবিত্রীবালা অগ্নিশর্মা হয়ে ভোট প্রার্থীকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছেন — “আপনাকে ভোট দেব ? কী উপকার করেছেন আপনি আমার ? আপনি যখন গদিতে ছিলেন তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিথিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড়ো ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারিনি, শেষে সে গুড়া হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল।

ছোট ছেলে গেল যক্ষ্মায়, তার কোন চিকিৎসা হলনা। সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন ? কাউকেই ভোট দেব না। বেরিয়ে জান বাড়ি থেকে দড়াম করিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল সাবিত্রী।”

ভোটের সাবিত্রীবালার এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র ভোট প্রার্থীদের বিরুদ্ধেই নয়, সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও শ্রেণিবিভক্ত সমাজের বিরুদ্ধেও তার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

বনফুলের ‘মণিকাঞ্চন’ গল্পে প্রশাসনের আইনি ব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে ও সর্বক্ষেত্রে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন গল্পের নায়ক সাধন বাবু।

এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের শোষণ ও ভন্ডামির বিরুদ্ধে বনফুলের প্রতিবাদী কণ্ঠ

উচ্চারিত হয়েছে ‘দেশদরদী কেনারামের রোজনামা’ গল্পে। দেশদরদের নামে স্বার্থপরতা, স্বজনপোষণ নীতির বিরুদ্ধে এই গল্পে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

‘নিমগাছ’ গল্পে পারিবারিক অন্যায়ে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। যে স্ত্রী সংসারের জন্য সব কিছু মেনে নিয়েছে তাকে শোষণ করে তাকে দিয়ে অত্যধিক শ্রম করিয়ে নিয়েও তার যথোচিত মূল্য দেয়নি যে পরিবার তাদের বিরুদ্ধে গৃহকর্মে নিপুণা লক্ষ্মী প্রতিমাতুল্য বধূটি প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হয়েছে।

‘জাগ্রতদেবতা’ গল্পে বনফুল অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গ্রামের একটি পুরনো মন্দির রয়েছে সেই মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহ রাখা হয়েছে। এই মহাদেবই জাগ্রত দেবতা। তাঁর কৃপাতেই লটারিতে টাকা পাওয়া পাওয়া ব্যবসায় উন্নতি, রোগমুক্তি, মামলা-মোকদ্দমা জেতা সম্ভব হয়। এছাড়া এই গ্রামের একটা প্রচলিত বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল প্রতিবছর বাৎসরিক পূজা উৎসবে একজন পাগল হয়ে যেতো। দেবতার মহিমাতেই এটা সম্ভব বলে তারা মনে করত। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী মানুষদের অন্ধবিশ্বাস ও অশিক্ষার কারণে এরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল। দেবতার মহিমা অসীম তিনি কারো ভালো করেন কারও মন্দ করেন। অলৌকিক ও অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘বিরজু রমা’ বনফুলের একটি অন্যতম গল্প। চিরকুমারী বিরজুর মা’র মধ্যে মাতৃত্বের প্রকাশ ঘটেছে। বিরজুর বাবার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হয়েও ভেঙে যায়। বিরজুর বাবা নতুন বিয়ে করে। বিরজুকে জন্মদেবার পর বিরজুকে তার মায়ের তত্ত্বাবোধানে রেখে যান। সে কালো গরুর দুধ বিক্রি করত বিভিন্ন বাড়িতে এবং প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে তার সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিরজুর মা’র ছেলের নাম হকরু। তার বিয়ে হয়েছে। বৌটি আসার পর হকরু বউ এর কথা শুনেই চলত। তার মায়ের প্রতি কোন দায়িত্ব সে পালন করেনি। গর্ভধারিণী মা পুত্রের এই আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে এই চরিত্রের একটি মহৎ দিক হল সে গ্রামের সকলের মা। প্রত্যেক বছর পূজার সময় সে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপহার দিত।

‘দুধের দাম’ বনফুলের একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এক বৃদ্ধা ট্রেনে উঠতে গিয়ে যাত্রীদের দ্বারা কিভাবে অবহেলা, অপমান ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সহ্য করেছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বৃদ্ধা পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। এজন্য তার পক্ষে এককভাবে ট্রেন থেকে নামা সম্ভব হয়নি। সে যাত্রীদের অনুরোধ করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু কেই তার কথা শোনেনি। অনেকে তাকে ভিখিরী, অশিক্ষিত ও টিকিট বিহীন যাত্রী বলেছে। আসলে সে ভিখিরী নয়। তার সেকেড ক্লাস এর টিকিট আছে। বেথুন স্কুলে পড়া এই শিক্ষিতা বৃদ্ধাটি বাংলা, ইংরাজি ও হিন্দি এই তিনটি ভাষায় বিশেষ দক্ষ।

তখন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল একটি কুলি। যে কুলিটি তাকে প্রথম শ্রেণির প্রতীক্ষালয়ে বসিয়ে দিয়েছিল এবং গয়াগামী ট্রেনেও তুলে দিয়েছিল। তাকে যেভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছিল অন্যান্য যাত্রীরা তা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। অভিজ্ঞতা সূত্রে বৃদ্ধাটি দেখেছে কয়েকজন সুবেসা সুতনী ও সুরুপা মেয়ে যখন ট্রেনে উঠেছিল তখন যাত্রীরা তাদের প্রতি সুমিষ্ট ব্যবহার করেছে। রূপ ও সৌন্দর্যহীন বৃদ্ধা সেই ব্যবহার পায়নি। নারী চরিত্রে প্রতি যাত্রীদের এই পক্ষপাতের বিরুদ্ধেও বনফুল পরোক্ষভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গল্প সূত্রে আমরা জানতে পারি কুলিটি বৃদ্ধাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বিদায় নিতে যাচ্ছিল সে সময় বৃদ্ধাটি তার মহানুভবতার জন্য তাকে দু'টাকা দিয়েছে। কুলিটি আট আনার বেশি নিতে চায়নি। তখন বৃদ্ধাটি কুলিটিকে বলেছে —

“তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছে। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াই নি দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা। দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।” এরমধ্যে চিরন্তন মায়ের ছবি আমরা খুঁজে পাই। যার মধ্যে উচ্চ ও নিম্ন কোন ভেদাভেদ নেই।

‘তিলোত্তমা’ বনফুলের অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা তিলোত্তমা দেখতে সুরুপা নয়। তার গায়ের রঙ তিলের মত কুচকুচে কালো। তার বাবা তিলোত্তমাকে বিয়ে দিয়েছে কিন্তু শর্ত অনুসারে বিয়ের পণ যথাযথ দিতে পারেন নি এই অভিযোগে তার লোভী শ্বশুর শাশুড়ি তিলোত্তমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি। তিলোত্তমার শাশুড়ি পুত্রবধূকে পেত্নীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। শ্বশুর-শাশুড়ি ঘোষণা করেছে তারা ছেলেকে আবার বিয়ে দেবে। বস্তুত ছেলের পুনর্বিবাহের আয়োজন করে। উষার সঙ্গে আবার বিয়েও হয়। বিয়েতে দশ হাজার টাকা, প্রচুর গয়নাপত্র পায়। উষার মায়ের কলঙ্কের কথা জানা থাকলেও নকুল নন্দীর লোভ ও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির জন্য সে কলঙ্কও ঢাকা পড়েছিল। তিলুকে তার স্বামী গোকুল জিজ্ঞাসা করেছিল যে দ্বিতীয়বার বিয়েতে তার কোন আপত্তি আছে কিনা। তিলোত্তমা ‘না’ বলে নীরবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্বামী সেবা, বাসন মাজা, কাপড়কাঁচা, ঘর গেরস্থালের কাজ নীরবে করে যেত। উষা গোকুলকে একটি শর্ত দিয়েছিল — “তিলোত্তমাকে জনৈক মত বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিতে হইবে।”

তিলোত্তমা তার পিত্রালয়ে গিয়েছে কিন্তু যাবার আগে সে অনুরোধ করে গিয়েছিল অন্তত বছরে এক আধবার যাতে দেখা করতে পারে। এভাবে অর্থলোলুপ মানুষের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

কল্লোল গোষ্ঠীর পুরোধা রবীন্দ্র পরবর্তী গল্পকার প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন -

“বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রই বাংলাদেশে দ্বিতীয় শিল্পী - যিনি গল্পে

এবং কবিতায় সমুন্নত শীর্ষবিহার করেছেন।”

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকদের ভাবনা ছিল - “জীবনানন্দের ভাষায় নষ্ট শশা, পচা চালকুমড়ার ছাঁচের এই জীবনবৃত্তের ওপারে আর এক সৌন্দর্য প্রোজ্জ্বল সার্থকতা- যার স্বাদ ‘গভীর - গভীর।’ তাঁদের এক চোখে অশ্রু, এক চোখে জ্বালা আর শিল্পীর তৃতীয় নয়নে সুন্দরের ধ্যানমূর্তি।”

তিনি মানুষের সুখ-দুঃখের বাস্তব গুণকে ছোটগল্পের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন। প্রেম-প্রতিহিংসা ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, শাস্ত্র জীবনবোধ বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব চিত্র, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্পের মুখ্য বিষয়। নাগরিক জীবনের অন্যতম কথাকার প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ‘কল্লোল যুগ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- “দুঃখও দেখছি বটে, দেখছি কদর্যতা। মার চোখের জল দেখেছি, গলিত কুষ্ঠ দেখেছি, দেখেছি লোভের নিষ্ঠুরতা, অপমানিতের ভীষণতা, লালসার জঘন্য বীভৎসতা, নারীর ব্যভিচার, মানুষের হিংসা, কদাকার অহংকার, উন্মাদ বিকলাঙ্গ রুগ্ন গলিত শব, তবু —

“দ্বার খোল, খোল দ্বার, রাত্রির প্রহরী,এ দেখেও আবার যখন শান্ত সন্ধ্যায় ঝাপসা নদীর ওপর দিয়ে মহুর না’ খানি যেতে দেখি স্বপ্নের মতো পাল তুলে, যখন দেখি পথের কোল পর্যন্ত তরুণ নির্ভয় ঘাসের মঞ্জুরি এগিয়ে এসেছে, দুপুরের অলস প্রহরে সামনের মাঠটুকুতে শালিকের চলাফেরা দেখি, তখন বিশ্বাস হয়না আমার মত না নিয়ে আমায় এই দুঃখভরা জগতে আনা তার নিষ্ঠুরতা হয়েছে।”

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘সাগর সংগম’, ‘মহানগর’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘ভবিষ্যতের ভার’, ‘শুধু কেরানী’, ‘হয়তো’, ‘বিকৃতক্ষুধার ফাঁদে’ প্রভৃতি ছোটগল্পে সমাজের বিভিন্ন স্তরের শোষণ বঞ্চনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

‘ভবিষ্যতের ভার’ গল্পে দেখানো হয়েছে এক তরুণ আদর্শবাদী হেডমাস্টারের স্বপ্ন ও আদর্শ দারিদ্র্যের কারণে কিভাবে বিনষ্ট হয়ে যায় তারই ছবি। বহু স্বপ্ন ও আদর্শ নীতিবোধ ও সততাকে আশ্রয় করে যিনি মানুষ গড়ার কারিগর রূপে হেডমাস্টারের পদ বেছে নিয়েছিলেন, সেই প্রধান শিক্ষকের জীবনের ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য এবং তা থেকে হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মহানগর’ গল্পে মহানগরের অমানবিকতা ও বিষাক্ততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। মহানগরের বিকৃত জটিল জীবন তার ভালো লাগেনি। রতনের ব্যর্থ জীবনের অনুভূতিকে লেখক নিম্নোক্ত ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন —

‘মহানগরের পথে ধুলো। আকাশে ধোঁয়া, বাতাসে বুঝি বিষ, আমাদের দেশে এখনো কখন কখন কামনা পূর্ণ হয়। যা খুঁজি তা মেলে ও বহুদিনের কামনার ফলও কেমন একটু বিষাদ

লাগে। মহানগর সব কিছুকে দাগী করে দেয়। সার্থকতাকেও দেয় একটু বিষিয়ে।’

বালক রতন দিদির শ্বশুরবাড়ী থেকে অপহৃত হবার পর মহানগরের উল্টো ডিঙ্গি এসে খুঁজে পায়। দিদি তখন গৃহবধু থেকে বারবনিতায় রূপান্তরিত। এই ক্লেদাক্ত সমাজের বিরুদ্ধে বালক রতন দিদির কাছ থেকে চলে যাবার সময় জানিয়ে যায় - “বড় হয়ে আমি তোমায় নিয়ে যাবো দিদি কারুর কথা গুনবনা।” রতনের মুখ দিয়ে এই প্রতিবাদী ভাষা তুলে ধরেছেন।

‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’ গল্পে প্রেমেন্দ্র মিত্র নিচু তলার মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন। পেটের দায়ে একদিন পতিতা বৃত্তি বেছে নিতে হয়েছিল এক নারীকে। দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা, পীড়ন ও আর্থিক অভাবে কি বীভৎস জীবনকে বেছে নিতে হয়েছে সেই অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রতি লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছে।

‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্পে পল্লীবাংলার রিক্ত সর্বহারা রূপটিকে লেখক তুলে ধরেছেন। গল্পের নায়ক নিরঞ্জন। কোনদিন তেলেনাপোতা গ্রামে আর ফিরতে পারেনি, অসহায় বৃদ্ধা তার যুবতি কন্যার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন লেখক। তেলেনাপোতাকে আবিষ্কার করবার জন্য মানবতাবোধ ও সহানুভূতির প্রয়োজন বলে লেখক মনে করেছেন।

‘শুধু কেরানী’ গল্পে এক তরুণ কেরানীর প্রথম সন্তান হবার পর তার স্ত্রীর সূতিকারোগে মৃত্যু ঘটে। মরবার আগে সে ঈশ্বরের কাছে মাথা কুটে বলতে চেয়েছিল মরতে সে চায়নি কিন্তু অর্থনৈতিক অনটনের জন্য চিকিৎসার অভাবে তাকে পরিশেষে মরতে হল। তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লেখকের এই প্রতিবাদ।

‘সংসার সীমান্তে’ গল্পে পুরুষ শাসিত সমাজে এক রূপহীনা নারীকে বেছে নিতে হয় পতিতাবৃত্তি। কিন্তু সেওতো চেয়েছিল স্বামী সন্তান, সুখ-শান্তি, কিন্তু তার স্বপ্ন কোন দিনই বাস্তবায়িত হয়নি। রজনীর পর রজনী ধরে এই রূপহীনা নারী অতিথির আগমনের প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করে থাকে মাত্র। বস্তৃত গল্পের নায়িকা রজনী এই ক্লেদাক্ত জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু আদৌ কি সে মুক্তি পেয়েছিল?

এবার আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে আলোচনা করছি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মাত্মতা, প্রশাসনিক দুর্নীতি প্রভৃতির বিরুদ্ধে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ পরিচয় মেলে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আজকাল পরশুর’ গল্পতে দেখানো হয়েছে তৎকালীন সমাজপতিদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পেটের দায়ে নারীকে শহরে এসে শরীর ব্যবসায়

নিযুক্ত হতে হয়েছে। তৎকালীন সমাজ ও সমাজপতিদের বিরুদ্ধে মানিকের লেখনী ঝলসে উঠেছে।

‘মাটির মাণ্ডল’ গল্পে জোতদার ধরণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সুদখোর মজুতদার ধরণী চড়া সুদে ভুবন, রসিক ও তোরাবদের ধান ঋণ দিয়েছিল। অত্যাধিক সুদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ চাষীরা জোতদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

১৯৪৩ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধান’ গল্পটি। ইতিমধ্যে অভাবগ্রস্ত মানুষের ঐক্যবদ্ধ করে সোনা মন্ডলের নেতৃত্বে ধানের গোলা লুট করবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করবার জন্য রাতারাতি ধানগুলি সরিয়ে ফেলে শরৎ। তারপর এগারোজন চাষীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এই সংবাদ পেয়ে শরৎ হালদারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’ গল্পে সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘অসহযোগী’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প। মুনাফা লোভী পিতার অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে পুত্র রমেনের প্রতিবাদ লক্ষ্য করবার মত।

বঙ্গ সংকটের পটভূমিকায় লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দুঃশাসনীয়’ গল্পে কালোবাজারে বঙ্গ চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। গল্পের নায়ক আনোয়ার জী রাবেয়াকে লজ্জা নিবারণের বস্ত্র দিতে পারেনি বলে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। রাবেয়ার আত্মহত্যা এক মূর্তিমান প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ তার স্বামীর বিরুদ্ধে নয়, তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে।

‘রাঘব মালাকার’ গল্পটি যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মনুষ্যত্বের পটভূমিকায় লেখা। সমগ্র দেশ যখন বঙ্গ সংকটের সম্মুখীন সে সময় নর-পিশাচ কালোবাজারীর বিরুদ্ধে রাঘব মালাকার ও বলরাম বঙ্গহীন বস্ত্রবাসীদের নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ফলে মজুতদার গৌতমের সব কাপড় লুণ্ঠন করে নিয়ে বঙ্গহীন নর-নারীদের মধ্যে বন্টন করা হয়।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা আর এক প্রতিবাদী গল্প ‘হারানের নাতজামাই’। কৃষকনেতা ভুবন মন্ডলকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পুলিশ এলে ভুবন মন্ডল ময়নার মার গৃহে আশ্রয় নেয় জামাই জগমোহন সে দিন ছিল পিত্রালয়ে। ময়নার মা সুকৌশলে ভুবন মন্ডলকে জামাই পরিচয় দেয় পুলিশের কাছে। পুলিশ তাকে ধরেনি ময়নার জামাই ভেবে। পরদিন জগমোহন ময়নার মার কাছে এসে এই ঘটনা শোনে। ময়নার মার ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করলে আসল ঘটনা জানবার পর সে ময়নাকে নিয়ে সংসার করে। ময়নার মা এভাবেই নকশাল আন্দোলনের নেতা ভুবন মন্ডলকে বাঁচিয়ে দেয়।

‘টিচার’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে প্রতিবাদী চরিত্র গিরীন রাজমাতা হাইস্কুলের শিক্ষকদের সংগঠিত করে মাস পয়লা বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবী

জানিয়ে শিক্ষক ধর্মঘটে অংশ নেয়। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী গিরীনকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেও গিরীন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেননি। ফলত গিরীনকে শিক্ষকতার কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু তাকে বরখাস্ত করে দেশের হাজার হাজার শিক্ষক সমাজের দাবীকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রাজনীতি সচেতন শিল্পী ব্যক্তিত্ব। তার গল্পে শ্রেণিসংঘাতের চিত্র রয়েছে। পরিণামে শোষিত মানুষের সংগঠিত রূপ এবং তাদের আত্মশক্তির বিকাশ দেখানো হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সতীনাথ ভাদুড়ীর গল্প আমার আলোচ্য বিষয়। বাংলা প্রতিবাদী গল্পের ধারায় সতীনাথ ভাদুড়ীর নামটি উল্লেখের দাবি রাখে, তিনি গল্পের আঙ্গিনাকে বহুদূর পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছেন সেই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও স্বাদে এনেছেন নতুনত্ব। বিহারের শুষ্ক মাটিতে বসে সেই মাটি ও মানুষের জীবন কথা তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। ছোট ছোট মানুষের সুখ-দুঃখ, শোক-ব্যর্থতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং প্রেম ও প্রীতি তাঁর গল্পের বিষয়।

তাঁর ‘গণনায়ক’, ‘বন্যা’, ‘আন্টা বাংলা’, ‘পরকীয়া’, ‘সন-ইন-ল’, ‘চরণদাস এম.এল.এ.’ ‘পুতিগন্ধ’, ‘তলানির স্বাদ’ প্রভৃতি গল্পে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। রাজনীতি সচেতন সতীনাথ উপলব্ধি করেছেন সাধারণ মানুষের প্রতি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগের নামে দেশের মানুষকে বঞ্চনা করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে লেখকের ক্রোধ অভিমান, বেদনা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে। মূলত তিনি রাজনৈতিক ভঙ্গিমকে ভালো চোখে দেখেননি। রাজনীতির নামে দুর্নীতি, শোষণ, অত্যাচারকে তিনি সমর্থন জানাননি।

বিহারের গ্রামীণ জীবনের স্বার্থপরতা, ক্ষুদ্রতা, জাতিভেদ প্রথা ও দলাদলি কিভাবে বারে বারে জন-জীবনকে বিপন্ন করে তোলে তার নিখুঁত আলেখ্য তিনি তুলে ধরেছেন ‘গণনায়ক’ ছোটগল্পে। এ গল্পে দেখানো হয়েছে দেশবিভাগের সীমারেখা যার মাইলস্টোন হচ্ছে নাগর নদীর ওপর একটি কাঠের পুল। কিছু মুনাফাখোর ব্যবসায়ী তাদের মধ্যে মুনিমজি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে তৎপর। লেখক এ ধরনের চরিত্রের মুখোশ খুলে দিয়েছেন।

‘বন্যা’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন কুশী নদীর বন্যার ফলে রসিকপুরা গ্রামের মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধ। কিন্তু বন্যার পরে শুরু হয় আবার তাদের মধ্যে বিরোধ।

‘আন্টা বাংলা’ গল্পে বিহারের নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই নীলকররা নাচ-গান, হৈ-চৈ করে সময় কাটিয়েও সাধারণ কৃষকদের উপর অত্যাচার

চালিয়েছে। নীল চাষীদের দেহে নীল কাল শিরার দাগের মতো অত্যাচারের নিমর্ম রূপটি লেখক তুলে ধরেছেন।

‘পুতিগন্ধ’ গল্পে ভাঙ্গামির বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে।

‘তলানির স্বাদ’ গল্পে ব্যক্তির মিথ্যাচারের জন্য একটি নারীর সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘পরকীয়া সন-ইন-ল’ গল্পে সতীনাথ দেখিয়েছেন শ্রীসাহেবরাম নামের এক এম.এল. এ.-র মূর্থতা ও চালাকির বাস্তব চিত্র। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ে শ্রীসাহেব রাম এম. এল. এ. কিভাবে উপমন্ত্রী হয়েছে তার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

‘করদাতা সংঘ জিন্দাবাদ’ গল্পে কিভাবে রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষকে উস্কে দিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মা আত্র ফলেয়ু’ গল্পে তৎকালীন সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অন্তর্কলহের বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘চকাচকি’ গল্পে দুবে-দুবেনিকে সামনে রেখে বিশ্বনিন্দুক মুসাফির নাথের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেখক।

‘মুনাফা ঠাকুরণ’ গল্পটি অসাধু ব্যবসায়ী পরিবারকে কেন্দ্র করে রচিত। সমাজজীবনের ও ব্যক্তি জীবনের ত্রুটিকে উপলক্ষ্য করে সতীনাথের এই ব্যঙ্গধর্মী গল্পটি অনবদ্য সৃষ্টি।

‘চরণদাস এম.এল.এ.’ সতীনাথের একটি ব্যঙ্গাত্মক গল্প। একসময় চরণদাস জনপ্রিয় ছিল কিন্তু এম. এল.এ. হবার পর সে জনগণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখেনি। তার দেশের বাড়ি ভাড়া দিয়ে রাজধানীতে সপরিবারে চলে যায়। এবার পার্টির হাইকমান্ডের নির্দেশ অনুসারে তাকে ফিরে আসতে হয় রাজধানী ছেড়ে তার সগৃহে। ভোটারদের সঙ্গে জনসংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি দেখেন আগে যাদের সঙ্গে তার চেনা পরিচয় ছিল তারাও তাকে ভুলে গেছেন। পার্টিকর্মীরাও তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে চলেছে। অতীত জনপ্রিয়তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রী সহস্রানন্দ স্বামীজীর স্মরণাপন্ন হন। দেবতাস্বরূপ স্বামীজীর জয়ধ্বনি করে তার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। সরকারী লোক গণনাকারি স্বামীজীকে সাধারণ লোকের সঙ্গে এক তালিকায় রাখতে চাইলে চরণদাস তাতে বাধা দেন। তার উদ্দেশ্য ছিল স্বামীজীকে দেবতার পৃথকাসনে বসিয়ে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা। সতীনাথ আলোচ্য গল্পে এক রাজনীতিবিদের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ভিন্নস্বাদের গল্প লিখেও প্রতিবাদী গল্প ধারার দক্ষশিল্পী হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর পর আমার আলোচনায় আসছে সুবোধ ঘোষের নাম। গোত্রান্তরের গল্পকার সুবোধ ঘোষ একটি স্মরণীয় নাম। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র সুবোধ ঘোষের ছোটগল্পে বঙ্গ দেশের যন্ত্রণা, বঞ্চনা, কুশ্রিতা, সংক্ষোভ, মন ও মেজাজ নূতনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি মানবিক মূল্যবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এই সময় কালের আর্থসামাজিক পটভূমিকাকে উপজীব্য করে তাঁর বহু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন সাম্যবাদী ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী।

সুবোধ ঘোষের ‘ফসিল’, ‘গোত্রান্তর’, ‘সিঁড়ি’, ‘সুন্দরম’ প্রভৃতি গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

‘ফসিল’ গল্পে আমরা দেখি অঞ্জনগড়ের রাজার সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্য এসেছিলেন মিঃ মুখার্জী যিনি মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রতিনিধি। অঞ্জন গড়ের কৃষি ও শিল্পের বিকাশে তিনি নিবেদিত প্রাণ। তারই উদ্যোগে শিল্প প্রতিনিধিরা এসে অঞ্জনগড়ের এক অংশ লিজ নিয়ে অভ্র ও অ্যাসবেসটস খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। এদিকে খনি গর্ভে ৯২জন শ্রমিক চোদ্দ নম্বর পিটের ধূসে পড়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, অন্যদিকে রাজার বনভূমি থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করতে গিয়ে আরও অনেকে প্রাণ হারায় এই সংবাদ প্রকাশিত হলে কৃষক ও শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করতে পারে ভেবে মিঃ মুখার্জী রাজাকে অনুরোধ করে দুলাল মাহাতোকে গ্রেফতার করবার জন্য। একদিকে রাজশক্তি, অন্যদিকে বণিকী সভ্যতা এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি হাত মিলিয়ে শ্রমিক নেতা দুলাল মাহাতোকে খুন করে। তার ডেডবডিও অন্যান্য লাসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সুবোধ ঘোষ এই নৃশংস চিত্র তুলে ধরেছেন আলোচ্য গল্পে। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস লক্ষ বছর পরেও একদিন ফসিলগুলো আবিষ্কৃত হবে।

‘গোত্রান্তর’ গল্পে আমরা দেখি উচ্চশিক্ষিত সঞ্জয় পেটের দায়ে রতন লাল সুগার মিলে চাকরি নেয়। প্রথমে তার মাইনে ছিল ত্রিশ টাকা। পরে এসে ঠেকে পনের টাকায়। বিশ্ববাণিজ্যে চিনির বাজারে মন্দা দেখা দিলে শ্রমিক ছাটাইয়ের নোটিশ পড়ে সঞ্জয় সেদিন কৃষকদের ধর্মঘটের পরামর্শ দেয়। সঞ্জয় বিপ্লবী হলেও তাকে পরিশেষে আত্মসমর্পণ করতে হয় রায়বাহাদুরের কাছে। গল্পে সমাজ বিশ্লেষণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

‘সিঁড়ি’ গল্পে সুবোধ ঘোষ মধ্যবিত্তের প্রবঞ্চকের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন।

‘সুন্দরম’ গল্পে আমরা দেখি কৈলাস বাবুর পুত্র সুকুমার ব্রহ্মচারী হতে চেয়েছিল, কোন পাত্রী তার পছন্দ হয়নি একারণে। আর সেই সুকুমার-ই ইরানী বেদেনী হামিদার মেয়ে তুলসীর প্রতি যৌনাসক্ত হয়। তার গর্ভে সন্তান এলে সুকুমার বিষপ্রয়োগের মাধ্যমে নারী হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি। তার মৃত্যুর পর ময়না ঘরের লাস কাটা ডাক্তার সুকুমারের পিতা কুৎসিতা তুলসীর লাস কেটে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। যদু ডোম কৈলাস বাবুর প্রতি ব্যঙ্গ করে বলে শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

এর মধ্যে তীব্র কশাঘাত নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

‘পরশুরামের কুঠার’ গল্পে যে জননী স্তন্যদান করে শিশুদের বাঁচিয়েছে তাকে হত্যা করে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

সুবোধ ঘোষের ‘স্বর্গ হতে বিদায়’ গল্পে স্বামীর অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। স্বামী প্রশান্ত ছিল স্বৈচ্ছাচারী, প্রতিনিয়ত সে স্ত্রীর উপর অন্যায় আচরণ করত। স্ত্রী অরুণা সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এবার আমার আলোচ্য বিষয় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট গল্পকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন বিধ্বস্ত বঙ্গদেশের এক জীবন্ত দলিল হিসেবে তাঁর ছোটগল্প চিহ্নিত। মার্কসীয় চিন্তাচেতনায় বিশ্বাসী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ তাকে শিক্ষা দিয়েছে। শোষিত-বঞ্চিত-অসহায় মানুষের আত্মক্রন্দন তিনি শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে গেলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘অধিকার’, ‘কালোজল’, ‘বন্দুক’, ‘মাননীয় শিক্ষক মহাশয় সমীপেয়’, ‘দীঃশাসন’, ‘হাড়’, ‘রেকর্ড’, ‘নীলা’, ‘আবাদ’, ‘বীতংস’ প্রভৃতি ছোটগল্প। তার ‘সৈনিকু’ ও নক্সচরিত’ গল্প দুটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

‘আবাদ’ গল্পটি হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিকায় রচিত। এই দাঙ্গা ভ্রাতৃত্বকে কলঙ্কিত করেছে ভারতকে। হিন্দুস্থানের চিতা থেকে উঠেছে ভূত, আর পাকিস্তানের কবর থেকে উঠেছে জিন। এই দুইশক্তি সম্মিলিতভাবে সাধারণ মানুষকে নিধন করতে থাকে। সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ মানুষের বিরুদ্ধে লেখকের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

ভারত স্বাধীনতা লাভের পর উদ্বাস্তু সমস্যা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। তিনশোটি ক্যাম্পে সহস্রাধিক উদ্বাস্তু এসে ভিড় করে। এই উদ্বাস্তুরা তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় চন্দ্রবোড়া ও বুনোশূয়োরের রাজত্ব, বাবলা ঝোপ ও শন ঘাসের জঙ্গল সাফাই করে সাতশো একর পতিত জমিতে সোনার ফসল ফলাতে থাকে। এই অগ্রগতিকে ভালোচোখে দেখেনি লোভী জোতদার যতীন ও অনুকূল। তারা গাইবান্ধা ক্যাম্পে আগুন ধরাতে যায়। হিমাংশু সোমের নেতৃত্বে ঢাকার নেত্রকোণা, রংপুর ও পাবনা থেকে দলে দলে অগুণিত মানুষ এসেছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে। সেখানে আঁধার পেরিয়ে ভোরের আলো ফোটে। জোতদারদের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের স-পক্ষে লেখকের বলিষ্ঠ ভাষা আলোচ্য গল্পে প্রকাশ পেয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এক প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প ‘বন্দুক’।

লোকপীড়ক, লোকশোষক, জোতদার লোকনাথ, ফজল, বৃন্দাবন, নুরমামুদ দীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যাচ্ছিল শোষণ। কৃষক ভাইরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলিয়ে ছিল। রহমানের নেতৃত্বে তিনভাগের দুভাগ ধান আদায় করতে কৃষক সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়। কখনো বা লোকনাথ ও ফজলের মত স্বার্থান্বেষী মানুষেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধিয়ে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভাঙন ধরাতে চায়। পরিশেষে ভাড়াটে খুনে রঘুনাথকে নিয়ুক্ত করা হয় রহমানকে হত্যা করার জন্য। এজন্য চারটে বন্দুক রঘুনাথকে দেওয়া হয়। কিন্তু রঘুনাথ নিপীড়িত মানুষের পক্ষ অবলম্বন করে বন্দুক চারটি রহমানের হাতে তুলে দেয়। এই সংবাদ পেয়ে শোষকরা ভীত হয়। শোষকদের পরাজয় এবং শোষিতদের জয় সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

‘নক্রচরিত’ অপর এক প্রতিবাদী গল্প। ক্ষমতার দন্ডে মনুত্তর ও যুদ্ধকালীন পটভূমিতে অগণিত নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ডের নায়ক হন নক্রচরিত ওরফে নিশিকান্ত। কৃত্রিম খাদ্যসংকট ও বস্ত্রসংকটের বিরুদ্ধে তৎকালীন প্রশাসক যন্ত্রের দালাল নিশিকান্তের বিরুদ্ধে অগণিত মানুষ গর্জে ওঠে শোষিত মানুষের বঞ্চনার প্রতিবাদ আলোচ্য গল্পে লেখক তুলে ধরেছেন।

‘বীতংস’ গল্পের সাধু সুন্দরলালের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

‘কালোজল’ গল্পে সমাজ শত্রুদের চিহ্নিত করেছেন লেখক। মথুরাদাস ছিল এই শ্রেণির প্রতিনিধি। সে চাল চোরাচালানকারী। কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করে অজস্র মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছিল সে। লেখক এই শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন।

‘শ্বেতকমল’ গল্পে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অসংগতি দেখানো হয়েছে। গল্পের নায়ক সিদ্ধার্থ পিতৃহীন ও মায়ের একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই সে ছিল মেধাবী। অর্থাভাবের মধ্যেও সে বি.এ. পরীক্ষায় বসেছিল। অন্যদিকে সিদ্ধার্থের পিছনে রেখে নকল করে পরীক্ষা দিয়েছিল আরেক ছাত্র। ফল প্রকাশের পর দেখা গেল সিদ্ধার্থ ইংরেজিতে ফেল করেছে এবং নকল করা ছেলেটি ডিস্টিংশন পেয়েছে। শিক্ষার নামে এই প্রহসনের বিরুদ্ধে ছাত্রদরদী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু’ গল্পে প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে যে দুর্নীতি রয়েছে তার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

গল্পের নায়ক স্বাধীনকুমার। সে মাইনর স্কুলে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। তার স্বপ্ন ছিল একদিন সে উচ্চশিক্ষা লাভ করবে, কিন্তু এই গরিব চাষার ছেলে তার প্রয়োজনীয় বইগুলি কিনতে পারেনি। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পেটের দায়ে তাকে ধান, চালের আরতদারের বাড়িতে থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। টাকার তাগাদায় যেতে হত স্কুল বন্ধ করে। বেশি রাতে পড়াশুনা করবার সময় সে আলোটুকুও পেতোনা। এরপর পরীক্ষা এগিয়ে এল। স্বাধীনকুমারের পরীক্ষার

প্রভুতি তেমন ছিলনা। পরীক্ষার হলে একটি প্রশ্নের উত্তরও লিখতে না পেরে পরীক্ষায় খাতায় তার মনের দুঃখের কথা জানালো।

‘মাননীয় পরীক্ষক মহাশয় সমীপেষু’ বলে সম্বোধন করে সন্ধ্যায় ট্রেনের চাকায় আত্মহত্যা করবার সিদ্ধান্তের কথা জানায়। যে ছাত্রটি একসময় অঙ্কে ১০০তে ১০০পেত ফাস্ট বা সেকেন্ড হয়েই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত, এত মেধা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সমস্যার কারণে সে আর শিক্ষালাভ করতে পারেনি।

অর্থনীতিসর্বস্ব শিক্ষাব্যবস্থা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মেনে নিতে পারেননি। শিক্ষা শুধু ধনীদেব বা গরীবদের জন্য নয়। ছাত্রের মেধার চেয়ে অর্থের মূল্যই যেখানে প্রাধান্য পায় সে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আলোচ্য গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। স্বাধীনকুমার চিঠির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ‘.....কেন আমি বাঁচতে পারলাম না, আমার মতো হাজার হাজার ছাত্রের পক্ষ থেকে সেই প্রশ্ন আপনার কাছে রেখে গেলাম। জবাবটা আপনি ভেবে দেখবেন। কাপুরেশ্বর মতো আত্মহত্যা করছি? না স্যার-না। এ আমার পরাজয় নয় — আমার প্রতিবাদ। বেয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক প্রলয়ের রাত্রে আমার বাবা দেশের মাটিতে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার রক্তও দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর জন্য তেমনি একটা ইতিহাসের সূচনা রেখে যাবে। সে ইতিহাস কবে গড়ে উঠবে আমি জানি না। আপনি জানেন স্যার, আপনি বলতে পারেন?’

— এই রক্তাক্ত প্রশ্নটিটির কে জবাব দেবে !

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত এক জনপ্রিয় গল্প ‘টোপ’। মার্কসীয় জীবনাদর্শে বিশ্বাসী লেখক রাজতন্ত্রের চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রামগঙ্গা এস্টেটের রাজা বাহাদুর এন. আর. চৌধুরী তার রোমাঞ্চকর শিকারের কাহিনী অবলম্বনে এই গল্পটি রচিত। রায় বাহাদুরের ছিল শিকারের নেশা। বাঘ হায়না প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে টোপ ফেলে বন্দুক দিয়ে গুলিবিদ্ধ করার মধ্যে সে খুঁজে পেত আনন্দ। খেয়ালী বিলাসী, মেজাজি রায়বাহাদুর মাতৃহারা এক মানব শিশুকে টোপ হিসাবে মধ্যে একটি সাঁকো থেকে জলার ধারে নুড়িতে নামিয়ে দেয়। হঠাৎ গর্জে উঠেছিল রায়বাহাদুরের রাইফেল, এক বিশাল রাঘের মরণ আর্তনাদ ও শিশুর গোঙানি যেন একই সুরে বেজে উঠল। রাজা রায় বাহাদুরের এরূপ হিংস্র প্রকৃতি অর্থাৎ মানব শিশুকে মেরে পশুশিকারের কাহিনী বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

‘হাড়’ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে রায়বাহাদুর এইচ. এল. চ্যাটার্জী মস্ত বড় এক ধনী ব্যক্তি। তার হবি ছিল বিচিত্র সব হাড় সংগ্রহ। বহুমূল্যে মানুষ, জীবজন্তুর হাড় সে ক্রয় করত। এদিকে শুরু হয়েছিল মনুষ্য চারদিকে ‘ফ্যান দাও ফ্যান দাও’ বুভুক্ষু মানুষের চিৎকার। এই সময় গল্প কথক পিতার চিঠি নিয়ে পিতৃবন্ধু রায়বাহাদুরের কাছে একটি

চাকরির জন্য আসে। রায়বাহাদুর তার সংগৃহীত হাড়গুলি একের পর এক দেখাতে থাকে। এইসময়ে দূর থেকে গল্পকথক দেখতে পান এক দুর্ভিক্ষ পীড়িত অভুক্ত ছেলে নিকটবর্তী ডাস্টবিন থেকে একটি হাড় নিয়ে চুষছে। এমতাবস্থায় তার উপলব্ধিতে এল একদিকে বিত্তের প্রাচুর্য অন্যদিকে অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের আত্মস্বর। এই বৈষম্যকে দূর করবার জন্য প্রয়োজন মন্ত্র শক্তির।

‘রেকর্ড’ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক অবিস্মরণীয় গল্প। চীনা মার্কেট থেকে স্বল্পমূল্যে কেনা একটি রেকর্ড বাজাতে গিয়ে সেই সঙ্গীত কোথাকার এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত এনিয়ে শুরু হয় নানা জল্পনা কল্পনা। কখনো মনে হয় এটি খাসিয়াদের গান, কখনো নাগাদের ঢাকের শব্দ কিংবা ব্রহ্মপুত্রের গর্জন কখনো মনে হয়েছে। বুনো হাতির গর্জন কিংবা সুইজারল্যান্ডের বিবাহ সংগীত। আবার কখনো মনে হয়েছে ইউরোপের একটি ছোট্টদেশের মুক্তিসংগীত। হিটলারের নাৎসী বাহিনীর অধিকারের সময় মুক্তি যোদ্ধারা শাসন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জানিয়েছে তার ধ্বনি কখনো মনে হয়েছে। কলকাতার বুকে ছাত্রদের উপর লাঠি, টিয়ার গ্যাস ও গুলি বর্ষণের শব্দ। পরিশেষে আবিস্কৃত হয় এটি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিবাদের ভাষা যা নথিভুক্ত হয়ে আছে রেকর্ডের মধ্যে। এই রেকর্ড কেউ নিশ্চিত করতে পারেনি পারবেনা। যে রেকর্ডটি ঘুমন্ত শিশুর মত লুকিয়ে ছিল তার সংগীতে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

এই যে সুর তা যুগে যুগে, দেশে দেশে কালে কালে এক। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিচিত্রধর্মী গল্পগুলোর মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর আমার আলোচনা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নাম এসে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী অর্থাৎ চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত এমনকি তার পরেও লাঞ্ছিত ব্যর্থ দরিদ্র ও নিঃসঙ্গ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের কথা যারা লিখে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ভন্ডামির বিরুদ্ধে, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। নরেন্দ্রনাথের ‘অবতরণিকা’ একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। আর্থিক অসঙ্গতির অভাবে পরিবারের সকলে মতামতকে উপেক্ষা করে সুব্রতর স্ত্রী আরতি একটি প্রাইভেট কোম্পানীর চাকরিতে যোগদান করেছে। হিমাংশু মুখুজে ছিলেন তার মনিব। একদিন হিমাংশুবাবুর সঙ্গে আরতির সহকর্মী এডিথের কমিশন নিয়ে মতবিরোধ ঘটে। এডিথ অপমানিত হন। সেদিন শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে এডিথ অফিসে আসেননি, সে দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মনিব মিঃ মুখার্জী এডিথ চরিত্র নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন। আরতির অন্যান্য সহকর্মীরা তা নীরবে সহ্য করলেও আরতি বলিষ্ঠভাবে তার প্রতিবাদ জানায়। আরতি মনিবকে নির্ভীক চিত্তে জানায়, মিঃ মুখার্জীকে এডিথের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। এতে হিমাংশুবাবু আরতির ওপর ক্ষুব্ধ হন। আরতি নারী জাতির প্রতি মনিবের অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানিয়েছে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে।

‘আবরণ’ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বঙ্গ সংকটের বিষয়ে লেখা একটি প্রতিবাদী গল্প। বঙ্গভাবে বংশীর স্ত্রী চাঁপাকে নগ্ন হয়ে থাকতে হয়। স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য বংশীকে পতিতা পল্লীতে গিয়ে সুখদার শাড়ী নিয়ে পালাতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে যারা বঙ্গ সংকট সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে গল্পকার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘আকিঞ্চন’ গল্পের নায়ক বিজন, সে প্রাক্তন স্কুল শিক্ষকের পুত্র, উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম বাংলায় এসেছে। দারিদ্র্যের তাড়নায় বেকার বিজন পরিচিত মানুষের কাছ থেকে টাকা ধার নিতে চায়। যেদিন পিতার চিঠি নিয়ে পরিতোষের বাড়ি গিয়েছিল অর্থ ঋণ নেবার জন্য। পরিতোষকে না পেয়ে এক ফুটফুটে তরুণীর আতিথেয়তায় আর সে পরিতোষের কৃপা প্রার্থী হয়নি। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি বিজনের বেকারত্বের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন নরেন্দ্রনাথ।

‘পতাকা’ নরেন্দ্রনাথ মিত্রের এক প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত রাজনৈতিক গল্প। এই গল্পটির উৎস হল স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পতাকা উত্তোলন নিয়ে বিরোধ। হিন্দু নেতা শচীবিলাস স্বাধীনতা দিবসে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য এগিয়ে আসে, অন্য দিকে মকবুল মনসুররা চাঁদমার্কী লিগের পতাকা তুলতে আগ্রহী - এনিয়ে বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। রাজনৈতিক দলাদলির বিরুদ্ধে লেখক এ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘আলপিন’ গল্পে যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় হিন্দুরা তাদের বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্বল সব ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। এই দুঃসময়ে স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যবসায়ী গৃহহারা মানুষদের নিঃস্ব করে দিতে চেয়েছে।

‘পূর্ণ’ গল্পে আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভিটেমাটি বিক্রি করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক শিক্ষক সপরিবারে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। টালিগঞ্জের এক খালের ধারে একটি বাসা বাড়িতে তারা আশ্রয় নিয়েছিল। এই পরিবেশে তার ছেলে দুটি অসৎ সঙ্গে পড়ে নষ্ট হতে যাচ্ছে। তার মেয়ে দুটিও ছিন্ন বস্ত্র পরে লজ্জা নিবারণ করছে। এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্ত হতে বৃদ্ধ শিক্ষককে রাস্তায় রাস্তায় চানচুর ফেরি করতে দেখা গেছে। ভাগ্যচক্রে মূল্যবোধ কিভাবে বিনষ্ট হয়ে গেল তার বাস্তব ছবি নরেন্দ্রনাথ এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

‘হেডমাস্টার’ গল্পে আমরা দেখি সাগরপুর এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালীন অবস্থায় জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে স্বদেশ ভূমি ছেড়ে দীর্ঘ সাতাশ বছর চাকরি করবার পর এক ছাত্রের কৃপায় কলকাতায় একটি ব্যাঙ্কের কেরানী পদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই চাকরি

সে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেনি।

পূর্বসূরী ও সমকালীন প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পকারদের পাশাপাশি প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা ছোটগল্পকারদের ছোটগল্প নিঃসন্দেহে বাংলা ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রথম মহিলা গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, সরসীবালা দেবী প্রমুখ এবং স্বাধীনতা উত্তরপর্বের উল্লেখযোগ্য মহিলা ছোটগল্পকারদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখেন পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষ জায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাধারানী দেবী ও নবনীতা দেব সেন প্রমুখ।

উল্লেখপঞ্জী

প্রথম অধ্যায়

১) 'বাংলার লেখক' (১৯৫৭) প্রমথনাথ বিশী	—	পৃঃ ৩৩.
২) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প -	—	পৃঃ ১৩২
৩) ত্রৈলোক্যনাথ কথাসাহিত্য ভাবনা - বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	—	পৃঃ ১৮
৪) ছোটগল্পের কথা - রবীন্দ্রনাথ রায়	—	পৃঃ ৭৩
৫) ত্রৈলোক্যনাথের শ্রেষ্ঠ গল্প -	—	পৃঃ ১২৮
৬) বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা - শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	—	পৃঃ ১২৫
৭) বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার - ভূদেব চৌধুরী	—	পৃঃ ৭১
৮) ঘরে বাইরে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ৭৯
৯) সবলা/ মল্লয়া - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ১২০
১০) গীতবিতান - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ৬০
১১) ক্ষিতিমোহন সেনের ডাইরি - ৮ই এপ্রিল ১৯৮৫	—	পৃঃ ০৫
১২) চিত্রাঙ্গদা - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ৪২
১৩) আরোগ্য - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ৪১
১৪) বিলাসের ফাঁসে -	—	পৃঃ ০৮
১৫) গল্পগুচ্ছ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	পৃঃ ১০৩
১৬) রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ : বিশ্লেষণ ও সৌন্দর্য বিচার : স্বপ্নি মন্ডল	—	পৃঃ ১১০
১৭) বাংলা ছোটগল্প : শিশিরকুমার দাশ	—	পৃঃ ১০২
১৮) বাংলা গল্পবিচিত্রা - নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	—	পৃঃ ৫২
১৯) বাংলা গল্প বিচিত্রা : পশু, প্রেম, ঙ্গবতারা- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	—	পৃঃ ১৩৩
২০) বিভূতিভূষণ রচনাবলী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	পৃঃ ১৪২

ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ

ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা ও রচিত গ্রন্থসমূহ

বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। এই মহিলা সাহিত্যিকদের আবির্ভাব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বঙ্গদেশের পাশ্চাত্য প্রভাবে যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল পাশাপাশি নারীশিক্ষার উন্নয়নকল্পে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার ফলস্বরূপ নারীরা আর অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল না। নারীর জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটল। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি- সমাজ ও রাজনীতি - সর্বত্রই নারীর জীবন পরিধি বিস্তার লাভ করল। পরিবর্তিত হল নারীর প্রেমভাবনা। প্রেমকে তারা নতুনভাবে উপলব্ধি করতে শিখল। তাদের প্রেমানুভবের কথা সাহিত্যে স্থান পেল। ইতিমধ্যে বেথুন সাহেব স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য এগিয়ে এলেন। কলকাতার বুকে গড়ে উঠল প্রচুর নারী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়। গড়ে উঠল মহাবিদ্যালয়। প্রথমার্ধে সংস্কার মুক্ত পরিবারের নারীরা বই-খাতা নিয়ে বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে এল। ধীরে ধীরে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরাও শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করল। বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘বীরঙ্গনা’ কাব্যে বীর নারীদের নবজাগরণের প্রভাবে মহিলা সাহিত্যিকরা পেলেন নতুন শক্তি। ভাবিত হলেন আধুনিক ভাবনায়। যুগযুগ ধরে নারী সম্পর্কে যে প্রচলিত চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছিল তারও ঘটল আমূল পরিবর্তন। নারী তার আপন ভাগ্য জয় করবার জন্য এগিয়ে এল। বঙ্গনারীরা আপন উপলব্ধির আলোয় সমাজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন,

“গত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গ মহিলাদের কেহ কেহ কাব্য রচনা করিয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।”^১

মহিলা সাহিত্যিকদের হাতে বৈচিত্র্যময় সাহিত্য রচিত হতে থাকল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গীতিকবিতা, বিভিন্ন আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, দিনলিপি, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। এগুলিতে ছড়ানো ছিটানো নারী জীবনের খন্ডচিত্রগুলি প্রকাশ পেল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গনারীদের লেখনীর মধ্যে তাদের মানসিক বিবর্তন এবং বাংলার নারীজাগরণের ইতিহাস ব্যক্ত হলো। যার সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায়না।

চিত্রা দেব ‘অন্তঃপুরের আত্মকথা’ গ্রন্থে লিখেছেন, - “প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাব সংমিশ্রণে তখন বাংলাদেশে গুরু হয়েছে এক আশ্চর্য আলো-আঁধারের জোয়ার-ভাঁটা। একদিকে

চলছে পূর্বতন ধারার পুনরাবৃত্তি অন্যদিকে সোনার কাঠির যাদু-ছোঁয়ায় সঞ্চারিত হচ্ছে নতুন প্রেরণা। ভাঙাগড়ার বিরাম নেই। একদিকে শুরু হয়েছে সমাজ সংস্কার, দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা অপর দিকে তখনো আকাশে উড়ছে বাবুদের ঘুড়ি কিংবা বুলবুল, পায়রা, জলসাঘরে নটীর নূপুর নিকুণে হারিয়ে যাচ্ছে বিলাসী সমাজ। এক বিচিত্র চরিত্রের সমাজ। সেদিন মেয়েদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। ছোট বড় সামাজিক অত্যাচার আর বিধি নিষেধের বেড়াজালে জড়িয়ে নারী জীবনের স্বাভাবিক পথটাই গিয়েছিল রুদ্ধ হয়ে। তাই দেখা যাবে উনিশ শতকীয় সমাজ সংস্কারের মূল কথাই হল নারীকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সম্মানের ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।”

২

নারীর এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা অদ্যাবধি সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সৃষ্টির উন্মেষ লগ্ন থেকে পুরুষ ছিল সমাজের অগ্রণী ভূমিকায়, নারী ছিল তাদের সহচরীরূপে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের কাছে নারীরা ছিল সম্পত্তির সমতুল্য। তারা ছিল একমাত্র ভোগের উপকরণ। সতীত্ব ও পাত্তিব্রত ছিল নারীদের মূল আদর্শ। সর্বসহা এই নারীরা শুধু দিয়েই গেছে, পায়নি কিছুই। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের ইচ্ছে অনিচ্ছের কোন মূল্যই ছিলো না। বঙ্গদেশে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে যখন ভাঙন শুরু হয়েছিল সে সময় অবক্ষয়িত সমাজের ফল হয়েছিল আরও ভয়াবহ। সঙ্গত কারণেই চিত্রা দেব বলেছেন,

“মনুর বিধানের অজুহাত ও মুসলমানী আবরু রক্ষার তাগিদ মেয়েরা একেবারে অচল সেই অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টোদিক - সেদিকে কোন লজ্জা নেই, শ্রী নেই, সজ্জা নেই। নবযুগের মনীষীরা সমবেত চেষ্টা শুরু করেছিলেন এই অন্ধকারের নাকি অন্ধকারের রুদ্ধ দরজাটা খুলে দেবার। তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। অচিরেই তামসী রাত্রের গাঢ় ছায়ায় ম্লান করে দুটি একটি প্রদীপ জ্বলতে শুরু করল। সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল আরো আগে।”৩

এই সলতে পাকানোর কাজ যারা আগে থেকে শুরু করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মহিলা গীতিকবিরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্র বালা মুস্তাফী সরস্বতী, প্রমীলা নাগ, ষোড়শীবালা দাসী, জ্ঞানেন্দ্রমোহিনী দত্ত প্রমুখ।

এইসব মহিলা কবিদের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন,

“পারিবারিক জীবনের বেদনাময় আঘাত, প্রিয়জন বিরহ, পুত্র-কন্যার প্রতি আশঙ্কা ব্যাকুল, নিবিড় সংসক্তি পূর্ণ স্নেহ মমতা, ভাগ্য ভগবানের প্রতি অশ্রু বিহ্বল দীর্ঘশ্বাস ক্ষুদ্র অনুযোগ জীবন রহস্যের দুর্জয়তার জন্য মৃদু খেদ ও ক্ষোভ বিরল ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তাঁহাদের কবিতার সাধারণ ভাব ও বিষয়। তাঁহাদের সমস্ত কবিতায় একটি শান্ত, বিষন্ন আত্মনিবেদনের সুর শোনা যায়।

তাঁহাদের কবিতা, তুলসী তলায় জ্বালা সন্ধ্যা দীপের স্তিমিত আলোকের ন্যায় যিনি মানব বুদ্ধির আগোচর সংসারের সুখ দুঃখের বিধাতা, তাঁহার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভাবারতির স্নিগ্ধ, শান্ত অর্ঘ্য রচনা।” ৪

এই মহিলা কবিরা সমাজ সংস্কারের পাষণ্ড বেদীটাকে নাড়িয়ে দিতে পারেননি। তাঁদের সাংসারিক কাজকর্মের অবসরে তাঁরা দেখেছিলেন বৃহত্তর জীবনের স্বপ্ন। চেষ্টা চালিয়েছিলেন বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু দর্শনের স্বাদ উপলব্ধি করতে এবং একই সঙ্গে আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের স্বপ্ন দেখেছেন তারা। ভেবেছিলেন সামাজিক মূল্যবোধে পৌঁছাতে, সমাজের ভালোমন্দ বিচার করেছিলেন তাঁরা নিজস্ব উপলব্ধির আলোকে। বড় রকমের আঘাত হেনে সমাজ বদলের কথা তারা ভাবেননি। বিধি নিয়মের নির্মমতা বঞ্চনা গ্লানি ও দুঃসহ অপমানে বোবা কান্নার মতো গুমরে গুমরে একদিন তাঁদের লেখনীতে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠ। ধীরে ধীরে যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তির ইতিহাসকে রক্তের অক্ষরে দুই-এককথা যা তাঁরা লিখে গিয়েছিলেন উত্তরসূরীরা তার মধ্যেই পেয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা। প্রবীর ঘোষ যুক্তিবাদের চোখে নারীমুক্তি গ্রন্থে ‘কিছু কথা’ অংশে লিখেছেন -

“বৈষম্যের সমাজ-কাঠামো টিকিয়ে রাখতে

বারবার ঘুরে-ফিরে

বিভাজনের নানা আয়োজন

ধর্ম-ভাষা-জাতপাত, আরও কত কী !

তারই মাঝে নতুন আমদানি

মূর্ত হয়ে চলমান ‘নারী স্বাধীনতা’, ‘নারী-মুক্তি’

‘নারীবাদী’ নারীদের উজ্জ্বল কিছু মুখ ও মুখোশ।

চিত্তকে বুলিয়ে দিতে হিঙ্গুপথ হাতড়ে ফেরে

ভিক্ষাপাত্র ধরা টানটান চামড়ার চক্চকে হাত।” ৫

বস্তুত নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারীবাদী, নারীদের উজ্জ্বল কিছু মুখের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে যে মহিলা গল্পকারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তাদের দুটি পর্বে বিভাজন করে তাদের জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ, সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা এবং তাদের রচিত গ্রন্থ সমূহ সম্পর্কে আলোচনা নিয়ে প্রদত্ত হল -

প্রাক স্বাধীনতা পর্ব

* স্বর্ণকুমারী দেবী

* সরসীবালা দেবী

স্বাধীনতা উত্তর পর্ব

*পূর্ণশশী দেবী

*শৈলবালা ঘোষ জায়া

*জ্যোতির্ময়ী দেবী

*রাধারাণী দেবী

*সাবিত্রী রায়

*ছবি বসু

*প্রতিভা বসু

*আশাপূর্ণা দেবী

*মহাশ্বেতা দেবী

*নবনীতা দেবসেন।

উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলাসাহিত্যে যে সব প্রতিভাময়ী লেখিকার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্র স্বর্ণকুমারী দেবী। সুদীর্ঘ ৫০ বছর ব্যাপী এই প্রতিভাময়ী নারী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেই শুধু নয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতেও তাঁর অসামান্য অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমন্ডলীর আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে কি শিক্ষার দিক থেকে কি সংস্কৃতিবোধের দিক থেকে, কি বঙ্গজীবনের নবজাগরণ ভাবনার ঋদ্ধির ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী। তিনি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাদশ সন্তান। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রদের শিক্ষার পাশাপাশি কন্যাদেরও শিক্ষা প্রসারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। তাঁর বিদ্যা-শিক্ষা গুরু হয় অন্তঃপুরে তিন বছর বয়স থেকে। যোগ্য শিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষালাভ করেন তিনি। ঠাকুর পরিবার ছিল শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির পরিশীলিত বাতাবরণ সৃষ্টির কেন্দ্র। গৃহের নিয়ম শৃঙ্খলা, উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল স্বর্ণকুমারী দেবীর মানস গঠনের সহায়ক ছিল সেই সঙ্গে ছিল তাঁর আপন প্রতিভা। এই প্রতিভা না থাকলে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সফল হতেন না। বৃহৎ পরিবারের সঙ্গে পিতা দেবেন্দ্রনাথের যেমন সুগভীর নৈকট্য ছিল, বড়দিদি সৌদামিনীর স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-অনুরাগ তেমনি বর্ষিত হয়েছিল। ‘সাহিত্যস্রোত’ গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যে মধুর থেকে মধুরতর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, স্বর্ণকুমারী দেবী তা উল্লেখ করেছেন। শুধু পিতা বা বড়দিদি নয় মা সারদা দেবীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত গভীর।

স্বর্ণকুমারী দেবী বাল্যকালে প্রতিদিন ভোরবেলায় তাঁদের ফুলবাগান থেকে ভালো-ভালো সুগন্ধযুক্ত ফুল আচল ভরে নিয়ে আসতেন। সেই ফুল থালায় সাজিয়ে মা সারদা দেবীকে

দিতেন। অতঃপর সকাল সাতটায় যখন উপাসনার ঘণ্টা বাজত তখন তিনি ফুল নিয়ে পিতৃদেবের গৃহে উপাসনায় উপস্থিত হতেন। উপাসনা গৃহে পিতা তাঁকে সঙ্গেহে টেনে নিতেন। ব্রাহ্ম ধর্মের উপাসনায় গ্রন্থপাঠে তিনি অংশ নিতেন। স্বর্ণকুমারী দেবী ঠাকুর বাড়ির অন্যান্য কন্যা ও পুত্রবধূদের সঙ্গে সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজি অধ্যয়ন করতেন। ‘সাহিত্য স্রোত’ - গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী লিখেছেন,

“তিনি মধ্যে মধ্যে অন্তঃপুরে আসিয়া আমাদেরকে সরল ভাষায় জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি যাহা শিখাইতেন তাহা আমাদেরকে নিজের ভাষায় লিখিয়া তাঁহারই নিকট পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রীদিগের মধ্যে আমিই ছিলাম সর্বাপেক্ষা ছোট নগণ্য ব্যক্তি। সেইজন্য পরীক্ষাতেও সকলের সমান হইবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। কিন্তু পরীক্ষার নম্বর আমরা কেহ জানিতে পারিতাম না। এইরূপে পিতৃদেব অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলেন।” ৬

স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি স্ত্রী জাতির উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির পরিমন্ডলে কোনো বাধাই তাঁর কাছে বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর ‘সাহিত্য স্রোত’ প্রবন্ধ গ্রন্থে আরও বলেছেন,

“বাড়ির মেয়েরা সকলেই জানিত, মেজদাদার মত সহায় বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই ; তাঁহার উপর সকলেরই বিশ্বাস ছিল অসীম।” ৭

১৭ই নভেম্বর, ১৮৬৭ সালে জানকী ঘোষালের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর বিবাহ হয়। বিবাহ কালে তাঁর বয়স ছিল তেরো। তাঁর সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীত চর্চায় উদার হৃদয় স্বামীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা কোন অংশে কম ছিলনা। তাঁর বিবাহের কিছুদিন পর স্বামী কর্মসূত্রে বিলাতে যান। সেই সময় স্বর্ণকুমারী স্বামীর সঙ্গে বিলাতে যাননি, জোড়াসাঁকোতেই ছিলেন এবং এখানকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বর্ণকুমারী তাঁর নিজস্ব জীবনের বিকাশে স্বামীর সহায়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন,

“আমার প্রিয়তম স্বামীর সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতিরেকে আমার পক্ষে এতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইত না। আজ বহির্জগত আমাকে যেভাবে দেখিতে পাইতেছে, তিনিই আমাকে সেইভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমপূর্ণ উপদেশে বা ঝটিকা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রেও যেমন সন্তরণনিপুণ ব্যক্তি সহজে ও অবলীলাক্রমে সন্তরণ করিয়া যায়, সাহিত্যজীবনের ঝটিকাময় ও উত্তাল তরঙ্গের মধ্য দিয়া আমিও সেইরূপ অবলীলাক্রমে চলিয়া আসিয়াছি।” ৮

উভয়ের সঙ্গে গভীর সখ্যতা, পারস্পরিক বোঝাপড়া ও ভাবের বিনিময় ঘটেছিল নানা রচনায়, নানা চিঠিপত্র ও বিভিন্ন রচনার উৎসর্গপত্রে তার বিশেষ উল্লেখ করেছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘জীবন স্মৃতিতে’ তার পরিচয় মেলে। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

“আমি সন্ধ্যাবেলা (মেয়েদের) সকলকে একত্র করিয়া, ইংরাজী হইতে ভাল ভাল গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম — তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্পদিন পরেই দেখা গেল যে, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন। তিনি আমায় সেইগুলি শুনাইতেন। আমি তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিতাম তখনও তিনি অবিবাহিতা। বিবাহের (১৭ই নভেম্বর, ১৮৬৮ রবীন্দ্রপঞ্জী/ প্রঃকুঃ মুখোঃ) পর তিনি ‘দীপনির্বাণ’ নামে একখানি উপন্যাস লেখেন। ‘দীপনির্বাণ’ প্রকাশিত হইলে সকল কাগজেই ইহার খুব প্রশংসা হইয়াছিল।” ৯

স্বর্ণকুমারীর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মেলে ‘ভারতী’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্যোগেই ‘ভারতী’ পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশকাল থেকেই স্বর্ণকুমারী গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী ছিলেন যোগ্য সঙ্গী। অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন বিখ্যাত সুরকার। তাঁর প্রভাবে স্বর্ণকুমারী দেবীর সুর সাধনার প্রকাশ ঘটে। পিয়ানো বাজিয়ে নতুন-নতুন সুরের সৃষ্টি করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সুরগুলিকে কথায় বেঁধে রাখতেন স্বর্ণকুমারী।

বলেন্দ্রনাথের জননী প্রফুল্লময়ী তাঁর ‘আমাদের কথা’ -য় বলেছেন,

“জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানে ঝাঁক খুব ছিল ও গান বড় পছন্দ করিতেন, একদিন আমার গান তাঁর শুনিবার খুব ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকুমারী তাঁরও এসব বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর কাছে লইয়া গেলেন।” ১০

দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের লেখা একটি চিঠিতে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে —

শান্তিনিকেতন

২৬শে কার্তিক, ১৩৩০

“স্নেহের বোনটি আমার — আমার হাতে এখনো কতকগুলি করণীয় কার্য অবশিষ্ট আছে। সেগুলি শীঘ্র চুকাইয়া ফেলিতে আমি নিতান্তই আগ্রহান্বিত। যমের দুয়ারে কাঁটা দিবার এখানে তুমি বই আর আমার কেহই নাই ; সুতরাং তোমার এবারকার ভাইফোঁটা ঠিক আমার সময়োপযোগী, আর সেই জন্য তাহা আমি অতিশয় যত্ন সমাদরের সহিত ললাটে বরণ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। দিব্যধামস্থিত আমাদের প্রাণের ভাই সতুর (সত্যেন্দ্রনাথ) বিরচিত একটি ব্রহ্মসঙ্গীত এখানে আমার জপমালা হইয়াছে। সে গীতটি এই —

“কেহ নাহি আর আমার সব তুমি।

লয়েছি শরণ তব চরণে দীননাথ। যদি

পাই তোমার ছায়া নাহি ডরি করাল কালে।

হায়! বিষ্ণু নাই

-কে এটা গাইয়া আমাকে গুনাইবে।

তোমার নিয়ত শুভাকাঙ্ক্ষী

বড়দাদা” ১১

স্বর্ণকুমারী দেবী ‘ভারতী’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তখন ‘ভারতী’ পত্রিকা অষ্টম বর্ষে এসে পৌঁছেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী এই তিনজন ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদকীয় চক্রমধ্যে ছিলেন। ১২৯১ থেকে ১৩০১ সাল পর্যন্ত পুনরায় ১৩১৫ থেকে ১৩২১ সাল পর্যন্ত তিনি ‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। “এই পত্রিকায় লেখা দেবার জন্য বহুমহিলা সাহিত্যিককে তিনি আমন্ত্রণ জানান।” ১২

তঁার ছিল উদার সমাজভাবনা প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গান প্রভৃতি সৃজনশীল ও মননশীল রচনাতে তিনি আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি নিজেকে সাহিত্যচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। ভারতের পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার প্রয়াস ছিল তঁার তীব্র। নারীশক্তির কল্যাণ বিষয়ক কয়েকটি কাজের সঙ্গে তঁার নাম জড়িত হয়ে আছে।

কাশিয়াবাগানে থিয়জফিক্যাল সোসাইটির অধিবেশনে তিনি যোগ দিতেন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এই সোসাইটির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন তিনি। তখন বহু মহিলাদের সঙ্গে তঁার গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। উনিশতম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। আবার মাদাম ব্লাভটস্কির দলভঙ্গের পরে ‘সখিসমিতি’ নামে স্বর্ণকুমারী মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। ‘সখিসমিতি’ স্থাপিত হয়েছিল ১২৯৩ সালের বৈশাখে, উদ্দেশ্য ছিল —

“ইহার উদ্দেশ্য ছিল ; মেয়েতে মেয়েতে আলাপ-পরিচয়, দেখাশোনা, মেলামেশা, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতির চেষ্টা, বিধবা রমণীকে সাহায্য করা, অনাথকে আশ্রয়দান ইত্যাদি।” ১৩

তঁার অপর জনহিতকর কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মহিলা শিল্পমেলা’। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, আগ্রা, জয়পুর, কানপুর থেকেও এই শিল্পমেলায় বহু শিল্পজাত দ্রব্য আসত। এই শিল্পমেলা প্রসঙ্গে তঁার ‘বিধবা শিল্পাশ্রম’ গঠন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

সাহিত্যের বহু শাখাতে স্বর্ণকুমারী দেবীর ছিল স্বচ্ছন্দ পদচারণা। তবে তিনি ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। নাটক, প্রহসন, গীতিকবিতা, গান প্রবন্ধ

রচনার ক্ষেত্রে তার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে, বঙ্গমহিলাদের মধ্যে তিনিই বোধহয় প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। সেইসঙ্গে তিনিই সর্বপ্রথম গাঁথা সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে মহিলা লেখিকাদের মধ্যে আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বঙ্গভারতীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল মাতৃভাষার সেবায় নিযুক্ত থেকেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি সংখ্যার দিক থেকেও কম নয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’ উপন্যাসটি ১৮৭৬ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। ‘ছিন্ন মুকুল’ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৮৭৯ খ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর। তাঁর ‘মালতী’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ১৮৮০ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ। প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘মিবাররাজ’ এর প্রকাশকাল ১৮৮৭ খ্রীঃ ১৭ই জুন। ‘হুগলীর ইমামবাড়ি’ উপন্যাসটির রচনাকাল ১৮৮৮ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী। এটি তাঁর লেখা দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর ‘স্নেহলতা’ উপন্যাসটি সামাজিক এটির প্রকাশকাল ১৮৯০ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারী। ঐতিহাসিক উপন্যাস ‘বিদ্রোহ’ প্রকাশিত হয় ১৮৯০ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট। রোমান্টিক প্রেমের উপন্যাস ‘ফুলের মালা’র প্রকাশকাল ১৮৯৫ খ্রীঃ ১২ই মার্চ। ১৮৯৮ খ্রীঃ জুলাই মাসে ‘কাহাকে?’ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। তাঁর ‘বিচিত্রা’ উপন্যাসটি ১৯২০ খ্রীঃ ৭ই মে প্রকাশিত হয়। ‘স্বপ্নরানী’ উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯২১ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর। ‘মিলন রাত্রি’ ও ‘দিবা-কমল’ উপন্যাসদ্বয় প্রকাশিত হয় ১৯২৫ খ্রীঃ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বিয়ের পরে ‘দীপনির্বাণ’ উপন্যাসটি লিখেছেন। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ কাহিনী নিয়ে এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি রচিত। টডের গ্রন্থ থেকে স্বর্ণকুমারী এই উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই উপন্যাসে স্বদেশানুরাগের গভীর পরিচয় মেলে।

এই প্রসঙ্গে সমমালোচক লেখক লিখেছেন, “মুসলমানদের হস্তে ভারতীয় হিন্দু রাজপুত বীরের পরাজয় ও ভারতভূমির অধীনতার বেদনাত্মক পটভূমিতেই ‘দীপনির্বাণ’-এর কাহিনী গড়ে উঠেছে। এর ইতিহাসের দিকটা হল দিল্লি অধিপতি চৌহানবংশীয় বীর পৃথ্বীরাজ ও তাঁর সহায়কারী সুহৃদ চিতোরের রাণা রাজপুত বীর সমর সিংহের সঙ্গে তুর্কি মহম্মদ ঘোরীর থানেশ্বরে বিরাট সংগ্রাম। মহম্মদ ঘোরী শৌর্যশালী হিন্দুকে পরাস্ত করে ভারতভূমিতে আধিপত্য বিস্তার করেছেন ন্যায় যুদ্ধে নয়, হিন্দুরই স্বদেশদ্রোহিতা ও রাজনীতি-বিরুদ্ধ উদারতার সুযোগ নিয়ে।” ১৪

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে চিতোররাজ সমর সিংহের পুত্র কিরণ সিংহের জন্ম বৃত্তান্ত দিয়ে এবং সমাপ্তি ঘটেছে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে। মোট বাইশ বছরের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে।

“প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রায় একুশ বছরের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং বাকী অধ্যায়গুলির মধ্যে অবশিষ্ট এক বছরের কাহিনী স্থানলাভ করেছে।” ১৫

ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক ঘটনার বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে, পাত্র-পাত্রীদের প্রণয়লীলা পরিবেশনে তিনি মুন্সীমানার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যগুণেরও যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষ ও নারী চরিত্রাবলী হয়েছে অত্যন্ত জীবন্ত। সবদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এটি তাঁর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে এই গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন।

‘মিবার রাজ’ উপন্যাসটি প্রথমে ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘কলঙ্ক’ নামে। পরে এই নামটি পরিবর্তন করেন তিনি এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য —

“এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বস্তু প্রণয় নয়। এর প্রধান বিষয় মেবার রাজের বীরত্ব, তার প্রতি ভীলদের অপরিসীম রাজভক্তি ও বিশ্বাস, বৃদ্ধ মন্দালিকের হত্যার অপরাধে আত্মগ্লানি।”

১৬

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। টডের ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

পরবর্তীকালে তাঁর ‘বিদ্রোহী’ উপন্যাসে রাজস্থানের ভীল ও রাজপুতদের বিরোধ ও মিলনের অনবদ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে পরিণত মনের পরিচয় মেলে। ঐতিহাসিক পরিমন্ডল সৃষ্টিতে ও উপন্যাসের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিসাধনে এবং গঠন রীতির পারিপাট্যে ‘বিদ্রোহী’ একটি সার্থক উপন্যাস।

‘হুগলীর ইমামবাড়ী’ উপন্যাসটিতে উপাদান সম্পর্কে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছেন

—
“উপসংহারে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র মিত্রের ইংরাজী বক্তৃতাচার অবলম্বনে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র মহম্মদ মহসীনের যে বাংলা জীবনচরিত লিখিয়াছেন ‘হুগলীর ইমামবাড়ী’ লিখিবার সময় আমরা সেই বইখানি হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তবে পাঠকগণ আমাদের আখ্যায়িকার সহিত ঐ জীবনচরিতের অনেক স্থলে অমিল দেখিতে পাইবেন।”

১৭

এই উপন্যাসটি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতপার্থক্য রয়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘হুগলীর ইমামবাড়ী’ উপন্যাসটি সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি লিখেছেন,

“স্বর্ণকুমারী দেবীর সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে ‘ছিন্ন মুকুল’, ‘হুগলীর ইমামবাড়ী’, ‘স্নেহলতা’ (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) ও ‘কাহাকে’ এই চারিখানির নাম করা যাইতে পারে।”

১৮

অষ্টাদশ শতাব্দীর সময় কালে ভাগীরথী তীরবর্তী মানুষের রাজনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি সামাজিক অবস্থার পরিচয় মেলে। বিলাসিতা ও দুর্নীতি হুগলীর জীবন প্রবাহকে বিষময় করে তুলেছে — এখানে তার বর্ণনা রয়েছে। মহম্মদ ও মুন্না এই দুইভাই-বোনের মধ্যে মধুর স্নেহের সম্পর্কচিত্র লক্ষ করা যায়। নবাব শাজাহান খাঁর স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় এই উপন্যাসে যেমন রয়েছে, তেমনি উদার ও উন্নত মহম্মদ মহসীনের চরিত্র স্থান পেয়েছে। উপন্যাসে সন্ন্যাসীর অলৌকিক কীর্তি কাহিনীর গতিকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মালোচনা উপন্যাসের কাহিনীর বাস্তবতাকে গ্রাস করেছে। ভোলানাথ, বুড়িমা, চুড়িওয়ালা চরিত্রগুলি তাঁর মানব-জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় বহন করে।

‘ফুলের মালা’ স্বর্ণকুমারী দেবীর শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্গদেশ এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি। বাসন্তী মুখোপাধ্যায় লিখেছেন,

“গ্রন্থরূপে প্রকাশিত উপন্যাসটির উপকরণ দেখে মনে হয়, লেখিকা উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের পরিচিত চার্লস স্টুয়ার্টের The History of Bengal থেকে এই উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কাহিনীর ঘটনাস্থল।” ১৯

ঐতিহাসিক এই উপন্যাসটিতে কিছুটা লেখিকার রোমান্স প্রীতিরও পরিচয় মেলে। ইতিহাসের সংশয়কে অনেকটা কল্পনার রঙে রাঙিয়ে দিলেও এতে সঙ্গতির কোনো অভাব ঘটেনি, সেদিক থেকে ‘ফুলের মালা’ স্বর্ণকুমারী দেবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। এই উপন্যাসটি ১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে ‘এ. খৃষ্টিয়ানো আলবার্টস’ -ইংরেজীতে অনুবাদ করে এর নামকরণ করেন ‘ফ্যাটাল গারল্যান্ড’। এই উপন্যাসের মূল বিষয় হল হিন্দু রাজা গণেশের অভ্যুত্থান। গণেশকে তিনি ন্যায়ের পূজারী হিসেবে গড়ে তুলেছেন। পাশাপাশি সেকেন্দর শাহ ও গাইসুদ্দীনের অসংযত কামনা বহির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তবে চরিত্রগুলো অনেকটা বাস্তবধর্মী হয়েছে।

‘ছিন্ন মুকুল’ স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম সামাজিক উপন্যাস। তিনি এই উপন্যাস অনেকটা বঙ্কিমানুসারী। উপন্যাসে ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতি স্নিগ্ধ মধুর পরিচয় মেলে। অসংখ্য ঘটনার সমাবেশে নাটকীয় আকস্মিকতা ও খল চরিত্র সৃষ্টিতে এই উপন্যাসটি স্বর্ণকুমারীর সার্থক সৃষ্টি। কনক ও নীরজার সখিত্বের সম্পর্কটি মধুর হয়ে উঠেছে। তিনি যে ব্যক্তি জীবনে সখি সমিতি স্থাপন করেছিলেন তার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে এ উপন্যাসে।

দুই খন্ডে প্রকাশিত ‘স্নেহলতা’ উপন্যাসটিতে বঙ্গসমাজের ভাব-ভাবনা ও কার্যকলাপ যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রভাব স্বদেশী আন্দোলন এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঞ্জীবনী সভার প্রসঙ্গ এ উপন্যাসে রয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশ পেয়েছে এই উপন্যাসে।

‘কাহাকে’ স্বর্ণকুমারী দেবীর একটি সার্থক সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের ওপরে উপন্যাসিক বিশেষ জোর দিয়েছেন। আত্মকথন রীতির প্রথম উপন্যাস এটি। উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনী। মৃণালিনী শিক্ষিতা ও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারিণী। হয়তো এর মধ্যে ঘটনার বাহ্যিক নেই, কিন্তু যুগধর্মের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে এখানে। নায়িকা মৃণালিনীর প্রণয় কাহিনী বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রমানাথের সঙ্গে নায়িকা মৃণালিনীর ঘটেছিল প্রেমের বিচ্ছেদ। তখন মৃণালিনীর অশান্ত হৃদয়ে বিশৃঙ্খল ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। উপন্যাসিক এখানে চরিত্রের অন্তর্মুখী ভাবনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘ত্রয়ী’ উপন্যাস ‘বিচিত্রা’, ‘স্বপ্নবাণী’ ও ‘মিলন রাত্রি’ -এই তিনটি উপন্যাসের মধ্যে কাহিনীগত যোগ সূত্রকে তিনি নিপুণভাবে রক্ষা করেছেন। এর পরিণতি বিয়োগান্তক হলেও একটি উজ্জ্বল ভাবাদর্শ এই ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই। এই উপন্যাসে যুগধর্মের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্গদেশের সামাজিক উৎসব, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন এই উপন্যাসে দেখানো হয়েছে। ডঃ সমরেশ মজুমদার লিখেছেন,

“এ উপন্যাসে লেখিকার ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে। নিজের বাল্যজীবনে পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও কন্যা স্বর্ণকুমারীর যে অনিন্দ্যসুন্দর সম্পর্ক শিল্পসুষমাময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, বাবাকে পুষ্পচয়ন করে দেওয়ার মধ্যে যে অনাবিল আনন্দ ছিল তার প্রতিফলন ঘটেছে উপন্যাসে। কখনো রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হলে কন্যাকে সেতার বাজাতে বলা, কখনো সংস্কৃত শিক্ষার পরীক্ষা নেওয়া, ইত্যাদির সঙ্গে ব্যক্তিজীবনে স্বর্ণকুমারীর সংস্কৃত উদ্ভটশ্লোক শিক্ষার ব্যাপারের সঙ্গে হাসির জীবন সম্পৃক্ত হয়েছে। হাসি ও হাসির পিতা কৃষ্ণলাল এবং জ্যোতির্ময়ী ও অতুলেশ্বরের সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখিকা ব্যক্তি জীবনের স্মৃতিকথাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। কৃষ্ণলালের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ধরা পড়েছে। এভাবে উপন্যাসটি স্বদেশিয়ানার সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের কথা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।” ২০

উনবিংশ শতাব্দীর মহিলা গীতিকবিদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি যে কাব্যগ্রন্থগুলি রচনা করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘গাথা’ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যগ্রন্থটি ১২৮৭ সালে প্রকাশিত। তাঁর কবিতা ও গানে প্রভাত সঙ্গীত, মধ্যাহ্ন সঙ্গীত ও নিশীথ সঙ্গীত রয়েছে। এই গ্রন্থে মোট ৭৪ টি কবিতা রয়েছে এবং গান রয়েছে ৯৯টি এর মধ্যে জাতীয় সঙ্গীত ৬টি ও ১৪টি ধর্ম সঙ্গীত রয়েছে। প্রভাত সঙ্গীতের প্রথম কবিতা ‘প্রভাত’। এই কবিতার কয়েকটি ছত্র নিম্নে প্রদত্ত হল —

“অরুণ মুকুট শিরে,
অধরে উষার হাসি,

পদতলে প্রস্ফুটিত

শত শত ফুল-রাশি !” ২১

— এই কবিতাটি অত্যন্ত সরল ও মিষ্টি। এর প্রকৃতি বর্ণনা অত্যন্ত সজীব। প্রগতির উদার দাক্ষিণ্য, প্রভাতের মিষ্টি আলো, মৃদু-মন্দ বাতাস, পাখির গান, বাতাসে গাছের পাতার কম্পন, প্রভাতকালীন সূর্যোদয় এই সময়ে যে বালকটি ফুলের সাজি নিয়ে বাগানে প্রবেশ করেছে তার কাছে এ প্রাকৃতিক দৃশ্য আনন্দের হিল্লোল বয়ে এনেছে। প্রভাতের রবি, পাখির গান, সুগন্ধযুক্ত দেশি ফুলের সমারোহ সবকিছুর মধ্যে রয়েছে হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া প্রকৃতির অনুপম রূপ।

তাঁর ‘খুকুরাণী’ - কবিতাটিতে বাৎসল্য রসের সঞ্চারণ ঘটেছে। খুকুরাণীর মধুর হাসি আনন্দের ঝর্ণাধারা বহন করে এনেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে একটি কম্পভূবন তৈরি হতে পারে ‘বিরহ কারে কয়’ - কবিতায় তার একটি সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। কবি লিখেছেন,

“বিরহ সেথা যত, মিলনে অনুরত,

গাঁথিছে মিলে মিলে প্রেমের সুবিস্ময়।” ২২

‘শারদ-জ্যোৎস্নায়’ কবিতায় প্রকৃতির অনুঘঙ্গে তিনি তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিরহের কথা ব্যক্ত করেছেন। এর মধ্যে রোমান্টিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। শরতের হিম জ্যোৎস্নায় নিশীথিনী আকুল নয়নে তাকিয়ে আছেন প্রণয়ীজনের কোমল স্পর্শের প্রত্যাশায়। আবার বসন্তের প্রথম বাতাসের আগমন সুখের মাঝখানে কবিমন কেঁদে ওঠে, স্মরণে আসে তাঁর হারানো স্মৃতি,

“হারানো স্মৃতির ছায়া সমুখে ভাসি।

ও ছায়া কাহার ছায়া ? ও মূরতি কার মায়া ?

চিনিতে পারিনে যেন চিনি চিনি যত করি !” ২৩

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘বসন্ত -জ্যোৎস্নায়’ কবিতাটিতে প্রকৃতির অপূর্ব রূপমাধুরীর প্রকাশ ঘটেছে। নীল আকাশের পাশে তারার মুচ্চিক হাসি, অসংখ্য তরুণরাজির হর্ষ, মধুর পরশ, উদার মলয় বাতাসে চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার বর্ণনায় স্বর্ণকুমারী দেবী রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এ যেন এক স্বপ্নময় জগৎ। তারই অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন ‘কবিতা ও গান’ কাব্য গ্রন্থের আলোচ্য কবিতাটিতে -

“মধুর স্বপন-বেশ, মধুর স্বপন-দেশ,

সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস ;

বিহুল চাঁদনী নিশি, বিহুল বাসন্তী দিশি,

প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস !” ২৪

‘মধ্যাহ্ন সঙ্গীত’ কাব্যগ্রন্থে আঠারোটি কবিতা স্থান পেয়েছে। মধ্যাহ্ন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের প্রবাহ এক কাব্যের কবিতাগুলিতে প্রকাশিত। ‘মধ্যাহ্ন’ কবিতায় স্বর্ণকুমারী বসন্তের মধ্যাহ্নকালীন প্রকৃতির অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন। ঘুঘুর বেদনাপূর্ণ ডাক, বসন্ত সমীরণে কম্পিত অরণ্যরাজী বসন্তের বাতাসের শব্দ সব মিলিয়ে এক রোমান্টিক পরিমন্ডল সৃষ্টি হয়েছে :

“চাতক সে ক্ষুদ্র পাখি সকরণ কণ্ঠে ডাকি

মেঘে চায় ডুবাইতে প্রাণ।” ২৫

চাতক পাখির ডাকের মধ্যে সকরণ মূর্ছনা - ঘন ঘন মেঘ পানে তাকানোর মধ্যে আশাবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

‘বঙ্গের বিধবা’ কবিতাটি শুচিস্নিগ্ধ বিধবা রমণীর শান্ত মূর্তি এঁকেছেন। বিধবা রমণীটির চরিত্র মাহাত্ম্যের গৌরবময়ী হলেও তার মন বেদনায় দীর্ণ।

‘বলি শোন খুলে’ কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীমতী রাধিকার বিরহ বেদনার কাব্যময় রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

‘কেমনে ভুলি’ কবিতাটি স্মৃতির অনুষঙ্গ অবলম্বনে রচিত।

‘সন্ধ্যা সঙ্গীত’ কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলিও স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দিয়েছে। সন্ধ্যাবেলাকার মিটমিট করে জ্বলতে থাকা তারা - মধুর চাঁপা ফুলের গন্ধ, ঝড়ে পড়ে বকুল ফুল ফুটন্ত মালতী ফুলের সমারোহে যেন অপূর্ব রাগিনী বেজে উঠেছে।

‘বাল্যসখী’ কবিতায় দুই সখী মিলে ফুলের মালা গাঁথে সাজা, কানের দুল তৈরি, ফুলের পাপড়ি জলে ভাসিয়ে দেওয়া সেই মধুর স্মৃতিগুলো স্মরণে এলে খুব ব্যথা জাগে, আজ সেই অতীতের সুখের দিনগুলি নেই —

একটি বাঁটায় দুটি কুসুম

আছিস কেমন ফুটি,

কে ছিঁড়িল আহা, একটি গো তার

একটি হৃদয় দুটি।” ২৬

‘নিশীথ সঙ্গীত’ এর তেইশটি কবিতার প্রেম ও প্রকৃতি যেন একই সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী দেশাত্মবোধক কবিতা রচনা করেছেন, যার মধ্যে গীতিকাব্যের সুর বর্তমান। সমর সঙ্গীত, রণ সঙ্গীত সার্থক দেশাত্মবোধক কবিতা। গীতিকারদের একটি দেশাত্মবোধক কবিতার উদাহরণ প্রদত্ত হলো —

“বল ভাই বন্দেমাতরম্

সাত সমুদ্রের ঢেউ তুফানে খেলুক গানের রং

অস্ত্র নাইক হাতে (মোদের) ভাবনা কিরে তাতে !

ভক্তি মহাশক্তি ও ভাই অমেয় ভূতলে।।

আমারে ভাই আমারে চলে, বন্দেমাতরম্ বলে।” ২৭

স্বর্ণকুমারী দেবী চারটি প্রণয়কাহিনী মূলক গাথাকাব্য রচনা করেছেন। সেগুলি যথাক্রমে ‘সাধের- ভাসান’, ‘সাম্রা সম্প্রদান’, ‘খড়গ-পরিণয়’ ও ‘অভাগিনী’।

‘সাধের ভাসান’ গাথাকাব্যে নায়িকা নদীতীরে গান গাইতে গাইতে শুনতে পেল নায়ক বিনোদ-ও একটি তরীতে নদী ভ্রমণ করছিল গান গেয়ে। সেখানে উভয়ের মধ্যে মিলন হয়। বিনোদ নায়িকাকে একটি আংটি পরিয়ে নদীভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। এই সময় দেখা গেল কালো মেঘের ঘনঘটা সব কিছুকে তুচ্ছ করে সাধের ভাসানে বেরিয়ে পড়েছে তারা।

‘সাম্রা সম্প্রদান’ গাথাকাব্যে রয়েছে নলিনী ও অজিতের প্রণয় কাহিনী। বাগদত্তা নলিনীর সঙ্গে অজিতের প্রেমালোকে সন্দেহ প্রকাশ করে প্রবাস প্রণয়ী চলে যায়। তারপর একদিন দেখা হয় এক মন্দিরে সন্ন্যাসিনী রূপে নলিনীর সঙ্গে তার পূর্ব প্রণয়ীর। এরপর এক দেবমন্দিরে উভয়ের মধ্যে বিয়ে হয়। অজিত ছিল এই বিবাহের পুরোহিত। নলিনীকে তার স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে তার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ল একবিন্দু অশ্রু। এই অশ্রুই হল সাম্রা সম্প্রদান। অনবদ্য ভাষার ও প্রেমের আবেদনে এই গাথা কাব্যটি স্বর্ণকুমারীর অন্যতম সৃষ্টি।

‘খড়গ পরিণয়’ গাথাকাব্যটির মূল সুর হল বীর্য ও রোমান্স। রারত্ন, পৃথ্বীরাজ কন্যাকে হরণ করে বিয়ে করেন কিন্তু সূর্যমল পৃথ্বীরাজ দুহিতাকে রাণার অনুপস্থিতিতে বিয়ে করেন। যদিও রাণা বাইরে যাবার আগে একটি দ্বিমুখী তরবারি রেখে যান রাজকুমারীর কাছে। পরিশেষে রাণা ও সূর্যমলের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাণা পরাজিত হন। হৃদ, অলংকার, ধ্বনিচাতুর্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর এই গাথাকাব্যটি মনোরম।

‘অভাগিনী’ একটি রোমান্টিক প্রেমের কাব্য। বিপিন এ কাব্যের নায়ক। স্ত্রী দামিনীকে গভীরভাবে সে ভালবাসতো। তার ইচ্ছে ছিল স্ত্রীকে স্বর্ণালঙ্কারে ভরিয়ে দিতে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অর্থের প্রয়োজনে সে চলে গেল প্রবাসে। দামিনী স্বামী বিরহে দিন কাটাতে থাকে। তারপর এক চিঠিতে জানতে পেল বিপিনের আগমন সংবাদ। আনন্দে মন ভরে গেল। এরপর সে খবর পেল বিপিনের নৌকা সমুদ্রে গিয়েছিল ডুবে। এই সংবাদ শুনে অভাগিনী দামিনী জ্ঞান হারালো। এরপর বিপিন যখন এলো তখন তার অন্তিম অবস্থা। বিপিনের কোলে মাথা রেখে সে চির নিদ্রায় শায়িত হল। ভাবে ও ভাষায় স্বর্ণকুমারীর এই গাথা কাব্যটি শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

স্বর্ণকুমারী গীতিনাট্য, নাটক ও প্রহসনও লিখেছেন। তাঁর ‘বসন্ত উৎসব’ প্রথম গীতিনাট্য। কৌতুক নাট্যগুলি হল ‘লজ্জাশীল’, ‘বৈজ্ঞানিক বর’, ‘লোহার সিঁদুক’, ‘ষষ্ঠীর বাছা’,

‘গানের সভা’, ‘তত্ত্বজ্ঞানী’ ও ‘শিক্ষা বিভাগ’। এই কৌতুকরসের নাটকগুলি রচনার ক্ষেত্রে স্বর্ণকুমারী দেবী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

তাঁর ‘রাজকন্যা’ নাটকটি নানা গুণে সমৃদ্ধ। ‘নিবেদিতা’ নাটকটিতেও ‘রাজকন্যা’র মতো রূপকথার ছায়া আছে।

‘কনে বদল’ ও ‘পাকচক্র’ প্রহসন দু’টিও আকর্ষণীয়। এই প্রহসন দু’টিতে হাস্যরসের উপাদান রয়েছে।

স্বর্ণকুমারীর ‘অতৃপ্তি’ নাটকটিতে দেখা যায় ললিত ও বনমালা লৌকিক প্রেমে তৃপ্ত নয়। শান্তির আশায় তারা বেরিয়ে পড়ে বাইরে। বনমালা এরপর আত্মবিসর্জন দিয়েছে আর ললিত অতৃপ্ত যন্ত্রণা নিয়ে দিন কাটিয়েছে। ভাবে, ভাষায়, সঙ্গীতে এই নাট্যকাব্যটি স্বর্ণকুমারীর অপূর্ব সৃষ্টি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটগল্পগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ ‘মালতী ও গল্পগুচ্ছ’। ‘নবকাহিনী’ তাঁর অপর গল্পগ্রন্থ। স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে, সার্থক চরিত্র চিত্রণে ও ঘটনা বিন্যাসে এবং বর্ণনা ভঙ্গির দিক থেকে সার্থক। ছোটগল্পে সমাজে যারা অবহেলিত, অবজ্ঞাত তাদের বেদনা সার্থক রূপ পেয়েছে এবং নারী চরিত্রগুলিও স্বমহিমায় ফুটে উঠেছে।

‘অমরগুচ্ছ’ তাঁর প্রধান গল্প। এই গল্পের নায়িকা বাল্যবিধবা। তার দাদার বন্ধু মি. চ্যাটার্জীকে সে ভালোবেসেছে। মি. চ্যাটার্জী একদিন পাহাড়ী ফুল দিয়ে নায়িকাকে জানায় তার প্রেমের বার্তা। তারপর সে বিদায় নেয়। বহুদিন পর একটি স্টেশনে নব পরিণীতা স্ত্রী সহ মি. চ্যাটার্জীর সঙ্গে গল্পের নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটে। নায়িকা তখন মি. চ্যাটার্জীর দেওয়া অমরগুচ্ছ উপহার দিয়ে চলে যায়। সেদিন সে স্বপ্নে দেখে তার স্বামীকে কিন্তু স্বপ্নভঙ্গে বুক ভাসিয়ে দেয় অশ্রুজলে। আসলে স্বামী নারীর জীবনে সর্বস্ব। স্বর্ণকুমারী আলোচ্য গল্পে জীবনেও সংস্কারের মেলবন্ধন ঘটেছে।

‘মিউটিনি’ গল্পের এক ইংরেজ রমণী, সিপাইদের সঙ্গে এক পুলিশের সংঘর্ষ দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়। পরে তার ভয় ভেঙে যায়। গল্পটিতে স্বদেশ প্রীতির পরিচয় মেলে।

‘কেন’ গল্পে দেখা যায় এক বিবাহিতা নারীর দেবী কালীর প্রতি অখন্ড আস্থার চিত্র। কিভাবে তার স্বামী বাবু সমাজের প্রতিনিধি প্রাণনাথের পতিতাসক্তির পরিবর্তে স্ত্রীর প্রতি অখন্ড বিশ্বাস গড়ে উঠল তারই কাহিনী।

‘লজ্জাবতী’ গল্পে যে মেয়েটি শান্ত স্নিগ্ধ স্বভাবের গুণে সকলের দ্বারা প্রশংসিত হত বিয়ের পরে শৃঙ্গুর বাড়ির লোকের নিন্দার কারণে যে অসহ্য যন্ত্রণা পেয়েছিল তারই সংবেদনশীল রূপ স্বর্ণকুমারী দেবী তুলে ধরেছেন।

‘কুমার ভীমসিংহ’ একটি সার্থক ইতিহাসাশ্রয়ী গল্প। তিনি টডের ইতিহাস থেকে

রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ এবং কমল কুমারী ও চঞ্চল কুমারী চরিত্রগুলি নিয়েছেন। রাজপুত নারীর মহিমাকে তিনি বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলে ধরেছেন।

‘ক্ষত্রিয় রমণী’ গল্পে ক্ষত্রিয় রমণীটি যে বীরাজনা তা দেখানো হয়েছে। এই ক্ষত্রিয় রমণীর আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব ও নির্ভীকতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন লেখিকা।

‘পেনে প্রীতি’ গল্পটিতে রয়েছে যৌবনবতী নারীর কাহিনী। প্রেম হল নারীর শ্রেষ্ঠ অলংকার। যৌবন আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের প্রেমের উন্মেষ ঘটে। ভগ্নীপতি একদিন সাত বছরের বালিকাটিকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিয়েছিল। দশ বছর পরে সে ভুলতে পারেনি এই প্রেমের সুরভিকে। কিন্তু তার জীবনে হয়ত পূর্ণতা আসেনি কিন্তু সেই ক্ষণকালের উজ্জ্বল মুহূর্তটি তাকে বাঁচিয়ে রাখে।

‘যমুনা’ গল্পে এক নারীর মর্যাদাসিক যন্ত্রণার ছবি আছে। একজনকে ভালোবেসে সে যখন নববধূ রূপে এলো তখন তার মনে ছিল অনেক আশা। কিন্তু তার স্বামী বিবাহিতা স্ত্রীকে দাসী বানিয়ে নারীত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। একটি আত্মমর্যাদা সম্পন্ন নারী এটি কখনও মেনে নিতে পারেনি।

‘তিনটি দৃশ্য’ ছোটগল্পে এক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী কিভাবে পুরুষকে পদদলিত করে আপন মহিমায় ভাস্বর হয়েছে, তারই চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্পটি গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের মর্যাদাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত। ক্ষেমঙ্করী কিভাবে তার ভাসিয়ে দেওয়া পুত্র সাগরের সন্ধান পেল এবং কুসংস্কারের মোহে বনমালীর জীবনে বিপর্যয় নেমে এলো তারই নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে এই গল্পে।

‘জীবন অভিনয়’ গল্পে মলিনা ও জনার্দনের মধ্যে প্রেমের মধুর সম্পর্ক কিভাবে জটিল হয়ে উঠেছিল তারই নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে।

গুণ্ডু ছোটগল্পই নয় স্বর্ণকুমারী ছিলেন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তিনি সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। ‘কবি ও কবিতা’ প্রবন্ধে স্বর্ণকুমারী দেবী শেলী ও বায়রনের কাব্যের রসগত পার্থক্য তুলে ধরেছেন। ‘সরলতা কি নিন্দাপ্রিয়তা’ প্রবন্ধটি জীবনরসের বর্ণনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ‘ইংরাজ দিগের ত্রীড়া কৌতুক’ প্রবন্ধে ইংরেজ চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। ‘শিল্পশিক্ষা’ প্রবন্ধে নারীজাতির শিক্ষার কথা ব্যক্ত করেছেন। ‘নীলগিরির টোডাজাতি’ প্রবন্ধে এই জাতির জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, ধর্মচর্চা, আকৃতি-প্রকৃতি ও তাদের কুটীরের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। সর্বোপরি নীলগিরির অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

স্বর্ণকুমারীর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে বিজ্ঞানের অনুরাগী পাঠক ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ‘তারকা জ্যোতি’, ‘নীহারিকা’, ‘সূর্য’

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধে। তাঁর 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ' সংকলন অংশে পাশ্চাত্যের বহু বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয় স্থান পেয়েছে।

সবশেষে স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পর্কে গোপাল হালদারের একটি মন্তব্য প্রদত্ত হল,

“বাংলা সাহিত্যে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায় Matriarch ;
সত্যই রবীন্দ্রনাথের যোগ্য অগ্রজ মনে, মতে, লেখায় ; সাহিত্যে
আধুনিক যুগের নারীর জীবন্ত আবির্ভাব।” ২৮

বাংলা সাহিত্যের ধারায় শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। সাহিত্য সাধনাকে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত রূপে বেছে নিয়েছিলেন। মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। সংখ্যার দিক থেকে তাঁর রচনা কোনো অংশে কম নয়। বাংলা সাহিত্যের যখন স্বর্ণযুগ - রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যরচনা করছেন সেই সময়ে বেশ কিছু প্রতিভাময়ী লেখিকার সাহিত্যাকাশে আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যারা তাঁরা হলেন স্বর্ণকুমারী, প্রভাবতী, নিরুপমা, অনুপমা, শরৎকুমারী, বেগম রোকেয়া, অনিন্দিতা, সীতা, শান্তা, গিরিবালা, জ্যোতির্ময়ী, শৈলবালা, রাধারানী, আশালতা ও সরসীবালা বসু।

সরসীবালা বসু একচল্লিশ বসন্ত বেঁচে থেকে বাংলা সাহিত্যের ভান্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তা নিঃসন্দেহ বিস্ময়কর। তিনি মোট ২০টি উপন্যাস, অসংখ্য ছোটগল্প ও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ লিখেছেন। যার সাহিত্যিক মূল্য কোনো অংশে কম নয়। পাশাপাশি তিনি নাটিকা লেখার ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে পত্রিকাগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেগুলি যথাক্রমে - 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মানসী', 'মর্ম্মবাণী' ও 'উত্তরা' এই সাময়িক পত্রিকাগুলিতে তাঁর গল্প উপন্যাস ও কবিতাগুলি একে একে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গ্রন্থগুলি কোলকাতা ও ঢাকার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হিসেবে প্রচারিত হত।

তাঁর জন্ম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। বিহারের গিরিডি শহরের বারগাভায় তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর। 'বাণীকুটীর' ছিল তাঁর বাসগৃহের নাম। এখানেই তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম ক্ষেত্র। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতবর্ষে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, এই আন্দোলনে তাঁর ছিল পূর্ণ সমর্থন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে গয়াতে যে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়েছিল, সেই অধিবেশনে সরসীবালা প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন।

সরসীবালা যে উপন্যাসগুলি লিখেছেন, সত্যি বললে তার প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই

সমাজ সমস্যা ও নারী সমস্যা নিয়ে রচিত। ‘আহুতি’ তাঁর প্রথম উপন্যাস। এই উপন্যাসটি গিরিডি়র বাণীকুটীরে বসে লিখেছিলেন। এই উপন্যাসের বিষয় হচ্ছে পণপ্রথার অভিশাপ। উপন্যাসটির উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন,

“বাঙলা দেশের

নিষ্ঠুর বরপণের নাম -

উৎসর্গ ক’রলাম

আমার ‘আহুতি’কে

বরের বাপমার রক্ততৃষ্ণা মিটবে কি” - ২৯

‘আহুতি’ উপন্যাসের কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। বঙ্গদেশের পণপ্রথার এরূপ নিষ্ঠুর চিত্র খুব কম উপন্যাসেই দেখা যায়।

‘চরকার উৎসব’ তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসটি কমলিনী সাহিত্যমন্দির আহিরীটোলা স্ট্রীট, কোলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। দেশের ভাই ও ভগিনীদের হাতেই এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল —

“মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত এই উৎসবে আজ গৃহে গৃহে নরনারী বিবিধ শুভকর্ম্মে রত হইয়াছেন, এই পুণ্য উৎসবের ছবি সুলেখিকার নিপুণ হস্তে সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে” - ৩০

‘চরকার উৎসব’ উপন্যাসটি ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য শ্রীযুক্ত জলধর সেন নিয়েছিলেন কিন্তু সেটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সরসীবালা দেবী বন্ধুর পরামর্শে গ্রন্থাকারে প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। দীর্ঘ একটি বছর ধরে জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় গ্রন্থটি প্রকাশে বিলম্ব ঘটে। পরিশেষে শ্রীমান শরৎ ও শ্রীমান গোষ্ঠের প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি প্রকাশ লাভ করে। সময় উপযোগী এই সুন্দর উপন্যাসটি গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ লেখা হয়েছে। আধুনিক বস্ত্র সংকটের পটভূমিকায় শিক্ষাপ্রয়োগী এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

‘মনোরমা’ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে এক অনাদৃত, উপেক্ষিতা নারীর জীবন কাহিনী। গ্রন্থটি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কুন্ডু মহাশয়কে উৎসর্গ করা হয় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। এই উপন্যাসের প্রভূত প্রশংসা করে ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকা লিখেছে, -

“গ্রন্থ কবীর রচনা-শক্তি আছে, ছবিখানি সুন্দর আঁকিয়াছেন।” ৩১

সরসীবালা বসুর আরেকটি করুণ রসাত্মক উপন্যাস ‘প্রায়শ্চিত্ত’। এই উপন্যাসের শিল্পগুণ সম্পর্কে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, -

“প্লটে নূতনত্ব আছে, ভাষা সহজ ও সুন্দর।” ৩২

‘মানসী’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল,

“বইখানি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে।” ৩৩

‘রেখা’ উপন্যাসটি স্নেহাস্পদ শ্রীমান শচীন্দ্র মোহন গোস্বামী মহাশয়ের কর কমলে উৎসর্গ করা হয়েছে। এই উৎসর্গপত্রের শেষ চারটি ছত্র নিয়ে প্রদত্ত হল ,

“এঁকেছি আপন মনে সাধারণ ছবি,
সৃষ্টির ক্ষমতাহীন আমি দীনকবি,
ত্রুটি যা রহিল ভাই সে দায় আমার,
সাদরে ‘রেখা’য় আজি লও উপহার” ৩৪

সরসীদি

১লা আশ্বিন, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

‘শুকতারা’ সরসীবালা বসুর গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক নূতন উপন্যাস। এই উপন্যাসটি প্রভাতের শুকতারার আলোর মতো পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গিরিডিতে বসে লেখা এই উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন কল্যাণীয় স্নেহ, প্রেম, পুষ্পলতা ও সুধাময়ীকে।

‘পরিত্যক্তা’ উপন্যাসটি সরসীবালা বসুর অনবদ্য সৃষ্টি। প্রিয় লাবণ্যলেখা দেবীকে এই গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গ পত্রের শেষ চার লাইনে লেখা হয়েছিল,

“লজ্জা, ক্ষোভ, ব্যথা আর অশ্রুশিশি দিয়া
লিখিলাম যেই চিত্র-সত্য দৃষ্টি নিয়া
তুমি তারে দেখো সখি-করপদে তব -
অশ্রুসিক্ত উপহার লও এই নবা।” ৩৫

একত্রিশটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটির প্রশংসা করে ‘উত্তরা’ পত্রিকায় লেখা হয়েছিল :

“লেখিকার গল্প বলিবার ভঙ্গী ও ভাষা সহজ ও সুন্দর।” ৩৬

“প্রতিষ্ঠা’ সরসীবালা দেবীর সমাজ সমস্যামূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসে সমাজজীবনের ছবি সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে, পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি হয়। অথচ ধর্মীয় উদারতা উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে কতটা প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে লেখিকা তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। এই উপন্যাসটি সম্পর্কে একাধিক সাময়িকপত্র মূল্যবান মন্তব্য করেছে। ‘প্রবাসী’ পত্রিকার ‘প্রতিষ্ঠা’ উপন্যাস সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য :

“বইখানা ভাল হয়েছে, দুই একজন বাদে অন্ততঃপক্ষে উপন্যাসের দিক দিয়ে আমাদের দেশের মেয়ে লেখিকারা পুরুষদের ছাপিয়ে উঠেছেন, পুরুষ লেখকদের সাবধান হওয়া উচিত। লেখিকা পল্লি-সমাজের যে চিত্রটি আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছেন, তা ভালই হয়েছে।”

‘মানসী’ পত্রিকার সারগর্ভ মন্তব্যটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

“লেখিকা বিজয়বাবু ও তাঁহার সহধর্মিণী সারদার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই উপন্যাসের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক সমস্যার অবতারণা করিয়া তাহার সুমীমাংসাও করিয়াছেন। গৌড়ামি ও অনুদারতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে হিন্দু ও ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্যে কিরূপ সম্ভাব স্থাপিত হইতে পারে, লেখিকা এই উপাখ্যানে তাঁহার একটি মনোরম দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।” ৩৮

‘প্রবাল’ সরসীবালা দেবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাস লিখে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। এই উপন্যাস পাঠ করে জানা যায় সরসীবালা একজন প্রগতিশীল লেখিকা। নবনীতা দেবসেন ‘প্রবাল’ উপন্যাস পাঠ করে মন্তব্য করেছেন :

“সরসীবালার মন ছিল উদার, রক্ষণশীলতা বিরোধী। কিন্তু বিদেশী ভাবাপন্ন অন্ধ সাহেবীয়ানার নকল নবিশীকেও তিনি ঠাট্টা করতে ছাড়েন নি। তিনি চেয়েছিলেন উদার, বিচক্ষণ, সুস্থ, সু-সামঞ্জস্য স্বদেশী আধুনিকতা, সুশৃঙ্খল শৃঙ্খলা যুক্তি। উচ্চবর্ণের হিন্দু ঘরের বিবাহিতা কন্যার সামাজিক বিড়ম্বনাকে নানাদিক থেকে সরসীবালা দেখিয়েছেন। নায়িকা ছিলেন রুচি, শিক্ষা, বুদ্ধি ও নৈতিক শক্তিতে, সেবায় এক আদর্শ মানুষী। অন্তঃপুরের বর্ণনাতেও লেখিকা যেমন দক্ষ, বাইরের বর্ণনাতেও তেমনি। গ্রামের বর্ণনায় যতটা পরিপক্ব মফস্বল শহরের বর্ণনাতে এবং নাগরিক জীবনের বিবরণেও তেমনিই নিপুণতা তাঁর। নিপুণতা প্রবাসী বাঙালীর জীবন বর্ণনাতেও। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ; উজ্জ্বল একটি উদার প্রগতিবাদী মন ‘প্রবালে’ উপস্থাপিত হয়েছে। আজকের নারীবাদী বিস্তারের যুগে ‘প্রবালে’র মত গ্রন্থের নব মূল্যায়নের সময় এসেছে। মানবিক আদর্শবাদ ও বাঙালীর সমাজ বিস্তার পরিবর্তনের প্রসঙ্গে এই বই নিতান্ত মূল্যবান।” ৩৯

এই উপন্যাসে লেখিকা প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন এবং সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তিনি।

‘শিবানী’ উপন্যাসে সরসীবালা দেবী শিবানী চরিত্রটিকে জীবন্তভাবে এঁকেছেন তার করুণ কাহিনী পরিবেশনে লেখিকা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

‘পুষ্পহার’ সরসীবালার একমাত্র কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘বসন্তে সম্ভাষণ’ এর রচনাকাল ২৭শে মাঘ, ১৩১১ এবং শেষ কবিতা ‘সঙ্গীত’ রচিত হয়েছিল ১৯শে চৈত্র, ১৩১৬ সালে। এই কাব্যগ্রন্থের প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা — বসন্তে সম্ভাষণ, বরষায়, চাঁদের প্রতি, সন্ধ্যা, প্রভাতে প্রভৃতি, পুরাণকেন্দ্রিক কবিতা — তারা, শকুন্তলা, অশোকবনে সীতা, মথুরা দর্শনে প্রভৃতি মানব প্রেমমূলক কবিতা — ‘কে তুমি’, ‘মিলন’, ‘অতৃপ্তি’, ‘সখার প্রতি’, ‘সে কেন’, ‘ভালবাসা’, ‘অভিমান’,

‘বিসর্জন’, ‘মেরী স্কটল্যান্ডের রানী’, ‘তুমি’, ‘খুকীর প্রতি’, ‘তুমি কেন হও না আমার’, ‘অজ্ঞানে অতিথি’ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক কবিতা — ‘আমার কুটীর’, ‘আমার পুত্র’, ‘আমার গৃহ’, ‘আশঙ্কা’, ‘পুরাতন’, ‘উত্তর’, ‘বেদনা’, ‘তাজমহল’, ‘অনুভব’, ‘সঙ্গীত’ প্রভৃতি।

সরসীবালা বসু ছোটগল্প লিখে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘যমুনা’, ‘মানসী’ ও ‘মর্মবাণী’ প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এই বিদূষী লেখিকার গল্পের বিষয় উপন্যাসের মতো সমাজসমস্যা ও নারী সমস্যার বিভিন্ন প্রসঙ্গ। তিনি যে সমাজ সচেতন শিল্পী ছিলেন ছোটগল্পগুলি তা প্রমাণ করে দেয়।

লেখিকার ‘মিলন’ সংকলন গ্রন্থে যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি যথাক্রমে - ‘যমুনা’, ‘উচ্ছৃঙ্খল’, ‘ব্যর্থ প্রণয়’, ‘কীর্তির ডাকাতি’, ‘ছুটী’, ‘দাগা’, ‘ঘাসওয়ালা’, ‘পানে’, ‘পোকা’, ‘ভাড়াটে’ প্রভৃতি।

‘শ্রেয়সী’ গল্প সংকলন গ্রন্থের গল্পগুলি হল - ‘হতাশ প্রেমিকা’, ‘এপ্রিলফুল’, ‘পাগল ও ছাতার কাহিনী’।

তাঁর ‘গ্রহের ফাঁদ’ গল্পসংকলনে যে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি হল, - ‘গ্রহের ফাঁদ’, ‘অসহযোগ’, ‘আতর’, ‘পাশ না ফেল’। এছাড়া দুর্দিনে, খুকীর কীর্তি, গণেরী, আগাছা গল্পগুলিতে নানাভাবে তৎকালীন সমাজ জীবনের সমস্যা লেখিকা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পগুলিতে লেখিকার স্বচ্ছ লেখনী, নিজস্ব চিন্তা, মানবিক মূল্যবোধের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে। কোথাও কোথাও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে সমাজজীবনের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়েছেন।

পূর্ণশশী দেবী বিদূষী মহিলাদের মধ্যে অন্যতমা। বাংলা সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। পূর্ণশশী দেবীর জন্ম ১৮৮৮ সালের শ্রাবণ মাসে। পাঞ্জাবের কর্ণাল শহর ছিল তাঁর জন্মভূমি। তাঁর পিতা কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন প্রথমে ব্যবসায়ী পরে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, মায়ের নাম রাজবালা দেবী। কর্মসূত্রে কালীকৃষ্ণকে পাঞ্জাব প্রদেশের সর্বত্র ঘুরতে হতো। কলকাতার অন্তর্গত বেহালা ছিল তাঁদের আদি বাসভূমি।

প্রবাসী বাঙালি লেখিকা হিসেবে আমরা পেয়েছি শরৎকুমারী দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, নিরুপমা দেবী ও আশালতা সিংহকে। কিন্তু পূর্ণশশীর মত তাঁরা কেউই দীর্ঘকাল বাংলার বাইরে থেকে সাহিত্যচর্চা করেননি। প্রবাসী বাঙালী হিসেবে পাঞ্জাবে সাহিত্যিক পরিবেশ না পেলেও তাঁর মধ্যে বাংলা ভাষার প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। পাঞ্জাবের প্রাদেশিক ভাষা পূর্ণশশীর জানা থাকলেও তিনি কখনও মাতৃভাষার চর্চা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর মা রাজবালা দেবী তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বাংলাতেই সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলি পড়াতে। বঙ্গবাসী, জন্মভূমি, অনুসন্ধান ও হিতবাদী পত্রিকার সঙ্গে পূর্ণশশীর পরিচয় ঘটেছিল ছোটবেলা থেকেই। সরোজিনী দেবী ছিলেন তাঁর

জ্যেষ্ঠা ভগিনী। মেজদি শরৎশশী দেবী ও পরিবারের প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন। মেজদি শরৎশশীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল গভীর। এই দুইবোন বাগানে বসে কবিতা আবৃত্তি করতেন। কঙ্কাবতী, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি, রবীন্দ্রনাথের সোনারতরী ও বিভিন্ন কবিতা ও গল্পের বই পড়তেন। দুই বোনে বইগুলি পাঠ করার পর যখন পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতেন তখন তাঁদের কথোপকথনের ধারাটি এরকম হত —

“মেজদি শরৎশশী বললেন আচ্ছা, চেষ্টা করলে আমরা লিখতে পারে না কি ? পদ্য না হোক, ছোটগল্প ?”

শূর্ণশশী একটু ভেবে বললেন, “হাঁ রে, পারি হয়তো, কিন্তু ছাপাবে কে আমাদের লেখা ?”

“শরৎশশী বললেন, লেখা তো হোক, তারপর ছাপার ভাবনা।”

“বেশ কি লেখা হবে ? গল্প ?”

“হ্যাঁ, বেশ বড় গল্প, উপন্যাসের মতন।”

এর পরেই দু’জন পাঞ্জাব প্রবাসী বাঙালী বালিকা একজনের বয়স বোধ হয় বছর বারো, অন্যজনের নয় কি দশ, “দুইবোন” নাম দিয়ে একটি উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করলেন। শরৎশশী দু’পাতা লেখেন তো শূর্ণশশী দু’পাতা। দুইবোনে সৃষ্টির আনন্দ ভরপুর হয়ে একটি মোটা খাতা ভরে উপন্যাসটি লিখে শেষ করেন।” ৪০

শূর্ণশশী দেবীর কবিতা লেখার প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল দিদি সরোজিনী দেবীর খাতা দেখে। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি একগাছি বাসি ফুলের মালা দেখে একটি কবিতা লিখে ফেলেন। কবিতাটি হল —

‘কেহনা আদরে মোরে,

চাহেনা আমার পানে।

একধারে পড়ে আছি

শুধুই উদাস প্রাণে।’ ৪১

শূর্ণশশী যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন সে সময় অর্থাৎ দশ বছর বয়সকালেই ফতেগড় নিবাসী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহের পর মেয়েদের শ্বশুর বাড়িতে থাকতে হত। কিন্তু শূর্ণশশীর ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তিনি ফিরে এসেছিলেন পিত্রালয়ে। অজস্র বই পড়বার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। মহিলা কবিদের কাব্য, উপন্যাস পাঠ করে তিনিও সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করলেন। এই সময়ে ‘পাপিয়া’, ‘নিশীথে’, ‘বাঁশরী’, ‘বন্ধুবিদায়’ প্রভৃতি রম্যরচনা লিখেছিলেন। এর দু’বছর পর তিনি ফিরে আসেন

তাঁর শৃঙ্গর বাড়িতে। সেখানে থেকে তাঁর সাহিত্য রচনা শুরু হয়। তিনি তাঁর ‘স্মৃতিকথা’ গ্রন্থে লিখেছেন,

“দুপুর বেলায় স্বপ্ন অবকাশে দিবানিদ্রার অভ্যাস আমার ছিলনা কোনোকালেই, শ্যামুড়ি-নন্দ যখন ঘুমাইয়া পড়িতেন তখন চুপি চুপি কবিতার খাতাখানা লইয়া একটুকু বসিতাম নিরিবিলিতে”। ৪২

পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় ‘খাতা’ গল্পের উমার কথা, তার স্বামীর নামও ছিল প্যারীমোহন। কিন্তু পূর্ণশশী সৌভাগ্যবতী, তাঁর স্বামী তাঁর কবিতার খাতাটিকে হস্তগত করে লুকিয়ে ফেলেননি, নিয়ে গিয়েছিলেন সাহিত্যানুরাগী বন্ধুর কাছে এবং সগর্বে এসে বলেছিলেন,

“প্রভাস বলেছিল.....কালচার পেলে ও মেয়ে একজন বিখ্যাত লেখিকা হবে.....।” ৪৩

স্বামীর আগ্রহ মুগ্ধ করেছিল পূর্ণশশীকে আর তাঁর বন্ধুর ভবিষ্যতবাণী।

“কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া অলক্ষ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল আমার অন্তরে দারুণ এক দুরাশার স্বপ্ন।” ৪৪

কমলকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পূর্ণশশীর সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছিলেন। তিনি একদিন ‘কুন্তলীন’ পুরস্কার নামের একটি বই এনে তুলে দিলেন পূর্ণশশীর হাতে এবং বললেন,

“তুই লুকিয়ে লুকিয়ে কি সব লিখিস, ওদের একটা পাঠিয়ে দেখ না, বেশ লেখা ছাপা হয়ে যাবে আর প্রাইজও পাবি।” ৪৫

বস্তুত এই পুরস্কার ছিল তৎকালের বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার। এইচ. বোস এই পুরস্কার দিতেন নূতন নূতন সাহিত্যিকদের উৎসাহ বাড়ানোর জন্য। পূর্ণশশী ‘আভা’ নামে একটি ছোটগল্প পাঠিয়ে দেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই পুরস্কারের জন্য অনুমোদন করেন। পুরস্কার স্বরূপ তিনি পেলেন পাঁচ টাকা। এর পরবর্তী বছরেও এই পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন। এরপর তিনটি রূপকথা। তিনটিতেই পুরস্কার লাভ করেন।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, অনুবাদ কর্ম সবকিছুতেই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তিনি একাধিক উপন্যাস, প্রেম সঙ্গীত ও দৌহাও হিন্দীতে অনুবাদ করেন। হিন্দী অনুবাদ গ্রন্থ ছিল ষাটখানি।

বেনারসের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি প্রধান শিক্ষায়ত্রীর পদও অলংকৃত করেছিলেন। ডাল্টনগঞ্জের বালিকা বিদ্যালয়েও বাইশ বছর ধরে এই পদে বৃত ছিলেন। সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালন করে এবং প্রধান শিক্ষিকার মতো দায়িত্বভার পালন করেও তিনি তাঁর সাহিত্য রচনা থেকে বিরত থাকেন নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘স্নেহময়ী’। এর পরবর্তী উপন্যাস ‘ফল্গুধারা’, ‘রূপহীনা’, ‘প্রেমের পরশ’, ‘অনুরাগ’, ‘নিশীথ বাদল’, ‘দিশেহারা’, ‘মহিলা মজলিস’, ‘রাতের

ফুল', 'অভিশপ্তা', 'পথে বিপথে', 'সাদাকালো', 'মনের মানা নাই', 'ভালোবাসা এলো জীবনে', 'স্রোতের মুখে' — উপন্যাসগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'রাতকে বাদল' ও 'আশায়োঁ কি চিতা' (হিন্দী) নামে উপন্যাস দু'টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁরই লেখা বাংলা থেকে হিন্দীতে অনূদিত গ্রন্থগুলি হিন্দী সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'বারোয়ারি উপন্যাস' — তেও তাঁর লেখা রয়েছে।

পূর্ণশশী দেবীর ছোটগল্পগুলিও শিল্পাত্মকর্ষের পরিচয় বহন করে। তাঁর গল্পগুলি 'বিচিত্রা', 'বসুমতী', 'প্রবর্তক', 'উদয়ন', 'গল্পলহরী', 'দীপালি', 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর গল্প সংকলন গ্রন্থের 'ঝড়ের পথিক', 'ভীরা রণজিৎ', 'স্মরণাগত' গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। 'সহমরণ', 'স্পর্শের মায়া', 'দুইদিক' প্রভৃতি গল্পে তাঁর পরিণত প্রতিভার পরিচয় মেলে। 'কুন্তলীন পুরস্কার' এবং অন্যান্য পুরস্কৃত গল্পগুলি হল 'দান', 'জগৎ' 'মায়ার বন্ধন', 'পূজার চিঠি', 'ময়ূরপঙ্কজী', 'নীলপদ্ম', 'জুয়াচুরি বুদ্ধি', 'সাথী', 'ছেঁড়া ডায়েরী' ও 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' প্রভৃতি গল্পগুলি সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ।

এছাড়া তিনি 'হাফিজ', 'গালিব' প্রভৃতির উর্দু কবিতার অনুবাদের ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পূর্ণশশীর গল্প, উপন্যাসে প্রবাসী জীবনের বহু অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। 'অনুরাগ' উপন্যাসের নায়ক অজিত লাহোরের অধ্যাপক। নায়িকা স্মৃতিদ্রষ্ট এক তরুণী। তরুণীটি দরিদ্র অজিতকে ভালোবেসেছিল। অজিতের জীবনের টানাপোড়েন এই উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। 'দিশেহারা', 'রাতের ফুল' উপন্যাসে দু'টিতে অসহায় বাঙালি মেয়ের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'স্রোতের মুখে' উপন্যাসে নায়িকা রেণু সে জীবন সংগ্রামে বিশ্বস্ত। বিয়ের পর স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লাঞ্ছনা সে মুখ বুজে সহ্য করেনি। রেণু চেয়েছিল মোহিতের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করে সে শুরু করবে নতুন জীবন। এদিকে মোহিত পুনর্বিবাহ করে। পরিশেষে ভাগ্যবিড়াম্বিতা রেণু বিয়ে না করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে অভিনেত্রীর পদ বেছে নিয়েছিল। সৎ পথে থাকা সত্ত্বেও সে তাঁর নারী জীবনের আদর্শ রক্ষা করতে পারেনি।

'রাতের ফুল' উপন্যাসটির ভৌগোলিক পটভূমি কাশীধামের এক অনাথা আশ্রয়হীন একটি মেয়ের জীবন অবলম্বনে এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে।

'সাদাকালো' উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় চটকলের শ্রমিক লাঞ্ছনা ও বর্ণবিষম্য। এই উপন্যাসের নায়ক জয়ন্ত তার সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে পূর্ণশশীর সংগ্রামী জীবনের সাদৃশ্য রয়েছে।

'মনের মানা নাই' উপন্যাসের নায়িকা সীতা। সে এক ধনী ছেলের প্রেম নিবেদন প্রত্যাখান করে তার মনের মানুষকে নিয়ে নিদারুণ দুঃখের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেছে। প্রেমের এই উদ্দামতার দিকটি লেখিকা অত্যন্ত যত্নে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে সমাজ জীবনের

পরিচয় মেলে।

এই বিদূষী লেখিকার ছোটগল্পগুলির বিষয়বৈচিত্র্যে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। ‘ছেড়া ডায়রী’ ছোটগল্পের ভৌগোলিক পটভূমি মুসৌরি পাহাড়। এই গল্পের নায়ক মৃত্যুপথযাত্রী, অসুস্থ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মুসৌরি পাহাড়ে এসেছিল হাওয়াবদলের জন্য।

‘নিরুদ্দেশের যাত্রী’ গল্পের নায়ক বিজিত কুমার। সে নিঃসঙ্গ, এলাহাবাদের প্রবাসী। জীবনে রঙিন স্বপ্ন অনেক ছিল তার। কিন্তু আঘাতে আঘাতে তার জীবন ভরে গেল। যৌবনের প্রাণচঞ্চলতার মধ্যে দেখা গেল প্রৌঢ়ত্বের ছাপ।

‘স্মরণাগত’ গল্পে দেখা যায় ছোট্ট মা তার পুত্রকে যে হত্যা করেছে তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছে।

‘সহমরণ’ গল্পে আমরা দেখি মেয়ের ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্য পিতাকে অনুতপ্ত হতে। পরিশেষে পিতা ক্ষমা চেয়ে নেয় তার মেয়ের কাছে।

‘স্পর্শের মায়া’ ছোটগল্পে নায়ক নায়িকার মধ্যে এতটুকু কোমল স্পর্শ এনে দিয়েছিল জীবনের সাফল্য।

তিনখন্ডে সমাপ্ত পূর্ণশশী দেবীর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ ‘মনে পড়ে’ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এই গ্রন্থের প্রথম পর্বের নাম ‘প্রভাতে’, দ্বিতীয় পর্বের নাম ‘মধ্যাহ্নে’, তৃতীয় পর্বের নাম ‘সায়াহ্নে’। প্রথম পর্বটি ‘প্রভাতী’ পত্রিকায়, দ্বিতীয় পর্বটি ‘সচিত্র শিশির’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। অধ্যায়ের নামকরণের ক্ষেত্রেও পূর্ণশশীর স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। যেমন, ‘মারি পাহাড়’, ‘দেবদুর্গ-বনবাস’, ‘রোগ শয্যায়’, ‘কুরুক্ষেত্রে’, ‘বৃন্দাবন ধাম’, ‘অজ্ঞাতবাসে’, ‘কাশীর স্মৃতি’। এই স্থানগুলি তাঁর জীবনের স্মৃতির অ্যালবাম স্বরূপ।

শৈলবালা ঘোষ জায়া বাংলা সাহিত্য সমাজের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি একদিকে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার ও বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ২রা মার্চ কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী, মা হেমাজিনী দেবী। পিতা ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল বর্ধমান।

মহাশ্বেতা দেবী শৈলবালা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি —

“১৩১৪ সালে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে ঘোষ পরিবারে লেখিকার বিয়ে হয়।স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি পড়তেন। পাশ করবার পর মাত্র আড়াই-তিন বছর প্র্যাকটিস করবার পরই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। উন্মাদ রোগে দশ বছর ভুগে তিনি মারা যান।.....”৪৬

বর্ধমান শহরের রাজবালিকা বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রী ছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে তিনি শিক্ষালাভ করেছেন তাঁর পিতা ও বড়ভাই এর কাছ থেকে। আকস্মিক ভাবে পিতার মৃত্যুতে তিনি শোকাহত হন। পিতাকে স্মরণ করে তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। একদিকে স্বামীর অসুস্থতা অন্যদিকে অর্থনৈতিক অস্থিচ্ছলতা তাঁর সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। সাংসারিক দায় দায়িত্ব পালন করেও অবসর সময়ে তিনি সাহিত্যরচনা করে যেতেন। কোন কোন দিন রাত জেগে জেগে নীরবে লিখে যেতেন তিনি।

শৈলবালা ঘোষ জায়া বিভিন্ন সম্মানীয় উপাধি পেয়ে বঙ্গের বিদূষী মহিলাদের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ছিল তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধের বিষয়। এই নিবন্ধ লিখে তিনি সরস্বতী উপাধি পেয়ে সম্মানিত হন। এছাড়া ‘সাহিত্য ভারতী’ ও ‘রত্নপ্রভা’ উপাধি পেয়ে গৌরবের অধিকারী হন।

তাঁর জীবনে দুর্দিন দেখা দেয় ১৩২৬ সাল থেকে। এসময় তিনি ভেঙে না পড়ে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর লেখনীকে অব্যাহত রেখে যান। এই সময়কার তাঁর জীবন ইতিহাস অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

তিনি তাঁর লেখাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। মানসিক ভারসাম্যযুক্ত স্বামীর চিকিৎসা, সংসারের খরচ সবকিছুই তাঁর লেখা থেকে যা রোজগার হত তা দিয়ে চালাতেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই দশটি গল্প প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট ৫৩ টি। তিনি ২২টি উপন্যাস, দশটি ছোটগল্প সংকলন, একটি নাটক, দুটি শিশু সাহিত্যের বই লিখে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন। এমনকি মিলিতভাবে বঙ্গের বিদূষী নারীরা যে বারোয়ারি উপন্যাস রচনা শুরু করেছিলেন তিনি সেই উপন্যাসেও একটি বৃহৎ অংশ লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রবাসী, বর্ষবাণী, বসুমতী, বেঙ্গলী, মানসী ও মর্মবাণী, বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর সাহিত্য সম্ভার একে একে প্রকাশ হতে থাকে।

প্রবাসী পত্রিকাতেই তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। ‘শেখআন্দু’ নামে একটি চাঞ্চল্যকর উপন্যাস প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ লাভ করেছিল। প্রবাসীর গল্প প্রতিযোগিতায় ১৩২২ সালে তিনি পুরস্কৃত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয়া মহাশেতা দেবী এ সম্পর্কে লিখেছেন -

“প্রবাসী পত্রিকাকে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ গুরু বলে অভিহিত করেছেন। শৈলবালা ঘোষ জায়ার আটত্রিশটি বই এর নাম আমার সামনে আছে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত উপন্যাস আত্মজীবনী ও ছোটগল্প তাঁর কাছে আছে। বিস্তৃত আত্মজীবনীটি কোন প্রকাশক প্রকাশ করলে শৈলবালা খুশি হতেন। বইএর সংখ্যা ৫২/৫৩ হলেও সব বইয়ের নাম আজ আর তাঁর স্মরণে নেই।” ৪৭

১৬টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ‘অবাক’ উপন্যাসে শৈলবালা ঘোষ জায়া উপন্যাসের কাহিনীর অভিনবত্ব চরিত্র চিত্রণের নৈপুণ্য ও ভাষাবিন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

‘অরু’ উপন্যাসটি ২৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত অরু নামে এক নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। পুত্র-প্রতিম শ্রীমান চিন্ময় সুন্দর রায়কে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

তাঁর ‘ইমানদার’ উপন্যাসটির উচ্চ প্রশংসা করেছে বসুমতী ও বেঙ্গলী পত্রিকা। এছাড়া মোজাম্মেল হক এই উপন্যাসে মুসলমান চরিত্রের প্রতি লেখিকা যে সহানুভূতি ব্যক্ত করেছেন তা উল্লেখ করেছেন। ‘গঙ্গাপুত্র’ উপন্যাসটি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী শুভেন্দুকুমার নন্দীকে উৎসর্গ করেছেন। পৌরাণিক আবহযুক্ত ‘গঙ্গাপুত্র’ উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ১৫টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে মূল কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত করে মূলকাহিনীকে পরিপুষ্ট দান করা হয়েছে।

‘জন্ম-অভিশপ্তা’ উপন্যাসটি ১৩টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ৮টি পরিচ্ছেদ তিনি ‘ক’-‘ট’ পর্যন্ত ১১টি বিভাগে বিভক্ত করেছেন। এটি মূলত করুণ রসাত্মক উপন্যাস। একটি নারী জীবনের করুণ ও মর্মস্পর্শী কাহিনী শৈলবালা ঘোষ জায়া অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

‘বিনির্গয়’ ২০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস, পরিচ্ছেদ সংখ্যা ২২। তিনি এটি উৎসর্গ করেছেন দেশের অগণিত স্বদেশ প্রেমিকদের উদ্দেশে। উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন —

“অমানুষের অত্যাচার পীড়িত, বিপন্ন নর-নারীর যাহারা সহায়তাকরী সেই সৎসাহসী, ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক দেশভ্রাতা ও দেশভগিনীগণের শ্রীকরকমলোদ্দেশে শ্রদ্ধাভাবে উৎসর্গ করিলাম।”

৪৮

‘মঙ্গলমঠ’ শৈলবালার ভক্তিরসাত্মক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি দুটি খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে ১৭টি পরিচ্ছেদ, ২য় খন্ডে ১৫টি পরিচ্ছেদ রয়েছে। দুটি খন্ড মিলিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৯টি। তাঁর পুত্র শ্রীমান নৃপেন্দ্রনাথ বসুকে তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসের নায়ক নিরঞ্জন। নির্মল ও পবিত্র চরিত্র নির্মাণে শৈলবালা অসাধারণ মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়েছেন। নায়িকা মায়া একদিকে মানবিক অন্যদিকে দেবীর সমতুল্যা। মায়া কখনো নারী চরিত্রের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেননি। বরং নারী চরিত্রের মহিমায় মায়া চরিত্রটি সমাজের আদর্শ স্থানীয়। এই উপন্যাসের লীলাময়ের বিচিত্র সৃষ্টিলীলা প্রতিফলিত হয়েছে। এর অপূর্ব আনন্দরস ও ভগবৎ চিন্তা পাঠককে পৌঁছে দেয় এক অনুভবের জগতে।

শৈলবালার কৌতুক রসযুক্ত গার্হস্থ্যধর্মী উপন্যাস। ‘মিষ্টি শরবত’ অনবদ্য সৃষ্টি।

কৌতুক রসের সমাবেশে, চরিত্র চিত্রণের পারিপাট্যে, ভাষার সাবলীলতায় তার ২০টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত আলোচ্য উপন্যাসটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। পরম পূজনীয়া লক্ষ্মীরূপা স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া দেবীর শ্রীচরণ কমলে ‘মিষ্টি শরবৎ’ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন।

‘রঙীন ফানুস’ উপন্যাসটি অপরাজিতা রায়কে উৎসর্গ করেন। ৩৪টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই উপন্যাসটিতে শৈলবালা অত্যন্ত নিপুণ ভাবে তাঁর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের গঠন বিন্যাসে, চরিত্র চিত্রণের অভিনবত্বে, সার্থক ভাষা বিন্যাসে ও যথার্থ নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি মুন্সীমানার পরিচয় দিতে পেরেছেন।

‘শান্তি’ উপন্যাসটি ১৭টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। এই উপন্যাসটি তাঁর স্নেহধন্য পুত্র গৌরহরি ঘোষ ও স্নেহধন্য পুত্রবধূ রেবারাণীর করকমলে উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট হিসেবে আমরা জানতে পারি, লেখিকা দেখেছিলেন পঞ্চকোট পাহাড় থেকে একটি অজগর সাপের খোলস তাঁর গৃহে ঝড়ে উড়ে এসেছিলো। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তিনি বেছে নিলেন তাঁর উপন্যাসের প্লট। বিষধর সাপ ভীতিকর। তিনি এক শ্রেণির ক্ষতিকারক মানুষদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। মানব শত্রু স্বরূপ এই বিষধর সাপ গুলিকে ধ্বংস করা গুণবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের একান্ত কর্তব্য। তাহলেই দেশের কল্যাণ ও শান্তি ফিরে আসবে। এই উপন্যাসের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনা বিন্যাসটিও কার্যকর সম্পর্কযুক্ত। কাহিনী পরিণতিও শিল্পসফল সন্দেহ নেই।

‘শেখ আন্দু’ শৈলবালা ঘোষ জায়ার একটি বিতর্কিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে বেশ চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল উপন্যাসটি মানসী ও মর্মবাণী পত্রিকায় ১৩২২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচ্য উপন্যাসে শৈলবালা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই উপন্যাসে শেখ আন্দু নামে এক মুসলমান ড্রাইভার, যে বয়সে যুবক, সে প্রেমে পড়েছিল এক হিন্দু মনিব কন্যার। এই ঘটনা নিয়ে লিখিত ‘শেখ আন্দু’ উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সমালোচক জনাব সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়’ লিখেছেন —

“লেখিকা আন্দুর ভিতর দিয়া একটি সরল, সবল, প্রেমপ্রবণ সত্যসন্ধ মুসলমান চরিত্র আঁকিয়াছেন.....হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হইবে। রাজনৈতিক কলোচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়া এ মিলন সম্ভবপর নহে। প্রকৃত মিলন প্রাণে — মনুষ্যত্বের পটভূমিকায়। ভৌগোলিক সীমারেখায় তা সীমাবদ্ধ নহে। সঙ্কুচিত বা বিঘ্ন সংকুলও হতে পারেনা।” ৪৯

মীজানুর রহমান ‘শেখ আন্দু’ উপন্যাসের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন —

“সদিচ্ছার মাপ কাঠিতে ‘শেখ আন্দু’ বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য অবদান। লেখিকার সংকীর্ণতামুক্ত দারাজদিলের দর্পণ। দৃষ্টান্ত-দর্জী দুলাল, মটর ড্রাইভার ‘শেখ আন্দু’ (আনোয়ারুদ্দীন)

এবং চতুষ্পাঠির অবসর-প্রাপ্ত অধ্যাপক ‘দাদাজী’ বা পণ্ডিত রামশঙ্কর চৌবের সম্পর্ক, সৌহৃদ্য, সহনশীলতার সুন্দর শিক্ষণীয়, প্রাণস্পর্শী চিত্র। সাহিত্যের মারফতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থাপন এবং অবাস্তবিক ব্যবধান নিরসনের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য লেখিকাকে জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ।” ৫০

এই উপন্যাসটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩৩। এটি উৎসর্গ করেন তাঁর দেবর শচীন্দ্রমোহন ঘোষকে। পাঠকদের কাছে এই উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময়ে আবেদন জানিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন —

নমো নারায়ণায়

সবিনয় নিবেদন,

১৩২২ সালের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় ‘শেখ আন্দু’ উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

যাঁহাদের উৎসাহ, সহানুভূতি এবং যত্নানুকূল্যে আজ ‘আন্দু’ সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে সাধারণে প্রকাশিত হইল তাঁহাদের মহানুভবতার চরণে কৃতজ্ঞ আনন্দে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান জানাইয়া জাতীয় উন্নতিকামী, উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান হিতৈষী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তে আমার স্নেহের ‘আন্দু’ সাদরে অর্পণ করিলাম। ইতি —

মেমারি, বর্ধমান

বিনীতা

১৩২৪, আশ্বিন

লেখিকা। ৫১

এছাড়া তাঁর ‘ঘৃণাহতা’ উপন্যাসটির কমলিনী সাহিত্য মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন গোষ্ঠবিহারী দত্ত ও শরৎচন্দ্র পালের করকমলে। এই উপন্যাসে তৎকালীন বঙ্গ সমাজের বাস্তবচিত্র নিপুণভাবে গ্রথিত হয়েছে।

‘জন্ম অপরাধী’ উপন্যাসটি প্রতিটি পরিচ্ছেদে শিরোনাম সংযোজিত হয়েছে এবং প্রতিটি শিরোনামগুলি ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিখিত। যেমন, ‘বরের চিঠি’, দাম্পত্য প্রেম, চরম মাধুর্য, সৌভাগ্যের দর্প, হতভাগ্যের লাঞ্ছনা, দেবতার কর্তব্য, চরম নৈরাশ্যে, শেষকথা প্রভৃতি। উপন্যাসিক এখানে চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ডাক্তারবাবু, বিনোদলাল, বিধু, কুমুদ প্রভৃতি চরিত্র রক্ত-মাংসে গড়া। উপন্যাসের ভাষা সাবলীল। এছাড়া তাঁর সই, তেজস্বতী, নমিতা, বিভ্রাট, বিনীতা-দি, লীনার শিক্ষা ও মহিমা দেবী উপন্যাসগুলি বাংলা

সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন।

মহিমা দেবী উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে। নবাব মহাবুর খাঁর প্রতি হিংসা ইকন, জালবিস্তার, চক্রান্ত, দ্বন্দ্ব অত্যন্ত নিপুণভাবে শৈলবালা ঘোষ জায়া ফুটিয়ে তুলেছেন। সম্রাটের অঙ্গুলি নির্দেশ কিভাবে মহাবুর খাঁকে হত্যাকরা হয়েছিল তার উল্লেখ এই উপন্যাসে রয়েছে।

‘ভাগের পূজা’ নামে বারোয়ারী উপন্যাসে তিনটি উল্লেখযোগ্য পরিচ্ছেদ তিনি লিখেছেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, লীলা দেবী এমনকি জলধর সেনের মতো প্রতিভাসম্পন্ন ঔপন্যাসিকরাও এই উপন্যাসটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

শৈলবালা ঘোষ জায়া সার্থক ঔপন্যাসিক হলেও কথাসাহিত্যের অপর শাখা গল্প রচনার ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। তাঁর গল্প সংকলন গ্রন্থগুলো হল যথাক্রমে অকালকুস্মাণ্ডের কীর্তি, থিয়েটার দেখা, মুচি, রুদ্রকান্ত, অভিনেত্রীর একরাত্রি, আড়াই চাল, করুণা দেবীর আশ্রম, মনীষা, স্মৃতিচিহ্ন। এই গল্পগ্রন্থগুলির প্রতিনিধিত্বান্বিত গল্প হল — বিজয়ার নমস্কার, সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান, মনীষা, অভিনেতার একরাত্রি, মুক্তি, প্রেতাশ্রম জবানবন্দী, ঐন্দ্রজালিক, লাফো, দাদামশায়ের বে, বীণার সমাধি, মাতৃস্নেহ, কর্পূরের মালা, ননি খানসামার ছুটিয়াপন, একাদশী, পাহাড়ের পথে, বজ্রঝংকার, শঠেশাঠাং, কোন রোগ ? জামাইবাবু, শিশুর স্মৃতি, নাতনি, আয়েশা প্রভৃতি।

ননি খানসামার ছুটিয়াপন শৈলবালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। পাড়াগাঁয়ের নিম্ন সম্প্রদায়ের মানুষদের বাস্তব জীবনচিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই গল্পে। এর ভাষা ও রচনাশক্তি প্রশংসার দাবি রাখে।

‘স্মৃতিচিহ্ন’ যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলিও সমাজ সমস্যামূলক এই গল্পগুলিতে রয়েছে প্রতিবাদ শিশুর স্মৃতি গল্পে ব্যাভিচার, ভ্রূণহত্যার প্রসঙ্গ আছে। ভ্রূণহত্যার জন্য এক পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল এক লেডি ডাক্তারের কাছে। সেই লেডি ডাক্তারটি এর প্রতিবাদ জানায়। অতঃপর সেই পুরুষটির সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু হলে এই দুষ্কার্যের জন্য তাঁকে কষে চাবুক চালিয়েছিল। ভ্রূণহত্যার মতো নির্মম কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ‘শিশুর স্মৃতি’ গল্পটি লিখিত হয়েছে।

‘বিজয়ার নমস্কার’ ছোটগল্পে ব্যথা নামে এক অসহায় বিধবার করুণ কাহিনি রয়েছে। এই নারীটি বহিঃরঙ্গে সধর্মনিষ্ঠ পুণ্যবতী। কিন্তু তার পরিবারের একাংশের ব্যাভিচার, পরসম্পত্তি হরণ, প্রবঞ্চনা ও সুরাতে আসক্ত এগুলি সে মেনে নিতে পারেনি। তারপর দেখা দিল তাদের আর্থিক অনটন। ব্যবসায় গণেশ উল্টে গেল, মামলা মোকদমায় জর্জরিত হল। একদিন তাকে ছলে বলে কৌশলে মিথ্যা চারিত্রিক অপবাদ দিয়ে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। তারপর থেকে

অন্য বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে দিন কাটাতে গিয়ে জীবনে নেমে আসে চরম বিপর্যয়। ব্যথা কিন্তু কবিতা লিখতে শুরু করে। একাধিক পত্রিকাতেও তার লেখা প্রকাশ পায়। পত্রিকার সম্পাদিকা তাকে অর্থদান করে পুরস্কার স্বরূপ। কিন্তু তাঁর আত্মীয়রা ব্যথার এই সাফল্য পছন্দ করেনি। ইতিমধ্যে তার শ্বশুর বাড়িতে শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী সংগ্রাম। এতে ব্যথার স্বামী ও তার ছোট দেওরের মৃত্যু ঘটে।

‘লাফো’ শৈলবালার এক জনপ্রিয় গল্প। বিজয়া দশমী দিয়ে এই গল্পটি শুরু হয়েছে। গল্পের নায়ক লাফো। তাকে অনেকেই পাগল মনে করে। সে দেবদারু গাছে ফুলের মালা তৈরী করে ঝুলিয়ে রাখে। লাফো রেঙ্গুনের বাসিন্দা। সে তার নিজের বাবা-মাকে দেখেনি। সে রেঙ্গুনের কাজ ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছিল তার গ্রামে। গ্রামের নায়েব ছিল তার কাকা। লাফোকে তিনি দু’দুবার বিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু কোন বউই দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকেনি। এরপর লাফো গোমস্তার চাকরি নেয়। তার কাকা মারা যান এবং ছোট বোনের বিয়ে দিয়ে রায়বাবুদের কাজ ছেড়ে দিয়ে। বাবুদের জমিদারীতে যোগদান করে। এনিয়ে উভয় জমিদারের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে লাফো চলে আসে অন্যত্র। বিজয়ার রাতে লাফো গুনতে পায় রায়দের ছোটবাবু মিথ্যে অজুহাতে প্রজাকে বলপূর্বক ধরে এনেছে। এর প্রতিবাদে একদিন রাতে লাফো ভোজালি নিয়ে ছোটবাবুদের ঘরে প্রবেশ করে এবং অবিশ্বাসী শঙ্করকে ভোজালি দিয়ে হত্যা করে। এখানেই গল্পের সমাপ্তি।

‘বুনো ওল ও বাঘা তেতুল’ গল্পের গল্পকার শৈলবালার একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে তৎকালীন বিচার ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে।

নাটক রচনার ক্ষেত্রেও শৈলবালা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে ‘মোহের প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকটি পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল। নাটকের চরিত্র, Climax , সংলাপ ও নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকা আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর অসামান্য অবদানের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। ‘রঘু সর্দার’ শিশু সাহিত্যমূলক ছোটগল্প গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। ‘রঘুসর্দার’, ‘ভূমিকম্প’, ‘গবেষণা’, ‘বিদায়-গ্রহণ’, ‘সংসাহসের পুরস্কার’, ‘নিরঞ্জন সর্দার’, ‘বোকার টুপি’, প্রত্যেকটি রচনাই শিশুপাঠ্যের উপযোগী। এরমধ্যে যেরকম অভিযানমূলক ঘটনাধারার উল্লেখ রয়েছে, তেমনি শিশুদের কৌতূহল, শিশুমনস্তত্ত্ব উপযোগী বহু প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত বিদূষী নারীরা নিজস্ব সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁদেরই একজন। তাঁর কাছ থেকে বাংলা সাহিত্য অনেক কিছু পেয়েছে। একদিকে পল্লীচিত্র, অন্যদিকে রহস্যময়তা ও গভীর বেদনা তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তিনি শুধু বঙ্গদেশেরই

সাহিত্যিক নন, রাজস্থানের প্রবাসী বাঙালির জীবন চিত্রও ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যে। সর্বোপরি রাজস্থানের সামগ্রিক পরিচয়ের পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্যের সীমানা প্রসারিত হয়েছে। ‘আত্মজীবনী’ থেকে আমরা তাঁর জীবনের একটা বৃহত্তর অংশ জানতে পারি।

“সেকালের সকলের মতো আমি ও দশ এগারো বছর বয়সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাঁচখানা বই (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়ভাগ কথামালা, বোধোদয়) এবং প্যারীচরণ সরকারের ‘ফার্স্টবুকে’র কয়েক পাতা পড়ে বিদূষী হয়ে সংসারযাত্রার জৈবভোজ্যরূপে আরেক সংসারের ভোজের পাতায় পরিবেশিত হলাম। সেখানে, অপর পক্ষের আত্মপ্রতিষ্ঠার গুরু এ পক্ষের আত্মবিলোপের সাধনার গুরুর জগৎ আরম্ভ হয়।

কিন্তু সংসারকে দাবাখেলার ছকে ফেললেই তো হারজিতের মীমাংসা করা যায় না। হার হয়, জিতও হয় ভাগ্যদেবীর নিয়ন্ত্রণে। তখন পরাজিত ‘নারী’ নামের মানুষটা যায় কোথায় ? সেইটেই হল সমাজের নিষ্ঠুর অনুশাসনে মানুষের জীবনের অপচয়ের দিক।

এই অপচয়ের জগৎই হল নারী জগৎ.....। যার মন আছে, মননশক্তির বিকাশ নেই। হৃদয় আছে, হৃদয়ের সম্মান নেই। যেন সুর আছে সঙ্গীত নেই। ভাব আছে ভাষা নেই। এমনি জীবন, সে যদি মুনি (মনন যাঁর আছে তিনিই মুনি) হতে পেত — তার প্রেম-বিবাহ-মিলন, তার শোক-বিলাপ আত্ননাদ না হয়ে বাল্মীকির কাব্য হতো। কালিদাসের মেঘদূত হতো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সুর পেত।

এই জীবন ও বৈধব্য নিয়ে লেখাপড়া এ যে কি জিনিস, সেদিন মহাকালী পাঠশালায় বিদূষী আমি বা আমরা দেখেছিলাম। আজও তার পঙ্গুতা বুঝতে পারি দেখতে পাচ্ছি।” ৫১

উপরের এই কথাগুলো এক অন্তঃপুরচারিণীর। তিনি আর কেউ নন, নারীবাদী লেখিকা ‘জ্যোতির্ময়ী দেবী’। ১৮৯৪ সালে জ্যোতির্ময়ী দেবীর জন্ম হয় রাজস্থানের জয়পুর শহরে। পিতামহ সংসারচন্দ্র সেন ছিলেন জয়পুর রাজার রাজকর্মচারী। পিতা অবিনাশচন্দ্র সেনও ছিলেন জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান। তার শৈশব অতিবাহিত হয় জয়পুরেই।

হুগলী জেলার গুণ্টিপাড়ায় কিরণচন্দ্র সেনের সহিত তাঁর বিবাহ হয় ১৯০৪ সালে, মাত্র ১০ বৎসর বয়সে। বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের হয়নি। মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে ছয়টি পুত্রকন্যা নিয়ে তিনি ফিরে আসেন পিত্রালয়ে। জীবনে এল বৈধব্য। গুরু হল জীবন সংগ্রাম।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর আত্মজীবনী শুধু তাঁর জীবনকথা নয়। সেই সময়ের সমাজে সীমাবদ্ধ অন্তঃপুরে মেয়েদের শিক্ষা ছিল যৌথ পরিবার, সর্বোপরি জাতিরক্ষা, রাজঅন্তঃপুরে ছিল রাজার শাসন, রাজপুতানার মেয়েদের নিপীড়নের পাশাপাশি ছিল বাঙালি মেয়েদেরও সমান দুরবস্থা। সমাজের এই নিষ্ঠুর অনুশাসন সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে দেন লেখিকা।

বিয়ের আগে যতটুকু পড়াশুনার দরকার ততটুকু লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন। বিয়ের পরেও লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজকর্ম সেরে স্বামীর কাছে ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ পড়তে শিখেছিলেন। আর বৈধব্যের পর পিত্রালয়ে ফিরে এসে পড়াশুনাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। বাবার এক কাকার কাছে শিশুপাঠ্য ইংরেজি বই, উর্দু ‘কিতাব’, সংস্কৃত ধাতুরূপ-শব্দরূপ পড়তেন। ঠাকুরদা ছিল জন স্টুয়ার্ট মিলের ‘সাবজেকশন অব উওম্যান’ বইখানি পড়াকালীন একটা আইন নিয়ে ঠাকুরদার সাথে জ্যোতির্ময়ীর আলোচনা চলে। শান্তিনিকেতন থেকে আগত নারায়ণ কেশব দেবল দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পাঁচ খন্ড ‘কাব্যগ্রন্থ’। সেই সঙ্গে পড়তেন প্রিয়ম্বদা দেবীর ছোট ছোট কবিতা। মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় প্রমুখ কবিদের কবিতাও পড়তেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর শাশুড়িমাতা নিজে শিক্ষিকা ছিলেন। হাতের লেখা ছিল খুব সুন্দর। তিনি ভাল সেতার বাজাতে পারতেন। বাড়ীর পরিবেশ ছিল স্বদেশী। বাড়িতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আসত তাই শৃঙ্গরবাড়িতে মনখারাপ-করা দিনগুলোতে পড়াশুনা করে তাঁর সময় কাটত ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ‘ব্যাধি ও প্রতিকার’, ‘গোরা’, ‘সদুপায়’, ‘সমূহ’ ইত্যাদি লেখাগুলো পড়েন। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কবিতা ‘আয়, আজি আয় মরিবি কে’, ‘হবে পরীক্ষা তোমার দীক্ষা অগ্নিমন্ত্রে’, সাথে পরিচিত হলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন খবরাখবর পড়ে অবাক হতেন। স্বদেশি আমলে ‘যুগান্তর’, ‘বন্দেমাতরম’, ‘প্রবাসী’ এই সব পত্রিকা পড়ে অরবিন্দ, রবীন্দ্র, উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ ও বালক ক্ষুদিরাম সম্বন্ধে ও বিভিন্ন স্বদেশি খবরাখবর জানতে পারতেন। প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা বের হ’ল ঋষি অরবিন্দের উদ্দেশ্যে।

১৪/১৫ বছর বয়সে এই সব পত্রিকায় যা বেরোত সব পড়তেন। লেখিকার নিজের কথায় “বাপের বাড়ির ভাবনা বাদ দিয়েছি।”

“কবিতা পড়া, আবৃত্তি শোনা, কোনো ইংরেজি বইয়ের গল্প শোনা, অনুবাদ - কবিতা শোনা এ জিনিসটা বাপের বাড়িতে একটা ঠিক নাগালের মাঝে পাইনি। ছোট ছিলাম তো।”

৫২

“এখানে এসে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথের ‘মানসী’, একটা পদাবলী-সংগ্রহ আর কয়েকটা তখনকার গ্রন্থাবলী রামমোহন রায়, রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্ত, ভারতচন্দ্র, দাশু রায়, বিদ্যাসাগর। ‘নবনারী’, ‘রাসেলাস’, ‘চাচার দরবেশ’, ‘হাতেমতাই’, ‘বেতাল পঞ্চবিংশতি’ একেবারে পাঁচফোরণ যেন। কয়েকখানাই মাত্র, কিন্তু অপূর্ব সমাবেশ। এবং প্রথম এখানেই শুনলাম রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। তখন রবীন্দ্রকাব্যের কিছুই বুঝি না।” ৫৩

প্রথম মেয়ে হলে তার মুখ দেখার টাকা দিয়ে কিছু বই কিনলেন। ‘বন্দেমাতরম’, ‘বন্দনা’ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘ভুতুড়ে কাণ্ড’ প্ল্যানচেট আর মিডিয়মের মারফৎ ‘অশরীরী কথা’।

রবীন্দ্রনাথের ‘হাস্যকৌতুক’, ‘ব্যঙ্গকৌতুক’ ইত্যাদি।

বৈধব্যের পরে পিতৃগৃহে ফিরে এসে সংসারের অনেক ঝামেলা সামলে বই ও খাতাপত্র হাতে লেখার চেষ্টা করতেন। পিতৃগৃহে ছিল সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন সময়ে কোন না কোন সাংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তি বাড়ীতে আসতেন। তাঁদের সঙ্গ পেতেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। ঠাকুরদার ভ্রমণসঙ্গী অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল সঞ্জীবন গাঙ্গুলী। তার মেয়ে মাধুরী জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গী ছিলেন। মাধুরীর স্বামী জয়পুর মহারাজা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাদের বাড়ীতে বাংলা পড়াশোনা ও লেখার আবহাওয়া ছিল। জয়পুর রাজ্যের এক পদস্থ কর্মচারী সুবোধচন্দ্র মজুমদার। ইনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর পিসেমশাই হন সম্পর্কে। তিনি লেখকও ছিলেন। মাঝে মাঝে গল্প লিখে মাসিক কাগজে পাঠাবার আগে তাদের পড়ে শোনাতেন। পরে যখন জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখতে আরম্ভ করেন তখন এই পিসেমশাই তাঁর লেখার ক্রটি দেখিয়ে দিতেন। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘উত্তরাধিকার প্রসঙ্গ’ প্রবন্ধটি বের হবার পর সুবোধচন্দ্র মজুমদার জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বলেন - “তুমি নিজের পক্ষই সমর্থন করলে ঠিক মতো। অপর পক্ষের কথা বলাতে তোমার লেখার জোর কমে গেছে।” ৫৪

এরপর জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বাবার নির্দেশে কলকাতায় চলে আসতে হয়। কলকাতার বাড়ীও ছিল একান্তবর্তী পরিবার। সেখানে ছিলেন ছোট কাকা, কাকীমা ও পিসিমা। কাকীমা ভাল গান গাইতেন। এই বাড়ীতে পিসতুতো ভাই ও কাকার ছেলেরা সবাই মিলে চালাত গান ও সাহিত্যিক আড্ডা। বিদেশী সাহিত্যের পড়া ও আলোচনাও চলত। ‘ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান’, ডস্টয়ভস্কির ‘ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট’ এবং টলস্টয় এর লেখা নিয়েও আলোচনা চলত। এখানে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা শুরু করেন। কাকাদের বন্ধু কান্তিচন্দ্র ঘোষ একদিন জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার খাতাখানা দেখতে পেলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রথমে একটি কবিতা ও তার পরের মাসে “নারীর কথা” নাম দিয়ে প্রবন্ধটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশ করতে দিলেন। এতে বাড়ীর সবাই খুব খুশী হলেন। নিজের ছোটকাকা, বাবার খুড়তুতো ভাইয়েরা, নিজের ভাইয়েরা সবাই বেশ খুশী। লেখিকার নিজের ভাষায় - “বোধ হয় মনে একটু সান্ত্বনা ও পেয়েছিলেন। নিঃসঙ্গ আত্মমন জন্মছাড়া জীবন বাড়ির মেয়েটির জন্য একটা খেলাঘর গড়ে ওঠার সহায়তা তারাই করেছিলেন তো।” ৫৫

এই কান্তিচন্দ্র ঘোষ ইতিপূর্বে ‘ওমর খৈয়াম’ অনুবাদ করেছেন। লেখিকা জয়পুরে থাকতে সবুজ পত্র পত্রিকায় প্রমথ চৌধুরীর লেখা সমালোচনা পড়ে অনামিকা দেবী নাম ঠিকানা দিয়ে একখানি ‘ওমর খৈয়াম’ আনিয়েছিলেন। তখনকার দিনে নিজের প্রকৃত নাম ঠিকানা দিয়ে যে একখানা বই আনবেন তাতেও মেয়েদের সংকোচ ছিল। সবুজপত্রের কর্মীমহল জয়পুরের অনামিকা দেবীকে এই নিয়ে আগ্রহ জনান। এই কান্তিবাবুর সহায়তায় জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা কবিতা, প্রবন্ধ

‘ভারতবর্ষ’, ‘ভারতী’, ‘বঙ্গবাণী’, ‘মোসলেম ভারত’ প্রভৃতি পত্রিকায় বেরিয়েছিল।

‘নারীর কথা’ প্রবন্ধটি একটু উদ্ভূত ছিল। কয়েকজন এই লেখা নিয়ে সমালোচনাও করলেন। ‘পতিদেবতা’ ও পাঁজির বিধিনিষেধের তালিকায় ‘স্ত্রী-তৈল-মৎস্য-মাংস-সন্তোষ নিষেধ’ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় তখনকার পুরুষসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কাব্যে কঠোর প্রতিবাদ করলেন। বললেন, “এ ছদ্মনামে পুরুষের রচনা। মেয়েরা এরকম লিখতে পারেন না”। ৫৬

আরো দু’একজন প্রতিবাদ করলেন, লেখিকা তার জবাবও দিয়েছিলেন।

১৩২৮ সালের কথা বলতে গিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেছেন, “বাইরে মেলামেশা তো দূরের কথা, ঘরের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলাতেও ছিল বিধিনিষেধ।” ৫৭

তাই যার প্রচেষ্টায় পত্রিকায় লেখা বের হল তাঁকে চিঠি লিখে জানতে চাইলেন লেখাটা কেমন লেগেছে। চিঠির জবাবের সঙ্গে কিছু বইও পেয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। দীর্ঘ আট বছর চিঠির মাধ্যমে আলাপ ও চেনা জানা হয়েছে। কান্তিবাবুর সহৃদয় স্নেহকৌতুক মেশানো আলোচনা ও উৎসাহ লেখিকাকে লিখতে পড়তে ভরসা দিয়েছে। সেই ভরসাই লেখার পথের পাথেয় হয়েছে। এই বন্ধুত্ব তাঁর কাছে বিশেষ সম্পদ এবং নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ পথের পাথেয়। এই স্বর্গীয় বন্ধুত্বকে তিনি তুলনা করেছেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বন্ধুত্বকে। বিবেকানন্দের সঙ্গে সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার।

“একটি অচেনা অদেখা সামান্য বিধবা অন্তঃপুরিকাকে করুণস্নেহে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে বই যুগিয়ে, লেখা সংশোধন করে, প্রকাশ করে তিনি আমায় সাহায্য করেছিলেন।” ৫৮

তিনি প্রচুর গান, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভুবনমোহিনী পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেয়। ১৯৮৮ সালে ৯৪ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি অমৃতলোকে চলে গেলেও বাংলা সাহিত্যকে যেভাবে পরিপূর্ণতা দিয়ে গেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ঔপন্যাসিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তিনি উপন্যাস রচনায় বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। যৌথ পরিবারের ভাঙন এই বিষয় নিয়ে ‘বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ’ উপন্যাসটি লেখা। ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসের বিষয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাঁর ‘ছাপাপথ’ উপন্যাসটির নায়িকা সুপ্রিয়া, নায়ক অজিত। উভয়ের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু সুপ্রিয়ার আকস্মিক পিতৃবিয়োগ ঘটে। এর ফলে তারা যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে পড়ে তার ফলস্বরূপ উভয়ের মধ্যে গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও বিয়েটি ভেঙে যায়। অজিতের পিতা অন্য পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর অজিতের অনুশোচনা জাগে। অজিত তার বন্ধু নিশীথকে সুপ্রিয়াকে বিবাহ করবার জন্য অনুরোধ জানায়। এতে সুপ্রিয়া সম্মত হয় নি। সুপ্রিয়া যখন কন্যা

গুরুকুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নেয় সে সময় এক ছুটিতে আজমীরে দাদার বাড়ীতে এলে, বিভাসের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। ধীরে ধীরে উভয়ের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার ঘটে এবং তাদের বিবাহের মধ্যে দিয়েই এর পরিণতি ঘটে। জ্যোতির্ময়ী দেবী এই দু'জনের মিলন ঘটিয়ে উপন্যাসটির সমাপ্তি টেনেছেন। এই উপন্যাসে তিনি অজিত-সুপ্রিয়া-বিভাস এই প্রধান তিনটি চরিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটি সম্পর্কে একটি মূল্যবান মন্তব্য করেছেন,

“ছায়াপথে’র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নিসর্গ চিত্রগুলি রত্ন কণিকার মত বিকমিক করিতেছে, সেগুলি তুলির দু’এক টানে জাপানী চিত্রকরের কারুকার্যসৃষ্টির মত অনবদ্য।” ৫৯

‘মনের অগোচরে’ উপন্যাসটি ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। এর অধ্যায়গুলো উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর নামানুসারে বিন্যস্ত হয়েছে। দৈনিক ‘হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড’ পত্রিকা এই উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছে — এটি মূলত পাঁচটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘হরিজন উন্নয়ন কথা’ উপন্যাসটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই উপন্যাসে লেখিকার প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় মেলে। এই উপন্যাসটির চরিত্র নৈপুণ্য, বর্ণনাভঙ্গি ও সাবলীল ভাষা ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পগুলিতে প্রতিবাদী ভাবনার পরিচয় মেলে। রাজপুতানার মেয়েদের নিপীড়নের ছবি মেলে ‘বেটি কা বাপ’ ছোটগল্পে। এই গল্পে আমরা দেখি ঠাকুমা একটি শিশুকন্যাকে আফিং খাইয়ে হত্যা করে। এই ঘটনাটি শিশুকন্যাটির মা বড় ছেলের কাছ থেকে জানতে পারে। পরে অপর একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হলে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে পদ্মিনী নাম রাখে তার জ্যাঠামশাই।

“লালজী সাহেব’ গল্পে আমরা দেখতে পাই সামন্ত প্রভুদের ঔরসে রক্ষিতাদের সন্তানরা অবৈধ সন্তান হিসেবে পরিচিত হত। তারা না পেত ভালো কলেজে লেখাপড়ার সুযোগ না পেত সামাজিক সম্মান। পরিশেষে বেদনার্ত হৃদয়ে সেই সন্তানটি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিত এই বিষয় নিয়েই গল্পটি লিখিত।

‘পিঁজঁরাপোল’ গল্পটি পতিতাদের জীবন নিয়ে লেখা। তাদের জীবনের যন্ত্রণাকে জ্যোতির্ময়ী দেবী অত্যন্ত বাস্তব সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন।

‘মর্ত্যের অঙ্গুরা’ গল্পে দেখা যায় নিষিদ্ধ পল্লীতে চাঁপা দাসীর মৃত্যু হয়েছে। সে একসময়ে ছিল পতিতা। যে পুরুষরা তাকে যৌন লালসা চরিতার্থ করত, তারা কিন্তু তার মৃত্যুর পর অস্পৃশ্য ভাবে মৃতদেহ সৎকারের কাজে এগিয়ে আসেনি।

তাঁর ‘রাজঘোটক’ গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি পাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদর লাভ করে। ‘তিনজন’, ‘লেডিস ক্লাব’, ‘চারধাম’, ‘গঙ্গা ফড়িং’, ‘জীধন’, ‘মণি-কণিকা’, ‘মা’, ‘অমর’, ‘তেপান্তরের মাঠ’, ‘দর ও দস্তুর’, ‘সন্ন্যাসী’, ‘ময়ূর সিংহাসন’, ‘আগাছা’, ‘জননী’, ‘বিশুদ্ধ প্রেম’

প্রভৃতি গল্পে সহজ সত্য, করুণ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। সহজ-সরল ভাষা গল্পগুলিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে।

‘আরাবল্লীর আড়ালে’ গল্পগ্রন্থের ‘সুমেরু রায়’, ‘পরাগে’, ‘মাজীসাহেব’, ‘সুশন দর্জী’ গল্পগুলিতে রাজস্থানের রাজ অন্তঃপুরের বিচিত্র কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়া ‘বাইজী লাল’, ‘রাজা-রানী ও কেশব’, ‘বরযাত্রা’, ‘ফণীমনসার বন’, ‘পুণ্য পরিক্রমা’, ‘রামচন্দ্রজীর শ্রাদ্ধ’ প্রভৃতি গল্প কিশোর-কিশোরীদের কাছে বেশ আকর্ষণীয়। আরাবল্লীর আড়ালে অনুষ্ঠিত রাজস্থানী হারেমের কাহিনী অবলম্বনে লেখা গল্পগুলি মুক্তালাবণ্যের মত কিশোরদের মনোমুগ্ধকারী।

‘মা’ গল্পটিতে মাতৃহারা পুত্রের গভীর ব্যাকুলতা চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছে।

‘দর ও দস্তুর’ ছোটগল্পে পিতৃ হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে। কিন্তু মেয়েটিই মূল্যবোধের শিকার হয়েছে।

‘জবালা’ গল্পটিতে ননী দত্ত বিবেকবান পিতা। তার কন্যার প্রতি মমত্ববোধের অভাব নেই। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গুলি নির্দেশে ননী দত্তের কন্যার জীবনে নেমে আসে শোকাবহ ঘটনা।

‘সেই ছেলেটা’ ছোটগল্পে ছেলেটা হল রাজ। তার মা বিধবা। তবু পাঞ্জাব যখন বিভক্ত হয় তখন রাজের বিধবা মা হল ধর্মিতা। দেশের লক্ষ লক্ষ ধর্মিতা নারীর প্রতিনিধি সে। হিন্দু সমাজে বিধবা নারীর এই পদস্থলনের চিত্র জ্যোতির্ময়ী দেবী অত্যন্ত বাস্তবভাবে তুলে ধরেছেন।

হিন্দু সমাজের উদ্ভট ঘটনাকেন্দ্রিক ছোটগল্প হল ‘পুত্রোষ্টি’। এই গল্পে এক ব্রাহ্মণের পুত্র নেই বলে নিজেই তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে। ফলে সমাজে বেঁচে থেকেও মৃতের সমতুল্য জীবনযাপন করে সে। কৌতুকের মধ্যদিয়ে আধুনিক জীবনযন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।

শুধুমাত্র ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই জ্যোতির্ময়ী দেবী খ্যাতি লাভ করেন নি। মহিলা কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান উর্দ্ধে। তাঁর ‘চক্রফল’ ও ‘নির্মাল্য’ কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে রোমান্টিক আমেজ লক্ষ করা যায়। ‘চক্রফল’ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় শ্রী উমানাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন —

“কবিতাগুলি পড়ে মনে হয় কবি যশ প্রার্থিনী হয়ে এগুলি রচনা করেন নি। এ লেখা তো মনের বাহন না। লিখে মুক্তি নেই।” ৬০

এই কাব্যগ্রন্থের ‘স্ফীংক্স’ কবিতাটিতে রয়েছে ইতিহাস চেতনা। বর্বর, রক্তপিপাসু, অত্যাচারী, রাজাদের উদ্দেশে তিনি লিখেছেন —

“তোমরা বর্বর, বর্বর

কারণ তোমরা তো তাদেরই অনুক্রম। যদি অপমান করো।

তাই দয়ালু ঈশ্বর আমাদের করেছেন মিথ্যাভাষিণী ও প্রবঞ্চক

তথা মিশরের ঐ স্ফীংক্সটার মতো

পৃথিবীর ইতিহাসে নীরব দর্শক।” ৬১

জ্যোতির্ময়ী দেবী পুরাণের নবমূল্যায়ন করেছেন একাধিক কবিতায়। ‘অহল্যা’, ‘শবরী’ ও গান্ধারীকে তিনি আধুনিক যুগচেতনার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। ‘গান্ধারী’ কবিতায় আমরা পাই —

“ফিরেনি সন্তান ঘরে অকৃতার্থ রণক্ষেত্র হতে

জয়ধ্বনি পায় নাই পথে হস্তিনাতে

বন্ধুর ধর্মের মহাপথে মিশিয়ে জীবন মৃত্যুর সত্য

শোক মৌন। শান্ত মুখ একাকিনী দাঁড়ায়ে গান্ধারী।।” ৬২

গান্ধারী জীবনের যন্ত্রণাকে লেখিকা নূতনভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অনন্যতা এখানেই।

অসাধারণ প্রতিভাময়ী রাধারাণী দেবী বাংলা সাহিত্যের এক সুপরিচিত নাম। গুণগত উৎকর্ষের দিক থেকে মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য। তিনি যে কাব্য সম্ভার, গল্পের ডালি ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। সংখ্যার দিক থেকে হয়তো খুববেশি না হলেও তিনি যতটুকু লিখেছেন তা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সন্দেহ নেই। বিস্ময়ের অভিনবত্বে, প্রকাশভঙ্গির চারুত্বে, চিন্তার গভীরতায়, সমাজচিত্রের উজ্জ্বল প্রতিফলনে বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র প্রত্যেকেই তাঁর রচনার স্বকীয়তা নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষ প্রশংসা করেছেন। বস্তুত তাঁর ছিল বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের উপর অসাধারণ দখল। তাঁর এই অসাধারণত্বের জন্য পাঠকমহল মুগ্ধ। প্রথাগত শিক্ষা হয়তো তিনি লাভ করতে পারেননি কিন্তু তাঁর দূরদর্শিতা ও উন্নত মৌলিক ভাবনাচিন্তার জন্য, তাঁর কাছ থেকে আমরা নতুন কিছু শিক্ষা লাভ করি। তিনি শুধুমাত্র নিজেকে সাহিত্য রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। দর্শন, রাজনীতি, গণমাধ্যম সবকিছুর মধ্যেই ছিল তাঁর অবাধ প্রবেশ। সর্বত্রই তাঁর এই প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যে যে সব বিদূষী লেখিকাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে রাধারাণী দত্ত যিনি অপরাজিতা দেবী নামেও সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁর গৌরব আজও অম্লান।

রাধারাণী দেবীর জন্মভূমি ঐতিহ্যবাহী শহর কোচবিহারে। ১৩১১ সালের ১৪ই

অগ্রহায়ণ তাঁর জন্ম তারিখ। পরাধীন ভারতবর্ষে কোচবিহার রাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলংকৃত করেছিলেন তাঁর পিতা আশুতোষ ঘোষ। পিতামহ পঞ্চানন ঘোষ ছিলেন কলকাতার বাদুড় বাগানের এক বর্ষিষ্ণু বনেদী পরিবারের লোক। তাঁর জন্ম থেকে কৈশোরকাল পর্যন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধির লীলানিকেতন উদার উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কুচবিহারের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তাঁর ঘটেছিল আত্মিক পরিচয়। এই উন্মুক্ত পরিবেশে থেকেই রাধারাণী দেবীর বিদ্যারম্ভ হয় এবং সাহিত্য রচনার বাতাবরণ তৈরি হয়। তাঁর পিতা আশুতোষ ঘোষও ছিলেন সাহিত্যপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর একান্ত প্রিয় কবি। রাধারাণী দেবী ব্যক্তি জীবনে তাঁর পিতার অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

মাত্র তেরো বছর বয়সে রাধারাণী সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং উচ্চশিক্ষিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর স্বামী মধ্যভারতের একটি রাজ্যে দায়িত্বশীল পদে কর্মরত ছিলেন। মাত্র আটদিনের ছুটি নিয়ে স্ত্রী রাধারাণী দেবীকে বিয়ের পর তেরো বছরের বধূকে রেখে তাঁর চাকরিতে যোগদানের জন্য চলে যান। সেখানে এশিয়াটিক ফ্লু রোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিকভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু ঘটে। মাত্র তেরো বছর বয়সেই শুরু হয় রাধারাণীর বৈধব্য জীবন। তাঁর উন্নতমনা ও শিক্ষিত শৃঙ্গুর পরিবারের প্রিয়জনেরা তাকে বিষকন্যা বলে কোনরূপ আঘাত না দিয়ে স্নেহস্পর্শে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর মামা-শৃঙ্গুর সুরেন্দ্রনাথ মল্লিকের স্নেহধন্যা হয়ে দিন কাটিয়েছেন, যিনি রাধারাণীকে প্রতিনিয়ত সাহিত্যচর্চায় অনুপ্রাণিত করেছেন।

রাধারাণীর জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশের সুপরিচিত সাহিত্যিক, বসুধারা, মেঘদূত পত্রিকা ও ওমর খৈয়াম প্রমুখ প্রসিদ্ধ কবির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই কবি হলেন শ্রীনরেন্দ্র দেব। ইনি রাধারাণীর কাব্য ‘দীপালি’ প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছিলেন। ধীরে ধীরে উভয়ের ভিতর জাগ্রত হয় প্রেমানুরাগ এবং তা পরিণতি লাভ করে বিবাহে। ১৯৩১ খ্রীঃ ৩১শে মে নরেন্দ্রনাথ দেবের সঙ্গে রাধারাণী দত্তের পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই নতুন দম্পতিদের জানিয়েছিলেন প্রাণভরে আশীর্বাদ। ১৯৩১ খ্রীঃ ১লা জুন ‘The Bengalee’ পত্রিকা তাঁদের বিবাহ সংবাদ বিষয়ে যে বিবরণ দিয়েছে তা উল্লেখ করা যেতে পারে :-

“POET MARRIES POETESS

DEV-DUTTA WEDDING AT LILLOAH

Calcutta, May 31st, 1931, There was quite a distinguished gathering at 'Devalaya', the Garden house at Lilloah of Mr. Narendra Dev this evening to celebrate the marriage between srimati Radharani Dutta and Mr. Dev. The function was unique from more than one point of view. Both the bride and the bridegroom are well. Known

to literary Bengal as poets of a high order and the occasion is rare when a poet marries a poet. Further importance attaches to the function in that Srimati Radharani is a girl widow and it is rare when a girl of her class and status remarries.” ৬৩

রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিং থেকে রাধারাণীকে একাধিক পত্র দিয়েছেন। তাদের এই বিয়েতে বহু জ্ঞানীশ্রী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুন্দর-মধুর ও সুখকর। ‘ভালোবাসা’ ছিল তাঁদের বাসগৃহের নাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কন্যা সন্তানটিকে আশীর্বাদ স্বরূপ নামকরণ করেছেন নবনীতা। স্নেহন্যা কন্যা নবনীতা দেবসেন তাঁর মা রাধারাণী দেবীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন --

“আমার মা রাধারাণী দেবীকে আমি দেখেছি সাম্রাজ্যীর সিংহাসনে। যশস্বী প্রিয়মাণ স্বামী, ও অনুগত সন্তান সমেত সুচারু একটি সংসার জীবনে সম্পূর্ণ আপন মননশীলতার গুণে সুধী মন্ডলে সম্মানিত, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি ব্যক্তিত্ব, যাঁর প্রতিটি কথার মূল্য আছে, যাঁর প্রতিটি পদ চয়নে আত্মবিশ্বাস ঝলসে ওঠে।” ৬৪

বস্তুত তাঁর মধ্যে ছিল ঈশ্বরদত্ত চারিত্র-প্রতিভা। যে প্রতিভাগুণে তিনি ঘরে বসে বহির্বিশ্বের জীবনধারাকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয়নি।

ব্যক্তিজীবনে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছিলেন তাঁর আদর্শ। তাঁদের জীবন দর্শনকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। গুরুর আসনে বসিয়েছেন এই দুই সাহিত্যিক দিকপালকে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ প্রতিষ্ঠ অধ্যাপিকা যশোধারা বাগচী লিখেছেন —

“বাংলা সাহিত্যে মানবী বিদ্যাচর্চার প্রেক্ষাপটে রাধারাণী দেবীর লেখার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধ ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-গুরু, কিন্তু (কিংবা হয়তো সেজন্যই) তাঁর লেখার সিংহভাগ জুড়ে আছে নারী। নারীর সামাজিক মূল্যায়ন এবং তার বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নারী লেখনীর সাহিত্যিক মূল্যায়ন, এই দুটি তাঁর লেখাতে ফিরে এসেছে বারে বারে।” ৬৫

যে সব মাসিক পত্রিকায় রাধারাণী দেবীর কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল ‘ভারতবর্ষ’, ‘বসুমতী’, ‘মানসী’ ও ‘মর্ম্মবাণী’, ‘কল্লোল’, সাহিত্য তীর্থ’, ‘উত্তরা’। এই পত্রিকাগুলিতে তিনি রাধারাণী দত্ত নামে লিখেছিলেন। ১৩৩৬ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘লীলা-কমল’ প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত কবি সাহিত্যিক ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। তাঁর বিবাহের পর আরও দু-দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। ‘বনবিহগী’ ও ‘সীথি-মোর’ এই কাব্যগ্রন্থ দুয়ের মধ্যে ‘সীথি-মোর’ মূলত সনেটগুচ্ছ। এই সনেটগুচ্ছে

রাধারাণী দেবীর চৌত্রিশটি মিলন বিষয়ক কবিতা স্থান পেয়েছে। দশটি কবিতা নিয়ে তাঁর ‘আঙিনার ফুল’ কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর ‘পুরবাসিনী’ কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে আঠারোটি কবিতা। ‘বিচিত্র রূপিনী’ কাব্যগ্রন্থে যে তেরোটি কবিতা স্থান পেয়েছে, এই কবিতাগুলি তাঁর শেষ কবিতা সংকলন বলা যেতে পারে। তিনি ‘আঙিনার ফুল’, ‘পুরবাসিনী’ ও ‘বিচিত্র-রূপিনী’ কাব্যগ্রন্থত্রয় অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এছাড়া হিন্দু বিবাহ অনুষ্ঠানের যে বৈদিক মন্ত্র গুলি রয়েছে সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করে ‘মিলনের মন্ত্রমালা’ নাম দিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। রাধারাণীদেবী এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন ‘বেদসংহিতা’ ও ‘মনুসংহিতা’ থেকে। বিবাহ করতে ইচ্ছুক হিন্দু যুবক-যুবতীরা এ গ্রন্থ পাঠ করে বিবাহের প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারেন। সহজ-সরল ও প্রাণোজ্জল ভাষায় তিনি যে অনুবাদ কর্মটি করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

তিনি ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক লেখক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন। স্কটল্যান্ডের অ্যাডিনবরা শহরে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে তাঁর স্বামী নরেন্দ্র দেব, কন্যা নবনীতা দেবও উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে হো-চি-মিন, আগাথা-ক্রিস্টি, মিখাইল শলোকভ ও ইলিয়াএরেন বুর্গের মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের সঙ্গে।

রাধারাণী দেবীর জীবনের ভুবনমোহিনী সুবর্ণপদক প্রাপ্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য স্বীকৃতি দান করে সম্মানিত করেন। তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে রোমান্টিক ভাবনা। একদিকে বিরহের সুর অন্যদিকে সুদূরের অভিসার। সৌন্দর্যচেতনা, প্রেমানুভব প্রভৃতি বিষয় তাঁর কার্যে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। নারীর প্রেমের পরশে পুরুষের পাষাণ হৃদয় কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় তারই এক সার্থক নিদর্শন হিসেবে কবিতার কয়েকটি ছত্র প্রদত্ত হল :-

“পুরুষ-পুরুষ মর্ম্মে সিঁধিয়া অমৃত করি

রচে মর্ন্তে অমর্ন্তের লীলা!

আপনারে রিক্ত করি’ নিঃশেষে করিয়া দান

কেন ত’র উদ্বেলিত সুখ ?

সংযমের সেবায় পুণ্যে ক্ষমায় সুন্দর প্রাণ

কি লাগিয়া বিমুগ্ধ উৎসুক।” ৬৬

তাঁর কাব্যে একদিকে রয়েছে প্রকৃতি প্রেম, অন্যদিকে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে মানব জীবনের সঙ্গে একই সূত্রে গাথা। তিনি বিরহের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন মিলনের বার্তা।

“আমার এ রিক্ত প্রাণে পরম পূর্ণতা বন্ধু তাই

আমি সর্ব সুখী,

তুমি বাসিয়াছ ভালো, আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই

নহি নহি দুখী !

তুমি বাসিয়াছ ভালো, তুমি ভালবাসিয়াছ বঁধু,

যত স্মরি তত প্রাণে উছলি উথলি ওঠে মধু ;

বিরহ বেদনা তাই গন্ধ ধূপে পরিণত শুধু

উর্দ্ধ অভিমুখী।” ৬৭

ছন্দের মাধুর্যে, শব্দের ঝংকারে, ভাবের ঐশ্বর্যে। তাঁর এই কবিতাগুলি আমাদের পৌঁছে দেয় এক অনুভবের জগতে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ‘বঙ্গের মহিলা কবি’ - গ্রন্থে রাধারাণী দেবীর কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন,

“রাধারাণীর কাব্য সমালোচনা অল্প পরিসরে হয় না ; তাহার মধ্যে যে বৈচিত্র্য আছে, যে গভীর চিন্তা, ভাব, প্রণয়, সৌন্দর্য, দুঃখ-বেদনা ও হর্ষের কল-কল্লোল জাগিয়া আছে, তাহার আলোচনা করিতে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি যেমন আবশ্যিক, তেমনি তা আপন জীবন দেবতাকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান না করিলে তাহা হইতে পারেনা।” ৬৮

যোগেন্দ্রনাথ ‘বঙ্গের মহিলা কবি’ গ্রন্থে রাধারাণী দেবীর কাব্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন তা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য :

“বাংলা ১৩৩৭ সাল হইতে ১৩৪৪ সালের মধ্যে তাঁর চারখানি বই পরপর প্রকাশিত হইয়াছিল। ‘বুকের বীণা’ বইখানিতে তরুণী নারীর নবপরিণীত জীবনের নানাদিকের ঘটনাচিত্র এবং উপলক্ষিকে কবি অত্যন্ত সজীবভাবে ছন্দে চিত্রিত করিয়াছেন। ‘আঙিনার ফুল’ বইখানিতে নারীচরিত্রের ও নারী সমাজের নানাদিক অতি সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। ‘পুরবাসিনী’ কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের বাংলাদেশের নারীর বহুবিচিত্র মূর্তিকে অবিকল জীবন্তভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে। এখানে বাঙালী নারী বিভিন্ন সম্পর্কে, বিভিন্ন পরিচয়ে এবং বিভিন্ন বয়সে তাঁহাদের বিচিত্র উপলক্ষি এবং বিশেষতর রূপ লইয়া কব্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ‘পুরবাসিনী’র মধ্যে আমরা দেখি নারীর আদরিনী কন্যা-মূর্তি, স্নেহময়ী অগ্রজা-মূর্তি, আনন্দ-চঞ্চলা অনুজা-মূর্তি, পরিহাসনিপুণা বৌদিদি মূর্তি, স্নেহময়ী জননী-মূর্তি, সখী, প্রিয়া এমনকি মুখরা দাসী পর্যন্ত ‘পুরবাসিনী’ হইতে বাদ যায় নাই। অপরাজিতার শেষ পুস্তক ‘বিচিত্ররূপিনী’। এই কাব্যে নায়িকার আট প্রকার অবস্থা আধুনিক কালের নায়িকার জীবনে যেমনভাবে রূপায়িত হইয়াছে তাহা চমৎকার ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এছাড়া পূর্বরাগ, মিলন-বিরহ ইত্যাদি অবস্থা বৈষ্ণবকাব্যে বর্ণিত সমস্ত লক্ষণ সহ বর্তমান কালের প্রতিবেশে ও উপাদান অতি সুন্দরভাবে কাব্যে প্রতিফলিত করিয়াছেন।” ৬৯

রাধারাণী দেবী ছিলেন একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। তাঁর প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের

অমূল্য সম্পদ। ‘পুরুষ’ প্রবন্ধে পুরুষ চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ তিনি ব্যক্ত করেছেন। ‘সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক’ প্রবন্ধে সতীত্বের অর্থ ও স্বরূপ রাধারাণী যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা অতুলনীয়। ‘নারীর ভালোবাসা’ প্রবন্ধে নারীর ভালোবাসার একনিষ্ঠতা ও তার তাৎপর্য তিনি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে যা ব্যক্ত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। ‘নারী’ প্রবন্ধে রাধারাণী নারীর মধ্যে আনন্দ স্বরূপিনী অনন্ত প্রাণশক্তির উল্লেখ করেছেন। ‘বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কাছে কেন বর্ষা প্রিয়, দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধটিকে আসন্ন বর্ষা, নববর্ষা, ঘন-বর্ষা, ক্ষান্তবর্ষা এই চারটি ভাগে ভাগ করে, বর্ষার যে বৈচিত্র্য তুলে ধরেছেন তা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

‘অন্তঃপুরে রবীন্দ্রনাথ’ প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ ব্যক্ত করেছেন।

‘সাহিত্য বিচারে পুরুষ-নারী ভেদ’ প্রবন্ধে ভেদাভেদের উর্ধ্বে উদার মনোভাব নিয়ে উভয়ের দৃষ্টির সৌন্দর্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ করেছেন।

‘শরৎ সাহিত্যের মেরুদণ্ড’ প্রবন্ধে নারী চরিত্রের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। ‘শিব ও শক্তি’ প্রবন্ধে শক্তিরূপিনী দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

‘অতি-সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্য’ প্রবন্ধে সাম্প্রতিক কালের কাব্য বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

এছাড়া ‘লীলাকমল’ এর সমালোচনা লিখতে গিয়ে সাহিত্যিক লীলাময় রায় লিখেছেন

“বইখানির সমস্ত কবিতা গুলিই প্রেমের গভীর আগ্রহে জীবনচঞ্চল। কিন্তু যখন মনে হয় এমন চমৎকার নিখুঁত কবিতাগুলি কবির জীবনের বাস্তব উপলব্ধি বা সত্যকার হৃদয়ানুভূতি থেকে উদ্ভূত নয়, সবটাই কল্পনার সাহায্যে রচনা, তখন মন বিস্বাদ হয়ে পড়ে।” ৭০

কথামূল্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক পত্রে লিখেছেন :-

“রাধু, তোমার লীলাকমলের কবিতাগুলি এতই অন্তঃস্পর্শী, এত emotional যে পড়তে পড়তে বারে বারে ভুল হয়ে যায়, এ তোমার সত্যকার অন্তর থেকে বাস্তবিকই উৎসারিত হয়ে আসছে বুঝি বা ! কিন্তু আমি তো তোমাকে ভাল করে চিনি দিদি ! আর যাই হোক, এ তোমার জীবনের বাস্তব উপলব্ধি থেকে লেখা কবিতাগুলি অন্য যে কোনও কারুর কাছে জীবন্ত সত্য হয়ে উঠলেও, লেখিকার কাছে কিন্তু এরা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। নিছক কাল্পনিক বিষয়ে এমন গভীর সত্যকথার মতন করে কী করে লিখতে পারলে ভেবে অবাক হচ্ছি ! যে বেদনা তোমার অকৃত্রিম উপলব্ধির বস্তু নয় কল্পনার সাহায্যে যাকে আয়ত্ত করেছো, তাকে এমন করে প্রকাশ করার মধ্যে তোমার কলমের বাহাদুরী যতই থাক, আমি বলবো তোমার নিজের বাহাদুরী নেই ভাই।” ৭১

শরৎচন্দ্রই নয়, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, রাজশেখর বসু, অনুদাশঙ্কর রায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকেরা রাধারাণী দেবীর কাব্যপাঠ করে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির নেপথ্যে এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের বিশেষ অবদান আছে একথা নির্দিষ্ট বলা যায়।

রাধারাণী দেবী ছিলেন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার। তিনি তাঁর ছোটগল্পে নারীর জীবনচিত্র এঁকেছেন নিপুণভাবে। নারীদের বিড়ম্বিত জীবনের কথা তাঁর ছোটগল্পের কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। বিবাহিত বরের সঙ্গে নারীর বিবাহ, সৎমায়েদের স্নেহের চিত্র, অরক্ষণীয় মেয়েদের জীবনের করুণ কাহিনি, সতীনের ঘর করা, বিয়ে ঠিক হয়েও বিয়ে ভেঙে যাওয়ার ঘটনা সব কিছুই লেখিকা গ্রহণ করেছেন সমাজ জীবন থেকে। তাঁর কিছু ছোটগল্পের নিদর্শন তুলে ধরা যেতে পারে।

তাঁর ‘যমের অরুচি’ গল্পে আমরা দেখি একটি অরক্ষণীয় মেয়ের করুণ কাহিনি। সে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে ব্যর্থ হয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর পথকে বেছে নেয়।

“হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়” গল্পে একটি সুন্দরী মেয়ে রাণী। ক্ষুধার জ্বালায় ও অত্যাচারী স্বামীর কুৎসিত আচরণে যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় তখন সতীত্বের চেয়ে তার কাছে বড় হয়ে উঠল নিজেকে যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে টিকিয়ে রাখা।

‘গতানুগতিক’ গল্পের নায়িকা অবিবাহিত অবস্থায় থাকাকালে সঙ্গীত চর্চা করতো, বিয়ের পরে সংসারের কাজকর্মের চাপে সঙ্গীতচর্চা বন্ধ করে দেয়। স্বামী পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে সঙ্গীতচর্চা করতে দেখে তার প্রশংসা করে। অথচ এই মেয়েটিই বিয়ের পরে গানের রেওয়াজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। মেয়েদের এই গতানুগতিক জীবন রাধারাণী দেবী অত্যন্ত বাস্তবভাবে তুলে ধরেছেন।

‘দাবি-হারা’ গল্পে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, নারীসৌন্দর্য ও মাতৃত্ব কোন্টির মধ্যে নারীজীবনের সার্থকতা প্রকাশ পায়। মাতৃত্বই যে নারীজীবনের সার্থকতা একথা গল্পকার এই গল্পে উপস্থাপন করেছেন। খীমের অভিনবত্বে এই গল্পটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ’ গল্পটি গড়ে উঠেছে একটি উচ্চাশী, সম্ভাবনাময়ী মেধাবী মেয়ের জীবন কাহিনি অবলম্বনে। সে লেখা পড়ায় বিশেষ আগ্রহী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে বিয়ে করবে। কিন্তু পিতা-মাতার চাপে তাকে পড়া ছাড়তে হয় ও অল্প বয়সে বিয়েও করতে হয়। বিয়ের পর এসিয়াটিক ফ্লু রোগে তার স্বামীর অকালপ্রয়াণ ঘটে। তারপর বিন্দু নামে বৌটিকে নির্জলা একাদশী পালন করতে হয় -- পরতে দেওয়া হয় সাদা থান -- পিত্রালয়ে তাকে বৈধব্যের জন্য সংযমী জীবন কাটাতে হয়। কিন্তু তাকে শ্বশুরবাড়িতে যাবার পর কালোপাড় শাড়ি পড়িয়ে, স্বর্ণালঙ্কারে

ভূষিত করে সাহিত্য রচনার জন্য চেয়ার-টেবিল, খাতা-কলম দেওয়া হয়। বিন্দু অকালবৈধব্যের জন্য বিদ্রোহিণী হয়ে পড়ে। ব্যক্তি, সমাজ, ভগবান কিংবা নিয়তির বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে।

‘শূন্যমনা বাঙালি মেয়ে’ ছোটগল্পের নায়িকা বাল্য বিধবা। পিতৃগৃহে সে বৈধব্যবেশে না থেকে কুমারীর মতো সাজসজ্জা করেই থাকতো। একদিন তার অশুচিতার প্রশ্ন তুলে তাকে আঘাত করে কোন এক অতিথি। তখন থেকে সে বৈধব্যের রিক্ততা নিয়ে দিন অতিবাহিত করে। যদিও বিবাহ ও বৈধব্য তার কাছে ছিল সমান।

‘আলো-কোথায় ওরে আলো’ ছোটগল্পে দেখা যায় যৌনরোগে আক্রান্ত পিতার ঔরসে অন্ধ ছেলের জন্ম হয়। এরপর হারায় পরপর কয়েকটি মেয়ে। মায়ের মনেও জাগে অপরাধবোধ। পরে মা যায় অন্ধ হয়ে।

‘বিমাতা’ ছোটগল্পে মাধুরীকে মা বলে ডাকত তার ছোটভাই তপন। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে মাধুরী তার ছোটভাইকে আনতে পারে নি। তপনকে জানিয়ে দেওয়া হয় তার মা মৃত, মাধুরী তার মা নয়। এ সংবাদ শুনে তপন মানসিক কষ্ট পায়।

‘পাতানো মা’ ছোটগল্পে দেখা যায় নিতুর পাতানো মা অনুসূয়া। যেহেতু সে নিতুকে গর্ভে ধার করেনি এজন্য তার মাতৃত্বের দাবি করা বৃথা সমাজ সত্যের কাছে তার সত্য অন্তর মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হয়।

‘মাসী’ রাধারানী দেবীর বাৎসল্যরসসিক্ত ছোটগল্প। মাসীর মতো অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল যার সঙ্গে, যার জন্য করতে হয়েছিল অনেক ত্যাগ, এরকম এক ভালোবাসার গল্প হল মাসী।

‘মা’ গল্পে সন্তানের ভুলের জন্য পিতার কাছ থেকে মায়ের গঞ্জন শুনতে হয়েছে, তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে এখানে।

‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’ গল্পের নায়িকা আদর্শবতী নারী। বিয়ে ঠিক হয়েছে কিন্তু মেয়েটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তার বিয়ে ভেঙে যায়। তবুও মেয়েটি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবার আগে তার উদ্ভ্রান্ত প্রেমিককে ক্ষমা করে দিয়ে তার প্রেমের সার্থকতা খুঁজে পায়।

‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’ গল্পে দেখা যায়, নায়িকা সুধার সঙ্গে বিলেত ফেরৎ ছেলের বিয়ে ঠিক হয়েছে। কিন্তু পাত্রের জুরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে সুধা অন্য কোন প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, পূর্ব প্রেমিকের প্রতি গভীর বিশ্বাসের জন্য।

‘যে নদী মরু পথে হারালো ধারা’ ছোটগল্পে মালতি ভালোবেসেছিল একটি ছেলেকে। কিন্তু কোষ্ঠী মেলেনি বলে তাদের বিয়ে হয় নি। অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ের পরও মালতী ভুলতে

পারেনি তার পূর্ব প্রণয়ীকে। মৃত্যুকালে অচেতন অবস্থায় সে মনে মনে তার প্রেমিকাকে খুঁজেছে আর তার নাম ধরে ডেকেছে। সত্যিই সম্পর্কে গভীর সংস্কারের গল্প এটি।

‘নিশীথ রাতের বাদলধারা’ তরুণী আমিনার গল্প। সেই এই গল্পের নায়িকা। নায়ক মৃত্যুপথযাত্রী যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত মুসলমান যুবক। সে আমিনার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমিনার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। কিন্তু আমিনা তাকে ভালোবেসে হিন্দু মেয়ের মত টিপ পড়ে, বেলফুলের মালা গাঁথে স্বামীর জন্য। গল্পের নায়ক বুঝতে পারে আমিনার প্রেমের গভীরতা।

‘ভাইফোঁটা’ গল্পটি একটি সুখী বিবাহিতা মেয়ের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত। মেয়েটি তার সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে পিত্রালয়ে এসেছে ভাইফোঁটা দেবার জন্য। সাংসারিক ব্যস্ততার মধ্যেও ভাই-বোনের মধুর সম্পর্কটিকে রাখার জন্য তুলে ধরেছেন অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে।

রাধারাণী দেবীর ‘শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র’, ‘অতীতের এক টুকরো’, ‘পূজার স্মৃতি’ রচনাগুলিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়া তাঁর বাদ-প্রতিবাদ মূলক লেখাগুলিতে যুক্তির পারস্পর্যে, ভাষার বিন্যাসে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর ‘শরৎচন্দ্র স্মারক বক্তৃতামালা’ ‘শরৎচন্দ্র : মানুষ ও শিল্প’ নানা কারণে মূল্যবান সন্দেহ নেই।

তাঁর জীবনের মুখ্য ঘটনাপুঞ্জ আলোচনা করতে গিয়ে আরও দুয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। তাঁর স্নেহধন্যা কন্যা নবনীতার সঙ্গে অমর্ত্য সেনের বিয়ে হয়। অন্তরা ও নন্দনা নবনীতার কন্যা। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কন্যার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে রাধারাণী শোকে-দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কন্যার বিবাহ বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তাঁকে চলে যেতে হয়েছিল।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর মৃত্যুতে তিনি দ্বিতীয়বার বিধবা হন। স্বামীর শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন ‘ভালো-বাসা’ নামের বাড়িতে সেখানে বহু সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটেছিল। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই সেপ্টেম্বর ৮৬ বৎসর বয়সে এই বিদূষী লেখিকার তিরোধান ঘটে।

এই পর্যায়ের আর এক উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী হলেন সাবিত্রী রায়। সাবিত্রী রায় ছিলেন আধুনিক যুগের কথাশিল্পী। উপন্যাস এবং ছোটগল্প রচনায় তিনি আপন প্রতিভার পরিচয় রাখতে পেরেছেন। ১৯১৮ সালের ২৮শে এপ্রিল বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরের সন্নিকটে উয়ারী পল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নলিনীরঞ্জন ও মাতা সরযুবালা সেন ছিলেন একান্ত শিক্ষানুরাগী এবং স্বদেশপ্রেমিক। কন্যা সাবিত্রী রায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাবা ও মায়ের ভূমিকা কোন অংশে কম ছিলনা। সে সময় নিকটবর্তী কোন বালিকা বিদ্যালয় না থাকায় ছেলেদের স্কুলে নলিনীরঞ্জন সেন সাবিত্রী রায়কে ভর্তি করিয়ে দেন। পরে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে সাবিত্রী রায় ম্যাট্রিক পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতার বেথুন কলেজে পড়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ভাই শিবপ্রসাদ সেন ও দেবপ্রসাদ সেন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই সাবিত্রী রায় দেশাত্মবোধক বহু কবিতা লিখে স্বদেশ চেতনার পরিচয় দেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি বিপ্লববাদের পরিচায়ক ; যেগুলি পাঠক মনে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল।

তাঁর বড়ভাই দেবপ্রসাদ সেন স্বদেশী আন্দোলন করতে গিয়ে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীর দৃষ্টিতে পড়েন। একদিন গভীর রাতে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে এসে তাঁদের বাড়ি তল্লাস করে। কিন্তু কোন আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়নি। বিপ্লবী দেবপ্রসাদ সেনকে পুলিশ ধরতে পারেনি। কিন্তু টেবিলের ওপরে রাখা সাবিত্রী রায়ের স্বদেশী যুগের পটভূমিকায় লেখা কবিতার খাতাটি নিয়ে চলে যায়। সেই খাতাটি আর কোনদিন ফিরে পাওয়া যায়নি, চিরকালের মত থানায় গচ্ছিত থাকে। পরাধীন ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সরকার স্বদেশী উদ্দীপনায়ুক্ত এই খাতাটি বাজেয়াপ্ত করলেও পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে সাবিত্রী রায় নতুন করে কবিতা লেখা শুরু করেন।

লেখিকা সাবিত্রী রায়ের মধ্যে জেগেছিল স্বদেশী যুগের আবেগ ও উদ্দীপনা। পাশাপাশি গাছপালা, মাঠ-ঘাট ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁর সাহিত্য রচনার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনের গভীরে বড় লেখিকা হবার গভীর স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল।

বড়ভাই দেবপ্রসাদের সঙ্গে স্বদেশী যুগে রাজবন্দী হিসেবে জেলে খেটেছিলেন শান্তিময় রায়। তিনিও ছিলেন স্বদেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তিনি জেল থেকে ছাড়া পেলে দেবপ্রসাদ শান্তিময়ের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে এলে সাবিত্রী শান্তিময় রায়কে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিলেন। একজন স্বদেশ প্রেমিকের জীবনে এলো আরেক স্বদেশ প্রেমিকা। ১৯৪০ সালে উভয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের তিনমাস যেতে না যেতেই শান্তিময় রায় ব্রিটিশ শাসকদের নজরে পড়েন। তাঁকে জেলে যেতে হয়। বিয়ের পরেই সাবিত্রী রায়ের জীবনে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিশেষভাবে ভাবিয়ে তোলে। শুরু হয় সাবিত্রী রায়ের জীবন সংগ্রাম।

একদিকে সাহিত্য রচনা, অন্যদিকে আদর্শ শিক্ষিকা হওয়া এই দুই স্বপ্ন ছোটবেলা থেকেই সাবিত্রী রায়ের অন্তরে নিহিত ছিল। এজন্য বিয়ের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জে শিক্ষিকার মহান বৃত্তি বেছে নেন। এরপর কলকাতায় এই মহান পদে বৃত্ত থেকেছেন। ইতিমধ্যে জন্ম হল তাঁর শিশুকন্যা। শিশুকন্যাকে ছেড়ে চাকরি করাটা ছিল তার পক্ষে বাধাবহুল। অন্যদিকে তাঁর শরীরও অনেকটা ভেঙে পড়ে। এজন্য তিনি স্বেচ্ছায় শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দেন। শিক্ষিকা পদ অলঙ্কৃত করে তিনি ছোটদের জন্য সহজ বাংলা শেখার একটি বই লেখেন। যে বইটি রচনার ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় মেলে।

সাবিত্রী রায় ছিলেন রাজনীতি সচেতন নারী। তাঁর মধ্যে রাজনীতির প্রশ্ন ও সামাজিক

জিজ্ঞাসা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল। সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে তিনি তাঁর মূল্যবান সময় সাহিত্যরচনার জন্য ব্যয় করবেন, এরকম দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্যদিকে ভারতের পরাধীনতা, গান্ধীবাদ, সত্য়াসবাদ, সাম্যবাদ, মহামারী, ভারত বিভাজন, সামাজিক মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন, উদ্বাস্ত সমস্যা, ভাষা সমস্যা, অস্পৃশ্যতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের উপর নির্যাতন, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের সমস্যা, দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করা মানুষদের দুঃসহ অবস্থা, বেকারি, কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মধ্যে আন্তর্জাতিকতা বোধেরও অভাব ছিল না। রাজনীতির অঙ্গন থেকে তিনি দূরে সরে থাকলেও রাজনীতি যার মনে শৈশব থেকে ছাপ ফেলেছিল সেই মানসিকতা থেকে তিনি রচনা করেছেন একে একে অসংখ্য উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোর ও শিশুপাঠ্য বিভিন্ন গ্রন্থসম্ভার। তাঁর পত্রগুচ্ছ বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দেশকে ভালোবেসে জীবনকে ভালোবেসে তিনি যে সাহিত্য একে একে রচনা করে গেছেন তাঁর সঠিক মূল্যায়ন আজও সম্ভব হয়নি। তবে একথা সত্য যে তাঁর গল্প উপন্যাস এবং কবিতাগুলি গতানুগতিক ধারা থেকে আলাদা হয়ে স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছে, এতে সন্দেহ নেই।

সাবিত্রী রায় একে একে আমাদের উপহার দিয়েছেন ‘সৃজন’, ‘ত্রিস্রোতা’, ‘স্বরলিপি’, ‘মালশ্রী’, ‘পাকা ধানের গান’ (১ম, ২য়, ৩য় পর্ব), ‘মেঘনা-পদ্মা’ (১ম-২য় পর্ব) এছাড়া ‘সমুদ্রের ঢেউ’, ‘ঘাসফুল’, ‘ব-দ্বীপ’ প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে তিনি কথা-সাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং প্রতিটি উপন্যাসই বিষয়বস্তু ও বিন্যাসের দিক থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। প্রকাশের স্বচ্ছন্দ গতি এনে দিয়েছে অনন্যতা। পাঠকের কাছেও এই উপন্যাসগুলোর আবেদন চিরন্তন হয়েই বিরাজিত থাকবে।

‘সৃজন’ উপন্যাসটি তিনি পিসিমা, মা ও বাবাকে উৎসর্গ করেছেন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি দিয়েই তাঁর উপন্যাস লেখার গুভারমুদ্র ঘটে। এর মধ্যেও রাজনৈতিক বাতাবরণ দুস্ত্রাপ্য নয়।

১৯৬১ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর তাঁর ‘ত্রিস্রোতা’ উপন্যাসের রচনা কাল। শিবু ও তাঁর ছাত্রবন্ধুদের উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসটি তিনি উৎসর্গ করেন। এই উপন্যাসে রয়েছে ধনী সমাজের নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার, হলনা পাশাপাশি ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অঙ্গুলি নির্দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের জীবনে যেভাবে নেমে এসেছিল কালো দিবস, তাদেরই কথা। উপন্যাসিক সাবিত্রী রায় মধ্যবিত্ত জীবনকেও তুলে ধরেছেন। সাহিত্যকারের প্রগতিশীল সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সাবিত্রী রায়ের লেখনীতে তাই ধরা পড়েছে। তিনি মধ্যবিত্ত মন নিয়ে শোষিত সর্বহারা মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে গণসাহিত্য রচনা করেছেন। রসসৃষ্টি ও সার্থকতার দিক

থেকে তাঁর এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে।

অত্যন্ত বাস্তবধর্মী চোখে দেখা চরিত্রগুলিকে সূক্ষ্মকল্পনার মেলবন্ধনে তিনি যে ‘স্বরলিপি’ উপন্যাসটি লিখেছেন তার প্রকাশকাল ১৯৫২ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৪৯ খ্রীঃ ২৭শে এপ্রিল লতিকা, অমিয়া, গীতা, প্রতিভা ও বাদল এই পঞ্চশহীদেদের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে ৪৫০ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে মুক্তিকামী শান্তি পিপাসু সংগ্রামী মানুষের জীবনালেখ্য যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরা হয়েছে প্রেম, প্রয়োজন, ঘাত-প্রতিঘাত সবকিছুকে। এই উপন্যাসের ভৌগোলিক পটভূমি হল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বালিয়া, বোবাদীপ, ভুবির ভেরবী ও সন্দেশখালি। এই মাটি সেদিন রক্তাক্ত হয়েছিল জঙ্গি কিষাণ ও কিষাণ বৌ -এর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে। ইংরেজ শাসকের আক্রোশে সংগ্রামরত অগণিত মানুষকে একে একে নিষ্কিঞ্চু করা হয়েছিল কারাগারে। সেই অন্ধ কারাগারে শাসক গোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারে শহীদ হয়েছিল অনেকেই। নারীর রক্তে ভিজে গিয়েছিল সেদিন কলকাতার রাজপথ। সাবিত্রী রায়ের রাজনৈতিক ও জীবনবাদী এই উপন্যাসটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ক উপন্যাস মালায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

তাঁর ‘মালশ্রী’ উপন্যাসটি ১৩৬১ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ প্রকাশিত হয়। সাবিত্রী রায় তাঁর কন্যা ও তাঁর পিতাকে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক বাতাবরণ দুর্লভ নয়।

তিনটি পর্বে বিন্যস্ত ‘পাকা ধানের গান’ ও দুই খন্ডে বিন্যস্ত ‘মেঘনা-পদ্মা’ উপন্যাসদ্বয়ের লেখিকা বহু কাহিনি ও উপকাহিনির সমাবেশে রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা ও বহু সামাজিক প্রশ্ন তুলে ধরে উপন্যাসটির শিল্প সম্মত রূপ দিয়েছেন। এছাড়া ‘সমুদ্রের ঢেউ’, ‘ঘাসফুল’, ‘ব-দীপ’ প্রভৃতি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রেও সাবিত্রী রায়ের প্রতিভার পরিচয় মেলে।

সাবিত্রী রায় শুধুমাত্র উপন্যাসিক হিসেবেই পরিচিত নন। তিনি ছোটগল্প লিখেছেন প্রচুর। তাঁর ‘গল্প সংকলন’ গ্রন্থে যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি যথাক্রমে ‘মাটির মানুষ’, ‘নূতন কিছু নয়’, ‘রাধারাণী’, ‘সাময়িকী’, ‘ধারাবাহিক’, ‘ওরা সব পারে’, ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’, ‘সমঝাদার’, ‘হাসিনা’, ‘প্যারামবুলেটার’, ‘অন্তঃসলিলা’। ‘নূতন কিছু নয়’ গল্প গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন ১৯৪৩-এর অকালে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের স্মরণে। এছাড়া ‘হলুদ ঝোরা’ গল্পগ্রন্থের ‘হলুদ ঝোরা’, ‘জাদুর বেহালা’, ‘কৃতজ্ঞ কাক’ ও ‘ফুলের বন্ধু’ গল্পগুলি সাবিত্রী রায়ের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

‘নূতন কিছু নয়’ গল্প গ্রন্থের গল্পগুলি রচিত হয়েছিল চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে। তাঁর ‘মাটির মানুষ’ ছোটগল্পে আমরা দেখি গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা যেভাবে গ্রামে সাড়া জাগিয়েছিল তার সার্থক ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। ‘নূতন কিছু নয়’ ছোটগল্পটি রচিত মন্বন্তরের পটভূমিকায়।

তাঁর ‘রাধারানী’ গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় একটি কিশোরী বধূকে ধর্ষণ এবং তার প্রতিরোধের ঘটনা। ‘ওরা সব পারে’ গল্পটি গড়ে উঠেছে একজন পরিচারিকাকে কেন্দ্র করে। এই পরিচারিকার সঙ্গে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। উভয়ের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কের ফলে ওরা ও আমরা ভেদ থাকে না। ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ গল্পে আমরা দেখি দেশভাগজনিত দুর্দিনে এক সম্পন্ন গৃহস্থ তার পরিচারিকাকে গৃহের দায়িত্ব দিয়ে জন্মভূমি ছেড়ে চলে আসে। ‘সমঝদার’ গল্পটি রচিত হয়েছে একটি অন্ধ ভিখারী বাউলকে নিয়ে। সে সত্যিই সুগায়ক, একমাত্র সঙ্গীত রসিকরাই তার সুরের মর্যাদা দিতে পারে। ‘হাসিনা’ গল্পে আছে এক শিশু ভিখারিণীর বিশ্বযুদ্ধকালীন যখন মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের দিনগুলিতে মান-অভিমান আনন্দ-বেদনার কথা। ‘অন্তঃসলিলা’ গল্পের নায়িকা শকুন্তলা, যে বহু কষ্টে লিখেছিল একটি গল্প যে গল্পটি তার স্বামীর কাছে বিশেষ মূল্য পায়নি। বরং স্বামী তাকে গল্পটি লেখার জন্য বিদ্রূপ করেছে। শকুন্তলার প্রতি বঞ্চনার চিত্র সাবিত্রী রায় সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এরমধ্যে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। লেখিকা তাঁর তিন বছরের আদরের নাতি সান্নিককে ‘নীলচিঠির ঝাপি’ নামক গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েই লেখা ‘নীল চিঠির ঝাপি’ গ্রন্থটি জীবনধর্মী। এছাড়া এই গ্রন্থে রয়েছে স্কেচ ও টুকরো কবিতার সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকটি চিঠি। ‘নীল চিঠির ঝাপি’র একত্রিশটি ছোট ছোট কবিতা পাঠকের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। সেরকম একটি কবিতা হল —

“শিল্পীর সমাধিতে দুটি ফুল দিও

ওগো পথচলা পথিক।

তার শেষ গাওয়া গান

স্নেহময়ী ঘাসের আঁচলে

মায়ের আদরহীনা শিশুর মতন

একা একা কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে এখন।” ৭২

এই গ্রন্থটি লেখিকা সাবিত্রী রায় সত্তরের দশকের শেষ দিকে রচনা করেছেন। তাঁর ‘চোখের জল ফেলোনা’, ‘মারিয়ানা’ ও ‘সৈনিকের চিঠি’ এই তিনটি অনুবাদগল্প ‘তারণী’ পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায়, সাবিত্রী রায়ের লেখা রচনাগুলি সমকালীন সমাজের প্রাণবন্ত, বর্ণময় ও বিশ্বস্ত দলিল হিসেবে চিহ্নিত।

বাংলা সাহিত্যের অপর এক যশস্বিনী মহিলা সাহিত্যিক হলেন ছবি বসু। ছোটগল্প ও প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ প্রতিভার পরিচয় মেলে। এছাড়া উপন্যাস রচনা পত্র-পত্রিকার সম্পাদনা

প্রভৃতি ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল স্বচ্ছ পদচারণা। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিরলসভাবে তিনি সাহিত্য রচনা করে গেছেন। মার্কসবাদে বিশ্বাসী এই বিদূষী নারী তাঁর সাহিত্যে সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়ে সমাজের নানাবিধ সমস্যা-বঞ্চনা-নিপীড়ন-দারিদ্র্য ও হতাশার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। তিনি ভেবেছেন নারীদের কথা। অন্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং অবরোধের বিরুদ্ধে নারী সমাজ জেগে উঠুক, এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর লেখনীতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আরতি রায়। কিন্তু তিনি ছবি বসু নামটি ব্যবহার করেছেন ছদ্মনাম হিসেবে। অসাধারণ মেধাবী ছবি বসু ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পান। কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি আই.এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল সাহিত্য ও ইতিহাস। এরপর শিক্ষা সূত্রে তিনি ভর্তি হন কলকাতার আশুতোষ কলেজে। এই কলেজে অধ্যয়নকালে প্রাতঃকালীন সময়টি তিনি বেছে নিয়েছিলেন। বাকি দুপুর ও বিকেলের অফুরন্ত সময়ে তিনি সঙ্গীত, সেতার বাজানো, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সমাজসেবা ও সাহিত্য রচনার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। অত্যন্ত প্রাণবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও সমাজ সচেতন ছবি বসুর থিয়েটার, সাহিত্যিক সম্মেলন, চলচ্চিত্র, সাহিত্যপাঠ, অভিনয় ছিল একান্ত প্রিয়।

তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতার শিল্পী। রাজনীতি সচেতন সুদক্ষকর্মী হিসেবে তিনি কখনও অতিসাধারণ দীনহীন পরিবেশে বস্তুতে বস্তুতে ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সম-অংশীদার হতেন। ক্লেশ, দৈন্য ও গ্লানিযুক্ত বস্তিজীবনের বাস্তব চিত্র, তাদের ভাষা, তাদের চিন্তা সবকিছুই উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী হয়ে। ধনী ও দরিদ্রের এই বিস্তর ব্যবধানকে ভালো চোখে দেখেন নি। আন্তরিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন সমাজের আমূল পরিবর্তন।

সুনীল বসুর সঙ্গে ১৯৫০ সালে তিনি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। সুনীল বসু ছিলেন মার্জিত-মনা, সুশিক্ষিত, সমব্রতী ও সমমনস্কসম্পন্ন। সুনীল বসু-ছবি বসু এই নবদম্পতির জীবন দর্শন ছিল অভিন্ন। তাঁর প্রথম কন্যা শর্মিষ্ঠা ও ছেলে কুণালের জন্মের পর শ্যামবাজারের যৌথ পরিবার ছেড়ে দক্ষিণ কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে দীর্ঘবছর ধরে শ্বশুর বাড়ির একান্নবর্তী পরিবারের বহু দায়-দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হত। দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতেও তাঁর নিকট আত্মীয়দের বিভিন্ন কর্তব্য পালন করতে হত। নিজের বাড়ির নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম ও সন্তানদের লেখাপড়া, লালনপালন সবকিছু করতে হত। এমনকি শ্বশুর পরিবার ও পিতৃ পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখে তাঁকে চলতে হত। এর মাঝখানে যতটুকু অবসর সময় তিনি পেতেন সেই সময়টুকু সাহিত্য চর্চার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখতেন। তিনি যদি বৃহত্তর দায়িত্ব পালন না করতেন তাহলে হয়তো বাংলা সাহিত্য ছবি বসুর কাছ থেকে আরও অনেক সৃষ্টিশীল সাহিত্য উপহার স্বরূপ পেত।

তাঁর সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রেরণা দাত্রী হিসেবে ছিলেন তাঁর সমমনস্ক স্বামী সুনীল বসু, যার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ব্যতিত তাঁর পক্ষে সাহিত্য রচনা সম্ভবপর হতো না। বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক দায়িত্বভার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন সুনীল বসু চেয়েছিলেন তাঁর সহধর্মিনী একজন বিশিষ্ট মহিলা সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করুক। কখনও বা সাহিত্য আলোচনা করে, সাহিত্যের বিষয় নির্ধারণ করে সময় দিয়ে তিনি পরোক্ষ সর্বতভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলেই ছবি বসু হতে পেরেছিলেন একজন বিশিষ্ট ছোটগল্পকার ও প্রাবন্ধিক।

বস্তুত তাঁর লেখনী বলসে উঠেছিল বিবাহভোর জীবন থেকেই। ‘বাংলার নারী আন্দোলন’ নামে যে গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন সেটি সে সময়ের নারী আন্দোলনকারীদের একটি পথপ্রদর্শক গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। নারীর আত্ম প্রতিষ্ঠা, নারীর অধিকার কর্তব্য, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের আলোকবর্তিকা ও দেশসেবার উদ্দীপনা যুক্ত এরূপ তথ্য নির্ভর পূর্ণাঙ্গগ্রন্থ বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। তিনি ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’ নামে যে মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তাঁর মধ্যে প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যকে ধরতে পেরেছেন।

ছবি বসুর জীবনে বহুলাংশে ছিল তাঁর বাবার প্রভাব। চাকরিসূত্রে অবিভক্ত বঙ্গদেশের বহুস্থানে ছোটবেলা থেকেই ঘুরতে হয়েছিল ছবি বসুকে। সেই সুবাদে উৎপীড়িত মানুষ, দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ, অভাব-অনটন ও হতাশায়ুক্ত মানুষের জন্য তাঁর চিত্ত ব্যথিত হত। যাদের জন্য সমাজের বৃহৎ অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করছে, ভগবানকে দোহাই দিয়ে নিজের ভাগ্য লিপিকে মেনে নিচ্ছে, তাদের প্রতি ছিল ছবি বসুর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি। তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনায় এদের কথা প্রধান উপজীব্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। অগণিত মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনা সবকিছুই তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন শিল্পী সুলভ দৃষ্টি নিয়ে। সমাজবাস্তবতা বলতে আমরা যা বুঝি সেই বাস্তবধর্মী গণসাহিত্য রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। তিনি মূলত ছিলেন মানব প্রেমিক। জীবনমুখী আদর্শে ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী সেখিকা মানবিক মূল্যবোধকে তাঁর সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।

ছোটগল্পকার হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিল সর্বাধিক। ‘অমৃত’, ‘চতুষ্কোণ’, ‘ডাক’, ‘অরণী’, ‘ঘরে-বাইরে’, ‘মহিলা’, ‘কথাশিল্প’, ‘রবিরাসরীয় যুগান্তর’, ‘দৈনিক বসুমতী’, ‘নন্দন’, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ‘সাহিত্য-পত্র’ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

‘আঙুন রাঙা’ গল্পগ্রন্থটি ১৯৬৮ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারীতে ‘কথাশিল্প’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থটি তিনি আশাদেবীর নামে উৎসর্গ করেন। এই গল্পগ্রন্থে স্থান পেয়েছে - ‘আঙুন রাঙা’, ‘স্মৃতি সায়রে’, ‘ফাঁকি’, ‘গ্রহ নয় শুধু তারা’, ‘একটি দশ নয় পয়সা’, ‘একটি যুঁই লতার জন্য’, ‘কান্না’, ‘শিল্পী’, ‘জনক’, ‘দাগ’, ‘নায়িকা’, ‘একটি আঘাতে গল্প’, ‘রাধারাণী’, ‘মেহমান’,

‘অন্তরাল’, ‘বিভা বৌদি’, ‘জন্মদিন’, ‘গাঙপারে’, ‘সোনার বালা’, ‘কটাচোখ’, ‘মুক্তি’, ‘সরীসৃপ’। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলির নায়িকা বঙ্গদেশের অবহেলিত, হতদরিদ্র মেয়েরা। তারা তাদের এই অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছে তারই জীবন্তরূপ ছবি বসু পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ‘রাধা মাসি’, ‘বিভা বৌদি’ এই গল্প দুটিতেও স্থান পেয়েছে অভাবগ্রস্ত নায়িকাদের জীবনচিত্র। এই সব নায়িকারা শুধু দিয়েই গেছে, বিনিময়ে তারা সমাজ থেকে কিছুই পায়নি। ‘জনক’ গল্পে সন্তান বাৎসল্যের যথার্থ পরিচয় রয়েছে।

‘প্রবহমান’ গল্পগ্রন্থটি তাঁর স্নেহধন্য কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র কুণালকে উৎসর্গ করেন। এই গল্পগ্রন্থে যে গল্পগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি হল — ‘প্রবহমান’, ‘দাহ’, ‘আস্তানা’, ‘উত্তরাধিকার’, ‘ঠাগুরুণের কৃপা’, ‘চিঠি’, ‘জীবন ও জীবিকা’, ‘দাপট’, ‘যখন যেখানে’, ‘এক প্রজন্ম’, ‘পায়ের তলায় মাটি’, ‘হরমোহনের সমাজ চেতনা’। এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলিতে সমাজের নানা সমস্যা, রুঢ়বাস্তবতা প্রধান্য পেয়েছে। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ ও সমাজ বাস্তবতার প্রভাব এই গল্পগুলিতে দেখা যায়।

‘ছায়া-অরণ্য’ গল্পগ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৮৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি। সমাজের নানা সমস্যা, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, নিপীড়নের প্রতিবাদ বিষয়ে রচিত এই গল্পগ্রন্থের গল্পগুলি হল — ‘স্মৃতিবাতায়ন’, ‘ব্যামো’, ‘সখী-সংবাদ’, ‘কাপুরুষ’, ‘পথ চলতে’, ‘আজব নগরীর নক্সা’, ‘সেই মেয়ে’, ‘রাজা-রানীর গল্পো’, ‘নীহারিকা’, ‘গায়েন বৌ’, ‘একটি নাটকের জন্য’। ‘ব্যামো’ গল্পটি লেখিকার অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পের নায়িকা জবা। সে কুমুদের স্ত্রী। তাঁর ছিল মনোরোগ, প্রত্যহ সে রাতে কেঁদে উঠত। কেউ বলত তাকে ভর করেছে কোন দৈবশক্তি, কারও মতে হিস্টিরিয়া রোগ ব্যতীত কিছুই নয়। এরপর অনেকে সুপারামর্শ দিয়েছিস জবার সন্তান-সন্ততি হলে হয়তো এ রোগ সেরে যাবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তার রোগ সারলো না। প্রকৃতপক্ষে তার ছিল মনের রোগ। প্রত্যহ সে পরের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করে গভীর রাতে কেঁদে উঠত। ছবি বসু পরদুঃখকাতর সহানুভূতিশীল এই নারী চরিত্রটি নির্মাণ করে শিল্প সফলতার যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন।

‘সখী-সংবাদ’ গল্পটি ছবি বসুর অসামান্য সৃষ্টি। দুই বেকার সখীদের মধ্যে ছিল সুগভীর অন্তরঙ্গতা। কর্মসংস্থানের জন্য তারা বহু জায়গায় একসঙ্গে যেত। কিন্তু কোন ভাবেই তারা চাকরি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেনি। একদিন এক ব্যক্তি চাকরির সংবাদ দিলে তারা দুজনেই সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণ করে। এতে এক সখী কৃতকার্য হয় তার চাকরি জুটে যায়। অন্য সখী ব্যর্থ হয় বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে তার দিন কাটে। এর পর একদিন দুই সখীর মধ্যে শুরু হয় ভীষণ কলহ সেই কলহের জোরে কর্মরত সখীটির চাকরি চলে যায়। সাময়িক ভাবে দুই সখীর মধ্যে মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরলেও যখন আবার তারা দুজনেই বেকার হয়ে পড়ে তখন তাদের মধ্যে আবার পূর্ববর্তী

মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয় ও ভাবের দিক থেকে ছবি বসুর এই গল্পটি পাঠকমনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে।

‘কাপুরুষ’ একটি মনস্তাত্ত্বিক গল্প। এই গল্পে অনুসন্ধান করা হয়েছে কাপুরুষতার মূল কারণ এবং তা থেকে মুক্তির উপায়। এটা থেকে মুক্ত হবার পথ হিসেবে কাপুরুষকে ধমক দেওয়া হয়। এই ধমক খেয়েই মুছে যায় তার কাপুরুষতার গ্লানি।

‘আজব নগরীর নক্সা’ একটি সমাজচিত্র ধর্মী সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পে কলকাতা মহানগরীর খন্ডখন্ড চিত্র অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

‘রাজা-রানীর গল্পো’ একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। যে রাজারানী রাজভোগ ও রাজসুখের মধ্যে দিন অতিবাহিত করত ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে, তা থেকে নেমে আসে সাধারণ স্তরে। তাদের ভাগ্যের এই বিপর্যয়ে আমাদের মনে আসে একটি কথা ‘চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়’।

তাঁর প্রতিটি গল্পের মধ্যে সমাজ বাস্তবতা প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যদিকে মেয়েরাই গল্পগুলির মুখ্যস্থান অধিকার করে আছে।

বসন্ত নামে পাঁচটি গল্পগ্রন্থের মধ্যে ‘বর্ষা’ ও ‘নীনা ক্রাভোৎসোভা’ এই গল্প দুটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ। এই অনুবাদ গল্পগুলিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তিনি ‘স্তালিন’ গ্রন্থটিতে স্তালিনের সাম্যবাদী আন্দোলন এবং তাঁর জীবন-ইতিহাস অত্যন্ত সচেতন দৃষ্টি নিয়ে রচনা করেছেন। তিনি কতটা রাজনীতি সচেতন তাঁর প্রমাণ মেলে এই গ্রন্থে।

‘সাহিত্যে বাঙলার ইতিকথা’ গ্রন্থে তিনটি মূল্যবান বিষয় স্থান পেয়েছে সেগুলি হল - সাহিত্যে বাঙলার ইতিকথা, প্রাচীন সাহিত্যে বাঙালীর জীবন যাত্রা এবং মধ্যযুগের বাঙালি ও তার মানস সংস্কৃতি। এই গ্রন্থে লেখিকার সমাজ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় মেলে।

লেখিকার ‘বাঙলার নারীর আন্দোলন’, ‘সংগ্রামী ভূমিকায় দেড়শো বছর’ এই গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য নানা কারণে। এই গ্রন্থে রয়েছে কথারস্তু, উনিশ শতকের প্রথম অধ্যায় বিদ্যাসাগর ও বাংলার নারী সমাজ, বঙ্গভঙ্গের যুগ, কংগ্রেস ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধারা, নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব, মুসলিম মেয়েদের গণআন্দোলনের ভূমিকা। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে শান্তি মিত্র ১৩৫৫ শ্রাবণ সংখ্যায় ‘সাহিত্য পত্র’ পত্রিকায় লিখেছেন —

“উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত নারী আন্দোলনের বিবরণ এক এক করে বাংলাদেশের মেয়েদের সামনে তুলে ধরেছেন শ্রীমতি ছবি বসু। সে জন্যে তিনি মেয়েদের ধন্যবাদের পাত্রী। এজন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম করে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং সেগুলিকে তিনি এমন সহজ ভাষায় পাঠক-পাঠিকাদের সামনে এনেছেন যে পড়তে পড়তে কোথাও হোঁচট

থেতে হয় না। এত আন্দোলন করে গেছেন মেয়েদের জন্যে যুগ যুগ ধরে এত মহীয়ান ও মহিয়সী পুরুষ ও মহিলা আমাদের অনেকের কাছেই তা অজ্ঞাত ছিল। শ্রীমতী ছবি বসু ‘নারী আন্দোলনের ধারা’ লিখে এদিক দিয়ে প্রত্যেক সাধারণ মেয়েরই উপকার করেছেন। বইখানি পড়লে সহজেই নারী আন্দোলনের একটা দ্রুম্যবিকাশ মনের ওপর ছাপ রাখে এবং নিজেদের সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ে।” ৭৩

মহিলা কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে প্রতিভা বসু একটি পরিচিত নাম। তিনি বাংলা গল্প ভান্ডারকে বিচিত্র ভাব ও বিচিত্র স্বাদে সমৃদ্ধ করেছেন। বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর আঙ্গিক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত ছিলেন অভিজ্ঞতার শিল্পী। আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসা তাঁর ছোটগল্পকে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর খাঁসাড়া গ্রামে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আশুতোষ সোম, মাতা সরযুবালা। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল রাণু সোম। পোষাকী নাম হল প্রতিভা। বাবা আশুতোষ সোম যে চাকরি করতেন সে চাকরী ছিল বদলির চাকরি। তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় কনভেন্ট স্কুলে। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী। বাবা মায়ের ইচ্ছাতেই তিনি গানের জগতে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর গান রেকর্ডিং হয়েছিল এইচ. এম.ভি তে। ক্লাসিক গানের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। সে গানগুলি রাণু সোম নামেই রেকর্ডিং হয়ে বের হত। রাণু সোমের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছিল ‘নবশক্তি’ নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। এছাড়া ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম ছোটগল্প ও প্রথম কবিতা দু’টি প্রতিভা সোম নামেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কবি ও কথাসাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রতিভা বসুর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বাবা-মায়ের পছন্দ করা পাত্র বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে যখন বিবাহ হয় তখন তাঁর বয়স আঠারো বছর। বিয়ের পরে তিনি সিনিয়র কেমব্রীজ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে প্রতিভা বসুর দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। কিন্তু উভয়ের লেখার ধরন ছিল ভিন্ন। বুদ্ধদেবের বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তিনি একটি শব্দ নিয়ে কিংবা তার সঠিক প্রয়োগ বিষয়ে দীর্ঘ সময় ভাবতেন, কখনও বা সারা রাত জেগে ঘরের ভেতরে পায়চারি করতেন। স্বামী বুদ্ধদেবের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনা। মুনশিগঞ্জ জেলা ‘স্মৃতি বুদ্ধদেব বসু - প্রতিভা বসু’ শীর্ষক সাক্ষাৎকার স্মৃতিচারণ বিশেষ সংখ্যায় উল্লেখ রয়েছে,

“বুদ্ধদেব শুধু পণ্ডিত কিংবা কবিই ছিলেন না, মানুষ হিসেবেও তার সঙ্গ পেয়ে

আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। আমরা অপরের পরিপূরক ছিলাম প্রতিভা বিকাশে কিংবা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অন্তরায়ের পরিবর্তে আমি বলব, আমার প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ বুদ্ধদেব বিনা সম্ভব ছিল না।

স্বর্গীয় স্বামী এবং প্রেমিক হিসেবে বুদ্ধদেবের সঙ্গে জীবনযাপন কোনটায় স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছি জানতে চাইলে।

“অবশ্যই বলব প্রেমিক বুদ্ধদেবই আমার কাছে বেশি আনন্দের ছিল। কারণ প্রেমের ক্ষেত্রে সময়জ্ঞান অভাব-অনটন কিছুই মনে থাকত না। ভাব এবং নীরব ভাষাই ছিল আমাদের অনুষ্ণ। তবে তখনকার দিনের প্রেম আর এখনকার দিনের প্রেমের মধ্যে ফারাক বিস্তর। বিয়ের আগে বুদ্ধদেব আমাকে স্পর্শই করেননি। কিন্তু তাতে প্রেমের গভীরতায় কোনো ঘাটতি ছিল না। বরং বুদ্ধদেবের সেই সংযত চরিত্রই আমাকে আরো বেশি আকৃষ্ট করেছিল তার প্রতি।” ৭৪

প্রতিভা বসুর দুই কন্যা প্রথমা কন্যা মীনাক্ষী, দ্বিতীয়া দময়ন্তী এবং তাঁর একমাত্র পুত্র শুদ্ধশীল বসু। তাঁদের গৃহে বহু জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটত। তাঁদের কাছ থেকেও সাহিত্য রচনার প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন। ‘বুদ্ধদেবই আমার শুদ্ধতম প্রকাশ’ নামে প্রতিভা বসুর লেখা অংশ পাঠ করে আমরা জানতে পারি,

“কোনো লেখকের ইচ্ছাশক্তির লয় নেই, ক্ষয় নেই। শেষ সীমারেখাও নেই। আসলে আমি লেখা শুরু করেছি অনেক পরে। বুদ্ধদেবের অনুপ্রেরণাতেই আমার লেখক জীবনের সূত্রপাত, সেই আমার প্রেরণার উৎস। আরো দু’জন লেখার গুণগ্রাহী ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এবং নরেশ গুহ। সত্যেন দা’র কথা ভুলতে পারব না কখনো। কী অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন। কী যে তার আন্তরিকতা বলে বোঝানো যায় না। তাঁদের উৎসাহ ও সহযোগিতার কথাও ভুলতে পারি না।” ৭৫

প্রতিভা বসুর বাড়িতে বসত আড্ডার আসর। তাঁর পিত্রালয়ে যে সমস্ত সঙ্গীত শিল্পী ও সাহিত্যিকরা দিনের পর দিন আড্ডায় অংশগ্রহণ করতেন তাঁরা হলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপ রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, হিমাংশু দত্ত, সমর সেন, বিরাম মুখোপাধ্যায়, অমিয় চক্রবর্তী, নরেশ গুহ, জীবনানন্দ দাশ, নজরুল ইসলাম, কাজী সাহেব প্রমুখ। এইসব আড্ডার আসরে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন সারগর্ভ আলোচনা হত তেমনি নতুন প্রতিভা কি করে উত্তরোত্তর বিকশিত হয় সে প্রসঙ্গেও আলোচনা হত। এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ প্রতিভার কবিও আসতেন প্রতিভা বসুর গৃহে। রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রতিভা বসু শিখেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। স্বামী বুদ্ধদেব বসুও রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। প্রতিভা বসুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক বিষয়ে একটি প্রসঙ্গ নিয়ে প্রদত্ত হল :-

“রবীন্দ্রনাথকে আমি দেখেছিলাম, তিনি একজন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী

সর্বস্বীন কবি এবং সর্বোপরি তিনি একজন রক্ত-মাংসের মানুষ কিন্তু বুদ্ধদেবরা রবীন্দ্রনাথকে দেবতা হিসেবে দেখত। তাই দেবতা তো সবসময় ভক্তের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। আমি তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সে হিসেবে দেখিনি। তাই তাঁর কাছাকাছি পৌঁছাতে আমার অসুবিধা হয়নি। এক সময় তো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষ একটি বিষয় নিয়ে আমার ঝগড়াই হয়ে গিয়েছিল। আমার বয়স তখন খুবই কম, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যাপারটা ততটা বুঝি না কুমারীতে যা লেগেছিল। বুদ্ধদেব ভাবতেই পারেননি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঝগড়া করা যায়। বুদ্ধদেব অবশ্য অনেকবার বলেছেন ঝগড়া মিটিয়ে নিতে কিন্তু আমি তা করিনি। একবার একজনকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ‘মালঞ্চ’ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে কপি করে দিতে। আর অরিজিনাল কপিটি আমার কাছে রেখে দিতে। কিন্তু তখন আমি রবীন্দ্রনাথের ওপর এতটাই রেগেছিলাম যে তাঁকে পান্ডুলিপিটি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। বুদ্ধদেব একথা শোনার পর আমাকে বলেছিলেন, এতটা রাগ না করলেই পারতে-রাগু।

ঝগড়ার কারণটা জানতে চাচ্ছে তো ?

বলব না। এটা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার।” ৭৬

প্রতিভা বসুর গৃহেও ছিল সাহিত্যের উপযোগী বাতাবরণ। বহু জ্ঞানীশুণী জনের আগমনে তাঁর গৃহ পূর্ণ হত। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যেও পড়েছিল তাদের প্রভাব। বড়মেয়ে মীনাঙ্কী একাধারে সম্পাদক ও অনুবাদক। তাঁর ‘বিদেশিনী’ অনুবাদ গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর ছেলে ঋজুরেখ বসুও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন এবং খুব ভালো লিখতেন। ‘দেশ’ ও ‘আনন্দ বাজার’ পত্রিকায় তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। ছোটমেয়ে দময়ন্তীও ভালো কবিতার জন্য খ্যাতিলাভ করেছেন। একাধিক পত্রিকাতেও তাঁর কবিতা ছাপা হয়েছে। মীনাঙ্কীর মেয়ে কঙ্কাবতী কলকাতার লেখিকাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। কঙ্কাবতীর কয়েকটি সাড়াজাগানো উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রতিভা বসুর রচনায় বুদ্ধদেবের মতো পাণ্ডিত্য নেই কিন্তু সহজ সরল ভাবে তিনি যে বিষয় উপস্থাপনা করতেন পাঠক মহলে তা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। তিনি যে উপন্যাসগুলি লিখে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন সেগুলি হল, ‘আলো আমার আলো’, ‘অন্তোনিনা’, ‘অপেক্ষাগৃহ’, ‘পদ্মাসনা ভারতী’, ‘ঈশ্বরের প্রবেশ’, ‘সকালের সুর সায়াহে’, ‘সমুদ্র পেরিয়ে’, ‘সমুদ্র হৃদয়’, ‘সোনালি বিকেল’, ‘অতলাভ’, ‘হৃদয়ের বাগান’, ‘দ্বিতীয় নক্ষত্র’, ‘অগ্নিতুষ্কার’, ‘রাঙা ভাঙা চাঁদ’। এই উপন্যাসগুলিতে বাস্তব চিত্র, চরিত্র বিশ্লেষণ উপন্যাসের কাহিনি নির্বাচন, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রকৃতি চেতনা, ঔচিত্যবোধ প্রভৃতি প্রসঙ্গের সার্থক রূপায়ন ঘটিয়েছেন। ‘সমুদ্র পেরিয়ে’, ‘সমুদ্র হৃদয়’, ‘সোনালি বিকেল’, ‘হৃদয়ের বাগান’, ‘রাঙা ভাঙা চাঁদ’, ‘আলো আমার আলো’

প্রভৃতি উপন্যাসে একদিকে রয়েছে রোমান্টিক প্রেম-বিরহ আর অন্য দিকে কাব্যগুণ ও নাট্যগুণের সমাবেশ। প্রতিভা বসুর সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বজ্ঞান, নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, সহজ সরল ভাষার আলোকে উপযুক্ত উপমা, চিত্রকল্প ও মণিমুক্তাসম কিছু কিছু প্রবাদপ্রতিম বাক্য প্রয়োগ করে সার্থক ঔপন্যাসিক-গুণের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত প্রতিভা বসুর নারী-চরিত্র অনেক ক্ষেত্রেই ত্যাগের মহিমায় সংযত চিত্তে পুরুষ চরিত্রগুলোকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছে। অর্থাৎ তার উপন্যাসের নারীচরিত্রগুলি যতটা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়েছে তুলনায় পুরুষ চরিত্রগুলি অনেকটাই নিম্প্রভ। এছাড়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একশ্রেণির লেখক তাঁদের লেখনীতে নারীকে ভোগ্য পণ্যে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। নারীবাদী লেখিকা হিসেবে প্রতিভা বসু তার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। যেসব লেখকেরা নারীর কল্যাণী রূপকে বিশেষভাবে তুলে ধরতে পারেননি কিংবা নারীকে ছোট করে দেখেছেন আন্তরিকভাবে প্রতিভা বসু তা মেনে নিতে পারেননি। তাঁর মতে নারীর কল্যাণী মূর্তিটি প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে, সমাজের ধারক ও বাহক রূপে নারীরা আপনভাগ্য জয় করবার জন্য এগিয়ে এসেছে। সেইসব নারীরা কেন বঞ্চিত হবে এই প্রশ্নই রেখেছেন তাঁর বহু উপন্যাসে।

প্রতিভা বসুর দুইখন্ডে প্রকাশিত তেত্রিশটি গল্পে আধুনিক মানুষের জীবন জিজ্ঞাসা প্রকাশ পেয়েছে। অবক্ষয়ী মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্টিত হয়েছেন তিনি। অভিজ্ঞতার শিল্পী প্রতিভা বসুর ছোটগল্পগুলিতে লক্ষ্য করা যায় সমকালীন জীবনানুভবের পূর্ণপ্রকাশ। তিনি তাঁর গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছেন দৃশ্যমান জগৎ থেকে। নিতান্ত আবেগহীন ভাবে তিনি মানুষের কথা বলে গেছেন। তাঁর ছোটগল্পের নারী চরিত্রগুলি আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। বিশেষভাবে মধ্যবিভূ, নিম্নমধ্যবিভূ শ্রেণির জীবনের অন্তর্নিহিত রহস্য সন্ধানে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। ভালোবাসার পূর্ণরূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত কাব্যিক বর্ণনায় ও নাটকীয় ভঙ্গিতে। বহুমুখী বিষয় অবলম্বনে রচিত তাঁর ছোটগল্প গুলিতে আমরা পাই বিন্দুতে সিন্দুর স্বাদ। তাঁর উপস্থাপন ভঙ্গিও অভিনব, আখ্যান বা প্লট গঠনের ক্ষেত্রে মেলে উৎকর্ষের পরিচয়। প্রতিভা বসুর ‘গল্প সমগ্র’ গ্রন্থের ১ম খন্ডে যে শিল্পগুণ সমৃদ্ধ গল্পগুলি স্থান পেয়েছে সেগুলি যথাক্রমে — ‘প্রতিভূ’, ‘ভালোবাসার জন্ম’, ‘ঘাস মাটি’, ‘বিকেল বেলা’, ‘স্বর্গের শেষ ধাপ’, ‘রূপান্তর’, ‘খন্ডকাব্য’, ‘বিচিত্র হৃদয়’, ‘অন্তহীন’, ‘স্বামী-স্ত্রী’, ‘ইন্সটিশনের মিষ্টিফুল’, ‘সেইদিন সকালে’, ‘গুণীজনোচিত’, ‘উৎস’, ‘শব্দব্রহ্ম’, ‘নিখাত সোনা’, ‘আয়না’। তাঁর দ্বিতীয় খন্ডের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল — ‘সকাল বেলা’, ‘ঈশ্বর ও নারী’, ‘মাৎসুমোতো’, ‘মিসেস পালিতের গার্ডেন পার্টি’, ‘সত্য মিথ্যা - মিথ্যা সত্য’, ‘প্রথম সিঁড়ি’, ‘মাদামোয়া জেল গতিয়ে’, ‘কাঁচা রোদ’, ‘সন্ধ্যাবেলা’ ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’, ‘ভেজানো দরজা’, ‘সত্যাসত্য’, ‘ন্যায় অন্যায়’, ‘মাধবীর জন্য’, ‘গর্ভধারিণী’, ‘অন্ধকারে’ প্রভৃতি।

তাঁর ‘ভালোবাসার জন্ম’ ছোটগল্পের নায়িকা পুষ্প। ব্রজেশ্বর তাঁর স্বামী। কি করে

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তাঁর প্রেমে পূর্ণতা এল তার এক সার্থক রূপ নিয়ে লেখা এই গল্পটি বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠগল্প।

‘ঘাস মাটি’ গল্পের নায়িকা মাধবী মিত্র। সে ছিল স্বদেশ প্রাণ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। ঢাকাতে থাকাকালীন মাধবী স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অতঃপর কলকাতায় আসেন। এই গল্পে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের সেতু গড়ে তোলার প্রয়াস রয়েছে। মাধবী ও ইয়ুসুফ এই দুজনের মধ্যে দেশ গঠনের যে প্রচেষ্টা তার এক সার্থক রূপ তুলে ধরেছেন প্রতিভা দেবী। গল্পশেষে এই সত্যই প্রকাশিত হয় যে প্রেম কখনো সময়ের সীমায় গভীবদ্ধ থাকে না। সব বয়সেই সমান রোমাঞ্চ এনে দেয় জীবনে। ইয়ুসুফের সঙ্গে মাধবীর ভালোবাসা অনেকটা ঘাসের মতো। ঘাস যেমন চিরদিন থাকে, মরে গিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে মাধবী ও ইয়ুসুফের প্রেমের মধ্য দিয়ে এইসত্য প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় ‘গুণীজনোচিত’ ছোটগল্পটি আত্মকথন ভঙ্গীতে লেখা। এ গল্পের নায়িকা, তার সঙ্গীতজ্ঞ স্বামী ও প্রভাস এই তিনটি চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠেছে এর কাহিনি। এটি একটি সার্থক প্রেমের গল্প। সুরের মধ্য দিয়েই উভয়ের মধ্যে রাগ অনুরাগ গভীর প্রেমালাপ হাস্য পরিহাস ব্যক্ত হয়েছে। সঙ্গীতজ্ঞা প্রতিভা দেবীর ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধি এই গল্পে জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে।

‘শব্দ-ব্রহ্ম’ গল্পের নায়ক শুভেন্দু। সে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। গল্পের নায়িকা এষা উচ্চশিক্ষিতা। উভয়ের মধ্যে চলতে থাকে প্রেমের টানাপোড়েন। গল্পের পরিণতি হতাশা-ভরা সাহারা মরুভূমি তুল্য। তাদের জীবন মরুভূমির মতই শুষ্ক ও উত্তপ্ত থেকে গেছে। এই দুর্গম মরুভূমি তারা পাড়ি দিতে পারেন নি।

‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’ গল্পটির নায়িকা বিদ্রোহী এলালতা। যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে বহু চিঠিপত্র লেখা-লেখি করেছেন। বিপ্লববাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে একদিন তাকে নিঃশব্দে মরে যেতে হল কলকাতার এক অখ্যাত বস্তিতে। এলার দাদা কৃষ্ণ রায় ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সংঘের একচ্ছত্র নায়ক। কোন এক ষড়যন্ত্র মামলার বিচারে যাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকালে আসামী কৃষ্ণ রায়ের ডায়েরি খুলতে গিয়ে পেলেন তাঁর মৃত বোন এলালতার হাতের লেখা। এটি দেখে কৃষ্ণ রায়ের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার সার্থক রূপ দিয়েছেন এই ছোটগল্পে।

‘অন্ধকার’ ছোটগল্পের নায়ক বীরেশ্বর নায়িকা রাধা। তারা প্রত্যেকেই স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত। দেশ উদ্ধারের জন্য তার নিজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। একদিন বীরেশ্বরকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ধরা পড়তে হয় পুলিশের হাতে। বোমা, পাইপগান, ছোরা, লাঠি, বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।

বীরেশ্বরের ধরা পড়ার সংবাদে রাধার মন গেল ভেঙে। বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়ে রাধা আত্মহত্যার পথকে বেছে নিতে চায়। আত্মহত্যার আগে বীরেশ্বর ও ঈশ্বরের কাছে রাধা ক্ষমা প্রার্থনা করে। ‘অন্ধকার’ গল্পের এই করুণ পরিণতি প্রতিভা বসু অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করেছেন।

বহু বিচিত্র স্বাদের ছোটগল্পের স্রষ্টা প্রতিভা বসুর বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এই প্রতিভাময়ী বিদূষী লেখিকার জীবনের একটি বড় স্বপ্ন ছিল স্বামী বুদ্ধদেব বসুর জীবন অবলম্বনে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এবং তাঁর জন্মভূমি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর খাঁসাড়া গ্রামে মৃত্যুর আগে একবার উপস্থিত হবেন। বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রতিভা বসুর এই দুটি স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্নও বাস্তবায়িত হয়নি ২০০৬ সালে ১৩ই অক্টোবর তারিখে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাময়ী প্রতিভা বসুর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সাহিত্য সারদা আশাপূর্ণা দেবী বাংলা সাহিত্যের এক সার্থকনামা ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার। তিনি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁর বিপুল সাহিত্য সৃষ্টির জন্য এবং নরনারীর সম্পর্কের নিখুঁত বিশ্লেষণের দ্বারা। তিনি যখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন সাহিত্য অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, মনোজ বসু, প্রমথনাথ বিশী, বনফুল, অনন্যদাশঙ্কর রায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ। আশাপূর্ণা দেবীর নাম এই সাহিত্যিকদের পাশাপাশি সমভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

আশাপূর্ণা দেবী ১৯০৯ সালের ৮ই জানুয়ারী কলকাতার পটলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিল্পী। তিনি সি. লাজারাস এন্ড কোং এর ডিজাইনার ছিলেন। মা সরলাসুন্দরী দেবীর ছিল সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। তিনি তাঁর পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে অবসর সময়ে গ্রন্থ পাঠ করে সময় কাটাতেন। তাঁদের গৃহে লাইব্রেরী থেকে অসংখ্য বই ও পত্র-পত্রিকা আসত। রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে আশাপূর্ণার জন্ম হলেও ছোটবেলা থেকে উপন্যাস, গল্প, নাটক, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ ছিল। তাঁর লেখার প্রেরণা যুগিয়েছিল মা সরলাসুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথাগত শিক্ষা লাভ করেননি, আশাপূর্ণাও তেমনি প্রথাগত স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভ না করেও নিজস্ব সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ঠাকুমা ছিলেন প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল ভাবনায় বিশ্বাসী। তিনি তাঁর পরিবারের কোন ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পড়বার অনুমতি দেন নি। একমাত্র ছেলেদের জন্যই গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হতো। শৈশবে আশাপূর্ণার ভাইয়েরা যখন পাঠ শুনত তখন তাদের বিপরীত পাশে বসে থেকে আশাপূর্ণা অক্ষরজ্ঞান লাভ

করেছিলেন। স্ব-শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন আশাপূর্ণা দেবী।

আশাপূর্ণা এবং তাঁর বোন কবিতা পাঠ করতেন। কবিতাপাঠের পর তাদের মধ্যে আলোচনাও হত। তেরো বছর বয়সে ‘শিশু সাথী’ পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন রাজকুমার চক্রবর্তী। কবিতাটির নাম হল ‘বাইরের ডাক’। রাজকুমার চক্রবর্তী আশাপূর্ণাকে উৎসাহিত করে বলেছেন তাঁকে অনেক অনেক কবিতা ও ছোটগল্প লিখে পাঠাতে হবে। শিশুদের জন্য পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর থেকে ছিয়াশি বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর লেখা থামে নি। পনেরো বছর যখন তাঁর বয়স সে সময় ‘খোকা খুকু’ পত্রিকায় ‘স্নেহ’ নামে একটি কবিতা লিখে প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হন। বড়দের জন্য প্রথম লেখা ছোটগল্প প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৪৩ সালে। গল্পটির নাম ‘পত্নী ও প্রেয়সী’। তখন তাঁর বয়স আটশ বছর।

পনেরো বছর বয়সে আশাপূর্ণার বিবাহ হয় কালিদাস গুপ্তের সঙ্গে। বিয়ের পর তিন বছর তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরে। তারপর ভবানীপুরের রমেশ মিত্র রোডে তারা চলে আসেন, সেখান থেকে ৭৭ বেলতলা রোডে থাকেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। গোলপার্কে তারা চলে আসেন সপরিবারে পুত্র সুশান্ত কুমার ও নাতনি নুপুর ও শতরূপাকে নিয়ে। ১৯৭০ সাল থেকে কালিদাস গুপ্ত ও আশাপূর্ণা দেবী গড়িয়ায় কানুনগো পার্কে নিজস্ব গৃহে বাস করেন। ১৯৯৫ সালের ১৩ই জুলাই তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত এই গৃহেই ছিলেন। গৃহবধু থাকার সঙ্গে সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ১৭৯ টি উপন্যাস, ছোটদের বই ৬২টি এবং প্রায় ৩০০০ টি ছোটগল্প রচনা করেছেন। শিশুদের উপযোগী ‘ছোট ঠাকুরদার কাশী যাত্রা’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৩ খ্রীঃ। বড়দের জন্য উপন্যাস ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দতে।

লেখিকার ১৫ টি উপন্যাস ও গল্প অবলম্বনে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় ২৪টি ফিল্ম হয়েছে। তাঁর উপন্যাস নিয়ে ৭ টি নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য অবলম্বনে রেডিওতে অনেক নাটকের উপস্থাপন হয়েছে। এছাড়া টি.ভি. সিরিয়ালও হয়েছে অনেক।

জনপ্রিয়তার কারণে ৪৯টি উপন্যাস হিন্দীতে, ১টি অসমীয়ায়, ৪টি ওড়িয়া ভাষায়, ৫টি মালয়ালাম ভাষায়, ১টি মারাঠীতে ও ইংরেজীতে দুটি অনূদিত হয়েছে।

তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস — ‘দ্রবী’, ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলকথা’। মা মেয়ে ও তার মেয়ে তিন প্রজন্মের এই তিন জনের জীবনকথাকে তিনি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নির্মাণ করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী বহু পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ‘লীলা’ পুরস্কার দিয়ে আর ‘যুগান্তর’ পত্রিকা ১৯৪৯ খ্রীঃ ‘মতিলাল’ পুরস্কার

দিয়ে সম্মানিত করে। ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ খ্রীঃতে। ১৯৬৬ খ্রীঃ ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন এবং এই গ্রন্থের জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৭৫ খ্রীঃ। ১৯৮৬ খ্রীঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক হরনাথ ঘোষ স্মৃতি পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন। শরৎ পুরস্কার পেয়েছেন ১৯৮৯ খ্রীঃ। ১৯৯৩ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পেয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আশাপূর্ণা দেবীকে ‘পদ্মশ্রী’ এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দেশিকোত্তম উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। সাহিত্য একাডেমির ফেলো নির্বাচিত হন ১৯৯৪ খ্রীঃ। ডি.লিট. সম্মানে সম্মানিত হন ১৯৮৩ খ্রীঃ জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও ডি.লিট. সম্মানে সম্মানিত হন তিনি।

আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ত্রয়ী বা ট্রিলজি উপন্যাস। তিনি ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, ‘সুবর্ণলতা’ ও ‘বকুলকথা’ লিখে ভারতীয় সাহিত্যের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। এই তিনটি উপন্যাসে সামাজিক বিবর্তনের ধারা পুরুষানুক্রমে ধরা পড়েছে। বহির্বিশ্বে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘটছে জীবনবোধের পরিবর্তন। অন্তঃপুরের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সংস্কার সব কিছুর ভাঙন, বিন্যাস ও পরিণতির নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের মাধ্যমে। মাতামহী, মাতা ও দৌহিত্রীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কে উপন্যাসের পাতায় মেলে ধরেছেন লেখিকা।

‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে পিতৃতন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে আমরা পেয়েছি সত্যবতীর পিতা রামকালী চট্টোপাধ্যায়কে। নায়িকা সত্যবতীর স্বামী নবকুমারও পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি। সত্যবতী ও সুবর্ণলতা প্রথাগত শিক্ষা লাভ করতে পারে নি। বকুলের মধ্য দিয়ে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে যে শপথের ইশারা ছিল সুবর্ণ ও বকুল তা রক্ষা করতে পারে নি। এই তিনটি উপন্যাসে লেখিকা মানব প্রেমের জয়বার্তাকে বহন করে এনেছেন। সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল তারা বিদ্রোহিণী নারী, মূর্তিমান প্রতিবাদস্বরূপ। ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে আমরা বকুলকে বলতে শুনি —

“মা-মাগো। তোমার পুড়ে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া লেখা, না -লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো। সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।” ৭৭

শ্রদ্ধেয় সমালোচক সরোজ বন্দোপাধ্যায় ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাস সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন -

“মহিলা গুণাবিতা এক স্ত্রী তাঁর উপন্যাসের বর্ণনা রীতিতে, সংলাপ দক্ষতা, ঘটনা বিন্যাসে বরাবর লক্ষ্য করা গেছে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’তে সেই সমস্ত গুণাবলী সুসমন্বিত। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লেখিকার কাল চেতনা, কালের রূপান্তর সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ অনুভূতি।” ৭৮

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের “তাঁর মধ্যে পাওয়া যায় বিশ্বমানবিকতার পরিচয়” শীর্ষক স্মৃতিচারণ মূলক লেখায় আমরা পাই —

“আশাপূর্ণা দেবী চরিত্রগুলির মাধ্যমে তাদের গতির মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের উত্তরণের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মেয়েদেরও এই পৃথিবীতে সমান ভাগ রয়েছে। এই পৃথিবীটা শুধু পুরুষদের শাসনের জন্য নয়, এখানে মেয়েদের ভূমিকা কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষদের থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় নারীর লালিত্য, নারীর মাধুর্য না পেলে পুরুষদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যায়।” ৭৯

বস্তুত এই ত্রয়ী উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে অন্দরমহলের নারীর সুখভাঙা আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস। আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন —

“বাংলাদেশের সেই অজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভূতে যারা বহন করে এনেছিল প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।” ৮০

এছাড়া আশাপূর্ণার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল - ‘মিতির বাড়ী’, ‘বলয়গ্রাস’, ‘অগ্নিপরীক্ষা’, ‘কল্যাণী’, ‘নির্জন পৃথিবী’, ‘শশীবাবুর সংসার’, ‘উন্মোচন’, ‘অতিক্রান্ত’, ‘নেপথ্য নায়িকা’, ‘জন্ম জন্ম কি সাথী’, ‘সমুদ্র নীল আকাশ নীল’, ‘যোগবিশেষ’, ‘ছাড়পত্র’, ‘নবজন্ম’, ‘আংশিক’, ‘এঘর-ওঘর’ প্রভৃতি।

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা’ গ্রন্থে লিখেছেন

--

“আশাপূর্ণা দেবীর কোন কোন উপন্যাসে গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে বহির্জগতের আকর্ষণ কিছুটা বিসদৃশভাবে মিশিয়াছে ; কোথাও বা রোমান্সের সুলভ বর্ণপ্রক্ষেপ এই ধূসর, সমস্যাশ্চুর্নক জীবনে কিছুটা বৈচিত্র্য আনিয়াছে। কিন্তু লেখিকার জীবন নিরীক্ষার সত্যসার এই গৃহজীবনের মধ্যেই নিহিত আছে।” ৮১

‘মিতির বাড়ী’ উপন্যাসের বিষয়, এক যৌথ পরিবারের জীবন কাহিনী। ‘শশী বাবুর সংসার’ উপন্যাস সংসারের দুঃখ-বেদনা-হাসি-আনন্দের রসে সমুজ্জ্বল। আশাপূর্ণার ‘অগ্নি পরীক্ষা’ উপন্যাসটি রকৌতুক ও মধুর হাস্যরস পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়। পারিবারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও সমস্যা ‘উন্মোচন’ উপন্যাসের বিষয়। জীবন সমস্যা এবং তা থেকে উত্তরণের ইঙ্গিত রয়েছে ‘নির্জন পৃথিবী’ উপন্যাসে ‘নেপথ্য নায়িকা’ উপন্যাসের নায়িকা মাধবী। সে নেপথ্যে

থেকে উপন্যাসের কাহিনীর গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর ‘ছাড়পত্র’ উপন্যাসের পটভূমি হল দুই নর-নারীর বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা। শচীপতি ও মন্টু এই দুজনের জীবনের উত্থান-পতন নাটকীয় তাৎপর্যে পরিবেশিত হয়েছে ‘মুখর রাত্রি’ উপন্যাসে। একটি তরুণী মেয়ের জীবন কাহিনি অবলম্বনে রচিত হয়েছে ‘উত্তরণ’ উপন্যাস।

সাহিত্য সম্রাজ্ঞী আশাপূর্ণার বিখ্যাত পরলোক সম্বন্ধীয় উপন্যাস ‘এঘর-ওঘর’। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘দেবায়ান’ উপন্যাসের পরে পরলোক সম্বন্ধীয় ‘এঘর-ওঘর’ উপন্যাসটি রচনা করেছেন আশাপূর্ণা দেবী।

আশাপূর্ণা দেবী যৌথ পরিবার ও ভেঙে যাওয়া পরিবারের সমস্যা এবং কোন কোন উপন্যাসে সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবন ছিল তার উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি। স্ত্রী-পুরুষের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, প্রেম-প্রীতি, ঘৃণা, জীবনের অন্তর্গত জটিলতা মনোগহনের আলো-আঁধারি পরিবেশ তাঁর উপন্যাসে পেয়েছে সার্থক শিল্পরূপ।

আশাপূর্ণা দেবী একজন প্রতিষ্ঠিত ছোটগল্পকার। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে আগ্রহী পাঠক পায় জীবনরসের সন্ধান। তিনি যে অনুভূতির কথাকার তাঁর ছোটগল্পগুলি সেটা প্রমাণ করে দেয়। তাঁর গল্পে যেমন অত্যাচারিত, গৃহচ্যুত গৃহবধূরা স্থান পেয়েছে তেমনি কলহপরায়ণা স্ত্রীর দ্বারা বিপন্ন গৃহকর্তার যন্ত্রণার ছবিও জীবন্তভাবে ফুটে উঠেছে। আবার বাড়ির পরিচারিকার কঠোর শাসনে কর্মরত পিতামাতার সন্তানের মস্তিষ্ক বিকৃতির ছবিও আছে। তেমনি সন্তানহীন গৃহের শূন্যতার ছবিও দুর্লভ নয়। আশাপূর্ণা বলেছেন —

“চিরদিনই আমার লেখার উপজীব্য গৃহগভীবদ্ধ কিছু সাধারণ মানুষ। আমার কলমের বিচরণ ক্ষেত্রের সীমানাও সীমিত গভীর মধ্যে আবদ্ধ। তাই এইসব গল্পের কাঠামোয় গল্প জিনিসটা স্বল্পই আছে। তবু সেখানেও কত বিচিত্র রং বিচিত্র স্বাদ। কত বৈচিত্র্য আর জটিলতা-বিশালতা আর ক্ষুদ্রতার টানাপোড়েন..... আর এগুলি যখন ধরা পড়ে যায় তখন অনুভবে আসে মানুষ কত অসহায়। সে অসহায়তা হয়তো আপন হৃদয়ের কাছেই। লোভের কাছে, বাসনার কাছে, অন্ধ আবেগের কাছেই।” ৮২

এবার আশাপূর্ণার কিছু ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করছি —

তাঁর ‘অপরাধ’ ছোটগল্পের পরেশ একটি ছোট কারখানার শ্রমিক। তাঁর স্ত্রীর নাম কল্যাণী। একদিন পরেশের জ্ঞাতিভাই নীরেন তাদের বাড়িতে আসে। অভাবের সংসারে নীরেনের আদর আপ্যায়নের কোন ক্রটি হয় নি। একদিন নীরেনের পাঞ্জাবি থেকে একটি সোনার বোতাম উধাও হয়ে যায়। পরেশ কারখানা থেকে ফিরে কল্যাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। তাদের মধ্যে

গুরু হয় মতান্তর। সৎ ও নির্লোভ নারী কল্যাণী বিবেকের যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়। এরূপ কল্যাণী নারিমূর্তিকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করাতে পরেশের কোন দ্বিধা দেখা যায়নি। অবশেষে দেখা গেল সেই বোতামটি আসলে নীরেনের জামার পকেটেই ছিল। যাবার বেলায় নীরেন পরেশের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। গৃহবন্দী নারীকে যে কোন অজুহাতে অপরাধী সাজানোর মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আশাপূর্ণার লেখনী ঝলসে উঠেছে।

‘তাসের ঘর’ গল্পে রয়েছে যৌথ পরিবারের কাহিনি। ননদ, জা, শাশুড়ি নিয়ে মমতার সংসার। একদিন তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে জেল পালানো মামাতো ভাই কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় নেয় মমতার গৃহে রাতের অন্ধকারে। পরের দিন ননদ তরঙ্গিনী সন্দেহের তির ছোড়ে, শাশুড়ি সন্দেহ প্রকাশ না করলেও তার দেওর বলে — ‘মেয়ে মানুষকে বিশ্বাস নেই’। ৮৩

স্বামী ফিরে আসবার পর ব্যঙ্গের সুরে স্ত্রীকে আঘাত করে। মমতা এই মিথ্যে অভিযোগের জন্য সংসার ছেড়ে পিত্রালয়ে চলে যেতে চায়। স্বামী সুধাংশু তার মেয়ের বিয়ের কথা ভেবে মমতার এই সিদ্ধান্তকে মানে নি। কিন্তু প্রকৃতই কি এই অবলা নারী স্বামীর কাছ থেকে পূর্বের মতো ভালোবাসা পেয়েছিলো? এই জিজ্ঞাসাই আশাপূর্ণা রেখেছেন এই গল্পে।

‘ছুটি নাকচ’ গল্পে আশাপূর্ণা বিনা দোষে আসামি এক গৃহবধূর করুণ কাহিনি গুনিয়েছেন। মালতী তার স্বামী অমূল্যকে নিয়ে শহরের এক ধনী বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে। এদিকে মনিব গিন্নী দশ ভরির চেন অগ্রিম দিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে সন্তানহীনা মনিব কন্যার জন্য হাসপাতাল থেকে ছেলে চুরির চক্র তৈরী করে। অল্পবুদ্ধি মালতী ধরা পড়ে যায় এবং তার তিনবছরের জেল হয়। জেল থেকে বেরিয়ে স্বামী অমূল্য একদিন ছুটির দিনে তাকে নিয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু ছুটির পরে অমূল্যকে আর দেখা যায়নি। এক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিষাপ নেমে আসে মালতীর জীবনে। তারপর ঠিকানাহীন নিঃসঙ্গ মালতী জেলফেরৎ ভাড়াটে গুন্ডা নিকুঞ্জকে নিয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। ভদ্র লোকের সমাজ বর্জিত নিকুঞ্জ মালতীকে জীবন সাথী করে অবশিষ্ট দিনগুলি সুখে কাটায়।

‘মফঃস্বল বার্তা’ ছোটগল্পের নায়ক বিশ্বজিৎ, নায়িকা নীলা। বিশ্বজিৎ জেলপালানো আসামি। ১১ বছর পরে বিশ্বজিৎ রাতের অন্ধকারে স্ত্রী ও কন্যার কাছে ফিরে এসেছিল। স্কুলশিক্ষিকা নীলা তাকে জানায় সে কোন অন্যায় করেনি। এই ঘৃণিত পলাতক স্বামীর প্রতি অগাধ ভালোবাসার ফলস্বরূপ বিশ্বজিৎ ফিরে পেতে চেয়েছে তার স্ত্রী, সন্তান ও সংসার। অন্যত্র চলে গিয়ে তারা নূতন জীবন কাটায়। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় মা ও মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে। মেয়ে খুকু উঁচু ক্লাসের ছাত্রী, সে জানত তার পিতা মৃত। কিন্তু আকস্মিকভাবে বিশ্বজিৎের এই আগমনকে খুকু মেনে নেয়নি। তার প্রতিবাদ স্বরূপ পাহারাওয়ালারা বিশ্বজিৎকে ধরে নিয়ে যায়। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় চাঞ্চল্যকর

সংবাদ —

“দিবা দ্বি প্রহরে জনৈকা শিক্ষায়িত্রীর উপর দুর্বৃত্তের আক্রমণ। বালিকা কন্যার প্রত্যাশপন্নমতিতে জননীর সম্মম রক্ষা।” ৮৪

এই পলাতক খুনী আসামির কথা পুলিশ প্রকাশ করে দেয়। এরপর নীলার উদ্যোগে বিশৃঙ্খল ছাড়া পায় এবং পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠে সু-সম্পর্ক। কিন্তু সত্য গোপন করবার চেষ্টা করায় তাদের সন্তান খুকুর মনে ভ্রান্তি থেকে যায়।

‘অর্থহীন’ ছোটগল্পের নায়ক অমলেশ, নায়িকা অনুভা। তারা দুজনে ভালোবেসে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। অনুভা যখন পিত্রালয়ে এসেছিল তার পিতা তখন বাড়ি সাজানোর কাজে ব্যস্ত। সে সময়ে অনুভা তখন জানতে পারে তার সন্তানহীনতার অন্যতম কারণ অনুভা নিজেই। অনুভা সেলাই এর স্কুল চালিয়ে দিন অতিবাহিত করত। সেখানে এক বিধবার সঙ্গে অমলেশের গড়ে ওঠে প্রেম। অনুভার সঙ্গে অমলেশের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর বিধবার গর্ভে এক সন্তানের জন্ম হয়। সন্তান বুড়ুসু অনুভা একাকীত্বের যন্ত্রণা নিয়ে দিন অতিবাহিত করে। অমলেশের মতো সে দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবেনি।

আশাপূর্ণার ‘ভালোবাসার নাম প্রতারণা’ গল্পে মালা ও পরাশর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত করে। মালা কিন্তু সন্তানহীনতার যন্ত্রণায় কাতর। হস্তরেখাবিদও জানায় তার সন্তানহীনতার কথা। পূজোপাঠ করে দেবতার কাছে সন্তান কামনা করে। মালার কথা ভেবে মিথ্যে প্রতারণার মধ্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করতে চায় অমলেশ। সে জানায় সন্তানহীনতার জন্য দায়ী নয় মালা, দায়ী সে নিজে। কিন্তু নারীর এই কোমল হৃদয় সন্তানহীনতার জ্বালায় দ্বন্দ্ব হতে থাকে।

‘স্টিলের আলমারী’ আশাপূর্ণার অনবদ্য সৃষ্টি। এই গল্পে পরিতোষ ও লতিকার দাম্পত্য জীবনের কথা আছে। ভবতোষ পরিতোষের জ্যাঠাতুতো ভাই। দুভাই এর মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা মধুর ছিলো না। ভবতোষ একদিন দূরের শহর থেকে ফিরে আসে পরিতোষ ও লতিকার গৃহে। কিন্তু লতিকা দাদা-ভাইয়ের এই সম্পর্ককে অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়নি। লতিকা একদিন ভবতোষকে কলকাতা থেকে একটি স্টিলের আলমারি কিনে আনতে বলে। এটি ছিল তার বহুদিনের ইচ্ছে। এজন্য পরিতোষ লতিকাকে শাসন করে —

“আঃ ! আবার সেই বাচ্চাবেলার মতন বড়দা বড়দা !

বলি তোর এই চারিদিকে টানাটানির সময়, ছেলেদের পরীক্ষার ফী লাগবে, দুশ্চিন্তায় সারা হচ্ছি, এর থেকে

তোর বৌদির স্টিলের আলমারিটা জরুরি হল ?” ৮৫

আশাপূর্ণার লেখনীতে লতিকার সরলতা ও উদারতার পরিচয় মেলে।

‘ইজ্জত’ আশাপূর্ণার সমাজ অভিজ্ঞতামূলক গল্প। এক পরিচারিকার সুন্দরী মেয়ের কাহিনি এই গল্পটি। শহরের এক বস্তিতে যেখানে বাজে লোকের উৎপাত, সেখানে তার মা এক মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়ের নিরাপত্তার জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করে। স্ত্রী রাজি হলেও স্বামী বস্তির মেয়েকে রাখার জন্য কেলেঙ্কারি হতে পারে ভেবে স্ত্রীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। তখন আশ্রয় প্রার্থিত মেয়েটি জানাতে বাধ্য হয় বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের কোন ইজ্জত নেই। ছোটলোকদের ব্যবস্থা হবে ছোটলোকের মতই। এর ফলে গৃহস্থ ঘরের স্বামী ও বস্তির মেয়ে দুজনেরই ইজ্জত থাকেনি।

‘জালিয়াত’, গল্পে শান্তিপ্রিয় স্ত্রী সাত্তনা ও শক্তিনাথের এক মাত্র মেয়ে। পিতার শাসনকে উপেক্ষা করে বাড়ি থেকে চলে যায়। ইতিমধ্যে শক্তিনাথের ছোটছেলে খানায় ধরা পড়ে। এজন্য শক্তিনাথ দায়ী করে তার স্ত্রীকে। এখানে প্রকৃতপক্ষে জালিয়াত কে ? স্ত্রী না স্বামী। যে স্বামী সবকিছু না বোঝার ভান করে থাকে সেই জালিয়াত হিসেবে চিহ্নিত। যে কোন সংসারে পিতা-মাতার থাকে যৌথ দায়িত্ব। একক ভাবে বউকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। একথাই আশাপূর্ণা আলোচ্য গল্পে বলতে চেয়েছেন।

‘নিবারণচন্দ্রের শেষ কৃত্য’ ছোটগল্পে রায়বাহাদুর নিবারণচন্দ্র বয়সে প্রবীণ, তার স্ত্রীর বয়সও তিরিশি। বয়সের ভারে একদিন নিবারণচন্দ্র মারা গেলেন। আয়োজন করা হল তার শ্রাদ্ধশান্তির। শ্রাদ্ধে বিপুল খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করা হল। নিবারণচন্দ্র এক-আধদিন সাহেবদের সঙ্গে ইয়ে খেতেন। এটি ভেবে স্কচ-হুইস্কি আনার প্রস্তাব করা হল। ইতিমধ্যে কক্সালসার এক বিধবা, হেমাঙ্গিনীকে জানালেন নিবারণচন্দ্র অনেকদিন ধরে আঙুর খেতে চেয়েছিল, এই শ্রাদ্ধে আঙুর না দিলে তার আত্মার হয়ত শান্তি হবে না। এই গল্পের মূল থিম হল মৃত্যু। এই মৃত্যু যথাসময়ে না ঘটলে বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা তাদের মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। নূতন কালের উদাসীনতার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ নিষ্ক্ষেপ করেছেন আশাপূর্ণাদেবী এই গল্পে।

‘নিজের জন্য শোক’ একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। বৃদ্ধ অবিনাশ চন্দ্র ও তার স্ত্রী শৈলবালাকে নিয়ে এই গল্পের কাহিনি বয়ন হয়েছে। নাতি-নাতনিদের নিয়ে বড় সংসার, সবার নজর নূতন প্রজন্মের দিকে। এজন্য স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভে ইচ্ছুক অবিনাশ সেনের আশা চরিতার্থ হয় নি। তার ভাগে খাদ্যও জোটে যৎসামান্য। স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত অবিনাশ নিঃসঙ্গ থেকে মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত হয়। একদিন তিনি হঠাৎ বুকের ব্যথা অনুভব করেন। মনে করেন হয়তো তার স্টোক হয়েছে। অবিনাশ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করলে স্ত্রী ছুটে আসে। এদিকে অবিনাশ চোখ বন্ধ করে মৃতের মত পড়ে থাকলেন। কবিরাজের মেয়ে তার স্ত্রী। নাড়ি দেখে বোঝেন তেমন কোন সমস্যা নয়। যথাসাধ্য সেবা করে চলে যাবার সময় অবিনাশ তার স্ত্রীকে একটু পাশে গুতে বলে। স্ত্রীর

একটু কোমল স্পর্শে, একটু মিষ্টি কথায় তার হয়তো হৃদয় জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু নাতি নাতনির জন্য তার সেই প্রয়াস ব্যর্থতা হয়। অবিনাশ তখন নিঃসঙ্গ ঘরে কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে।

‘মাথা ধরা’ আশাপূর্ণার একটি কৌতুক ও কারুণ্য মেশানো গল্প। অসিত যখন কলকাতায় থাকত তখন তার মধ্যে দেখা গিয়েছিল প্রাণচঞ্চল্য। কিন্তু কর্মসূত্রে ব্যাঙ্গালোরে বদলি হয়ে যাওয়ায় সে এবং তার স্ত্রী করবী নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকে। করবী এই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্ত হবার জন্য অসিতের অফিসের বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করে, আড্ডা দেয় ও তাস খেলে। তার স্বামী অসিতের প্রতি কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করেনি। ইতিমধ্যেই তার মেয়েটিও বড় হতে থাকে। আড্ডাবাজ মাকে দেখে তার মেয়েটিও বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। স্ত্রী ও কন্যার এই অবাধ মেলামেশাকে গল্পের নায়ক অসিত কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। নিঃসঙ্গতার জ্বালা নিয়ে অসিতের দিন অতিবাহিত হয়।

‘প্রাণাধিকা সুখ’ গল্পে দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামী শচীনাথ ও স্ত্রী লীলার প্রশ্নে দুই ছেলে বিপথগামী হয়েছে। বড়ছেলেকে খুঁজতে গিয়ে জানতে পারে তার ছোট ছেলেই বড় ছেলেকে হত্যা করেছে। এজন্য শচীনাথ লীলাকে গালাগাল করে। এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় শচীনাথ। একটা উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে সন্তানের এই অধঃপতনে শোকাহত পিতামাতার ছবি আশাপূর্ণা দেবী শিল্পসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এছাড়া তাঁর ‘অভিনেত্রী’, ‘আত্মহত্যা’, ‘ভয়’, ‘ছিন্নমস্তা’, ‘সীমারেখার সীমা’, ‘পৌরুষ, অন্যস্বর’, ‘নিখাদ পৃথিবী’, ‘চিরন্তনী’, ‘সর্পশিশু’, ‘আত্মহত্যা’, ‘অনাচার’, ‘আহত খানা’, ‘বরফজল’, ‘অঙ্গার’, ‘শান্তি’, ‘দুঃসাহস’ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি বাঙালির পরিবার জীবনের অন্যতম দলিল। তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি রক্ত মাংসে গড়া ও জীবন্ত হতে পেড়েছে।

শিশুদের জন্য লেখা তার ‘দূরবীন’ গল্পটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ‘দিব্যেন্দু সুন্দর’ গল্পটি বাংলার কিশোর কিশোরীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

আশাপূর্ণার বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রন্থ গুলিতে বিষয় ভাবনা ও ভাষাশৈলীর সার্থক পরিচয় মেলে। এজন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম শ্রেণির শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন যে, উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনায় আশাপূর্ণা অনন্যা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখিকা বিশিষ্ট সমাজসেবিকা, অধ্যাপিকা, সাংবাদিক, সুবক্তা, গবেষক, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী মহাশ্বেতা দেবী একটি জনপ্রিয় নাম। তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে বাংলা সাহিত্যে সংযোজিত হল সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক

জীবনের এক নূতন ধারা। তিনি ছিলেন বাস্তব জীবনের যথার্থ রূপকার।

মহাশ্বেতা দেবীর জন্ম ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। পিতা ছিলেন কল্লোল যুগের অন্যতম লেখক মনীশ ঘটক। যিনি যুবনাশ্ব ছদ্মনামে পাঠকমহলে পরিচিত। বহু উপন্যাস ও ছোটগল্পে লিখে তিনি খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর ‘পটল ডাঙার পাঁচালী’ উপন্যাস অন্ত্যজদের দোহপ জীবন এবং চোর, ভিখিরি, পকেটমার ও দেহজীবিনীদের নিয়ে লেখা। অবহেলিতরা যুবনাশ্বের লেখনীতে প্রথম উপস্থিত হন। পিতৃপ্রদত্ত এই সহজাত মানসিকতা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাশ্বেতা ঘটক। মা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ও সাহিত্যিক। তাঁর লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল ‘মাসিক বসুমতী’, ‘জয়শ্রী’ ও ‘পরিচয়’ পত্রিকাতে। বাবা-মা’র প্রভাব ছোটবেলা থেকেই মহাশ্বেতা দেবীর উপর পতিত হয়েছিল।

বারবার স্থান বদল ঘটেছে মহাশ্বেতার শিক্ষাজীবনে। তাঁর প্রথম শিক্ষারস্ত্র ঘটে ঢাকার ইডেন মন্তেসরি স্কুলে। তারপর মেদিনীপুর মিলন স্কুলে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯৪২ -এ তিনি মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ -এ তিনি ইংরেজি বিষয়ে অনার্স নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে উত্তীর্ণ হন। এরপর তাঁর পড়াশুনায় সাময়িক কালের জন্য ছেদ পড়ে। ১৭ বছর পর ১৯৬৩ -তে তিনি বহিরাগত পরীক্ষার্থী হিসেবে ইংরেজি বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শান্তিনিকেতন থেকে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪৭ -এর ১০ ই ফেব্রুয়ারি প্রখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। গণনাট্যের অন্যতম সক্রিয় কর্মী বিজন ভট্টাচার্যের পত্নী হবার সুবাদে মহাশ্বেতা অবহেলিত জনতার মূল্য সম্পর্কে ছিলেন সচেতন, এই প্রেক্ষিতকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। বিবাহের পর তিনি পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশনে, তারপর রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা পদে বৃত্ত হন। তিনি অধ্যাপনাও করেছিলেন বিজয়গড় জ্যোতি রায় কলেজে। কিছুদিন ডাক ও তার বিভাগেও কর্মসূত্রে যুক্ত ছিলেন। এটাও জানা যায়, তিনি জীবিকার কারণে আমেরিকায় বাঁদর চালান দেবার টেন্ডার পাবার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন।

বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহাশ্বেতার বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন অসিত গুপ্তের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মহাশ্বেতার সঙ্গে এই বিবাহও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। দ্বিতীয়বারও তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। স্বামী – প্রেমবঞ্চিতা, বিবাহবিচ্ছেদ কাতরা এই মহিষসী নারী বুকে গভীর যন্ত্রণা নিয়ে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কালি কলমকে। সেই হিসেবে গ্রন্থই তাঁর পরমবন্ধু। তাঁর সৃষ্টিশীল গ্রন্থগুলি মহাকালের কণ্ঠি পাথরে যাচাই করা সোনা হিসেবে গণ্য হয়েছে। এরপর কিছুদিন সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন। ‘যুগান্তর’, ‘বসুমতী’, ‘আজকাল’, ‘বর্তমান’, ‘ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি’, ‘বিজনেস

স্ট্যাভার্ড', 'সানডে', 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'নিউ রিপাবলিক' ও 'যোজনা' প্রভৃতি পত্রিকায়ও সাহিত্যচর্চার কাজে যুক্ত থাকেন তিনি। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'ত্রৈমাসিক', 'পত্রিকা', 'বর্তিকা'র সম্পাদনার দায়িত্বভার তিনি পালন করেন। এই পত্রিকার সম্পাদনার সময় থেকেই তিনি সাহিত্য রচনাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।

মহাশ্বেতা এমনি একজন লেখিকা যার পদবী প্রথমে ছিল ঘটক। তারপর বিবাহসূত্রে ভট্টাচার্য আবার ভট্টাচার্য থেকে দ্বিতীয়বার বিবাহসূত্রে গুপ্তা অভিধায় চিহ্নিত হলেও তিনি আমাদের কাছে দেবী হিসেবে চিহ্নিত মহাশ্বেতা দেবী। অত্যন্ত মেধাবী ও দীপ্ত গবেষক মহাশ্বেতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রতিনিধিত্ব করে ভারতের গৌরবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। ভারত ও ফরাসি সরকারের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রমে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে গিয়েছিলেন। ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি দলের অন্যতম সভ্য হিসেবে ফ্রান্স ফুট বইমেলায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ সুবক্তা মহাশ্বেতা দেবী লন্ডন ও পশ্চিম জার্মানিতে একাধিকবার বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯৮৮ খ্রীঃ আমেরিকার পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মার্কসিস্ট স্টাডি সার্কল' এর আমন্ত্রণে উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৯৯০ খ্রীঃ আমেরিকায় বিশিষ্ট ফুলব্রাইট লেকচারার হিসেবেও তিনি আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। জেনেভাতে একটি শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। সেই সম্মেলনের মূল বিষয় ছিল - 'তৃতীয় বিশ্বের কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক উন্নয়ন'। এ বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামতগুলো এই সম্মেলনের প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করেছিল। এছাড়া এই বছরেই তিনি একদিকে ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ফ্রান্সের সংস্কৃতি সংস্থার পক্ষ থেকে যুগ্ম আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। ভারতের সুনামগরিক হিসেবে ব্যক্তিত্ব ও পণ্ডিত্যের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেলেন ভারতবাসীরা তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

মহাশ্বেতা দেবী নানা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য। ১৯৭৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে লীলা পুরস্কার ও শরৎচন্দ্র স্মৃতি পদক। ভুবন মোহিনী পদক ও জগত্তারিণী স্বর্ণ পদক যথাক্রমে ১৯৮৩ ও ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পেয়ে বিদূষী লেখিকার গৌরব বৃদ্ধি পায়। মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ম্যাগসেসাই ও অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার তিনি পেয়েছেন ১৯৯৬ খ্রীঃ। ভারত সরকার প্রদত্ত দেশিকোত্তম ও পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েও তিনি অলংকৃত হয়েছেন। এই উপাধি মহাশ্বেতা দেবীকে উচ্চস্থানে বসিয়েছে নিঃসন্দেহে।

মহাশ্বেতা দেবী সমাজসেবামূলক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে ব্যাপ্ত রেখেছেন বঞ্চিত-অবহেলিত-সাঁওতাল, লোথা, শবর, আদিবাসীদের নিয়ে। তিনি জানতেন, এই অন্ত্যজশ্রেণির মানুষকে না জানলে ভারতকে সঠিকভাবে কখনও জানা যায় না। এই অন্ত্যজশ্রেণি সম্বন্ধে তিনি বারবার

উল্লেখ করেছেন The voice less section of Indian society। ভারতীয় সমাজের এই বৃহত্তর অংশ শুধুমাত্র নিরক্ষর স্বল্প স্বাক্ষর ও অনুন্নতই নয়, মূল স্রোত থেকে এরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করছে। বিভিন্নভাবে তিনি তাঁর গল্পে, উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তুলে ধরেছেন অখ্যাত গ্রামে-গঞ্জে যেখানে এই শ্রেণির লোকের বাস তাদের কথা। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলে গল্প ও উপন্যাসের উপাদানকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর লেখনীর ভাষায় সেই উপাদানগুলি জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করেছে। তিনি তাদের বড়ই কাছের মানুষ। যে নীচুতলার হতদরিদ্র মানুষদের অন্ধকার কুঁড়েঘরের হেঁসেল পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তিনি তাঁর প্রতিটি গল্প বা উপন্যাসের চরিত্রগুলির চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নভঙ্গ খুবই জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন। মানবতার আদর্শ হল মূল্যবোধ সেই মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবাদী লেখিকার লেখনীর ভাষা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাঁর ভাষা সহজবোধ্য অলংকারবর্জিত অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও চাঁছোলা। এই মহৎ গুণের কারণেই মহাশ্বেতা শুধু বাঙালি পাঠকদের কাছে সুপরিচিত হয়ে থাকেননি। তাঁর বহুলেখা অনুবাদ হয়েছে ইংরেজি, হিন্দী, নেপালি, উড়িয়া, অসমিয়া, তামিল, তেলেগু, কাশ্মীরী ও কানাড়ি প্রভৃতি ভাষাতে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পরে তাঁর অবস্থান। তিনি আশাপূর্ণা দেবী, বিমল মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের মতো মধ্যবিত্ত বাঙালির কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেননি। মহাশ্বেতা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও ব্রাত্য জীবনের অন্যতম কথাকার হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করেছেন। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে যেসব বিদূষী নারীর লেখনিতে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠ সেই প্রতিবাদী ধারার লেখিকাদের মধ্যে তিনি অন্যতম সেরা। যথার্থ অর্থে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী ধারার রূপকার। আজও তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য জীবনকে দুটিভাগে ভাগ করা যায়। ১৯৫৫-১৯৭৫ খ্রীঃ তাঁর লেখিকা জীবনের প্রথম পর্যায়। আর দ্বিতীয় পর্যায়টি হল ১৯৭৬ খ্রীঃ থেকে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক। আজ পর্যন্ত তাঁর প্রথম পর্বের চেয়ে দ্বিতীয় পর্বে প্রতিবাদী কণ্ঠ বেশি শোনা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী এমনই একজন লেখিকা যিনি তাঁর সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাকে শুধুমাত্র বঙ্গদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থান, বৃন্দেলখন্ড প্রভৃতি স্থানের ভাষা, সংস্কৃতি, সুরছন্দকে আপন অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। আমরা বাংলা সাহিত্যে আরও কয়েকজন উজ্জ্বল নক্ষত্রের সন্ধান পাই, যারা অবিভক্ত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভারতের একাধিক প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ভাগলপুরের ভাষা ও জনজীবনের চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরে বাংলা সাহিত্য ভূমিকে উর্বর করেছেন। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিহারের অন্তর্গত দ্বারভাঙ্গার ভৌগোলিক পটভূমিকায় সাজিয়েছেন তাঁর

নৈবেদ্য। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বেছে নিয়েছেন মুঙ্গের জেলাকে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ভৌগোলিক পটভূমি ছিল পূর্ণিয়া জেলা। পূর্ণিয়ার প্রকৃতি মানুষের জীবন কথা বলতে গিয়ে তিনি সেখানকার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পূর্ণরূপ তুলে ধরেছেন। প্রবাসী বাঙালি হিসেবে তাঁদের এই সাহিত্যিক অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মহাশ্বেতা দেবী ভারতের আদিবাসী দলিত সমাজ ও অসহায় শ্রমিকদের নিয়ে তাঁর একাধিক রিপোর্ট, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটগল্পে যে রূপ দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে সমকালের জীবন্ত দলিল হিসেবে প্রমাণিত, কালের কষ্টিপাথরে তার যাচাই হয়েছে। এবার আমরা তাঁর সাহিত্যকৃতির যথার্থ পরিচয় তুলে ধরব।

তাঁর প্রথম পর্বের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ‘ঝাঁসির রাণী (১৯৫৬)’, ‘নটী’ (১৯৫৭), ‘মধুরে মধুর’ (১৯৫৮), ‘প্রেমতারা’ (১৯৫৯), ‘তিমির লগন বা তারার আঁধার’, ‘অরণ্যের অধিকার’ (১৯৭৭), ‘হাজার চুরাশির মা’ (১৯৭৪), ‘কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাওঁর জীবন ও মৃত্যু’ (১৯৬৭), ‘সুভাগা বসন্ত’, ‘বিবেক বিদায় পালা’, ‘পলাতক’, ‘সুরজ জাগরাই’, ‘তিতুমির’, ‘নৃসিংহ-দুরবতার’, ‘পাকাল’, ‘বৈসুচনের সেনা’, ‘বন্দোবস্ত’, ‘টেরোজ্যাকটিল’, ‘পূরণ’, ‘সহায় ও পিরথা’, ‘সতী’, ‘শৃঙ্খলিত’, ‘আশ্রয়’, ‘সত্য-অসত্য’, ‘সিধু-কানুর ডাকে’, ‘দৌলতী’, ‘পালামৌ’, ‘গৃহমণী’, ‘শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা’, ‘সরসতীয়া’, ‘জটায়ু’, ‘অক্লান্ত কৌরব’, ‘নৈঋতে মেঘ’, ‘স্বৈচ্ছা সৈনিক’, ‘নীলছবি’, ‘জঙ্গল’, ‘বিশ-একুশ’ এছাড়া তিনি আরও বহু উপন্যাসের স্রষ্টা।

‘ঝাঁসির রাণী’ মহাশ্বেতা দেবীর ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন ‘বুন্দেলখণ্ডে’ গিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেত্রী লক্ষ্মীবাইকে নিয়ে যে ঐতিহাসিক কাহিনি পরিবেশিত হয়েছিল সেখান থেকে উপাদান নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাসটি রচনা করেন।

প্রেম কাহিনি অবলম্বনে ‘নটী’ উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। যে উপন্যাসে তাঁর সমাজ বাস্তবতার পরিচয় মেলে।

‘তিমির লগন বা তারার আঁধার’ উপন্যাসে উঠে এসেছে মধ্যবিত্ত জীবনকথা। এই উপন্যাসের চরিত্র চিত্রণে তিনি সাফল্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

‘মধুরে মধুর’ উপন্যাসের নায়ক নৃত্যগীতে বিশেষ অনুরাগী। উপন্যাসের নায়ক সাধন নাচ-গানের জন্য কখনো যাযাবর বেদের দলে, বৈষ্ণবদের কীর্তনের দলে, পূর্ববঙ্গের লোকসঙ্গীতের শিল্পীদের সঙ্গে কিংবা রাজপুতানার বান্জারাদের দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে সঙ্গীত ও নৃত্যের সুর ও তালের সঙ্গে আত্মগম্ব হয়েছেন। এর ফলে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে তার ঘটেছে আত্মিক পরিচয়।

‘প্রেমতারা’ উপন্যাসে আমরা দেখি সার্কাস দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে, অসংখ্য খেলা

দেখিয়ে যে মেয়েরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করত এবং সার্কাসের মালিককে অর্থসম্পদে পরিপূর্ণ করে দিত, তারা পারিশ্রমিক হিসেবে পেত অতিসামান্য। বঞ্চিত, শোষিত, অসহায়া নারীদের প্রতি মহাশ্বেতা দেবী সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন।

‘হাজার চুরাশির মা’ উপন্যাসটিতে শিল্পীর দায়িত্ব ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে মহাশ্বেতা দেবী এক শিল্প সমৃদ্ধ রূপ তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের পটভূমি নকশাল আন্দোলন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়সীমায় কোলকাতা ও তার আশেপাশে যখন নকশাল আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেসময় কোলকাতার ভবানীপুরের উচ্চমধ্যবিত্ত চাটুজ্যে পরিবার থেকে বেরিয়ে এসেছিল নায়ক ব্রতী। সে মুনাফাখোর ও স্বার্থপর নেতাদের প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেনি। ঘৃণধরা সমাজকে ভাঙতে গিয়ে ব্রতী পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। পুলিশবাহিনী এই আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য শত শত আন্দোলনকারীদের গুলি বিদ্ধ করে মহাশ্মশানভূমিতে পরিণত করেছিল। শতসহস্র শবদেহের মধ্যে ব্রতীর সংখ্যা ছিল হাজার চুরাশি। ব্রতীর মা সেদিন ব্রতীর মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। তার কান্নার মধ্যে রক্তের গন্ধ, প্রতিবাদ ও শোক ছিল নিহিত। প্রশ্ন জেগেছিল তার মায়ের মনে, পৃথিবীটা কি তাহলে শুধু মৃতদের জন্যই তৈরী? ব্রতীর মা সুজাতার ছেলেকে এবং তার পরিচিত জনদের দেশকে নূতনভাবে আবিষ্কারের কথা বলেছেন।

‘অপারেশন বসাই টুডু’ মহাশ্বেতা দেবীর অপর এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস। এই উপন্যাসের পটভূমি ঝাড়গ্রামের গভীর অরণ্য। বসাই টুডু ছিল নকশাল আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তার নেতৃত্বে শাসক দলের বহু লোক ও পুলিশবাহিনীর মৃত্যু ঘটেছিল। যে ক্ষেতমজুর আর সাঁওতালরা উঁচু তলার মানুষদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধেও ছিল বসাই টুডুর সংগ্রাম। উপন্যাসের নায়ক বসাই টুডুকে হত্যা করবার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদল এই শক্তি সম্মিলিতভাবে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিল। পরিশেষে বসাই টুডুর মৃত্যু ঘটে। সে ছিল সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলনের অন্যতম প্রতিনিধি। মহাশ্বেতা এই উপন্যাসে একদিকে নকশাল রাজনীতি অন্যদিকে ভূমিহীন কৃষকের কথা ও কৃষি বিপ্লবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে মহাশ্বেতা দেবী এই উপন্যাস রচনা করেননি।

‘আঁধার মানিক’ উপন্যাসটি মহাশ্বেতার ইতিহাসচেতনা ও জীবনবোধের এক অনবদ্য দৃষ্টান্ত। বর্গী আক্রমণের ভয়াবহতা রয়েছে এই উপন্যাসে। বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত আঁধার মানিক থেকে ডাহাবাড়া পর্যন্ত সমস্ত গ্রাম সেদিন অশ্বারোহী বর্গীদলের লুটপাট গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, সুন্দরী নারীদের ধর্ষণ করা এই সমস্ত বিপর্যয়ের ছবি তুলে ধরার মধ্যে লেখিকার ইতিহাস চেতনার পরিচয় মেলে।

‘কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু’ উপন্যাসে চুয়াড়, কলহন, কীভাবে কবি হয়ে বন্দ্যঘটি গাঞি হয়ে ‘অভয়ামঙ্গল কাব্য’ রচনা করেছিল এটাই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সেদিন রাজসভায় চুয়াড়বৃন্দের মুখে সত্য প্রকাশিত হল,

“বাম্ভোন কেও লও হে, উ ছেলা চুয়াড়, দলছাড়া,
সমাজ ছাড়া, বাম্ভোন হতে পয়াসী, তা এখন আমাদের
রাজা মর্যাছে। উর তুল্য পুরুষ সমাজে লাই, উটিকে দাও
আমরা রাজা করবা।” ৮৬

এরপর গর্গরাজা বিধান দিলেন তাকে গলায় তণ্ডু তামার যজ্ঞসূত্র পরতে হবে। তারপর দলন হাতীর পায়ের নিচে ফেলে তাকে মেরে ফেলা হবে। এই সংবাদ শুনে কারারুদ্ধ কবি পালালেন, কিন্তু রাজার সৈন্যদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেলেন না। সমাজের নির্মম অনুশাসনকে তিনি মেনে নিলেন। অন্য জনে উত্তরণের এক আশ্চর্য কাহিনি লেখিকা তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে। বাংলা উপন্যাসের জগতে মহাশ্বেতার এই উপন্যাসটি একটি স্থায়ী সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

‘মাস্টার সাব’ উপন্যাসে আমরা দেখি এক শিক্ষকের কথা। জগদীশ নামে এই শিক্ষক একটি জাতকে যেভাবে আলোড়িত করেছিল তার ফলস্বরূপ এক আততায়ীর হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তার এই করুণ কাহিনি উপন্যাসের বিষয়।

‘অরণ্যের অধিকার’ মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই উপন্যাসটি তিনি লিখেছেন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ রেখে। বীরশা মুন্ডার বিদ্রোহ এই উপন্যাসকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। মহাশ্বেতা এই উপন্যাস লেখার সময় সুরে সিং এর ‘Dust-Storm and Hanging Mist’ গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিহারের জঙ্গল পাহাড় অঞ্চলের শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত আদিবাসীরা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল বীরশা মুন্ডা। তিনি আদিবাসীদের কাছে দেবতার সমতুল্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শোষণ ও শাসনের প্রতিবাদে আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে বৃটিশ পুলিশদের হাতে ধরা পড়েন, রাঁচি জেলে তাকে ভীষণভাবে নির্যাতন করা হয়। এর ফলে রক্তবমি করে তার মৃত্যু ঘটে। বীরশার মৃত্যু হয়তো হয়েছে। কিন্তু এক বীরশাকে মেরে আন্দোলন কখনও দমিয়ে রাখা যায় না, শতশত বীরশা মুন্ডার জন্ম হয়। মহাশ্বেতা বীরশার স্বদেশ প্রেমের সার্থক পরিচয় দিয়েছেন। এই উপন্যাসটির জন্য তিনি ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকাদেমি পুরস্কার পান।

‘বিশ একুশ’ উপন্যাসের পটভূমি নকশাল আন্দোলন। বিপ্লবীদের একদিন ঘর ছাড়তে হয়েছিল। উপন্যাসের নায়ক তপুর সন্ধান গিয়েছিল ভাই দীপু। তপুর পায়ে ছিল দগদগে ঘা তবুও নিজের প্রাণরক্ষার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল পর্বত সাঁওতালের একটি অর্জুন গাছে। একদিন তপু

বিশ্বাসঘাতককে হত্যা করেছিল। মহাজনী ঋণ পরিশোধের সময় ‘বিশ’ মহাজনরা না বললেও সত্য সন্ধানের প্রতীক স্বরূপ তপু বিশ বলতে পেরেছিল। এই ‘বিশ’ শব্দটি ধ্বনিত হতে থাকে অর্জুন গাছের পত্রে পত্রে — সত্য-বিশ্বাস ও সত্যতার প্রাণমন্ত্র হিসেবে এই উপন্যাসের বৃহত্তর স্থান জুড়ে থাকে।

‘চোটি মুন্ডা ও তার তীর’ উপন্যাসে তীরটি ছিল এক অলৌকিক শক্তির প্রতীক।

‘বৈসূচনের সেনা’ মহাশ্বের একটি সমাজ সচেতনমূলক উপন্যাস। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নেতাদের সৃষ্ট মন্তানদের দৌরাত্ম্য, তোলা আদায়, তরুণী হরণ, বস্তির নিরীহ মানুষকে খুন করা ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। একদিন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির গর্জে ওঠে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হল, অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে, তারপর সেখানে তৈরি হ’ল শান্তির বাতাবরণ।

মহাশ্বের দেবীর ‘সতী’ উপন্যাসটি একটি মেয়ের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি। মলিনা, কৃষ্ণা, অমা এরা দেখতে সুন্দরী নয়, কালো। কালো মেয়েদের কদর কম। কালো মেয়ে হলে মেয়েটিকে ত্যাগ করার প্রশ্ন ওঠে। নায়িকা মলিনা নির্যাতন সহ্য করলেও উপন্যাসের শেষে তার আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে। সতীত্বের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

‘টেরোড্যাকটিল, পূরণ সহায় ও পিরথা’ উপন্যাসে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অঞ্চলের প্রচলিত বিশ্বাসের চিত্র আঁকা হয়েছে। আদিবাসী জীবন নিয়ে কাজ করে চলেছে সাংবাদিক পূরণ সহায়। সে একদিন জানতে পারে পিরথা গ্রামের এক গুহায় টেরোড্যাকটিল নামে একটি সরীসৃপের চিত্র অঙ্কন করেছে এক তরুণ শিল্পী। এই রহস্যময় প্রাণীটিকে পূর্বপুরুষের প্রেতাত্মা ভেবে তাকে খাদ্য হিসেবে দেয় জল, ঘাস ও মাছ। এই প্রাণীটি উপন্যাসে কীভাবে বহুব্যাঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে মহাশ্বের দেবী তারই সার্থক রূপ দিয়েছেন।

‘শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা’ উপন্যাসে আমরা দেখি - রাজকর্মচারী মেদিনী নারায়ণ সিং এর এক পুত্রের জন্ম হয়, তার নাম ‘গণেশ’। তাকে মানুষ করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক অভ্যাজ রমণী লছিমাকে। লছিমা বন্দী অবস্থায় থাকে মেদিনীনারায়ণের অন্দরমহলে, লছিমাকেও ভোগ করতে থাকে। নারীর এতটুকু সম্মান দেয়না। মাতৃহীন গণেশের পালয়িত্রী লছিমার জীবনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। লছিমাকে ‘রাখনি’ করে রাখে, একমুঠো ঘণার খাদ্য সে পায়। এই হতভাগ্য রমণীদের বাস্তব চিত্র মহাশ্বের তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

রামায়ণের কাহিনি অবলম্বনে মহাশ্বের ‘জটায়ু’ উপন্যাসটি ভিন্ন স্বাদ এনে দিয়েছে। এই উপন্যাসে জটায়ু চরিত্রের পাশাপাশি অন্যান্য চরিত্রগুলি আধুনিক নাগরিক জীবনের পরিচয় বহন করে।

‘স্বেচ্ছাসৈনিক’ উপন্যাসটি বীরপুজার প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। মহাশ্বের বীরপুরুষদের রোমান্টিক মেজাজকে অত্যন্ত রমণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন এই উপন্যাসে।

‘নীলছবি’ লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত রচনা। কলকাতার এক সত্যমূলক ঘটনা অবলম্বনে এটি রচিত। উপন্যাসে বাঘ-সিংহ আসলে তৎকালীন প্রশাসক। তারা সমাজদেহে বিষের ছুড়ি মারতে অভ্যস্ত। অথচ সত্য ও মূল্যবোধের পূজারী অভ্র, মণি, হিমাংশুকে কায়েমি স্বার্থবাদীরা আদর্শভ্রষ্ট করতে পারে নি।

‘জঙ্গলে’ উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী দু’টি নরনারীর সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনকথা তুলে ধরেছেন। আদিবাসী অঞ্চলের জনজীবন, শবরশ্রেণির লোকদের সামাজিক অবস্থান, রাজনীতিক নেতাদের কায়েমি স্বার্থবাদী চরিত্রগুলির মুখোশ তিনি খুলে দিয়েছেন। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে লেখিকা এই উপন্যাসটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পগুলিতে বর্ণিত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের শোষণ, বঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আছে। সেই সঙ্গে নকশাল আন্দোলনের কথা বারবার যুক্ত হয়েছে। তিনি বহু ছোট গল্পের স্রষ্টা। তাঁর কিছু ছোটগল্প এ প্রসঙ্গে আলোচনার আপেক্ষা রাখে।

তাঁর ব্রাত্য-জীবন ও পরিবারকেন্দ্রিক গল্প হিসেবে ‘বায়েন’ গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত এক ডোম পরিবারের বিপর্যয়ের কাহিনি হল বায়েন। তাদের বিশ্বাস, সংস্কার, আচার-আচরণ, রীতিনীতি, অলৌকিক বিশ্বাস ও অন্ধ কু-সংস্কারাচ্ছন্ন ডাইনি প্রথার বাস্তব চিত্র এই ছোটগল্পটিতে লক্ষ্য করা যায়।

মহাশ্বেতার ধর্মকেন্দ্রিক সার্থক ছোটগল্প হল ‘বজ্রমমায়ের থানে’। এই গল্পে ধর্মের প্রতি সাঁওতালদের প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তারা সুস্থতা ফিরিয়ে এনেছে ধর্মসংস্কারকে দূরে ফেলে দিয়ে। রতন হেমব্রমের কুসংস্কার মুক্ত মন ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে এই গল্পে।

‘গ্রামবাংলা’ গল্পে তিনি দেখিয়েছেন ভোটসর্বস্ব রাজনীতির সংকীর্ণতা। রাজারাম হেমব্রমের তিন বিধা জমিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধের জেরে বহু মানুষের প্রাণহানি ঘটে।

‘জনী আর উর্বশী’ গল্পের পটভূমি কলকাতা শহর। ‘ধীবর’ ছোটগল্পে রয়েছে নকশাল আন্দোলনের পটভূমি। এই গল্পটিতে রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

‘সমাজবাদ ববুয়া’ মহাশ্বেতার বিখ্যাত ছোটগল্প জংলী বেরসার গান এই ছোটগল্পে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

মহাশ্বেতার ‘দ্রৌপদী’ ছোটগল্পের নায়িকা দ্রৌপদী। সে একজন সক্রিয় নকশাল কর্মী। পুলিশের হাতে সে ধরা পড়ে। লক আপ থেকে এনে পুলিশকর্মী তাকে ধর্ষণ করে। ফলে

দ্রৌপদী রত্নমূর্তি ধারণ করে পুলিশ কর্তা এতে আতঙ্কিত হয়।

‘নুন’ ছোটগল্পে জোতদার ও মহাজনরা আদিবাসী দোসাদদের হাতে না মেরে ভাতে মারার জন্য উত্তমচাঁদ বানিয়া নুন সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে দোসাদ অঞ্চলের মানুষরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হাতির খাদ্যের পাত্রের নীচে মাটি মেশানো নুন খেয়ে অনেকে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই গল্পে নুনের জন্য মানুষও পশু পর্যায়ে নেমে আসে।

‘ভূমিদাত্রী’ ছোটগল্পে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্ক ও রাজনৈতিক নেতাদের সম্পর্কের বাস্তব চিত্র লেখিকা তুলে ধরেছেন।

‘রুদালী’ ছোটগল্পে রয়েছে অভিনব পেশায় নিযুক্ত এক শ্রেণির নারীদের কথা। তারা জোতদার, মহাজনদের মৃত্যুতে কাঁদতে যেত - শনিচারী ও বিখনি কেঁদে কেঁদে জীবন নির্বাহ করত।

‘স্তন্যদায়িনী’ গল্পের নায়িকা যশোন। সে বিশ্বাস করতো সে দেবীর অংশসম্ভূতা। তার বুকের দুধে বাবুর বাড়ির সন্তানরা ও নিজের কুড়িটি ছেলের প্রাণ বেঁচেছে। অথচ যশোদা যখন দুরারোগ্য ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে তারজন্য বাবু একটুও সহানুভূতি দেখায় নি বরং তাকে বাড়িতেও স্থান দেয়নি। এই গল্পের থীম হল ভারতের ধন সম্পদ গ্রহণ করে, ভারতকে শোষণ করে ঘৃণ্য রাজনৈতিক নেতারা ও স্বার্থপর জনগণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতকে হতশ্রী করে তুলেছে।

‘জগন্নাথের রথ’ ছোটগল্পের নায়িকা পুণ্যদাসী। সে দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি। জগন্নাথের রথের চাকার সঙ্গে তার জীবনের সম্পর্ক। অথচ রথের চাকার তলায় তাদের চাপা পড়তে হয়। একদিন সে বৃন্দাবনে চলে যায়। সেখানে কৃষ্ণ গুণগান করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে।

‘যশোমতি’ গল্পে আমোদি জননেতা প্রাণকৃষ্ণের দ্বারা অপমানিত হয়ে সে মথুরায় থাকা প্রাণকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি।

‘শিবা’ গল্পে কিভাবে দুকড়ি দ্বারা গ্রামের জোতদার প্রেমদাসের ফাঁদে পড়েছিল এবং পরিশেষে তার মৃত্যু ঘটল তারই কারণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

‘জল’ গল্পে জলের জন্য ন্যায্য মজুরির জন্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তার বিবরণ রয়েছে।

‘এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ’ গল্পে লখিন্দরা কেমনভাবে তৎকালীন জোতদারদের নির্মম অত্যাচারে মৃত্যুর করালগর্ভে পতিত হল তার মর্মস্পর্ক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

খিদের জ্বালায় অবহেলিত বঞ্চিত অন্ত্যজ শ্রেণির উপজাতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী লিখেছেন ‘জন্মতিথি’, ‘রাফস’, ‘বাণ’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘জাতুধান’ এবং ‘সাঁঝ

সকালের মা' প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি। আজও এই গল্পগুলির আবেদন ম্লান হয়ে যায়নি।

‘জন্মতিথি’ গল্পে রয়েছে অনুগ্রহের জন্য আমরণ প্রচেষ্টা। পেটের জ্বলাই এখানে মুখ্য জ্বালা হিসেবে দেখা দিয়েছে। কুড়ন ও তার মা শহরের বিত্তবান বাড়ির উচ্ছিষ্টের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তারা সে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে পারে না। অবশেষে জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট খাদ্য সামগ্রী সাফাই করবার জন্য গাড়ি আসে। সেখান থেকে সংগ্রহ করতে পারে না তারা খাদ্যের কয়েকটি দানাও। তখন নিরুপায় হয়ে কুড়নের মা চাপাকল থেকে জল সংগ্রহ করে আনে, ক্ষুধার্ত কুড়নের খিদের জ্বালা মেটায়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘রাক্ষস’ গল্পটিতেও খাবারের প্রতি আগ্রহের কথা রয়েছে। গল্পের নায়ক ভবতারণ বাবু। তিনি অত্যধিক খেতেন বলে ‘রাক্ষস’ নামে পরিচিত। একমাত্র তার পেনশনের টাকাতেই সংসার চলে। টাকার বেশির ভাগ অংশই তাঁর নিজের খাবার জন্য ব্যয় করেন। ভবতারণবাবু পরিবারের অন্যান্যদের জানান, তিনি যদি বেশি না খান, খাদ্যের অভাবে যদি তার জীবনদীপ নিভে যায়, তাহলে পরিবারের অন্য লোকরা বাঁচবে কী করে? এই জিজ্ঞাসা দিয়েই মহাশ্বেতা দেবী ‘রাক্ষস’ গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন।

‘জাতুধান’ মহাশ্বেতা দেবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এ গল্পের নায়ক। সাজুয়ার কাছে ভাতের খিদেটাই সবচেয়ে বড়। পঞ্চাশের আকালের সব খিদেই যেন তার পেটে। সে না মরেও মরার ভান করে নিজের শ্রাব্দের চাল ও জ্ঞাতিভোজের জন্য বরাদ্দ চাল নিয়ে পালিয়ে যায়। সে যে বেঁচে আছে একথা শুনলে হয়ত রামসিংজীকে সেই চাল ফেরত দিতে হবে। মহাশ্বেতা দেবী ধর্মশাস্ত্রের বিধিনিয়ম কতটা অসার তা আলোচ্য গল্পে দেখাতে চেয়েছেন।

‘বাণ’ গল্পটিতেও আমরা দেখি খিদের কথা বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বালক চিনিবাস এই গল্পের নায়ক। তার মধ্যে রয়েছে খাবার জন্য প্রবল আগ্রহ। ভাতের গন্ধ চিনিবাসকে আকুল করে তোলে। একদিন বাগদীছেলে চিনিবাস তার দিদিমার কাছে শোনে বাণের গল্প। এ বাণ হল গৌরাজ প্রেমের বাণ। গৌরাজ আসবেন ভেবে চিড়ে-মুড়ি, বাতাসা সবকিছু খেতে পাবে। কিন্তু চিনিবাসের কাছে সাদা ভাতটি ছিল একান্ত কাম্য। অল্পময় ভুবনের কথা সে ভাবে কিন্তু তাঁর ভাগ্যে ভাত আর মেলে না। ভাত না পেয়ে চিনিবাস তার মাকে মেরেধরে মুড়ি-বাতাসা ফেলে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

মহাশ্বেতার ‘ভাত’ গল্পটিও পাঠকের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। গল্পটি মূলত এক অবস্থাপন্ন সংসারের সঙ্গে অন্নহীন মানুষের সংঘাতের গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি এক পরিবারের কর্তা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তাকে বাঁচানোর জন্য একদিকে চলছে চিকিৎসা অন্যদিকে চলছে তান্ত্রিকের হোম। সেই সংসারে কাজের জন্য উচ্ছ্ব নাইয়া নামে

এক পরিচারিকাকে নিযুক্ত করা হয়। সেই বাড়িতে প্রত্যহ অনেক লোক খেতে পায়। ইতিমধ্যে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ সংবাদ জানান যতক্ষণ যজ্ঞ চলতে থাকবে ততক্ষণ অবধি কেউ খেতে পারবে না। এদিকে উচ্ছবের খিদে তুঙ্গে ওঠে। এসময়ে হঠাৎ খবর পেল, পুজো শেষ হওয়ার আগেই বাড়ির কর্তা মারা গেছেন। ব্রাহ্মণের নির্দেশে বহু উপাদেয় খাদ্য অশৌচ বলে সব ফেলে দিতে হবে। ক্ষুধার্ত উচ্ছব ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ভাতের হাড়ি চুরি করে পালিয়ে যায় এবং ভাত খেয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। এই নিয়ম ভাঙার অপরাধে উচ্ছব নাইয়াকে মারতে মারতে থানায় যায় নিয়ে। ‘ভাত’ গল্পে পরিণতি বিষয়ে হয়ত বিশ্ব সাহিত্যে এরূপ আর দ্বিতীয় গল্প রচিত হয়নি, এখানেই মহাশ্বেতা দেবীর অনন্যতা।

‘সাঁঝ-সকালের মা’ গল্পে অত্যন্ত গরীব পরিবারের ছেলে সাধনের পেটের জ্বালা কখনো মেটে না। সারাদিন সাধনের মা ঠাকুরানি সেজে ভক্তদের কাছ থেকে চাল-ডাল সংগ্রহ করে। সাঁঝ-সকাল মানে সন্ধ্যা ও সকাল। এই সময়ে তার মাকে ক্ষুধার্ত ছেলের মা হিসেবে দেখা যায়। তখন তাকে ঠাকুরানির ভেক ধরতে দেখা যায় না। একদিন সাধনের মা মারা যায়। তার মায়ের শ্রাদ্ধে পুরোহিত শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ করবার পর তার প্রাপ্য চাল যখন পুটলিতে বাঁধতে থাকে সাধন তখন পুরোহিতকে ‘দূর শালা’ বলে গাল দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। কোনো শাস্ত্রবাক্য সে শুনতে চায় না। বস্ত্রত বেঁচে থেকে ভাতের গন্ধের মধ্যে সাধন খুঁজে পায় তার মৃত মাকে। সে যতবার ভাত রাঁধবে কিংবা ভাত খাবে ততবারই মনে পড়বে সাঁঝ ও সকালের তার মায়ের মুখ।

‘অর্জুন’ একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। অর্জুন নামে একটি সুবিশাল গাছ। এই গাছটিকে অরণ্যনির্ভর আদিবাসীরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করত। এই গল্পে অর্জুন গাছটি যেন গ্রাম প্রহরীর মতো। একসময় যেখানে লক্ষ লক্ষ গাছ অবস্থান করত, আজ সেখানে মানভূমের উপেক্ষিত লুপ্তিত ভূমিতে বেঁচে আছে শুধুমাত্র সেই অর্জুন গাছটি। সেখানকার পরস্পর বিরোধী দুই রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। তারপর তাদের মধ্যে গোপনে চুক্তি অনুসারে টাকা দিয়ে ও মদের বিনিময়ে গাছটি কেটে ফেলতে হবে বলে আদিবাসীরা এখানে একটি কৌশল খাটিয়েছে। তারা টাকা নিয়েছে কিন্তু জমিদারী আমলের বানডিহি জঙ্গলের দেবতার প্রতীক হিসেবে সেই গাছটি না কেটে ওই টাকা দিয়ে অর্জুন গাছটিকে পাথর দিয়ে ঘিরে একটি দেবতার থানে পরিণত করে। এটা যদিও চতুরতার কোন গল্প নয় আদিবাসীদের প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ‘অর্জুন’ ছোটগল্পটি।

‘বেহুলা’ গল্পে লেখিকা বেহুলাকে মনসা মঙ্গলের একটি চরিত্র হিসেবেই শুধু দেখেননি, তাকে নদী হয়ে বয়ে যেতে দেখেছেন। একদিন বেহুলা ইন্দের সভায় পায়ের হাঁটু পর্যন্ত দেখিয়ে দেবতাদের সন্তুষ্ট করেছিল। তাতে বেহুলার যে পাপ হয়েছিল সেই পাপ খন্ডাতে নদী হয়ে বইতে হচ্ছে বেহুলাকে। সেই গ্রামে সর্পদংশনে বহু লোকের মৃত্যু হত। একদিন সাপের আস্তানাগুলো

জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের মানুষ। ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি মূর্তিমান প্রতিবাদ রয়েছে আলোচ্য গল্পে।

‘দেওয়ান খইমালা ও ঠাকুল বটের কাহিনী’ গল্পটি এক রোমান্টিক প্রেমের গল্প। রূপকথার আমেজ রয়েছে এই গল্পটিতে। বিরহী ও বিরহি প্রেমিক-প্রেমিকার জলে ভেসে যাওয়ার করুণ কাহিনি আলোচ্য গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

‘রোমথা’ মহাশ্বেতা দেবীর এক নিষ্ঠুরতার গল্প। এই গল্পে রয়েছে ইতিহাস চেতনার যথার্থ পরিচয়। রাজা লক্ষ্মণ সেনের আমলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে রাজবৈদ্যের হাতে দান করা হত। রাজবৈদ্য সেই ব্যক্তিকে গরমতেলের কড়াইতে জীবন্ত অবস্থায় সেদ্ধ করে পৌরষত্ব বাড়াবার ঔষধ তৈরি করত। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ‘রোমথা’ নামে পরিচিত ছিল। মৃত্যুর আগে রোমথার জীবন সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা, পালিয়ে যাবার ইচ্ছে কত স্বপ্নই না তাদের মনে উদয় হত। কিন্তু সবশেষে নির্মম নৃশংসভাবে হত্যা করা হত। এই নিষ্ঠুরতার কাহিনি পরিবেশন করতে গিয়ে মহাশ্বেতা নীরব সাক্ষীরূপে একটি প্রাচীন আম গাছের কথা উল্লেখ করেছেন। গাছটি নীরবে সাক্ষী হয়ে অবস্থান করছে। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের মতো অহংকারী রাজারা গাছটির অহংকারের কথা শুনতে পারে না।

‘ভাতুয়া’ গল্পে ভাতুয়া হল সেই মেয়েরা, যাদের পিতা মহাজনের ঋণ শোধ করতে না পারায় মহাজনের কাছে ভোগের সামগ্রীতে রূপান্তরিত হয়।

‘অন্ন অরণ্য’ গল্পে দেখা যায় মনিবপুত্রের সম্ভোগ বাসনা পূর্ণ করে এক ভাতুয়া মেয়ে। কিন্তু মনিব পুত্রের কাছ থেকে যেদিন সে প্রতারণিত হয়, সেদিন সে ক্রোধবশতঃ মনিবপুত্রের পুরুষাঙ্গ ধারালো দা দিয়ে কেটে ফেলে।

‘মোহনপুরের রূপকথা’ গল্পে চোখে কম দেখা এক আন্দিবুড়ি জল থেকে শামুক তুলতে গিয়ে মাছ ধরেছে ভেবে একটি সাপকে ধরে আনে। মাছ ধরতে এসে সাপ ধরেছিল এটা তার কাছে রূপকথা বলেই মনে হচ্ছিল। এ যেন তার কাছে জীবনের রূপকথা। তারপর অপারেশনের জন্য হাসপাতালে নিয়ে এলে সে রূপকথার মতো ভাবতে থাকে ডাক্তার ঔষধ ভালো ভালো খাদ্য প্রভৃতি।

এমনি রূপকথাধর্মী একটি গল্প ‘গন্ধ’। নিত্যানন্দ গিরি নামে এক অসৎ ব্যক্তি ভমর নামে এক তরুণ প্রতিবাদীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। নিত্যানন্দ একদিন তার রক্ষিতা পদ্মমণিকে প্রতারণা করে, ভমর এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এর ফলস্বরূপ ভমর খুন হয়। পদ্মমণি জেগে থেকে খুন হওয়া ভমরকে দেখে।

মহাশ্বেতা দেবী শুধুমাত্র অন্ত্যজশ্রেণির কথাই লেখেননি তাঁর গল্পে, প্রেমের প্রসঙ্গও রয়েছে। ‘কবিপত্নী’, ‘কাগাবগারে কই’, ‘জাহ্নবীর মুক্তি’ এই গল্পগুলিতে সার্থক প্রেমের চিত্র

অঙ্কিত হয়েছে।

জাহুবীর ‘মুক্তি’ ছোটগল্পের নায়ক এক তরুণ বিদ্রোহী। সে ভালবেসেছিল এক যুবতীকে। প্রথম দু’টি গল্পেও অর্থবিত্তহীন প্রৌঢ়দম্পতির অনবদ্য প্রেম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

‘বিছন’ ছোটগল্পে আদিবাসী হরিজন চাষিদের ওপর জোতদার মহাজনদের শোষণের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

‘মানত’ ছোটগল্পে কুসংস্কারের প্রভাবে কীভাবে শ্রমজীবী মহিলারা প্রাণ হারায় তার মর্মস্পর্শ কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে।

জাতপাতের বিরুদ্ধে লেখা ‘হারুন সালেমের মাসি’ লেখিকার অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। রাজনৈতিক ভন্ডামির বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার ‘তুসুমা’ গল্পটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহাশ্বেতা দেবীর ‘লড়াই’ গল্পের নায়ক ভদু শবর। তার নেতৃত্বে ন্যায্য পাওনার দাবিতে লড়াই সংগঠিত হয়। এই লড়াই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রবন্ধ সাময়িকী বিচিত্র বিষয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এগুলির সাহিত্যমূল্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে।

নবনীতা সেনের বাংলা-সাহিত্যে আলোকোজ্জ্বল উপস্থিতি বিস্ময়কর। তাঁর প্রতিভার স্পর্শে আধুনিক জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা, ন্যায়, নীতি, শ্রদ্ধা মানুষে মানুষে সম্পর্ক প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তাঁর জীবন দৃষ্টির স্বকীয়তা তাঁর সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্বাদ এনে দিয়েছে।

এই বিদূষী নারী ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত কবি নরেন্দ্র দেব, ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক রাধারাণী দেবীর সুযোগ্য কন্যা। কলকাতার সর্বজন পরিচিত ‘ভালো-বাসা’ নামক গৃহে তাঁর জন্ম হয়। বর্তমানে তিনি কলকাতার এই গৃহেই বাসরত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ‘ভালোবাসা’ নামক গৃহটিকে হেরিটেজ গৃহ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর স্বামী হলেন নোবেল বিজয়ী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তাঁর দুইকন্যা অন্তরা দেবসেন এবং নন্দনা সেন। এছাড়া তিনি শ্রাবস্তী নামে একটি মেয়েকে দত্তক কন্যা হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক হবার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি M.A. পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হন। এরপর ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী পেয়ে সম্মানিত হন। এছাড়া তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ.এস.এ. ও ইউ.কে এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ইউ.জি.সি.-র সিনিয়র ফেলোরূপে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত থাকেন।

বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি তিনি হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, ফরাসী, জার্মান,

সংস্কৃত প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থপাঠ করে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী হন। দীর্ঘকাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা পদে যুক্ত থেকে ২০০২ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া তিনি পৃথিবীর নারী জাগরণমূলক কার্যে বৃত থাকেন। স্ত্রী সম্প্রসারণমূলক শিক্ষার জন্য নতুন দিল্লী তাঁকে ফেলো হিসেবে মনোনীত করে। তাঁর একটি অন্যতম বড় কাজ হল ষোড়শ শতাব্দীর চন্দ্রাবতীর রামায়ণের ইংরেজিতে অনুবাদ। এই অনুবাদ গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যিক মহলে এবং ইংরেজি পাঠকমহলে তিনি তাঁর সাহিত্যকৃতি ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

নবনীতা দেবসেন, আন্তর্জাতিক লেখিকা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী ও জেরুজালেমে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে এবং সৃষ্টিশীল সাহিত্য পরিদর্শনের জন্য তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো, জার্মানি, ফ্রান্স ও জাপানে গিয়েছিলেন। ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে রাধাকৃষ্ণন মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজে মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে যে সেমিনারগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। আবার এডিটর হিসেবে ম্যাকমিলনের ভারতীয় আধুনিক উপন্যাস সিরিজের বাংলার চিফ্ এডিটর হিসেবেও নির্বাচিত হন। অন্যদিকে তিনি একাধিক সাহিত্যিক পুরস্কার সরস্বতী সম্মান, কবীর সম্মান এবং রবীন্দ্রপুরস্কার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কারের নির্বাচক সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেন। তিনি নিজেও পেয়েছিলেন ভারত থেকে বিভিন্ন সম্মানসূচক খেতাব। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার, মহাদেবী বর্মা পুরস্কার, ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার, হারমনি পুরস্কার। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি পেয়েও সম্মানিত হন। বর্তমানে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করে আছেন। এছাড়া তিনি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা লেখিকা সংস্থার সভাপতির পদেও নিযুক্ত ছিলেন।

নবনীতা দেবসেন আশিটির অধিক গ্রন্থ প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর বাংলা কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, হাস্যরসাত্মক রচনা বিষয়ক অনুবাদ সাহিত্য এবং শিশু সাহিত্য গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সংযোজন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারিণী নবনীতা দেবসেনের লেখনী আজও সচল। তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে বাংলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে তাই আমাদের প্রত্যাশা।

‘প্রথম প্রত্যয়’ নবনীতা দেবসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৫৯ খ্রীঃ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি সামাজিক রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কিত বহু গ্রন্থের রচনা করেছেন। একজন রাজনীতিবিদের মতো নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা ‘আমি অনুপম’ গ্রন্থটি ১৯৭৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি একটি বিশেষ সময়ের নকশাল আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্র ফুটিয়ে

তুলেছেন। তিনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন ভারতীয় সাহিত্যিকদের ইংরেজি সাহিত্যে লেখার সমস্যার কথা।

১৯৮৮খীঃ তিনি লিখেছেন প্রাচীন যৌথ পরিবারের ভাঙন বিষয়ে একটি গ্রন্থ। তাঁর সাহিত্যে ছিন্নমূল হতাশা প্রবণ মানুষের আশার কথা স্থান পেয়েছে। বলতে গেলে তাঁর কাব্য, নাটক, উপন্যাস সবগুলিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে নারী। তাঁর ছোটগল্প এবং ভ্রমণ সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে নির্মল হাস্যরস, মানবজীবনের গভীরতা উচ্চচিন্তাশীলতা যা বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক চিহ্নিত করে রেখেছে। ১৯৮০ সালে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’ প্রকাশিত হয়। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ ‘করুণা তোমার কোনপথ দিয়া’ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তাঁর ট্র্যাকবাম্যাকহনে মহক মহানে’ গ্রন্থটি বাংলা ক্লাসিক সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

নবনীতা দেবসেনের গল্পসমগ্রগুলোর প্রথম খন্ডে রয়েছে - ‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’। এই গ্রন্থে ‘মঁসিয়ো হুলোর হলিডে’, ‘প্রজেক্ট চর্মচটিকা’, ‘প্রাণবিন্দুবাবুর খরগোশ’, ‘ডক্টর দেবসেনের বিদেশযাত্রা’, ‘অলৌকিক রত্নভস্ম এবং নন্দকাকু’, ‘অপারেশন ম্যাটারহর্ন’ প্রভৃতি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে।

‘গল্পগুজব’ গ্রন্থে রয়েছে - ‘গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ’, ‘মিরাক্যাল’, ‘জোবান সুজিকি’, ‘এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট’, ‘খেসারং চোখ’, ‘সুটকেস’, ‘জগমোহন বাবুর জগৎ’, ‘পরীক্ষা’, ‘জীবে দয়া’।

‘ভালোবাসা কারে কয়’ গ্রন্থে ‘হাওয়া-ই-হিন্দ’, ‘টাংরী কাবাব’, ‘দাদামণির আংটি’, ‘সেদিন দুজনে’, ‘চক্রবর্তী রাজশেখর H.O.D.H.S’, ‘চোরধরা’, ‘মহানায়ক সুরজিতদা’, ‘ভালোবাসা কারে কয়’ প্রভৃতি গল্প স্থান পেয়েছে।

তাঁর ‘নাট্যারম্ভ’ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ‘মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর’, ‘অজাচার’, ‘বনলতার পুষি’, ‘চাঁদগড়ার কারিগর’, ‘ক্ষণপ্রভা’, ‘প্রেমচাঁদিনি’, ‘আবার এসেছে আষাঢ়’, ‘নাট্যারম্ভ’।

‘বসন্মামা ও অন্যান্য’ গল্প গ্রন্থে রয়েছে - ‘স্পটলেস স্পটেড ডিয়ার’, ‘মেহেবুব টেলার্স’ (ক্যালকাটা নাইন), ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ মূলতানী কামধেনু’, ‘ডিভাইন পাওয়ার অব এটর্নী বা যোগ বিভূতি’, ‘দি নেক্সট’, ‘গুনিয়াভাই’, ‘ইয়াং সায়েবের গাড়ি’, ‘চোর-চোর’, ‘মেজকাকিমার গল্প’, ‘মেজদির কেছা’, ‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’।

তাঁর তৃতীয় খন্ডের গল্পসমগ্র রয়েছে — ‘খগেনবাবুর পৃথিবী’ এবং অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে - ‘নিমন্ত্রণরক্ষা’, ‘উওরাধিকার’, ‘হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ’, ‘ধর্মভাই’, ‘নোরার বাড়ি’, ‘স্বপ্নের মতো’, ‘খগেনবাবুর পড়শী’, ‘পত্রোত্তর’, ‘বামুন-মুচি-রাজা’, ‘বারোজ 555 কে.পি ন্যানডি ফ্রম ক্রাইস্ট চার্চ’, ‘ভরতকথা’, ‘দেশে যাওয়া’, ‘বঁ ভোয়াইরাজ’, ‘খগেনবাবুর পৃথিবী’ প্রভৃতি গল্প।

নবনীতা দেবসেনের উপরোক্ত ছোটগল্পগুলি অভিনব বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং নতুন শিল্পপ্রকরণে প্রাঞ্জল। তাঁর এই ছোটগল্পগুলির ভাষা পাঠকমাত্রকে আকর্ষণ করে, সর্বোপরি জাগিয়ে তোলে এক জিজ্ঞাসা।

শিশু সাহিত্যিক হিসেবেও নবনীতা দেবসেন সুপরিচিত। তাঁর রোমহর্ষক অভিযানমূলক গল্পগুলির নায়িকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বালিকারা। তিনি একাঙ্ক নাটক রচনা করেও পুরস্কৃত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অসামান্য অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

উল্লেখপঞ্জী

দ্বিতীয় অধ্যায়

- ১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড — শ্রী সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা - ৪৮৮।
- ২। অন্তঃপুরের আত্মকথা — চিত্রা দেব, পৃষ্ঠা - ৪।
- ৩। তদেব - পৃঃ - ৪।
- ৪। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ - ৯৭।
- ৫। যুক্তিবাদের চোখে নারী মুক্তি — প্রবীর ঘোষ - পৃঃ ১০।
- ৬। সাহিত্যস্রোত — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ৫৬।
- ৭। সাহিত্যস্রোত — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ৫৭।
- ৮। স্বর্ণস্মৃতি — মন্মথ নাথ ঘোষ, পৃঃ - ৬।
- ৯। জীবন স্মৃতি — জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, পৃঃ - ৫৮।
- ১০। আমাদের কথা — প্রফুল্লময়ী, পৃঃ - ৫৯।
- ১১। চিঠি — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃঃ - ৬০।
- ১২। স্বর্ণকুমারী দেবী — ড. সুদক্ষিণা ঘোষ।
- ১৩। 'নারীর শিক্ষা ও মহিলা শিল্পাশ্রম' — শরৎ কুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী, পৃঃ - ২৬৯।
- ১৪। স্বর্ণকুমারী দেবী — ড. মীনা চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ - ১৪৫।
- ১৫। স্বর্ণকুমারী ও বাংলা সাহিত্য — পশুপতি শাসমল, পৃঃ - ১৬৫।
- ১৬। স্বর্ণকুমারী দেবী — ড. মীনা চট্টোপাধ্যায়।
- ১৭। 'ছগলী ইমামবাড়ী' — স্বর্ণকুমারী দেবী ভূমিকা অংশ।
- ১৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ - ২৮৫।
- ১৯। প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস — তরুণ সান্যাল - প্রবন্ধ - স্বর্ণকুমারী দেবী : সমাজ সচেতনতায়
প্রথমা — বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ৯৬।
- ২০। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প — ডঃ সমরেশ মজুমদার, পৃঃ - ২৮।
- ২১। প্রভাতসঙ্গীত — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ৫।
- ২২। বিরহ কারে কয় — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ২২।
- ২৩। বাংলা গীতিকবিতা উনিশ শতক — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ১৫২।

- ২৪। তদেব — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ - ১৫২।
- ২৫। মধ্যাহ্নসঙ্গীত — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ২৮।
- ২৬। সন্ধ্যা সঙ্গীত — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ৫৮।
- ২৭। গীতিগুচ্ছ (প্রথম খণ্ড) — স্বর্ণকুমারী দেবী, পৃঃ - ৪৭।
- ২৮। স্বর্ণকুমারী দেবী — সীমা চ্যাটার্জী, পৃঃ - ২৮৬।
- ২৯। সরসীবালা বসুর নির্বাচিত গল্প — পৃঃ - ১৪৫
(সংকলক ও ভূমিকা অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী)
- ৩০। তদেব — পৃঃ - ১৪৮।
- ৩১। তদেব — পৃঃ - ১৪৯।
- ৩২। তদেব — পৃঃ - ১৪৯।
- ৩৩। তদেব — পৃঃ - ১৪৯।
- ৩৪। তদেব — পৃঃ - ১৪৮।
- ৩৫। তদেব — পৃঃ - ১৪৯।
- ৩৬। তদেব — পৃঃ - ১৫১।
- ৩৭। তদেব — পৃঃ - ১৪৯।
- ৩৮। তদেব — পৃঃ - ১৫৪।
- ৩৯। তদেব — পৃঃ - ১৬২।
- ৪০। পূর্ণশশী দেবীর নির্বাচিত রচনা — সংকলক ও সম্পাদনা - অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও
অভিজিৎ সেন, পৃঃ ৪১০।
- ৪১। তদেব — পৃঃ - ৪২১।
- ৪২। স্মৃতি কথা — পূর্ণশশী দেবী, পৃঃ - ১৪৮।
- ৪৩। তদেব — পৃঃ - ৪২।
- ৪৪। তদেব — পৃঃ - ৪২।
- ৪৫। তদেব — পৃঃ - ৪৭।
- ৪৬। শৈলবালা ঘোষ জায়ার গল্প সংকলন — সংকলক - অভিজিৎ সেন ও
অনিন্দিতা ভাদুড়ী, পৃঃ - ১২।
- ৪৭। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ১৩।

- ৪৮। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ২৩৩।
- ৪৯। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ২৩৮।
- ৫০। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ২৪৫।
- ৫১। জ্যোতির্ময়ী দেবী রচনা সংগ্রহ — সম্পাদনা গৌরকিশোর ঘোষ, পৃঃ - ১১২।
- ৫২। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৫০৩।
- ৫৩। জ্যোতির্ময়ী দেবীর আত্মজীবনী — পৃঃ ৫০৪।
- ৫৪। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৫২৪।
- ৫৫। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৫২৭।
- ৫৬। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন ৪র্থ খন্ড — পৃঃ - ৬২৪।
- ৫৭। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৬২৫।
- ৫৮। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৬২৯।
- ৫৯। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংগ্রহ (তৃতীয় খন্ড) — পৃঃ - ৬৩০।
- ৬০। পূর্বোক্ত (১ম খন্ড) — পৃঃ - ১৩।
- ৬১। পূর্বোক্ত (১ম খন্ড) — পৃঃ - ১৪।
- ৬২। পূর্বোক্ত (১ম খন্ড) — পৃঃ - ১৪।
- ৬৩। বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৫১।
- ৬৪। রাধারানী দেবীর রচনা সংকলন — সংকলক অভিজিৎ সেন, পৃঃ - ৭।
- ৬৫। পূর্বোক্ত — পৃঃ ২১।
- ৬৬। বঙ্গের মহিলা কবি — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৫৩।
- ৬৭। পূর্বোক্ত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৫৪।
- ৬৮। পূর্বোক্ত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৫৪।
- ৬৯। পূর্বোক্ত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৬০।
- ৭০। পূর্বোক্ত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৬২।
- ৭১। পূর্বোক্ত — যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পৃঃ - ২৬২।
- ৭২। সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন — তনিকা সরকার ও গার্গি চক্রবর্তী, পৃঃ - ১৩০।
- ৭৩। সাহিত্য পত্র — শান্তি মিত্র, পৃঃ - ৬।
- ৭৪। মুন্সিগঞ্জ জেলা/স্মৃতি/বুদ্ধদেব বসু — সাক্ষাৎকার স্মৃতিচারণ, পৃঃ - ১।

- ৭৫। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ২।
- ৭৬। পূর্বোক্ত — পৃঃ - ৩।
- ৭৭। বকুলকথা — আশাপূর্ণা দেবী, পৃঃ - ৪২১।
- ৭৮। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর — সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ - ৩৭০।
- ৭৯। সাহিত্য আকাশ আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা — সম্পাদনা বিপুল আচার্য।
- ৮০। প্রথম প্রতিশ্রুতি — আশাপূর্ণা দেবী লিখিত ভূমিকা - ২. , পৃঃ - ১৬।
- ৮১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৭৪১।
- ৮২। পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, আশাপূর্ণা দেবী — সম্পাদনা - নূপুর গুপ্ত। সাহিত্যম ; প্রথম প্রকাশ ;
জানুয়ারী, ২০০৯ ; পৃষ্ঠা - ৬।
- ৮৩। পূর্বোক্ত — পৃষ্ঠা - ৩০।
- ৮৪। পূর্বোক্ত — পৃষ্ঠা - ৩৪২।
- ৮৫। পূর্বোক্ত — পৃষ্ঠা - ৪২৫।
- ৮৬। কবি বন্দ্যোপাধ্যায় গাঙ্গুলীর জীবন ও মৃত্যু — মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, পৃঃ - ১০৩।

ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু

যে কোন ছোটগল্পের মধ্যে থাকবে একটি রমণীয় বিষয়বস্তু, তার প্লট হবে সংক্ষিপ্ত। একজন গল্পকার তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও মানসিকতা নিয়ে গল্প রচনায় ব্রতী হন। এর বিষয় সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। যেকোন বিষয় নিয়ে ছোটগল্প রচিত হতে পারে। একটি ভাঙা রেকর্ড নিয়েও যেমন গল্প লেখা যায় কিংবা একটি রঙিন অ্যাশট্রে-ও হতে পারে ছোটগল্পের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, সহজ সরলভাবে থাকবে, তার আবেদন হবে চিরন্তন কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের বিষয় পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলে গল্প ছোট ব্যথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা বড় ব্যথার মধ্যে পৌঁছাতে পারে। ব্যথা বা দুঃখেই নয় সেখানে সুখেরও সঞ্চারণ ঘটতে পারে। ছোট প্রাণ না হয়ে তা হতে পারে বৃহৎ প্রাণ। সহজ-সরল জীবনের পরিবর্তে জটিল বিকৃত ভীতিকর কোনো বিষয়ও হতে পারে গল্পের উপাদান। গল্পে থাকবে বিষয়বস্তুর উপযোগী ভাষা, থাকবে সমাজজীবনের বাস্তব ছবি। এই বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে সামাজিক, পারিবারিক, মনস্তাত্ত্বিক, প্রেমবিষয়ক, প্রকৃতির পটভূমিতে মানুষ, অতিপ্রাকৃত, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, হাস্যরসাত্মক, সাংকেতিক বা প্রতীক, বিজ্ঞান নির্ভর, প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত বহু বিষয় স্থান পেতে পারে।

সমগ্র জীবন নয়, জীবনের খণ্ডাংশ নিয়ে অনাবশ্যক চরিত্র বর্জন করে তীব্র গতি নিয়ে স্বল্প পরিসরে রচিত হয় ছোটগল্প। ছোটগল্পের এই বৃহত্তর ক্ষেত্র থেকে একমাত্র যে দিকটি আমার মূল প্রতিপাদ্য সেটি হল - প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু।

মহিলা গল্পকারদের অনেকেই তাঁদের গল্পে প্রতিবাদী চেতনার দিকটি তুলে ধরেছেন। অন্যায়, অবিচার, শোষণ, ধর্মান্ধতা, মূল্যবোধহীনতা, আদর্শগত বিরোধ, কুসংস্কার প্রভৃতি প্রতিবাদীভাবনা বাংলা ছোটগল্পে একটি বৃহত্তর স্থান অধিকার করেছে।

মহিলা গল্পকারদের লেখা গল্পে উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। সে কণ্ঠস্বর কোথাও ক্ষীণভাবে কোথাও জোরাল ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। হয়তো অনেকেই বহুমুখী বিষয় অবলম্বনে গল্প রচনা করেছেন সেই প্রসারিত ক্ষেত্রে না গিয়ে আমার পরিধি সীমাবদ্ধ থাকবে প্রতিবাদী গল্পের বিষয়বস্তু সংগ্রহের দিকে, এ ক্ষেত্রে আমরা প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা-উত্তর মহিলা গল্পকারদের গল্পের বিষয়বস্তু এক এক করে তুলে ধরবো।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘নূতন বালা’ গল্পটি ‘গহনা’ নামে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের নায়ক নলিন। সে বিলেতে শিক্ষাসূত্রে গিয়েছিল। সেখানে সে আধুনিক শিক্ষা পেয়ে সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হয়। এরপর ধীরে ধীরে একটি বিদেশি মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং সে তাকে বিয়েও করে। এদিকে তার পিতা বিহারী বাবু ও মা পুত্রের জন্য ভামিনী নামে তাদের কন্যাসম একটি মেয়েকে পুত্র বধূরূপে মনোনীত করে। নলিন তার বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে। পিতা-মাতার মনোনীত পাত্রী (ভামিনী)-কে বিয়ে করতে সম্মত হয়। নলিনের মা ভামিনীর জন্য যে নূতন বালাটি তৈরি করেছিলেন তা ভামিনীর হাতে পরিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ জানায়। নলিন এই অনুরোধ রাখতে পরেনি। ‘গহনা’ গল্পে নলিনের এই প্রতিবাদ মূলত পিতা ও মাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অন্যদিকে পবিত্র হৃদয়া ভামিনী যে একদিন ভাবী স্বামী ও সুখীদাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল তা করুণ পরিণতি বহন করে এনেছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে ভামিনী হয়েছে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিতা ও উপেক্ষিতা। ভামিনীর দিক থেকে যে প্রতিবাদ এসেছে তা হল তার অদৃষ্টের বিরুদ্ধে। গল্পকার স্বর্ণকুমারী দেবী এভাবে তাঁর প্রতিবাদী চেতনার যথার্থ প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

‘লজ্জাবতী’ স্বর্ণকুমারী দেবীর অপর এক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার ও নিপীড়নে একটি শান্ত, লজ্জাশীলা তরুণী লজ্জাবতীর জীবনদীপ অকালেই নিভে গিয়েছিল। এর মূলে ছিল তার অভিমান। তার ননদ ফুলকুমারী তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে বলেছে —

ননদ তাহার হাতটি হাতের মধ্যে ধরে বলল, “তুই ভাই অমন কেন ?”

“কেমন ?”

“যেখানে তোর দোষ নেই, সেখানেও কথা কোসনে !”

লজ্জাবতী জানায় — “কথা কইতে গিয়ে দেখেছি উল্টা হয়, কে জানে আমি কি রকম করে বলি, সবাই ভুল বোঝে!”

“দাদাও ? কেন আমি তো দাদাকে বলতে তিনি সব বুঝিলেন”

“ফুলকুমারীই তাহার পক্ষ হইয়া স্বামীকে সব বলিয়াছে, তাহার জন্যই সে স্বামীর আদর পাইয়াছে, কৃতজ্ঞতায় লজ্জাবতীর নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল”।

এই গল্পে লজ্জাবতীর সংলাপে প্রচ্ছন্নভাবে প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে।

‘যমুনা’ গল্পের নায়িকা যমুনা। সে জানে না পারেনি তার স্বামী বিবাহিত, তাকে প্রতারণা করে বিবাহ করেছে। তার স্বামী ছিল জাতিতে বৈদ্য, কিন্তু যমুনা কায়স্থ, এই অভিযোগে তাদের মধ্যে বিবাহ হয় নি এই রূঢ়ভাষা প্রয়োগ করে। পূর্ব-স্ত্রীর প্ররোচনায় যমুনা দাসী হিসেবে আখ্যা পেয়েছে। জাতপাতের ব্যবধানের জন্য সে ভোগ করেছে জীবনযজ্ঞা। সে স্বামীকে দেবতা

জ্ঞানে সে পূজা করত। একদিন সে বুঝতে পারল তার স্বামী হস্তারক। সে তার ঘর ছেড়ে চলে যায় অসহনীয় অত্যাচার ও অপমান সহ্য করতে না পেরে। স্বামী একদিন তাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখলে যমুনার প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হয় —

“আমাকে স্পর্শ করিও না। তুমি আমার স্বামী, কিন্তু আমি তোমার পত্নী নহি আমাকে স্পর্শ করিও না।”

স্বামীর প্রতারণা ও ছলনার বিরুদ্ধে সে জানিয়েছে তার প্রতিবাদ। পরিশেষে যমুনা আত্মহত্যার পথকে বেছে নেয়। অসহায় অপমানিত এই নারীটি মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সমালোচক ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন —

“স্মশান-ভূমিতে যমুনার জীবন্ত জীবনাবসান পুরুষ প্রধান সমাজের বর্বরতার বিরুদ্ধে নারী চেতনার সুতীক্ষ্ণ ধিক্কার। অথবা আগাগোড়া রচনায় অপ্রগলভ সংঘম, এবং নারী প্রকৃতির স্বভাব উন্মোচন পুরুষের চোখে জীবনের এক নতুন রূপ ঐকে দিয়েছেন।”

‘প্রতিশোধ’ একটি ভিন্নস্বাদের গল্প। এই গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। পিতা কালীপ্রাসাদের নিদারুণ অভাবে অনটনে মৃত্যু হয়। পিতার এই মৃত্যু তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পিতৃমাতৃহীন এই অনাথ বালকের পিতৃহত্যাকারীর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। সে এর প্রতিশোধ নেবে এই শপথ করে। দেবীপ্রসন্নের গৃহে তার স্থান হলেও সে তার প্রতিজ্ঞার কথা ভোলেনি। প্রত্যহ দেবীর কাছে প্রতিশোধ ভিক্ষা চাইত। একদিন মন্দির-পতি দেবীপ্রসন্নের ছেলে অসুস্থ হলে দেবীকে প্রসন্ন করবার জন্য কালীপ্রসাদকে অনুরোধ করে। এই নির্দেশ পেয়ে যজ্ঞ ও হোম শুরু করে। তার বর্ণনা দিয়েছেন স্বর্ণকুমারী দেবী নিম্নলিখিতভাবে—

“অগ্নি ব্যোমভেদী শব্দে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া শত মূর্তিতে উর্ধ্বগামী হইল, বালক সেই অগ্নিময় মূর্তিরাশির দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেল যে হোম করিতেছে কেন ? উদ্দীপ্ত হৃদয়ে সেই শতমূর্তি লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, প্রতিশোধ প্রতিশোধ ! শতমূর্তি যেন একত্রে তথাস্তু বলিয়া মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল।”

বালক মারা গেল।

“পিতা শোকনুগ্ন, মাতার আর্তনাদে চতুর্দিক বিদারিত, কালীপ্রসাদের হৃদয় অনুতাপ-যন্ত্রণায় ক্ষত বিক্ষত, সে ভাবিতেছে পূর্ণহৃদয়ে সে দেবীর নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে নাই সেই জন্যই এইরূপ ঘটিল।”

একদিকে বালকটির মৃত্যু অন্যদিকে তার ছোটমেয়ে মেঘমালার সজ্জা গ্রহণের ফলে কালীপ্রসাদ দেবীর কাছে তার প্রতিশোধ প্রার্থনা বিফল হোক এটাই সে চাইল কিন্তু মেঘমালা বাঁচতে পারলো না। দেবীপ্রসন্ন স্বপ্নে জানতে পারলেন মন্দিরের অধিকারী স্বামী, স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে বঞ্চনা

করেছে বলে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তার সংসারে এই বিপর্যয় নেমেছে এদিকে কালীপ্রসাদ দেবীর কৃপাণ হাতে নিয়ে নিজহাতে তার বক্ষে বসিয়ে দিল। এভাবেই কালীপ্রসাদ অন্যায়ের প্রতিশোধ নিল। গল্পটির পরিণতি করুণ রসাত্মক কালীপ্রসাদ চরিত্রের অন্তর্দন্দ্ব ও তার যন্ত্রণাকে স্বর্ণকুমারী সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন। এখানে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

‘নবডাকাতের ডায়েরি’ গল্পে স্বদেশ চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। নবকুমারের পিতা আগে ক্যামিকেল সাহেবের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে সহিংস বিপ্লবকে সমর্থন করে এবং হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয়। স্বদেশী ডাকাতি করতে গিয়ে নৃশংস কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। নিজের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল —

“আবাল্য আমি স্বদেশী। দুধে দাঁত বোধ হয় তখনও আমার সব ভাজে নাই, যখন আমি সদলবলে দোকানীদের বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া আসিয়াছি। এবার স্কুল ছাড়িয়া রীতিমত ভাবে বিপ্লবপন্থী হইয়া পরিলাম।”

ক্যামিকেল সাহেব নবকুমারের এই মানসিকতা বুঝতে পেরে তাকে বোঝালেন -

“ও পথ ছাড় নবকুমার, ওতে দেশেরও মঙ্গল নেই, তোমারও মঙ্গল নেই, প্রকৃত বন্ধুর উপদেশ শোন, ও পথ ছাড়, আবার পড়াশুনা ধর, ‘বল, স্কুলে ভর্তি হবে - আমি আজই তোমার নামে টাকা জমা দিয়ে দিব।”

তবুও ক্যামিকেল সাহেবের কথা অগ্রাহ্য করে হিংসাত্মক বিপ্লব, হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্যকলাপী স্বদেশী আন্দোলনের জন্য করতে থাকে। নবকুমারের প্রতিবাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরাধীনতার জ্বালা তার কাছে ছিল বিষবৎ। একদিন তাকে হিংসাত্মক কাজের জন্য জেলে যেতে হল। পুলিশের অত্যাচারে একাধিক চিহ্ন রয়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় তার মনে পড়ল ক্যামিকেল সাহেবের কথা। সাহেবের স্নেহপূর্ণ স্পর্শ সে অনুভব করল। শুনতে হল তার আন্তরিকতাপূর্ণ কথা —

“ভালো আছো তুমি নবকুমার ?”

- নবকুমার তখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ক্যামিকেল সাহেবের প্রচেষ্টায় নবকুমার জেল থেকে মুক্তি পেল। তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটল, শুরু করল অধ্যয়ন। ভালো রেজাল্ট নিয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। নবকুমারের মধ্যে প্রথমে যে প্রতিবাদী ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা নিতান্ত প্রিয়জনের স্পর্শে রূপান্তরিত হল।

স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখা ‘তিনটি দৃশ্য’ গল্পটিও স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। গল্পের শুরুতে লেখিকার বাঙালী মেয়েকে নিয়ে মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ — “পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তাজ্জব কি, তিনি অসঙ্কোচে বলিয়া উঠেন, ‘বাঙালীর মেয়ে। এই দেখনা একজন কুলবধু — সাত চড়ে যার মুখে রা বাহির হয় না। আধহাত ঘোমটা টানিয়া স্টেশনের পথে চলিতে চলিতে যিনি প্রতি মুহূর্তে পথ

হারাইয়া বসেন, স্বামী বিলাত হইতে ফিরিতে না ফিরিতে তাঁহার পূর্বের এত লজ্জা-সরম-চলিয়া গেল কোথায় ? তিনি এখন পরিপূর্ণ মেমসাহেব। স্বামীকে পাশে বসাইয়া নিজে টমটম হাঁকাইয়া চলেন? ইংরাজী বোলচালে ডিক্রীধারী পুরুষকেও হারাইয়া দেন।

কেবল বালিকাবধূ কেন, সেদিন দেখিলাম, পঞ্চাশ বছরের এক বর্ষিয়সী, শিবপূজা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করিতেন না, মেম দেখিলে অস্পৃশ্য বস্তু বিবেচনায় নাসিকা কুণ্ঠিত করিয়া আট হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইতেন, আজ তিনি অসঙ্কোচে স্বামীর সহিত বিলাতে যাত্রা করিলেন। পূজো ছাড়িলেন, গাউন ধরিলেন, টেবিলে বসিয়া খানা খাইতে শুরু করিয়া দিলেন। ইহাকে তাজ্জব ব্যাপার বলিবনা ত কি ?”

লেখিকা বলতে চেয়েছেন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বোধহয় একমাত্র বাঙালি মেয়েদেরই আছে। গল্পের নায়িকা ধনিষ্ঠা। তিনটি দৃশ্যের মাধ্যমেই লেখিকা ধনিষ্ঠার বিবাহ, স্বামীগৃহে যাত্রা, স্থিতি ও প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমেই তার জীবনের পূর্ণছবি উপহার দিয়েছেন।

প্রথম দৃশ্য কর্ণবেধ। দ্বিতীয় দৃশ্য ধনিষ্ঠার বিবাহ উপলক্ষে রাজমাতা ও কুমার বাহাদুরের আগমন। সুদৃশ্য হাতির দাঁতের বহুমূল্যের গহনা প্রদান ধনিষ্ঠাকে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে ধনিষ্ঠার পিতৃগৃহে আগমন দীর্ঘদিন পর উদ্দেশ্য সেই গহনাগুলোকে স্বামীর হাত থেকে রক্ষা করার আশ্রয় চেষ্টা। শৃঙ্গুরের মৃত্যুর পর স্বামীর পদস্খলন শুরু হয়। তিনি অন্য নারীতে আসক্ত, স্বামীর চারিত্রিক অধঃপতনে অর্থহানি ঘটেছে। উপরন্তু এখন গহনাগুলোর উপর তার নজর। তাই গহনার বাক্সগুলো মাতার কাছে গচ্ছিত রাখার কিছু পরেই স্বামীর আগমন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে দাম্পত্য কলহ —

“ধনিষ্ঠা অকুণ্ঠিত স্বরে বলিল ‘গয়না আমি দেব না।’”

জামাতার স্বর আরও চড়িয়া উঠিল ‘দেবে না ?

এখনই নিয়ে এস বলছি, নইলে ভাল হবে না। চোর তুমি।’”

ধনিষ্ঠা বলিল, “আমার ধন আমি এনেছি,

আমি চোর আর তুমি তা কেড়ে নিতে এসেছ - তুমি সাধু।”

এরপর ধনিষ্ঠার স্বামী যখন তার পিতা মাতাকে অসম্মান করে কথা বলে - তখন ধনিষ্ঠার আত্মসম্মানবোধ আহত হয়। প্রতিবাদী ধনিষ্ঠা ক্ষণকাল পাষণমূর্তির ন্যায় সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বালিসের নিম্ন হইতে বাক্স দুইটা বাহির করিয়া বনাৎ করিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিল বাক্সের ডালা ভাঙ্গিয়া গিয়া তন্মধ্যস্থ মনি মানিক্যরাশি ঝকঝকিয়া উঠিল। সেই হীরাজহরতের জ্যোতিকে ম্লান করিয়া দিয়া ধনিষ্ঠার দেহকান্তি হইতে দেবী সদৃশ তেজস্বিনী আভা বিনির্গত হইল।”

ধনিষ্ঠার এই প্রতিবাদ তার স্বামীর বিরুদ্ধে। স্বামীর অন্যায় অপমানের বিরুদ্ধে এক নারীর চূড়ান্ত প্রতিবাদ গল্পটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

‘ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘কেন?’ গল্পটি ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ‘ভারতী’ ও ‘বালক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এটি নবকাহিনী গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গল্পে ঊনবিংশ শতাব্দীর অবক্ষয়িত ও কলুষিত কলকাতার বাবু সম্প্রদায়ের সার্বিক সমাজচিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে। তৎকালীন বাবুরা বারাজনা বিলাসী, নেশাগ্রস্থ, সংসারে অনাসক্ত ও বিপথগামী হয়ে দিন অতিবাহিত করত। এমনকি রক্ষিতা রাখা ছিল তাদের আভিজাত্যের লক্ষণ। যে ব্যক্তি যত বেশি রক্ষিতা রাখত তার সামাজিক মর্যাদা ছিল তত বেশি।

বক্ষ্যমান গল্পে প্রাণনাথ হলেন এই বাবু সমাজের প্রতিনিধি, তার গৃহে মনোরমা স্ত্রী বর্তমান। একটি পুত্র সন্তানও আছে। অথচ সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনে সে ছিল অত্যন্ত উদাসীন। স্ত্রীর প্রতি তার বিশেষ আন্তরিকতা নেই। অন্য নারীতে আসক্ত প্রাণনাথ তার স্ত্রীর প্রতি প্রেম-ভালোবাসা দেখায়নি। স্ত্রীর প্রতি অনাদর ও অপমান সে করেছিল সে স্বামীর আদর থেকে প্রেম থেকে, বঞ্চিতা একটি স্ত্রীর মর্মবেদনা স্বর্ণকুমারী করুণ ভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পটিতে গল্পের সূচনাতে স্ত্রী-টির স্বগতোক্তিটি হল — “সংসারে স্বামীর ভালোবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? কোলে সোনার পুতুলি বৎস, কৌশল্যার মত শাশুড়ির কন্যার অধিক স্নেহ-যত্ন তবুও মনের আগুন নেভে না।”

স্বামীর আচরণের জন্য গৃহবধূ নীরবতা পালন করলেও শাশুড়ি পুত্রকে মাঝেমাঝে তীব্র ভাষায় গালাগাল করত। এজন্য স্বামী তার ঘরে না এসে ১০-১৫ দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যেত। স্বামীর অদর্শনের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে সে বলেছে — “স্বামী যে ভালোবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও নয়, কিন্তু তাহার এই অদর্শন সহেনা।”.....“সমস্ত বুঝি তবু এ নেশা তাড়াইতে পারিনা।”

নায়িকার স্বামী-প্রেম বঞ্চনার বেদনাকে লেখিকা অত্যন্ত করুণভাবে ব্যক্ত করেছেন। এভাবে দিনের পর দিন বধূটি মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে দিন অতিবাহিত করেছে। রাতে একদিন এক দেবীরূপা রমণীকে স্বপ্নে দেখতে পেলেন। তিনি তাকে একটি জবাফুল দান করে বললেন —

“এইনে মাথায় পর, স্বামী ভালোবাসিবে।”

তারপর শাশুড়ির নির্দেশে কালীঘাটে দেবীকালীর কাছে পূজো দিতে গিয়েছে সেই রমণীটি। কালীর ছদ্মরূপ ধরে এসে বধূটির খোঁজখবর নিয়েছে। চেতনা ফিরে পাবার পর সহিষ্ণু ও ভাগ্যবতী নারীটি রমণীটিকে জানিয়েছে “আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেননি, তার কি দোষ?”

দাসী জানিয়েছে —

“দেখনা গায়ে একখানা গহনা পর্যন্ত রাখেনি। এদিকে তো বাবু বাড়ি থাকেননা।

কেবল যখন গহনার দরকার হয় তখন রাত বাস করতে আসেন। আমরা এত করে বলি বৌমা দিও নাগো, স্বামী গেছে যাক, গহনা গুলো দিও না। তা যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায় তখন ও কি আর বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে ?”

হৃদবেশিনী অপরিচিতা রমণীটি জানিয়েছে —

“সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা ! এমন স্ত্রীকে নেয়না !আমরা হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনে। এ পূণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। দিদি তোর দুঃখ আমাকে দে মাকালী যেন তোকে সুখী করেন।”

সেই মুহূর্তে বধূটির মনে হল, এই নারীই যেন তার স্বপ্নের দেবীমূর্তি।

পুরুষতান্ত্রিক বর্বরতার দ্বারা লাঞ্ছিতা এই বধূটি দেবীর কৃপায় সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ফিরে পেয়েছিল তার স্বামীকে। বধূটির আচরণকে কেউ কেউ নারীর প্রতিবাদহীন সহ্যশীলা মূর্তি রূপে দেখেছেন আবার অনেকে একে নীরব প্রতিবাদ রূপেও চিহ্নিত করেছেন। তার মনে দুঃখ আছে, বেদনা আছে কিন্তু প্রতিবাদের সুর তেমন জোরালোভাবে দেখা দেয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর মধ্যে যে নতুন জাগরণ এসেছে সামাজিক জাগরণের এই সংকেত অত্যন্ত সযত্নে তুলে ধরেছেন।

‘পূজার তত্ত্ব’ একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে স্বর্ণকুমারী দেবী বিয়ের পণপ্রথার বিরুদ্ধে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। আলোচ্য গল্পে সুশীলার বিয়ে হয়েছিল এক অর্থলোভী পরিবারে। সুশীলার বাবা ছিল মদ্যপ। তার মায়ের প্রচেষ্টাতেই সুশীলার বিয়ে হয়েছিল। তিলতিল করে জমানো টাকা দিয়ে মেয়ের বিয়ের সময় বরের জন্য রেশমী চাদর এনে দিয়েছিল। কিন্তু তার শ্বশুরবাড়ী মনের মতো হয়নি। অর্থলোভী শাশুড়ীর মুখ থেকে সুশীলার অনেক নিন্দা বা খোটা শুনতে হয়েছে। বরের মায়ের এই নিষ্ঠুরতা সুশীলা আন্তরিকভাবে মেনে নেয় নি। পূজো উপলক্ষ্যে জামাইও মেয়েকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সুশীলার মা কিন্তু জামাই শাশুড়ীর অনুরোধ রক্ষা করেনি। মেয়ে শ্বশুর বাড়ীর কথা অগ্রাহ্য করে একাই এসেছিল। হৃদয়হীন সমাজের পটভূমিতে লেখিকা সুশীলা এবং তার মায়ের বেদনাকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তুলে ধরেছেন। পূজোর পরে তত্ত্ব পাঠিয়েছিল তার মা। সে তত্ত্ব দেখে শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা কুণ্ঠিত মন্তব্য করেছিল —

“সে সকল কথা যে কন্যা সুশীলার শ্রবণ সুখকর হইল না তাহা বলা বাহুল্য। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মাকে স্মরণ করিল, তাহার দুঃখিনী মা, তাহার জন্য তাঁহাকে কত কষ্টই সহ্য করিতে হয়। মাতার কষ্টের স্মৃতির মধ্যে তাহার নিজের কষ্ট চাপা পড়িয়া গেল।”

সুশীলা তার শ্বশুরবাড়ীতে শুনেছে পিতৃনিন্দা, পিতা মদ্যপ আর তার বাপের বাড়ীতে শুনতে হয়েছে মদ্যপ স্বামীর নিন্দা, সহ্যশীলা সুশীলাকে সান্ত্বনা দিয়েছে তার মা —

“সহ্য করে কর্তব্য পালনই মনুষ্যত্ব। স্ত্রীলোকেরও জীবনের উদ্দেশ্য আছে। তুমি যখন তোমার ছেলেগুলিকে মানুষ করে তুলবে - তখন তোমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।”

সমাজসচেতন শিল্পী স্বর্ণকুমারী দেবী সুশীলা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই ‘পূজার তত্ত্ব’ গল্পটি পাঠ করে আমাদের স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ গল্পের নিরুপমার কথা। নিরুপমা পণপ্রথার শিকার হলেও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছে।

‘কান্তিবাবু খোসনাম’ গল্পটিতে রয়েছে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ। রবীন্দ্র যুগে যে সব কবিরা রবীন্দ্র কবিতার ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন সেই কবিতাগুলির আবেদন ও শিল্পমূল্য ছিল অত্যন্ত গৌণ। তাঁদের মধ্যে কবিত্বের বড় অভাব। কান্তিবাবু ছিলেন সেই কবিদের দলের প্রতিনিধি। অথচ তাঁর আত্মপরিচয় ও কাব্যজ্ঞান শূন্যত কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী কান্তিবাবুর মতো নামমাত্র কবিদের বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ।

‘মালতী’ ছোটগল্পে নারীমনের জটিল মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখিকা মালতী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। রমেশ মালতীর আপন দাদা নয়, উভয়ের মধ্যে কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই অথচ একে অপরের উপর ছিল অনেকটাই নির্ভরশীল। উভয়ের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু তা গড়ে ওঠেনি। রমেশ ও শোভনার মধুর সম্পর্ক যখন গড়ে উঠলো, তখন রমেশকে হারিয়ে মালতীর জীবন শূন্যতায় পূর্ণ হল। এই সুন্দর পৃথিবীতে তার কোনো স্থান নেই। শোকে দুঃখে একদিন মালতী প্রাণ বিসর্জন দিল। শোভনা ও রমেশ উভয়ের ভালোবাসার ভুল বোঝাবুঝির জন্য মালতীর জীবনে নেমে এসেছিল অমঙ্গলের ছায়া। একটি নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে লেখিকা ব্যথিত চিত্তে তার আপন উপলব্ধির কথা প্রকাশ করেছেন নিম্নোক্ত ভাষায় —

“পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ। একটি সুন্দর গোলাপ দেখিয়া যত্নে কে না গ্রহণ করে ? তাহাকে কেনা ভালোবাসে ? কেননা তাহাতে চক্ষুর তৃপ্তি হয়, তাহাতে নিজের সুখ হয় - কিন্তু সেই গোলাপটি গুকাইলে কে তাহাকে মায়াদৃষ্টিতেও একবার চাহিয়া দেখে ? ক’জনের চক্ষু হইতে তাহাতে অকৃত্রিম শোকাশ্রু পড়ে ? তাহা পড়ে না বলিয়াই অকৃত্রিম অশ্রুর এত আদর। নিঃস্বার্থ ভালোবাসার এত আদর।”

‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্পে রয়েছে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই গল্পে কুসংস্কারের জন্য একটি পরিবারে কিভাবে বিপর্যয় নেমে এসেছে লেখিকা তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন। গঙ্গা বক্ষে প্রথম সন্তান বিসর্জনের নির্মম প্রথা এবং এই প্রথার কুফল কতটা ভয়াবহ লেখিকা সেদিকটি আলোকপাত করেছেন এই গল্পে। বনমালী ও ক্ষেমঙ্করী সম্পর্কে স্বামী ও স্ত্রী। ক্ষেমঙ্করী গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সন্তান বিসর্জন দেবার মুহূর্তে বনমালী

জানিয়েছিল —

“সর্বনাশী, ক্ষান্ত দে, চিরকাল সর্বনাশ করে এসে এখনও তোর আশ মিটল না ? নূতন করে আবার সর্বনাশ করতে চাস ?”

ক্ষেমঙ্করীর প্রতি তার এই সতর্কবাণী উচ্চারিত করে সে গুরু ধরে গাঁজার নেশায় বুদ্ধ হয়ে ক্ষেপামি শুরু করল। এখন দু’জনেই অপ্রকৃতিস্থ। অত্যধিক গাঁজার ধোঁয়া সেবনের ফলে বনমালীর মৃত্যু ঘটল। আর ক্ষেমঙ্করী ভৈরবী সেজে নানা দেশ পরিভ্রমণ করতে শুরু করল। কাহিনির শেষে তার গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া পুত্রকে ফিরে পায়। মাতা ও পুত্রের মিলনে কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু ক্ষেমঙ্করী আর তার স্বামীকে ফিরে পায়নি। গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন সম্পর্কে মানব জীবনে যে সংস্কার প্রচলিত ছিল এবং তা কতটা বিস্ময় পরিণতি বহন করে এনেছে লেখিকা তার সার্থক রূপ দিয়েছেন এই গল্পে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখিকার এই প্রতিবাদ বাস্তবধর্মী সন্দেহ নেই।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর ছোটগল্পে নারীজীবনের অন্তরঙ্গ রূপ তুলে ধরেছেন একজন নারীর দৃষ্টি নিয়ে। মূলত তাঁর গল্পে অবহেলিত নারীর জীবন বেদনাই বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রতীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখিকা নূতনভাবে আলোকপাত করেছেন। প্রতীবাদী চেতনামূলক গল্পগুলি তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

গল্পকার সরসীবালায় গল্পে প্রতীবাদী চেতনার যথার্থ পরিচয় মেলে। ‘আগাছা’ গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই বিধবা রমণীটি ডাক্তার নলিনাক্ষর বাড়ীতে তার ছোট ছেলের দাইমা। রমণীর অকালমৃত্যুতে তার পুত্র ভজুকে নলিনাক্ষর স্ত্রী প্রমোদা পুত্রস্নেহে মানুষ করতে থাকে। প্রমোদার তিন পুত্রের সাথে ভজুও বড় হতে থাকে। কিন্তু নলিনাক্ষর নিজে ও তাঁর বাড়ীতে বেড়াতে আসা বোন নিরূপমাও যেন ঠিক ভজুকে সহ্য করতে পারে না। ঐ একরকমি ছেলেটাকে যখন তখন কটু কথা বলতে ওরা দ্বিধাবোধ করে না। পুত্র খোকনের সঙ্গে ভজুকে পড়াশুনা করতে দেখে নলিনাক্ষর উক্তি — “এ যে কাক কোকিল চেনবার জো নেই। তুমি সব মাটি করছ প্রমোদা ! ছোঁড়া গোলায় যাবে শেষে।”

নিরূপমা ভজুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, — “এই বুঝি তোমার ঝি। এর ছেলে, বউএর জন্য তো আমি কিছু আনি নি ভাই। তুমি কিন্তু একে বড্ড আশ্চর্য্য দিয়ে মানুষ করছ, তোমার পেটের ছেলে কিনা বোঝবার জো নেই।”

পিসিমার আনা উপহার মোটর গাড়ীটি যখন দুলাল নিলুর হাত থেকে নিয়ে ভজুকে দিল তখন “ভজু কিন্তু মটরটি হাতে লইয়াই রাগভরে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিল। মটরটি তৎক্ষণাৎ দুমড়াইয়া গেল। দুলাল ছুটিয়া সেটি কুড়াইয়া আনিতে যাইতেই নিরূপমা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, -
- “ওমা, কি দসি়া ছেলে গো, এতো তেজ, চার টাকার অমন জিনিসটা একদন্ডে নষ্ট করে ফেললে,

একি হতভাগা দস্যিকে ভাত দিয়ে পুষিছ বউ, ঘরের এতো গাছগাছালির মধ্যে এ আগাছার উপদ্রব কিসের রে বাপু। এ যে সওয়া যায় না।”

“দুলাল গাড়ীটি উঠাইয়া আনিয়া দম দিয়া চলাইবার চেষ্টা করিতে গাড়ীটি অচল হইয়া রহিল। তাহা দেখিয়া নিরুপমা জুলিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, -- “ওর দফা একেবারে শেষ করেছে। কোথাকার অনামুখো বাপমা-খোজা কাহারের ছেলে, দে তোরা ওকে বিদেয় করে। এই বয়সে এতো তেজ, বড় হলে যে ফণা তুলে ছোবল মারবে, এ যে দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষা গো।”

মেয়ে সুশীলা যখন মাকে বুঝিয়ে বলতে আসে যে এতে ভজুর কি দোষ। তাকে তো এইভাবেই মানুষ করা হয়েছে। তখন নিরুপমা “সেই তোমার মামীমার বুদ্ধিকেই বলিহারী দিই। ঝি এর ছেলেকে তেমনিভাবে মানুষ কর। তা না নিজের ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে মানুষ করা। এ আক্কেল নেই যে বড় হয়ে শেষে বিষয়ের ভাগ পর্যন্ত নিতে পারে। চার-পাঁচ ছেলের মা হলি বউ, এ বুদ্ধিটুকু তোর ঘটে নেই, আর নলিনকেও বলি, সে পুরুষ মানুষ, তাকে তো একটু আক্কেল করতে হয়।”

বালক ভজু এসব শুনেও কিছু মনে করে না। কিন্তু যেদিন, “নিরুপমা আহারের স্থানে আসিয়া দেখিলেন, ছেলেরা খাইতে বসিয়াছে। তাঁহার ছেলে সরল, মেয়ে সুশীলাও বসিয়াছে, ভজুও তাহাদের মধ্যে। ঠাকুর পোলাও পরিবেশন করিতেছে। নিরুপমা দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, -- “এ কি কাভ ! ভাতের ছোঁয়া ও কি ! ভজুর সঙ্গে বসে খেতে হবে নাকি ? পঁড়ে, ভজুর থালা ওখান থেকে তুলে দাও, - একেবারে একপাশে ক’রে দাও। কাহারের ছেলে - ভদ্রলোকের ছেলে একসঙ্গে বসে ভাত খাবে, একি মেলেচ্ছপনা।”

নীলু কহিল, -- “পিসিমা, ওতো বরাবরই আমাদের সঙ্গেই খায়।” পিসিমা তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন, -- “সে তোমার মার আচার বিচার নেই বলেই খায়। বিদেশে একলা আছে, জাত কুটুম কেউ নেই, কাজেই যা ইচ্ছে তাই করে, -- তা ব’লে আমরা দাঁড়িয়ে চোখের সামনে এসব অনাছিষ্ট ব্যাপার হ’তে দেবো না তো।”

সরল কহিল — “তুমিও যেমন মা, হোটেল গিয়ে যখন আমরা দাড়ীওলা চাচার হাতের কোণ্ডা, কোর্মা খেয়ে আসি তখন ?”

মা গর্জিয়া কহিলেন, -- “বাইরে তোরা যা ইচ্ছে তাই করিস তা ব’লে কি ঘরেও মেলেচ্ছপনা করতে হবে ? খাদী তুই না মেয়ে মানুষ, তোরও কি একটু বাহুবিচার নেই। কাহারের ছেলের পাশেই গিলতে বসে গেছিস।”

পাঁড়ে ভজুর থালা তুলিয়া লইয়া দূরে সরাইয়া দিল, ভজু কিন্তু সোজা উঠিয়া চলিয়া গেল। - আহারের স্থানে আর ফিরিয়া আসিল না। নিরুপমা রাগিয়া কহিলেন, -- “ছেলের তেজ আছে

খুব, বিষ নেই কুলোপানা চক্কর।”

এমতাবস্থায় প্রমোদা সারারাত জাগিয়া বসিয়া রহিল। যদি ভজু আসিয়া মা বলিয়া ডাক দেয়। কিন্তু ভজু চিরতরের জন্য চলিয়া গেল। ঐটুকু একটি ছেলে সে যেন জাত পাতের ভেদাভেদ, যাকে মা বলে ডাকত সে যে তার নিজের মা নয়, ভায়েরাও যে নিজের ভাই নয় সব এই একটা ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়া বুঝিয়া ফেলিয়া নীরব প্রতিবাদে ঘর ছাড়িল।

সরসীবালার ‘সহযোগ’ গল্পটিতে গল্পের নায়িকা শ্যামা প্রসঙ্গে লেখিকা বলেছেন মেয়েদের মুখচোখ যত সুন্দরই হোক না কেন তার গায়ের রং কালো হলে সে কুরুপা। শ্যামার স্বামী সুধীর ইয়ার-দোস্তুদের নিয়ে ফুর্তিতে ব্যস্ত। অসুস্থ স্ত্রী ও কন্যার প্রতি কোন খেয়াল নেই। মাসের মাহিনার বেশীর ভাগই বন্ধুদের নিয়ে মদ-মাংস ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। রূপহীনা শ্যামাকে স্বামীর ঠিক পছন্দ নয়। বিবাহের পর হইতেই শ্যামা ভয়ে ভয়েই থাকে। পান থেকে চুন খসলেই স্বামীর আশ্ফালন। স্বামীর আদেশ বন্ধুদের সাথে মদের আসরে মাংসের চপ ভেজে দিতে হবে। কিন্তু সেদিন যেন শ্যামা পেরে উঠছে না। অসুস্থ শরীরে অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে নাজেহাল শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। সে বলিয়া ফেলিল -- “দুটো হাত নিয়ে কত কি করব, আলো জ্বালব, না মেয়ে ভোলাব, না রাঁধব।”

অসুস্থ মেয়ে কাঁদতে থাকে। শ্যামা বলে “ওকে চুপ না করিয়ে আমি কিছু করতে পারব না।” সুধীর বলে ওঠে — “মাসীর ঘরে খেটে খেটে শুকিয়ে মরতে, সেই ছিল ভাল। এখানে এসে দিন দিন বিবি হয়ে উঠেচেন।”

এরপর শ্যামা যেন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। শ্যামার ধৈর্যচ্যুতি হইল। সে কহিল “বড় সুখেই রেখেচ কিনা, — এর চাইতে মরণ হলেই বাঁচতাম। সুধীর স্ত্রীর মুখে এতখানি স্পর্ধার উত্তর কোনদিন শোনে নাই। প্রথমটা শুয়াই সে চমকিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ। যে মানুষ ‘সাত চড়ে রা’ দিত না আজ সে এমন কথা বলিতেছে ? না জানি, প্রশ্নই পাইলে এর পরে আরও না কি বলিয়া বসিবে। সে তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল — “কি, এতবড় স্পর্ধা ! নেহাৎ দয়া করে বিয়ে করে এনেচি, তাই না ? মাসী-মেসো পায়ে কত তেল মালিস করেছিল, মনে আছে ? অই তো কালো বউ, কেউ তো ঘেঁসেনি, ভাগ্যিস উদ্ধার করেছিলাম।”

শ্যামা রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল -- “এ উদ্ধার করা নয়, জ্যান্ত খুঁচিয়ে মারা -- এ যে আর রাতদিন সহ্য হয় না গো” “আমি কিছু করতে পারব না, আমার মাথা ব্যথা করচে।” সুধীর কহিল -- “নেহাৎ মার খেয়ে মরবে কেন, এখনো বলচি” -- সে জবাব দিল -- “মেরে ফেললেও কিছু পারব না।” “বটে ? এতবড় আশ্পর্ধা ? মর তবে পুড়ে।”

শ্যামা পুড়িয়া মরিল। সহায় সম্বলহীনা, অসহায়া শ্যামা মৃত্যুর মধ্য দিয়া স্বামীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করল।

সরসীবালার ‘মার্শাল ল’ গল্পটি আবার ভিন্ন স্বাদের। সুদূর মেসোপটেমিয়ার সেনাবাহিনীর ক্যাম্পের পাশে হোটেলে আগুন লাগে। সেনাবাহিনীর কঠোর নিয়মকানুন মার্শাল ল কে অগ্রাহ্য করে নায়ক প্রসাদ ছুটে যায় আগুন নেভাতে। এই অধ্যক্ষ প্রসাদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন -- “তুমি সাহসী, তুমি নির্ভীক, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু যুবক, তুমি অবাধ্যতার পরিচয় দিয়েছ। সমর নীতির আইন অনুসারে তুমি আজ অপরাধী, সুতরাং দণ্ড পাবার উপযুক্ত। কিছু উত্তর আছে দেবার ?”

প্রতিবাদী প্রসাদ অবজ্ঞার হাসি হাসে, যখন সে সৈন্যশ্রেণি থেকে বহিস্কৃত হয়। প্রসাদ বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মার্শাল ল এর ভয়েতে সে নিজে গুটিয়ে থাকেনি। প্রতিবাদী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

‘প্রকাশকের বিড়ম্বনা’ গল্পে দেখি সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার সুভাষের স্ত্রী নীলা মিত্র যার ডাক নাম নেলী সে অল্প-সল্প লিখতে পারে। ছোটবেলা থেকেই ছোট ছোট কবিতার মাধ্যমে যার লেখা শুরু। বিয়ের পর সে চুপি চুপি লেখার খাতাখানি গল্প কবিতায় ভরে ফেলেছে। পাশের বাড়ীর বন্ধু আন্না তার লেখার প্রশংসা করে। কিন্তু নেলী তার ডাক্তার স্বামীটিকে ভীষণ ভয় পায়। সে এসব লেখা পছন্দ করে না। একদিন নেলীর স্বদেশী দাদা ও তার বন্ধু বেড়াতে এসে খাতাখানি নিয়ে যায়। “কালির আচড়” নাম দিয়ে বই বের করে নেলীকে এক কপি পাঠায়। পিয়ন রেজিষ্ট্রি বুক ও চিঠি নেলীর স্বামী ডাক্তারের হাতেই দেয়। ডাক্তার বইখানি দেখে রেগে গেলেন। “অন্তঃপুরবাসিনী হিন্দু কুলবধু আজ হাজার লোকের আলোচনার বিষয়, তার পবিত্র নাম আজ যে-সে উচ্চারণ করিবে। পরপুরুষ, অপরিচিত রাম-শ্যাম আজ স্বচ্ছন্দে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছে হায়, হায়, নারীমর্যাদা, সতীর পবিত্রতা, অকলঙ্ক গুণ ভুলের সহিত যাহার তুলনা। — যা ভালবাসি না তাই। আমার ঘরে বসে আমরাই অল্প খেয়ে আমার সঙ্গেই লুকোচুরি। এত যদি নাম জাহির করবার ইচ্ছে, যাও কেন না থিয়েটারে, সার্কাসে, বায়োস্কাপে, খুব নাম হবে। -- ছিঃ ছিঃ অবশেষে আমার নাম ডুবল — বাঁটা মার এইসব স্বাধীন জেনানাদের মাথায়। দেশের লোক আবার এদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। গুষ্ঠির পিন্ডি পাড়ছেন।”

নেলী যখন বলে সে কিছুই জানে না। দাদারা তাকে চমৎকৃত করার জন্য করেছে। তখন ডাক্তার আরো রেগে যায়। শেষে প্রকাশকের নামেই মামলা করে বসে। এতেও যখন সুবিধা হয় না তখন বইটির প্রকাশ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সমস্ত কপি ও আ-বাঁধা কাগজ কিনে নিয়ে হাসপাতাল কম্পাউন্ডের বাগানে আগুন জ্বালিয়ে দেন। নেলীর বন্ধু আন্না যখন জানতে পারে, সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। -- “তোর সেই লেখার সমাধি হচ্ছে বুঝি ! আর তুই স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে দেখছিস ?”

কান্নাভরা হাসি হাসিয়া নেলী আতঁকপেঁ কহিল -- “কি করব তুই বলতে চাস ?”

উগ্রকণ্ঠে আন্না কহিল -- “কি আবার করবি, বিদ্রোহ করবি মাপ করিস বোন, এ অত্যাচার পণ্ডতেই করে, আর নির্বিচারে সয়ে যায় যারা তারাও পণ্ড ছাড়া আর কিছু না।” নেলী মৃদুস্বরে কহিল, -- “তা জানি আন্না, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন তারই জ্বালানো সাজে যে আগুনে সবকিছু অসত্য বা অন্যায়কে পোড়াবার শক্তি রাখে -- সে শক্তি সবার মধ্যে নেই বোন।”

আন্না অবাক হইয়া কহিল, -- “কিন্তু এই যে একটা খামখেয়ালের বসে একজন অবিরোধী তোমার প্রতিভার উন্মেষকে এমন ক’রে হত্যা করলেন, এর বিরুদ্ধে বলবার কি তোমার কিছু নেই নেলী?”

চাকর আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। নেলী খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তার চোখে মুখে চুমা লইয়া বলিয়া উঠিল --- “এই খোকার মুখ চেয়ে আমি সব ভুলব আন্না -- আর যদি আমার আশা না ব্যর্থ হয়, তাহলে যে সাধ, যে মুকুলিত কামনা আজ আমার বুকের মধ্যে আগুনের হক্কায় মুষড়ে গেল, এই শিশুর জীবনে তাকেই আমি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।”

আন্নার বিদ্রোহের সঙ্গে নেলী সামিল হতে না পারলেও সে যেন সেদিন থেকে সঙ্কল্প করে বিদ্রোহের। যে কাজ সে করতে পারেনি সে কাজ সে তার খোকার মধ্যেই গড়ে তুলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে।

চেতনামুক্ত পূর্ণশশী দেবীর গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করা হলো।

অভিসারে গল্পের নায়িকা কল্যাণী, সুন্দরী বিধবা। একমাত্র পিতা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। পিতা দেবনাথ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত, স্থানীয় জমিদার হিরন্ময়ের কাছে পিতা ঋণগ্রস্ত। সময় মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় জমিদারের লোকজন এসে হিরন্ময়কে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করে। পিতা বুঝতে পারে কল্যাণীকে নিয়েই এই ষড়যন্ত্র। ব্যাকুল পিতা চিন্তা করে কল্যাণীকে যদি শৃঙ্গুরবাড়ী পাঠানো যায়। এদিকে প্রতিবেশী পদ্মপিসী জমিদারের চিঠি চুপিচুপি পৌঁছায় কল্যাণীকে। জমিদার দেবনাথকে ঋণমুক্ত করার পরিবর্তে দাবি করে কল্যাণীকে। একমাত্র সম্বল হাতের দুগাছি রুলি বন্ধক দিয়ে কল্যাণী বাবাকে কবিরাজ ডেকে এনে চিকিৎসা করায়। অসহায় পিতা বলে ফেলেন -- “কলি, তোর বাবাকে এবার আর বাঁচাতে পারবি না মা। -- “ধর্মপথে বাঁচবার উপায় নেই”, -- যতই চেষ্টা করো।”

কল্যাণী ব্যগ্রব্যাকুল ভাবে বলে, “আমি তোমাকে বাঁচাব বাবা, তোমাকে অমন নিষ্ঠুরভাবে মরতে দিতে আমি পারব না।”

তারপর সে ছোট এক টুকরো কাগজে চুপি চুপি কি লিখে পদ্মপিসীকে দিয়ে আসে।

এরপর পিতা ঘুমিয়ে পড়লে --- “বাইরের কপাটে শিকল টেনে দিয়ে কল্যাণী একবার আকাশপানে চেয়ে হাত জোড় করে বললে --- তুমি তো অন্তর্যামী -- সবই তো দেখছ। তুমি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা কর।

তারপর সভয়ে, চকিত নয়নে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে কুঠা জড়িত এস্ত চরণে বাগানের পথ ধরে চলল। যত যায় বুকের কম্পন ততই বেড়ে চলে। অন্ধকারে বিষম একটা বিভীষিকা জাগিয়ে শৃঙ্গালের দল ডেকে ওঠে কোথায়, -- নিশীথিনীর বুক ফাটে, আর্তনাদের মত। কল্যাণী সহসা থমকে দাঁড়ায় আবার চলে-- সে আজ অভিসারিকা।

পুষ্করিনীর খানিক তফাতে পশ্চিম দিকে যে বাঁশঝাড়গুলো গায়ে গায়ে ঠেকে নিবিড় ছায়াকুঞ্জ রচনা করেছে, সেদিকে আসতেই শুকনো পাতার খসখস শব্দ শোনা গেল। একটা দীর্ঘছায়া, কে যেন এগিয়ে আসে সন্তর্পণে। কাছে, -- আরো কাছে -- কল্যাণীর বুক হাতুড়ীর ঘা পরতে লাগল। হিরন্ময় আস্তে বললে -- এসো কল্যাণী, আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, তোমার এত দেবী।”

কল্যাণী নিজেকে সমর্পণ করার আগে দেখে নেয় দলিলখানা সত্যিই তার ঠাকুরদার সাক্ষরিত কিনা। নিশ্চিত হয়ে কল্যাণী তমসুকখানা মোমবাতির আলোয় পুড়িয়ে ফেলে। কল্যাণীর চটুলতা হার মানে জমিদার হিরন্ময়। জমিদার প্রদত্ত টাকার বাড়িল পিতাকে পৌঁছাতে চায় কল্যাণী।

আঘোরে নিদ্রিত পিতার বালিশের তলায় নোটের তাড়া ও একটুকরো কাগজ রেখে পিতার পা দুখানিতে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বললে -- “সন্তানের অপরাধ নিও না বাবা, -- চোখের উপর পিতৃহত্যা দেখতে পারব না বলেই আজ তোমাকে এ অবস্থায় রেখে -- এমন করে যেতে হ’ল।”

“কল্যাণী যে পথে এসেছিল সেই পথেই চলে আবার, কিন্তু খানিকটা গিয়েই গতি পরিবর্তিত করে আসে সেই বকুলতলার পুকুরঘাটে। দু’তিন ধাপ নামে আস্তে আস্তে কল্যাণীর গা হুম্‌হুম্‌ করে ওঠে, বুক টিপটিপ করে। অন্ধকারে পুকুরের জল কিরকম মিশমিশে কালো দেখাচ্ছে -- যেন রক্তপিপাসু রাক্ষসের সর্বগ্রাসী হাঁ !

নৈশবাতাসে বাঁশঝাড়গুলো কর্কশ শব্দ করে -- পাতাগুলো সির্‌ সির্‌ করে কাঁপে। কল্যাণী থমকে দেখে, ওকি ? বাঁশঝাড়ের ফাঁকে আলো দেখা যায় না হ্যাঁ, এ সেই মোমবাতির ... হিরন্ময় এখনো প্রতীক্ষা করছে -- কী অধীর ব্যাকুল প্রতীক্ষা ! হায় ! ভগবান্ --

ধীরে ধীরে কল্যাণী পুকুরে নেমে পড়ে -- সেই কালিগোলা মতো কালো জলে, কী শীতল তার স্পর্শ ! কন্টকিত দেহ, স্পন্দমান বক্ষে সে আকুল হয়ে চায় আকাশের দিকে, হাত দু’খানি জোড় করে আর একবার বলে আমায় ক্ষমা করো

কল্যাণী একবার ডোবে, আবার ভাসে -- আবার ডোবে। কেউ দেখে না, শুধু আকাশ ছাওয়া মেঘের ফাঁকে দুটি নক্ষত্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখে কল্যাণীক এই অপরূপ অভিসারযাত্রা।

টেউগুলি এর চারিদিকে আবর্ত রচনা করে আনন্দে নাচতে থাকে —

— ছল্ ছল্ ছলাৎ !

হিরন্ময় ছুটে আসে এবার, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই পায় না দেখতে। বিভ্রান্ত চিহ্নে ব্যাকুল কণ্ঠে সে ডাকে কল্যাণী ! একি করলে কল্যাণী !

সাড়া পায় না। প্রতিধ্বনি ফিরে আসে শুধু। অন্ধকারে সাঁ সাঁ করে গুমরে ওঠে কোন অদেহীর আকুল দীর্ঘশ্বাস। মাথার ওপর বকুলের শাখার শব্দ হয় ঝটপট করে, তারপরও কার তীব্র অউহাসি ? হিরন্ময়ের বুকের রক্ত জমাট করে দেয় -- বরফের মত। ওঃ ! কল্যাণী”

জমিদারের অত্যাচারের সীমাহীন মাত্রা থেকে পরিভ্রাণের পথ মৃত্যুকেই খুঁজে নেয় কল্যাণী।

“দুই দিক” গল্পটির প্রতিবাদী নায়িকা অমিতা। অমিতা স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পর জ্যাঠা ও জ্যাঠাইমার কাছেও থাকতে না পেরে একদিন মাত্র পনেরো টাকা সম্বল করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নানা বিড়ম্বনা ভোগের পর আর্ষসমাজভুক্ত একজন সহৃদয় হিন্দুস্তানী ভদ্রলোকের আশ্রয়ে জীবনকে নতুনভাবে খুঁজে পায়। সেদিনের সেই সাধারণ গৃহবধূ একজন ডাক্তার হয়ে ওঠে। এই অমিতাই একদিন জ্যাঠামশাই এর সঙ্গে তার স্বামীগৃহে গিয়েছিল এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে। স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। তবুও “ হিন্দু মেয়ের পতি ভিন্ন আর গতি নেই, -- স্বামীগৃহের আন্তকুড় ঝাঁট দিয়ে খাওয়া হিন্দু নারীর পক্ষে পরম গৌরবের বিষয় না কি ! -- তাই এই ভাগ্যহীনা মেয়েটি শাশুড়ী ও স্বামীর পায়ে ধরে কত কাকুতি মিনতি করে সে বাড়ীর কোণে এতটুকু আশ্রয় যাপ্তা করেছিল, কিন্তু বিমুখ হয়ে ফিরতে হ’ল তাকে শুধু চোখের জল সম্বল করে। অমিতার বধু জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি।”

বিতাড়িতা অমিতা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে লক্ষ্মী বাদশাবাগের কাছাকাছি একখানি বাংলাতে থাকে। অল্পসময়ের মধ্যে বেশ নাম করে ফেলেছে সে। সহকর্মী চিকিৎসক ডাক্তার চক্রবর্তীর সাথে অমিতার বেশ সখ্যতা। অমিতার পূর্বতন স্বামী -- রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার দ্বিতীয় স্ত্রী দুটি সন্তান রেখে মারা যাওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েন। তিনি বহুকষ্টে ঠিকানা যোগাড় করে অমিতার কাছে আসেন। অমিতার আমূল পরিবর্তনে হতবাক হয়ে যান। অমিতাও অবাক হয় বইকি। তবে অমিতা আর স্বামীকে স্বামীর মর্যাদা দেয় না। কর্তব্যবোধে শুধু থাকা

খাওয়ার ব্যবস্থা করে। দুজনের কথাবার্তায় ধরা পড়ে অমিতার প্রতিবাদী রুখটি। “...তারপর বার দুই কেশে, অমিতার অবনমিত শুক্ল মুখের পানে তাকিয়ে বাধবাধভাবে তিনি বললেন, কত কষ্টে তোমার সন্ধান করতে পেরেছি যে ওঃ !

অমিতা অতর্কিতে এসে পড়া ক্ষণিকের দুর্বলতা সবলে ঝেড়ে ফেলে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে -- কেন ?

প্রশ্নকারিণীর কণ্ঠস্বরে জড়তা বা সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই, কিন্তু সেই এতটুকু ‘কেন’ -র মধ্যে এমন অনেক অর্থ ছিল, যার উত্তর বিশেষ ভেবেচিন্তে দেওয়া যায়, কাজেই রমেনবাবু বিব্রতভাবে আমতা আমতা করে বললেন -- এদিকে এসেছিলুম একটা কাজের চেষ্টায়, তাই ভাবলুম এতদূর এসেছি যদি, তা’ একবার দেখেই যাই

আবার সেই প্রশ্নেই আসছিল মুখে -- কেন ? এত অনুগ্রহ কিন্তু অমিতা উদ্যত রসনা সংযত করে নিলে তাড়াতাড়ি। তার ঠোঁটের কোণে চকিতে ফুটে উঠল বক্রহাসির রেখা, সে হাসি তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলার মত শাণিত !

দীপু এতক্ষণ তার বাবার চেয়ার ধরে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল, অমিতা তার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল -- এ ছেলেটি ? -- এটি আমার ছেলে। ঐকে প্রণাম কর দীপু।

..... দীপুর বাবা ছেলের দিকে মমতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন -- ও এমন রোগা ছিল না, কিন্তু এবার ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তারপর যত্নআত্তিও পায় না বেচারা -- কেন ?

-- কে করবে ? মা না থাকলে ছেলেপিলের যত্ন হয় না তো ? নীহার মারা গেছে গেল কার্তিক মাসে -- প্রসব হতে গিয়ে ও !

-- সেই শব্দটুকুর মধ্যে কেবল দরদই নয়, আরো এমন কিছু ছিল যা সহজে ধরা যায় না।”

কিন্তু অমিতা স্বামীর পুত্র, মা মরা ছেলে দীপুকে ভালোবেসে আপন করে নেয়। দীপুও খুব খুশী। কিন্তু “দীপুর বাবার মুখের ভাব বিদ্যুৎ গর্ভ মেঘের মত থমথমে ছেলের উচ্ছ্বাসিত আনন্দের এতটুকুও লাগেনি তা’তে।

দেখে অনিতা ক্ষুদ্র হল না, বরং আনন্দ বোধ হ’ল তার -- এ জয়ের আনন্দ। একদিন পায়ে ধ’রে ভিক্ষা চেয়েও করুণার কণামাত্র পায়নি যার কাছে, অমিতা আজ তারই সামনে মাথা তুলে দাঁড়াত পেরেছে বিজয়িনী হয়ে। লোকটা একটু বুঝুক -- নারী হলেও সে একজন মানুষ - - পশু নয়। তার তুচ্ছ জীবনেরও মূল্য আছে, নারীত্বের মর্যাদা আছে।”

আর তাই রমেনবাবু যখন বলেন, “বাস্তবিক তুমি তো আমার অনাত্মীয় নও। তোমার সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠতম, মধুরতম সম্বন্ধ সে তো শুধু এ জনৈক নয়। অতি হতভাগা আমি, মহামূর্খ,

তাই পুজোর ফুল পায়ে দ'লে” -- সবশেষে তার ব্যাকুল প্রশ্ন -- “তুমি তো সেই অমিতা ?” বছর তেরো আগে আমি যাকে ... না, না, সে অমিতা মরেছে অনেকদিন, তুমিই তো গলাটিপে মেরেছ তাকে। আজ তুমি যদি তার সন্ধানেই এসে থাকো, তা হলে সেটা মস্ত বড় ভুল তোমার। সে অমিতা আর নেই। অমিতা যেতে যেতে আবার ফিরে বলল দীপুকে আমি চাই -- মনের মত করে মানুষ করতে ওকে আমার ভাল লেগেছে বলে, কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতা এর মধ্যে নেই কিছু। তুমি যতদিন খুশী এখানে থাকতে পারো স্বচ্ছন্দে, আমি তোমার মাথায় করে রাখব -- হিতৈষী বন্ধুর মত, কিন্তু স্বামীত্বের দাবী.....না, সে আর হয় না।”

প্রতিবাদী অমিতা স্বামীকে আর গ্রহণ করে না। সে বোঝাতে পেরেছে নারী হলেও সে পুরুষের থেকে কোন অংশে কম নয়। এ তার নারীত্বের মর্যাদা।

দিন মজুর কানাই। জমিদারের একমাত্র মেয়ের বিয়েতে বাড়ীতে অনেক কাজ। জমিদারের জমিতে বাস করে তারা। তাই বেগার তাকে খাটতেই হবে। কানাই অসুস্থ। কয়েকদিন জ্বরে পড়ে আছে বলে নায়েব মশাই নিজে তাকে ডাকতে এসেছেন। অভুক্ত কানাই মুড়ি খাচ্ছিল। কিন্তু নায়েবের আর দেরী সহ্য হয় না। কানাইকে বলে মুড়িগুলো কোচরে ঢেলে নিয়ে খেতে খেতে যেতে। কানাই এর বৌ স্বর্ণ ঘরের ভিতর থেকে সবই শুনছিল। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। “একটুকুন ঝাঁজালো সুরে সে বলে উঠল, চৌপর দিন জলে ভিজ়ে ভিজ়ে তোমাদের ব্যাগার খেটে এসে ও সেই যে জ্বরে পড়েছে -- ব্যাস। একবারে বেহঁস, জ্বরের উপর জ্বর। কত কাভ করে তবে মাথা তুলতে পেরেছে আজ। মানুষটার পেটে ভাত জল পড়ে নাই এখনো, তার ওপর এই দুর্যোগের মধ্যে ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে কি আবার না গো বাবু, ক্ষ্যমা দাও গরীবকে প্রাণে বেঁচে থাকে তবেই না.....

বাবু তো অবাক। এক ফোঁটা মেয়ে -- তার এত ফড়ফড়ানি। স্বর্ণের উত্তেজিত মুখের পানে খানিক নীরবে চেয়ে থেকে প্রবীণ নায়েব মশাই একটু হেসে বলেন -- ইস। ভারি যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস স্বল্প ? সেদিনকার একরত্তি মেয়ে, এত কথা বলে হ্যাঁ রে ? জলে ভেজা। রোদে পোড়ার ভয় করলে কি জনমজ্বরের দিন চলে, ম্যালেরিয়ার সময়, জ্বর-জারি ঘরে-ঘরেই লেগে আছে, তার জন্য কাজ কর্ম সব ছেড়ে দিয়েস্বর্ণর গা জ্বলে যায়

-- তা যা-ই বলে বাবু, আজ ও বেরোতে পারবে না। জন-মজ্বরের সুখ-অসুখ থাকতে নেই বুঝি ? তাদের দেহ বুঝি পাথর দিয়ে বলতে স্বর্ণ মুখ ফিরিয়ে নেয়।”

অল্পশিক্ষিত শ্রমিক বধূ স্বর্ণ নায়েবের সামনে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। যদিও সে তার স্বামীকে রক্ষা করতে পারেনি। নায়েব তাকে অসুস্থ শরীরেই বৃষ্টিতে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কাজ করায়। তাই কানাই যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে এক গা জ্বর নিয়ে ফিরে আসে তখন তার আর ভাত

খাওয়ারও ক্ষমতা ছিল না। পরের রাতে কানাই এর মৃত্যু ঘটে। জমিদারের মেয়ের বিয়ের বাজনার আওয়াজে চাপা পড়ে যায় স্বর্ণের কান্নার আওয়াজ।

শৈলবালা ঘোষজায়া অজস্র গল্প রচনা করেছেন। অসহায়, অপাংক্তেয় মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর গল্পে। তাঁর গল্পগুলি বেশিরভাগ সেন্টিমেন্টাল। নারী জাতির প্রতি রক্ষণশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব কিভাবে নিপীড়ন করেছে তার বিবরণ ও তার বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শৈলবালা ঘোষরায় রচিত ‘বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল’ গল্পটি একটি প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা উকিল কন্যা, তার স্বামী দেবীপ্রসাদবাবু রাশভারী উকিল, দোদর্ভপ্রতাপ মানুষটি কিন্তু মদ্যপ। বন্ধুবান্ধব সহ প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় হৈ-হল্লা করতে থাকেন। বাড়ীতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় রাগান্বিতা কিনে সেখানে নাচ গান ও পানের আসর বসাতেন। এহেন মদ্যপ স্বামীকে ঠিক করার জন্য স্ত্রী যে পন্থা অবলম্বন করেন বা যে সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করেন তা অনেক গল্পেই পাওয়া যায়। এ যেন সেই চিরাচরিত নরম মনের বাঙালী মেয়ে নয়, যে শুধু সহ্য করে আর মার খায়। মার খেতেখেতে মরতেও দ্বিধাবোধ করেন না। এখানে দেখতে পাই প্রতিবাদের নব পন্থা। যে পন্থা স্বামীকে মদ্যপান রহিত করতে যে কোন পন্থা অবলম্বন করতে পারে। স্বামীকে মদ্যপান থেকে আটকানোর জন্য,..... “অর্দ্ধ সমাপ্ত সহি করা কাগজ ফেলিয়া, ডেপুটিবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আজ্ঞে হাঁ, এই যে যাই।”

আর ঠিক সেই মুহূর্তে একগাছি ছোট রুল হাতে করিয়া গৃহিণী ঘরে ঢুকিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দুয়ার বন্ধ করিয়া, শিকল আঁটিয়া সশব্দে চাবিকুলুপ লাগাইয়া চক্ষের নিমেষে চাবিটা জানালা গলাইয়া বাহিরের বারান্দায় ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, “নতুন ঝি, যাও, চাবিটা মোনসোববাবুর স্ত্রীর কাছে রেখে এস, রাত্রি আটটার পর তিনি যখন বেড়াতে আসবেন তখন এটা আনতে বোলো.....”

“দাঁত কিড়মিড় করিয়া বিকট ভঙ্গিতে মুখ খিঁচাইয়া, প্রচণ্ড মুষ্টিঘাতে চেয়ারের বেত ছিঁড়িয়া, লাথি মারিয়া পোষাকের অনেকটা উল্টাইয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া ডেপুটিবাবু বলিলেন, “কার হুকুমে, মুন্সেফবাবুর স্ত্রীর কাছে চাবি পাঠাল।”

দ্রুত করিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া ডেপুটি-গৃহিণী শান্তস্বরে বলিলেন “মাতলামি কোর না” --

যুসি পাকাইয়া উন্মাদ হুঙ্কারে ডেপুটিবাবু বলিলেন, “তোমার বড় বাড় হয়েছে, যা খুসি তাই করছ, জানো তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব, রক্তারক্তি করব, খুন করব।”

কার্পেট ফেলিয়া কোলের উপর হইতে রুলটা তুলিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া, ডেপুটি গৃহিণী ধীরভাবে বলিলেন, “যা পারো কর কিন্তু মাতালকে জব্দ করতে আমিও জানি। আমি তোমার

মাথাও ভাঙ্গব না, রক্তারক্তিও করব না। খুনও করব না, কিন্তু এই রক্ত ছুড়ে তোমার পায়ের গোছে এমন মারব যে, পনেরো দিন বিছানা ছেড়ে না উঠতে পার। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে খবর দেব, যে, আমার স্বামী মদ খেয়ে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করছিল বলে, আমি নিজেই তার পা ভেঙ্গে শয্যাশায়ী করে রেখেছি, এতে আদালতের কার্যক্ষতির জন্য মাতাল ডেপুটি যা দণ্ড হওয়া উচিত হোক, আর আমারও.....”

এরকম নির্ভীক কথাবার্তা খুব কম গৃহিণীর মুখে পাওয়া যায়, এতদিন মেয়েরা মার খেয়ে এসেছে। শৈলবালার কলমে যেন ‘উল্টপুরাণ’ গৃহিণীর বশ মানা যেন অপমানকর। তাই পরের শনিবার ডেপুটিবাবু আদালত থেকে সোজা বাগানবাড়ীতে হাজির। কোচম্যানকে দিয়ে বলে পাঠালেন সে রাতে তিনি বাড়ী ফিরবেন না। গৃহিণীও খবর পেলেন চারজন নর্তকী, বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গে মদের আসরের মহোৎসব আজ বাগানবাড়ীতে। গৃহিণীও দমবার পাত্রী নন। নতুন ঝি ও দারোয়ান নিয়ে গাড়ী হাকিয়ে বাগান বাড়ীতে হাজির হয়ে স্বামীকে ডেকে পাঠালেন।

“গৃহিণী গম্ভীরভাবে বলিলেন, “গাড়ীতে ওঠো, বাড়ী যেতে হবে”।

কর্তা আকুল হইয়া বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ ! বাগানে উকিল মোসাহেব ডেপুটির সবাই এসেছেন এ কী কেলেকারী করতে এলে, আমায় জ্যান্ত মুখটা পুড়িয়ে দেবে ?

গৃহিণী ততোধিক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “আগুন-জ্বলেছ, বাতাস দিয়েছ, নিজে মুখ বাড়িয়েছ, না হলে আমার ক্ষমতায় কি এত কুলোয় ? এখন ভাল চাও তো বাড়ী চল”।

মুখ কাঁচুমাচু করিয়া কর্তা বলিলেন, “ভদ্রলোকেরা সবাই রয়েছেন, কি বলব ওদের কাছে ? দোহাই তোমার বাড়ী ফিরে যাও ...”

দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, “মাতলামি করবার লোভে যাদের কান্ডজ্ঞান থাকে না, তারা খুব ভদ্র ! -- তুমি মানের কান্না রাখ, -- ওঠো বলছি গাড়ীতে --” প্রাণপনে সাহস সঞ্চয় করিয়া মরিয়া ভাবে কর্তা বলিলেন, “আমি যেতে পারব না --

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, যেতে পারবে না ? বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি” কর্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “হাঁ হাঁ কর কি ? কর কি ? পাগল হলে না কি ?”

গৃহিণী বলিলেন “মাতালের স্ত্রীর পক্ষে পাগল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।”

গাড়ীর ও-পাশের দ্বার খুলিয়া গৃহিণী ডাকিলেন, “দারওয়ানজি” সামনে আসিয়া, লাঠি ঘড়ে দ্বারবান মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিয়া বলিল “হুজুর” --

গৃহিণী তজ্জনী উঠাইয়া বলিলেন, “তুমি আমার বাপের বয়সী বুড়ো মানুষ, ঝুঁসিয়ার হয়ে উজ্জত বাঁচিয়ে চলো। মাতালের আড্ডায় যেতে হচ্ছে, সাবধান থেকে, হুকুম দিয়ে রাখছি,

যাঁহাতক বেয়াদবি দেখবে, বে-দরদে লাঠি চালিও, তারপর মামলাবাজীর ঠেলা সামলাবে তোমার ডেপুটি মনিব।.....

সভয়ে ডেপুটিবাবু বলিলেন, “রক্ষা কর, রক্ষা কর -- আমার ঝকমারি হয়েছে, -- পাঁচ মিনিট সময় দাও, ওঁদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে আসি —”

পরদিনই ডেপুটিবাবু ভাড়া চুকাইয়া বাগান বাড়ী ছাড়িয়া দিলেন।

দাপটের সাথে প্রতিবাদী গৃহিণী স্বামীকে সুস্থ পরিবেশে ফিরিতে বাধ্য করলেন। শৈলবালার “দীপ্তি” গল্পটির নায়িকা দীপ্তিকে প্রতিবাদী মূর্তিতে দেখতে পাই। বি.এ. পড়া দীপ্তি প্রতিবাদ করে সমাজ সংসারের লোভী পুরুষ সরকারমশাই এর বিরুদ্ধে, যে তার বিধবা ভাই বৌদের সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে চায়। দীপ্তি অমানবদনে বলে, “নিশ্চয়। দুটি অসহায় বিধবা ভাই বৌকে ফাঁকি দিয়ে তাদের সম্পত্তি আপনি যখন গলাধঃকরণ করছেন, তখন দান্নির মত ভদ্রলোকের উচিত আপনার গলায় আঙ্গুল দিয়ে সেগুলো টেনে বের করা। তা যদি তিনি না করেন, তা হলে আমি তাঁকে ছাড়ব না। বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, জ্যাঠামশাই সাব-জজ, কাজেই আইনের মজা আমিও কিছু কিছু বুঝি। আমি তাঁকেও দেখব, আপনাকেও দেখব”।

সরকারমশাই এর তো দীপ্তির এহেন কথায় দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম। “এঁয়া, একি মেয়েমানুষ”।

প্রত্যুত্তরে দীপ্তি বলিল, “হ্যাঁ, মনে আছে আমি মেয়েমানুষ। আপনাদের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার প্রতিবাদ করা আমার পক্ষে অমার্জনীয় মূঢ়তা। যেমন আপনার বিধবা ভাই বৌ দুটি --”

সরকার মশাই যখন ভাইবৌদের নামে অমার্জনীয় কথা বলতে যান তখন দীপ্তি বাধা দিয়ে বলে, “যেহেতু তারা ন্যায্য প্রাপ্যের অধিকার দাবি করে। জানি সব। গলায় তুলসীর মালা ধারণ করেছেন, তিলক কেটেছেন, ঘটা করে হরিনামের মালা জপ করেন, সব ভাল। ওগুলোকে আমি নমস্কার করি। কিন্তু ওতে ভন্ডামী জোচ্ছুরী নৃশংসতা ঢাকা পড়ে না। লোকের চোখ আছে, আড়ালে চুপি চুপি সত্য কথা বলে, এমন লোকও আমি দেখেছি।”

তারপর সরকারমশাই যখন রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, “..... চালে আগুন ধরিয়ে দিতাম, খুন করতাম।.....”

তখন দীপ্তি বলে “স্বীকারোক্তিগুলা অত্যন্ত স্পষ্ট হচ্ছে, বিমলাদি সাক্ষী। ভাত্-বৌদের ন্যায্য প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবেন, না এবার আমিই পুলিশ ডাকব ? মেয়েটির কণ্ঠস্বর অচঞ্চল, কঠিন।

দমিয়া গিয়া সরকার মশাই বলিলেন, “কেন ?”

“নৈতিক বুদ্ধি আর সংসাহসের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

আপনার মত মানুষকে জেলখানার বাইরে থাকতে দিলে শুধু পতিপুত্রহীনা ভ্রাতৃবোদের ক্ষতি নয়, সামাজিক শান্তিরও ব্যাঘাত। সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না। তখন আঙ্গুল বাঁকাতে মানুষ বাধ্য হয়, যান।” সে দুয়ারের দিকে আঙ্গুল দেখাইল।”

শৈলবালার কলমে দীপ্তি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী অজস্র গল্প লিখেছেন। যে গল্পগুলিতে আমরা খুঁজে পাই নিপীড়িত-প্রবঞ্চিত-ভাগ্যতাড়িত মেয়েদের বাস্তব ছবি। তিনি যে গল্পগুলি লিখেছেন বলতে গেলে সবগুলির ভৌগোলিক পটভূমি বঙ্গদেশের বাইরে রাজস্থান, বারাণসী, উত্তরভারত ও পশ্চিমভারত পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁদের গল্পে আছে পণপ্রথার বীভৎসরূপ, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অসহায়তা, কালো মেয়ের বিবাহজনিত সমস্যা, বিধবাদের প্রসঙ্গ। তিনি প্রবাসে কাটালেও বঙ্গসমাজের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর যোগ। জ্যোতির্ময়ী দেবীর কলমে সমাজ জীবনের যে বাস্তব ছবি পরিস্ফুট হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম প্রতিবাদের সুর।

‘আরাবল্লীর আড়ালে’ গল্পে লেখিকা দেখিয়েছেন রাজস্থানের সুন্দরী নারীর অপূর্ব মুখমন্ডলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বিপন্ন মুখের ছবি। বীরাঙ্গনা নারীদের জীবনেও বহু ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে রাজপুত্র রমণীরা, বহু প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শ নারীর পরিচয় দিয়েছে।

‘মর্ত্যের অপ্সরা’ গল্পে পতিতাদের জীবনের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখিকা দেখিয়েছেন কেন তারা এই ঘৃণ্যপথকে বেছে নিয়েছিল, তাদের জীবনের ভবিষ্যৎ কি, তাদের মৃত্যুর পর কীভাবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তাদের নশ্বরদেহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ। জীবনবাহু যারা বহু পুরুষের মনোরঞ্জন করেছে। পেয়েছে বহুজনের অন্তর পরিচয় অথচ এই সমস্ত রমণীদের মৃতশরীরের অবমাননার বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘পিঁজরাপোল’ একটি বড় গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি কাশীর পথে পথে মৃত মানুষের সারি। লেখিকা এইসব চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিসুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

‘জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে অবহেলিত নিপীড়িত নারীরাই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। এই নারীরা অনেকটা স্বাধীন। প্রেমের ক্ষেত্রে তারা যেরকম নিজস্ব মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঠিক তেমনি প্রেম প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রেও নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাঁর সৃষ্ট অনেক মেয়েরাই অর্থলোভী, নারীলোভী পুরুষদের প্রত্যাশা করেছে। আবার অনেক মেয়েরা জাত-পাতের উর্ধ্বে অসবর্ণ বিবাহকে সমর্থন করেছে। রক্ষণশীল মানসিকতার পরিবর্তে তারা পরিচয় দিয়েছে প্রগতিশীল ভাবনার।

ডঃ সুদক্ষিণা ঘোষ ‘মৃণালের কলম’ গ্রন্থে বলতে চেয়েছেন যে তিনি জীবনকে দেখেছেন বৃহত্তর পটভূমিকায় ভাগ্যবিড়ম্বিত পরীর জীবনকে তিনি খুব কাছে থেকে দেখেছেন। অজস্র মেয়েদের

লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, বঞ্চনা শুধুমাত্র পরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি দেশের লক্ষ লক্ষ নারীদের প্রতিনিধিত্ব করেছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী রাজস্থানের সাধারণ নর-নারীদের নিয়ে বহু গল্প লিখেছেন আবার রাজ অন্তঃপুরের নারীজীবনের ট্রাজেডির ছবিও আঁকেছেন। ‘শেঠানীজী’ গল্পের নায়িকা অপরূপ সুন্দরী। যৌবনে তার রূপ সকলকে মুগ্ধ করত। একদিন এই মেয়েটি হয় রাজস্থানের রাজ অন্তঃপুরের রাণী। চন্দ্রাবৎজীর মহলের জলসায় পেয়েছিল একটি নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণটি যদিও তার কাছে ছিল বহু আকাজক্ষিত। জলসায় উপস্থিত হল। এই সুন্দরী নারীটির গলায় এলো মুক্তোর মালা, মাথায় সিদুর, কানে ঝুমকা-দুল। ঝাঁড়ের আলোতে তার সৌন্দর্য দেখে রাজা মুগ্ধ হল, রমণীটিও রাজার মনোরঞ্জন্যের জন্য সমস্ত ছলা-কলাকে কাজে লাগাল। রাজার পাশে অবস্থিত মহারানী এটা ভালো চোখে দেখিনি। এরপর ছলনাময়ী নারীর মধ্যে জননী সত্ত্বা প্রকাশ পেল। শেঠানীজীকে খোঁজার হাতে পাঠানো ঔষধ খেতে বলা হল। সে ওষুধের মধ্যে ছিল মারণ বিষ। ধীরে ধীরে সে নিস্তেজ হয়ে প্রাণ হারাল। শেঠানীজীর প্রতি এরূপ অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে জ্যোতির্ময়ী দেবী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্পটির সঙ্গে ‘আরাবল্লীর আড়ালে’ গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ধাপি নামে যে অপরূপা মেয়েটি রাজপ্রাসাদে এসে গোদাবরী বাঈ রূপে পরিচিত হল। এই গোদাবরী বাঈকেই পাঠানো হল সামান্য ত্রুটির কারণে বন্দীশালায়। নির্জন অন্ধকারময় দুর্গতলে অন্ধকারময় জগৎ থেকে আর কখনো ফিরে আসেনি। অচেনা রমণীর এই নির্মম করুণ আলেখ্য আমাদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। আরাবল্লীর আড়ালে এমনি কত কি ঘটে যায়। তার খবর কে রাখে।

‘সতী’ জ্যোতির্ময়ী দেবীর একটি প্রতিবাদী গল্প। এ গল্পে রামমোহনের দাদা জগমোহনের দ্বিতীয় পত্নী অলকমণির জীবন কাহিনি অবলম্বনে লেখা অলকমণিকে সতী হতে হয়েছিল অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে হয়েছিল তাকে। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে গুরু নির্দেশে অলকমণিকে সতী সজ্জায় সাজানো হয়েছে। গহনা পরিয়ে নববস্ত্র পরিধান করিয়ে শ্মশানঘাটের পথে হেঁটে হেঁটে যেতে হয়েছিল অলকমণিকে। পথে একটি শিবিকা এলে তাতে আরহণ করে তথাকথিত নিয়মানুসারে বধুমাতা সতীযাত্রা করেছিল। ধরে ধরে তাকে তুলে দেওয়া হল চিতাকাঠে। পুণ্যবতী মহাসৌভাগ্যবতী, সতী-সাবিত্রীর সঙ্গে তুলনা করে হরিধ্বনি, উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে তাকে চিতায় তুলে দেওয়া হল। জ্যোতির্ময়ীদেবী আলোচ্য গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘পুত্রোষ্টি’ গল্পটিতে জ্যোতির্ময়ী দেবী ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্পে নিঃসন্তান দম্পতির পুত্র লাভের বাসনায় পুত্রোষ্টি যজ্ঞের আয়োজন করেছিল। পুজার উপকরণের বিন্দুমাত্র ত্রুটি সে রাখেনি। পুরোহিত দম্পতিকে জানালেন একটি পশুকে এই যজ্ঞে বলি দিতে হবে। সেই পশুটি অবশ্যই তাদের একান্ত প্রিয় হতে হবে। তাদের গৃহপালিত একটি

ভালুক ছানা ছিল। সে আদরের ভালুক ছানাটিকেই জীবন্ত সমাধি দিতে হয়েছিল পুরোহিতের নির্দেশে। মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি যে নির্মম আচরণ করা হয়েছিল লেখিকা তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বেটিকা বাপ’ গল্পে আমরা দেখি শিশু কন্যার প্রতি নির্মম আচরণ। তৎকালে কন্যাসন্তানের বিশেষ কোনো মর্যাদা ছিল না। তাদের সংসারের বোঝা বলে মনে করেছিল শিশুকন্যার বাবা ও মা। এর ফলস্বরূপ শিশু কন্যার বাবা নির্মমভাবে কন্যাটিকে হত্যা করে। লেখিকা কন্যা ভ্রূণ হত্যা ও শিশুকন্যাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষরা একবারও বুঝতে শেখেনি যে একশোটি পুত্র পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল করতে না পারলেও একটি কন্যা সন্তান তার চেয়েও বেশী মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। লেখিকা আরও দেখিয়েছেন আরাবল্লীর আড়ালে বালিকা কন্যা বিক্রয়ের কাহিনী। যে সমাজ নারীজাতির সম্মান দিতে পারেনি, সে সমাজের বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রতিবাদ জানিয়েছেন ‘সে ছেলেটা’ গল্পে।

জাত-পাতের বিরুদ্ধে লেখিকার একটি অনবদ্য গল্প ‘এপারগঙ্গা-ওপারগঙ্গা’ এই গল্পের নায়িকা সুতারা হিন্দু। তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এক মুসলমান যুবক। অথচ মুসলমান যুবকটির প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ দূরের কথা, সুতারাকে মুসলমান স্পর্শ করেছিল বলে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে চলতে হয়েছে। লেখিকা এই ধরনের সম্প্রদায়গত বিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

এছাড়া লেখিকা বিধবার প্রতি অবিচার, বারান্ধনা নারীর প্রতি কুৎসিত আচরণ, অন্ত্যজদের মৃতদেহ ফেলে রাখার প্রসঙ্গ, বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতি তৎকালীন সমাজের অন্ধকারময় দিকের বিরুদ্ধে জানিয়েছেন প্রতিবাদ।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘গঙ্গাফড়িং’ গল্পটিতে ষোলো বছরের নায়িকা সুবালার সঙ্গে চব্বিশ বছরের অজিতের এক মিষ্টি মধুর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুবালাকে পড়াতে অজিত এ বাড়ীতে আসত। কিন্তু অজিতের পিতা এ বিবাহে রাজি নয়, অজিত বন্ধু জিতেনকে দিয়ে বলিয়েও পিতাকে রাজি করাতে পারেনি। অজিত সুবালার মাকে বলে, পিতার অগোচরে বা অবর্তমানে সে সুবালাকে বিবাহ করবে। সরল মনে সুবালা অজিতকে বিশ্বাস করে। এ বাড়ীতে অজিতের আসা যাওয়া চলতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন অজিতের বিবাহ হয়ে যায়।

তারপর বহুদিন বাদে অজিত সুবালার খোঁজ পায়, ততদিনে অজিতের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে এক কন্যা বর্তমান। সাক্ষাতের পর অজিত সুবালাকে তার স্বামী পুত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানতে পারে, সুবালা অজিতের বন্ধু জিতেনের দ্বারা প্রতারিত। বিবাহের প্রলোভন ও সাহায্যের আছিলায় সুবালার সঙ্গে মেলামেশা। তারপর বিয়েতে মায়ের মত নেই বলে জিতেনের পলায়ন।

অবশেষে মানিকের জন্ম।

অবিবাহিত কুমারী মায়ের সন্তানকে নিয়ে গুরু জীবন সংগ্রাম। অবশেষে ধর্ম মা কামার গিন্নীর সহায়তায় মুড়ি ভেজে বিক্রি করে অতিকষ্টে জীবন ধারণ।

হঠাৎই অজিত ওকে প্রস্তাব দিয়ে ফেলে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। তার বাড়ীতে, তার মেয়ের অভিভাবকের মতন হয়ে সে থাকবে। সুবালার যেন হঠাৎ চমক ভাঙল। “....বললে, না, আমি যাব না”। অজিত ভাবল যে তার জন্যই সুবালার আজ এই পরিণতি। সে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। “আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও। আমি আমার মেয়ের সঙ্গে মানিকের বিয়ে দেব। তুমি চল। তুমি জান না, আমি নিজের কাপুরষতায় কত কষ্ট পেয়েছি।

সে বিশ্বাস করছি। কিন্তু আমি যাব না। তুমি কি আমাকে একটু শান্তিও পেতে দেবে না ? অজিত ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলে। আমার প্রায়শ্চিত্ত করি বিয়ে দেওয়াতে কি আর হবে, আবার হয়তো তোমার নির্দোষ মেয়েটি আমার ছেলের হাতে কষ্ট পাবে। ওই কি বড় হয়ে - থাকগে।

লজ্জিত অপ্রতিভ অজিতের অর্ধসমাপ্ত কথাটার শেষ বুঝতে বাকি রইল না। একটুখানি চুপ করে থেকে সে আবার বললে, তোমাদের এখন কি করে -- ? বলে থমকে গেল।

সুবালার মুখে একটু হাসির আভাসের মতো দেখা গেল, ঐ মুড়ি ভেজে। একটু থেমে বললে, দরকার হলে কামার মা দেন, আর অন্য কাজও করি - পাড়ার লোকের চাল কড়াই ভাজি, বাছি।

অজিতের চোখ তোলবার ক্ষমতা ছিল না। সুবালার শ্রান্ত উদাসীন চোখ দুটি তার পানে চেয়েছিল। অবশেষে বললে, তবে তুমি শুধু খরচের টাকাই আমার কাছে নাও।

না আমার আর আশাও নেই, নেশাও নেই, কোনোরকমে সোজা এই পথেই শেষ খুঁজে নিতে দাও। সুবালা মৃদু দৃঢ় স্বরে বললে। আমার অচল আর হবে না। আর - তুমি এস না। সুবালা উঠে দাঁড়াল।”

সুবালার এই ভিন্ন ভাবনার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা। পুরুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সে খানিকটা স্বনির্ভর হতে পেরেছে। তার দিনাতিপাতের এখন আর কোন অসুবিধা নেই। তাই সে অজিতকে দৃঢ় কণ্ঠেই ‘না’ বলতে পারে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘দর দস্তুর’ গল্পটি বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া এক মেয়ের একটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিবাহ পূর্ববর্তী রীতি হল কেনে দেখানো পর্ব। নিভা নামক মেয়েটিকে চরম অমর্যাদার সম্মুখীন হতে হয়েছে, পাত্র পক্ষের সামনে। “পূর্ব দিনের চেয়ে বেশি করে সাবান, স্নো ঘষে রংটা খানিকটা খসখসে করে, মাথা ঘষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন করে শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবেচিন্তে অনেক পরিশ্রমে

শ্যামা মেয়েটিকে সবাই সাজালো — “অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখের কোলে উপচে জল পাঠায়।”

পাত্র পক্ষের বিভিন্ন ধরনের অশালীন কথাবার্তা পাত্রীর পিতাকে সহ্য করতে হয়। কিছু বললে পাছে মেয়ে পছন্দ না হয় এই ভয়। নিভার তো “গান গাইতে গলা কেঁপে গেল”, তারপর মেয়ে পছন্দ হলেই তো হল না। পাত্রীর কালো রঙকে ফরসা করার পদ্ধতি স্বরূপ টাকা, গয়না প্রদান। কি অদ্ভুত প্রথার সামনে আজও মেয়েরা নত হয়ে নারীত্বের অপমান ঘটায়। এই গল্পে জ্যোতির্ময়ী দেবী নিভার মাধ্যমে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। নিভার কাতরোক্তি “আমার ওরকম করে বিয়ে দিও না মা”। “ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল করে এল”।

মা’ও তো মেয়ে। মায়েরও তো এই সামাজিক রীতি মেনেই বিবাহ হয়েছিল। তাই মা’ও যেন নিজের অজান্তেই বলে ফেলেন “এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।”

এই সামাজিক ব্যাধির অবসান কোথায়? নারীত্বের অপমান মেনে নিয়েই কি নারীরা যুগ যুগান্ত ধরে দরদস্তুর করেই পথ চলবে।

“জননী” গল্পটিতে সামাজিক প্রথা মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম করতে হয়। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করতে যুগ অস্বীকার করে। বিধবা জননীর কৃত্তী পুত্রেরা সবাই সচ্ছল। একজন প্রফেসার, একজন ডাক্তার, দু’জন উকিল। এহেন পুত্রদের সংসার চালানোর খরচ বেশী হওয়ায় মাতাকে কথা শুনতে হয়। মা মরা পৌত্র যোগেনকে বেশি প্রশ্রয় দিচ্ছেন জননী। তাই ছেলেদের দোষারোপে বার্ষিক্য না আসলেও মায়ের স্থবিরতা হল। তাই আন্তে আন্তে জননী সবকিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। সব দায়িত্বভার ছেড়ে ঠাকুরঘর ও শিশুদের নিয়ে পড়ে রইলেন। নিজে অসুস্থ হলেও কাউকে কিছু বললেন না। এরপর এই মাতার মৃত্যুতে পুত্ররা ষোড়শ উপাচারে শ্রাদ্ধ করে। এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে এত সমারোহ দেখে যোগেন প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। শ্রাদ্ধ অর্ধসমাপ্ত করে উঠে পরে এবং বলে “তখন তো কেউ তোমরা ঠাকুমাকে এসব কিছুই দাওনি। খালি সবাই রাগ করতে, “আমি মরা ঠাকুমাকে দিতে চাই না”।

যোগেনের এই প্রতিবাদী কথার মধ্য থেকেই প্রকাশ পায় যে এই সামাজিক প্রথা কতটা অমূলক। মৃত্যুর পর এই সব দানক্রিয়াদিতে কি লাভ মৃত্যুর।

রাধারাণী দেবীর পরিচয় শুধুমাত্র কবি কিংবা প্রাবন্ধিক হিসেবেই নয়, তিনি একজন বিখ্যাত গল্পকার ও প্রথাগত শিক্ষা তিনি লাভ করেননি। কিন্তু তাঁর সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই। ছোটগল্প-এর বিষয় নির্বাচনে, স্বচ্ছ-সাবলীল ভাষা

চয়নে তাঁর যে অসামান্য দখল ছিল একথা নির্দিষ্টায় বলা যায়। নবনীতা দেবসেন মা রাধারাণী দেবীর গল্পের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন —

“মধ্যবিত্ত বাঙালির সামাজিক মূল্যবোধের বিবর্তনের দিক থেকে ভাবলে ইতিহাসবিদ হিসেবে প্রতিটি গল্পকেই তাঁর মহার্ঘ সম্পদ মনে হয়েছে। যার একটিও হারানো উচিত নয়। এর মধ্যে তরুণী বাল-বিধবা লেখিকার মনের যে চেহারাটি ফুটেছে, বঙ্গ সংস্কৃতির সাক্ষ্য হিসেবে সেটি নিঃসংশয়ে মূল্যবান।” ১

রাধারাণীদেবীর গল্পে ধরা পড়েছে সময়ের প্রতিচ্ছবি। ‘কল্লোল’ পত্রিকার পুরোধা মণীন্দ্রলাল বসু রাধারাণীর গল্প লেখার উপাদান সম্পর্কে রসদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখেছেন, তাঁর লেখার দর্পণে প্রতিফলন ঘটেছে সময়, চেতনা ও মূল্যবোধের। তাই সঙ্গত কারণেই তিনি বলেছেন, “আমাদের কালের গল্প শুনতে চাও তো রাধারাণীর কাছে যাও, ও পুরো সময়টাকে ধরতে পারবে।”

২

নারীর সতীত্ব বিষয়ে রাধারাণী যে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচায়ক। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পুরুষতান্ত্রিক হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারীরা আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে, যদিও তাঁর গল্পের এই নারীরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান। তারা বিদ্রোহ করে না, মানসিক দিক থেকে এ নারীরা দৃঢ় সংকল্প হলেও সমাজকে তারা ভেঙে ফেলেননি। নারী পুরুষের সম্পর্ক তাঁর কাছে প্লেটনিক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ‘শনিবারের চিঠি’, সম্পাদকের কিছু কিছু আপত্তিজনক মন্তব্যটি লক্ষ করেছেন।

অন্তঃপুরের রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের জন্য ‘শনিবারের চিঠি’, কার্টুন বের করেছিল। রাধারাণী বসে কুটনো কুটছেন, ইজিচেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা কবি। কিন্তু মানুষের দেহজ রিপুতাড়না ও আত্মিক প্রেমভাবকে রাধারাণী পৃথক করে দেখেছেন, দেহ ও মনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন জীবন যাপনে রিপু জয় করাকেই মনুষ্যোচিত কাজ বলে সম্মান দিয়েছেন। প্রেমে দেহের জিৎ, তাঁর চোখে মনুষ্যত্বের পরাজয়। তাঁর নায়িকারা প্রেমে পড়ে বটে, কিন্তু তারা সনাতন, সংজ্ঞায় সতী, অনায়াসে দেহকে উত্তীর্ণ করে যেতে পারে তাদের প্রেম। একের পর এক গল্পে দেখতে পাই বালবিধবা কন্যার, বা বয়স্কা কুমারীর একাকিত্বের কাহিনী।”

রাধারাণী দেবীর গল্পে বাঙালি নারী জীবনের বিড়ম্বনার বাস্তব চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। কোন কোন গল্পে একটি মেয়ের দোজবরের সঙ্গে বিবাহের কাহিনী, অরক্ষণীয়া নারীর দুঃখময় জীবনের কথা, বাল্যবিধবা নারীর জীবন কথা, সতীন ঘরে থেকে বিড়ম্বিত জীবনের চিত্র, বাগদত্তা মেয়েদের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কাহিনী, সন্তানহীনা নারীদের মর্মযন্ত্রণা, মা হবার আকাজক্ষা, সৎ মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসার পরিচয় সব কিছু উঠে এসেছে। এই শ্রেণির গল্পগুলিতে নারীরা অনেক ক্ষেত্রেই

বিদ্রোহিণী। এই বিদ্রোহ কখনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কখনও সমাজের বিরুদ্ধে দেখা দিয়েছে।

‘যমের অরুচি’ রাধারাণীর প্রথম শ্রেণির গল্প। এই গল্পটিতে একটি অরক্ষণীয় মেয়ের জীবন কথা বর্ণিত হয়েছে। পণ প্রথার ভয়াবহতা একটি নারীর জীবনে কিভাবে মৃত্যুকে ডেকে এনেছে লেখিকা তার সার্থক রূপ দিয়েছেন। গল্পের নায়িকা ক্ষেত্তি তার বয়স বেড়ে যাচ্ছে এজন্য পাড়ার গিন্নীদের বাক্য যন্ত্রণা তার মাকে শুনতে হয়েছে। বাংলাদেশে মায়েদের প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে এমনি বহু বাক্য যন্ত্রণা শুনতে হয়। পণ প্রথার অভিশাপ থেকে সমাজ মুক্ত হতে পারেনি। ক্ষেত্তির পিতা বিবাহের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে রাখতে পারেনি। তার দিদিদের বিয়ে দিতে গিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি। ঘরে তাদের পুরানো আমলের বাসন কাসন ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। এরই মধ্যে রামখুড়ো, মিত্তির মশাই, গোবিন্দ এমন একটি সম্বন্ধ এনেছিল যে ক্ষেত্তির চেয়ে বয়সে তিন গুন বড়ো। তার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় পাথর বেঁধে নদীর জলে ডুবে মরা অনেক ভালো। এই বয়স্ক লোকটির সঙ্গে বিয়ে ঠিক না হলে সমাজে ক্ষেত্তিদের এক ঘরে করে রাখা হবে। মিত্তির মশাইয়ের মায়ের শ্রাদ্ধে কোন ডাক আসবেনা। এভাবে ধীরে ধীরে ক্ষেত্তির সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। এরপর ক্ষেত্তি বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। লেখিকা তার বর্ণনা করেছেন এভাবে - “মেজদি-মেজদি-শিগগির এসো, সর্বনাশ হয়েছে - ‘কি হয়েছে রে মটু ? অমন করছিস কেন ? ‘ছোড়দি গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়ে গেছে, মেজদিগো, - ‘অ্যাঃ সে কি রে। কোথায় সে ? কোথায় সে? ‘মাণিদা তাকে তুলে এনে আমাদের বাইরের ঘরে শুইয়েছেন উঁ হু হু হু - মেজদি গো, ছোড়দিকে মোটে চেনা যাচ্ছে না। কি ভয়ানক দেখতে হয়ে গেছে - কি হবে ভাই ?”

তীব্র অভিমানবশত গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেবার আগে ক্ষেত্তি সারা রাত ঘুমায়নি ছটফট করে কাটিয়েছিল। এজন্য তার মা ভেবেছে অনাদরের জন্যই হয়তো অভিমান করে সে এই পথ বেছে নিয়েছে বিয়ে হয়না বলে তার মা একদিন মৃত্যু কামনা করেছিল সেই দুঃখেই হয়তো সে প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছে। ক্ষেত্তির মৃত্যু হল কিন্তু তার মৃত্যুকে ঘিরে সমাজের এক শ্রেণির মানুষ নানা জল্পনা কল্পনা করতে শুরু করল। প্রতিবেশী মণির কাছ থেকে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এজন্য গোবর্ধন ঘোষ ও গাঙ্গুলি মশাই থেকে শুরু করে আরো অনেকেই মণির সঙ্গে ক্ষেত্তির কোনো বাজে সম্পর্ক ছিল বলে ভেবে নিয়েছে। মণি স্বার্থত্যাগী পরোপকারী উদারচিত্ত। বিভূতি সেনের মেয়ে ক্ষেত্তির এই ঘটনার জন্য মণির এত মাথা ব্যথা কেন, ঘোর সন্ধ্যাবেলায় মণি সেখানে কি প্রয়োজনে গিয়েছিল এরূপ সন্দেহ প্রবণ মানসিকতা নিয়ে তারা বলেছিল, ‘ঘোর কলি! ঘোর কলি! পাপ চারপো পূর্ণ হয়ে এসেছে এবার।’

যেমন কর্ম তেমনি ফল, বীভৎস চেহারা হয়েছে। কি আর বলব ! সমস্ত চুল ভুরু-টুরু পুড়ে গেছে। গায়ের চামড়া পুড়ে সব কুঁচকে গেছে মাঝে মাঝে লাল দগ্দগে ঘা সে অতি বিকট দৃশ্য।

‘যাই হোক সমাজের বুকের উপর এতবড়ো একটা ব্যভিচার চলবে এটা তো ঘটতে দেওয়া ঠিক নয়। এর একটা প্রতিবিধান তো করা উচিত।’ নিশ্চয়ই, তাতে কি সন্দেহ আছে? চলীন, কায়েত পাড়ায়। মিত্তির মশাইদের ওখানে একবার যাওয়া যাক। দেখি, এত বড় কাণ্ডটার তারা কি মীমাংসা করেছেন। ‘হ্যা, চলুন না, চলুন না, যাওয়া যাক। অ্যাঃ, দেখলেন তো, অমন ছুরিতে যমেরও অরুচি।’

এরূপ ঘুণ ধরা সমাজ যেখানে একটি মুমূর্ষু মেয়ের জন্য একটু সহানুভূতি তো দূরের কথা, তারা তাকে নিয়ে বিভিন্ন অপবাদ দিতে দ্বিধাবোধ করেনি। সমাজের এরূপ নোংরামি, মিথ্যা অপবাদ এগুলো থেমে যানি।

‘হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়’, গল্পটিতে রাধারাণী দেবী রাণী নামে একটি গরীব মেয়ের জীবন কাহিনী অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। রাণী ছিল অত্যন্ত রূপবতী নারী। গণত্বকারের দৃষ্টিতে তার মধ্যেই রাণী হওয়ার লক্ষণ বলে মনে হয়েছে। এক সময়ে রাণীর বাবা ছিল লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। মস্ত বড় বাড়ীতে বহু কর্মচারী থাকত। তার বাবার সেই কারবারটি ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে উঠে যায়। তারপর তারা আশ্রয় নেয় নেনু বাগানের সরঞ্জালির ভেতর একটি ঘরে। তার মা মিনে করা রাঁধুনির কাজে নিযুক্ত হয়। কিছুদিন বাদে তার মায়ের মৃত্যু হল, মেয়েকে রাণী হওয়ার আশীর্বাদ করে। রাণীর বয়স বৃদ্ধির সাথে তার রূপ যৌবন পুষ্পিতা মাধবী লতার মতো হয়ে উঠলো। মাতৃহীনা রাণী দৈন্যের দায়ে বাসন মেজে, রান্না করে, বাটনা বেটে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। রাণী যে গৃহে কাজ করত সেই গৃহের কর্তার খাস ভৃত্য মধী খানসামা রাণীকে ভালোবেসে এক জোড়া পাতলা সোনার পাত মোরা তামার শাখা বের করে রাণীকে প্রেম নিবেদন করে। সে বাড়ীর মেজ বাবু বিশ্বনাথ এই দৃশ্য দেখে ফেলে এবং রাণীকে আশ্বস্ত করে তাকে নির্ভয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়ার কথা জানায়। তারপর ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র বিশ্বনাথ ছুটিতে বাড়ীতে ফিরে এসে তার মায়ের কাছে রাণীকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানায় এতে বাড়ীর কর্তার আপত্তি থাকে। আপত্তির কারণে এই বিয়ে হয়নি। রাণীর সঙ্গে বিয়ে হল দোজবর ভূপতি নামে এক চাকুরে ছেলের সঙ্গে। সে কলকাতার খিদিরপুরের জেটিতে জাহাজে কাজ করে। ভূপতি বিয়ের পর স্ত্রী রাণীকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি। এত সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করা সত্ত্বেও ভূপতি পতিতা নারীর সঙ্গে সংসর্গে লিপ্ত হত এবং সে ছিল মদ্যপ। মাসের বেতন সে মদ খেয়ে উড়াতো। মাঝে মাঝে মদ্যপ অবস্থায় গভীর রাতে বাড়ীতে ফিরে এসে চিৎকার আর মাতলামি, বমি, হাসি, কান্না, অশ্রাব্য গালাগাল, রাণীকে প্রহার ও হৈচৈ করত। ভূপতির এরূপ আচরণে রাণী প্রতিবাদ করত। আর প্রতিদান স্বরূপ তাকে পেতে হত মারধোর, লাথি, চুলের মুঠি, গালিগালাজ ও কুকথা শুনতে হত। তার পর “ভূপতি উচ্ছৃঙ্খলাতা বেড়েই চলেছে; ফলে অর্থাভাবধার কজ্জ ঘটি বাটি বাঁধা রাণীর অর্দ্ধাহার অনাহার প্রহার উপবাস দুঃখ দৈন্য ও কষ্টের

যেন সীমা নেই ! দিন যেন আর চলে না।”

এরপর প্রেমপত্র, প্রেমের গান, মিষ্টি, টাকাকড়ি, রূপোর কোমরের গোট প্রভৃতি রাণীর ঘরের সামনে আসতে দেখে রাণী কেঁদে কেঁদে সে স্থান ত্যাগের অনুরোধ জানায় ভূপতিকে। প্রত্যুত্তরে ভূপতি রাণীকে গালাগাল করে এবং গোট ছড়া দিয়ে রাণীকে বেদম প্রহার করে। সুযোগ পেয়ে এই গোট ছড়া নিয়ে পালিয়ে যায়। বিপিন রাণীকে খুবই ভালোবাসত। রাণীর প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির সুরে সে প্রেম নিবেদন করে। ভূপতির অত্যাচার তাকে ব্যথিত করে। অভুক্ত রাণীকে খাইয়ে পরিয়ে সুগৃহিণী রূপে গ্রহণ করতে চায় এবং সবিনয়ে অনুরোধ জানায় তার সঙ্গে গাড়ীতে করে পালিয়ে যেতে। একদিকে রাণীর সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা, পেটে ভাত নেই, একমীঠো ক্ষুদ্রও নেই ঘরে অন্যদিকে সেদিন বিপিন রাণীর জন্য এনেছে খাবার। তাকে রাণীর মত করে রাখবে এই প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছিল। ধীরে ধীরে সংস্কারের বেড়া জাল থেকে মুক্ত হয়ে প্রেমের আহ্বানে সে সাড়া দিয়ে বিপিনের গাড়ীতে উঠে বসে।

আলোচ্য গল্পে পেটের জ্বালায় অত্যাচারী স্বামীর প্রতি ঘৃণাবশতঃ রাণী তার সহ্য ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলেছিল। তার কাছে সতীত্বটাই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। ভালোভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকাটাই তার কাছে ছিল জরুরি বিষয়। তাই সংস্কারের বেড়া জাল ছিন্ন করে বিপিনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে এবং স্বামীর অক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

তৎকালীন সংস্কারবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে রাণীর এই প্রতিবাদ — রাধারাণীর অমর লেখনীতে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল, লম্পট পুরুষরা কিভাবে মেয়েদের জীবনে বিভীষিকার মতো দেখা দেয়, এ ছবি শুধু বঙ্গদেশেই নয়, সারা ভারতের কি শহরে, কি গ্রামে এই অসহায় মেয়েদের উপর নির্যাতনের সেই চিত্রই অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখিকা তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

‘গতানুগতিক’ গল্পটিতে স্বামীর প্রতি জীর প্রতিবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। এই গল্পের নায়িকা মলিনা। চৌদ্দ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছে। বিবাহিত জীবনে তার কেটেছে আরও চৌদ্দ বছর। সংসার জীবনে প্রবেশ করে সবার সঙ্গে মন জুগিয়ে চলতে হয়, উদায়াস্ত পরিশ্রম করতে হয় তাকে। ঘর গৃহস্থালির কাজ করে সে রীতিমতো সংসারী। তার মধ্যে শাশুড়ি ও ননদের দুর্ব্যবহারে সে অতিষ্ঠ। পাশের বাড়ির একটি পনেরো বছরের মেয়ে গানের রেওয়াজ করে - বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, ঋতুরঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের গান সে গেয়ে যায়। স্বামী মেয়েটির গান শুনে প্রশংসা করলে মলিনা এসে রেগে যায়। মলিনাও বাল্যকালে সুগায়িকা ছিল - বিদ্যালয়ে যখন পড়ত ‘ডাকঘর’ নাটকের সুধার অভিনয় করে খুবই প্রশংসা পেয়েছিল।

বিয়ের পর এগুলো তার কাছে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘরের বাসন মাজতে

মাজতে নিজেই সে স্বগতোক্তি করে — “মাগো কত বেলাই যে হয়ে গেল ক’খানা বাসন মাজতে! কখন উনুনে আঁচ দেবো, কখনই যে ঘর দোরে বাঁট-পাট -বিরান-মাদুর সারবো - ঠিক নেই।”

এরপর দোতলায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দেখা হয় তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামী মলিনাকে জানায় পাশের বাড়ির মেয়েটা বেশ গান গায়। মলিনা সে গান শুনেছে কিনা ? ওর গাওয়া গান মলিনার কেমন লাগে। বধূ তার উত্তরে জানিয়েছে —

“ভালো না ছাই। তারপর অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোট উল্টে সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেতে যেতে বলতে থাকে - মেয়ে মানুষ গৃহস্থ ঘরে গান নিয়ে যেন ধুয়ে খাবেন।” বিয়ের পর তার গানের বিষয়ে স্বামীর কোনো আগ্রহ দেখেনি মলিনা। অথচ সে সুগায়িকা ছিল। তাই স্বামীর মুখে পাশের বাড়ীর মেয়েটির গানের প্রশংসা শুনে সে অসহ্য বোধ করেছে।

মলিনার কাছে গান আজ বিরক্তিকর - স্বামী গানের কথা বললে সে ক্ষুব্ধ হয়। গল্পটিতে প্রতিবাদ আছে - লেখিকা সেই প্রতিবাদকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘দাবিহারা’ গল্পে স্বরিত নামে একটি মেয়ে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। পরিশেষে দোজবরে বিবাহ করতে সে রাজি হয়েছে। অন্যদিকে দিবেন্দুও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চায়নি। বিবাহের ব্যাপারে উভয়ের প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় থাকলেও সারিত মাতৃত্বের প্রশ্নে বিবাহ করেছে।

‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্ধদ’ গল্পের নায়িকা - বিন্দু। চার বোনের মধ্যে সে একগুঁয়ে, জেদি। এই তীক্ষ্ণরুদ্ধি জেদি মেয়েটিকে কেউ কখনো খোসামোদে ভুলিয়ে বা ভুল বুঝিয়ে কাজ করতে পারেনি। মা এজন্যই বিন্দুর প্রতি অপ্রসন্না। পিতা তাকে আদর করে ‘পাগলি’ বলত। মা বলত এরূপ একগুঁয়ে মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ আছে। নিজের স্বভাবের দোষে ওকে কষ্ট পেতে হবে। তার স্বভাব না পাল্টালে তাকে বাকি জীবন জুড়ে পুড়ে মরতে হবে।

বিন্দু পড়াশুনায় বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রীদের মধ্যে ভালো ছিল। পড়াশুনা ছাড়াও সাংসারিক অনেক বিষয় সে বুঝত সবচেয়ে বেশি। এজন্য তার মা তাকে অপছন্দ করলেও শিক্ষয়িত্রীরা এই মেধাশালিনী ছাত্রীটির উপর খুবই প্রসন্ন ছিলেন। যখন বিন্দুবালা এগারো বছরে পদার্পণ করল, তখন তার মা চিন্তা করেছিল এত বড় হয়ে স্কুলে পড়া ভালো নয়।

তার মায়ের উক্তি - “ইস্কুলে পাঠিয়েই বা লাভ কি ? পড়ে তো জজ ব্যারিস্টার হবে না ? বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন জীবন তো কাটবে সংসারের ধামা কুলো হাঁড়ি কলসি আর ছেলের ঝিনুক কাঁথা নেড়েচেড়ে। তা সে রাজার ঘরেই বিয়ে হোক বা গেরস্থ ঘরেই হোক। দোয়াত কলম খাতা বই নিয়ে মেয়েমানুষের জীবন কাটে না।”

এরপর গৃহশিক্ষক রাখা হলো - স্কুল ছাড়তে হল বিন্দুকে। এজন্য সে দুঃখ পেয়েছিল।

অনাহারে অর্ধাহারে থেকে কেঁদে কেটে দিন কাটাতে লাগল। বিন্দু পিতা-মাতার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু তার প্রতিবাদ সেদিন তার বাব-মা কর্ণপাত করেনি। গৃহশিক্ষক প্রসন্ন বাবুর পাঠও সে গ্রহণ করেনি স্কুল ছাড়ার মর্মবেদনায়।

আবার ছোট মেয়ে ইন্দুর জন্য বেনারসী শাড়ি আনলেন কিন্তু বিন্দুর জন্য আনা হয় নি, এজন্য বিন্দু মায়ের উপর গর্জে ওঠে। শুধুমাত্র বিয়ের সময় দেবে একথা শুনে বিন্দু প্রতিজ্ঞা করে বসল, জীবনে সে কখনো কারুর কাছে আবদার করে কিছু চাইবে না। বাবা তাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলে বিন্দু এতে রাজি হয়নি — সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। ইতিমধ্যে তার বিয়ের যোগাযোগ শুরু হলে মুখ গুঁজে অশ্রুস্রব কণ্ঠে বলল —

“বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার বিয়ে একন দিও না। আমার একটুও ভালো লাগেনা ওসব।”

অবশেষে দানসামগ্রী রক্ষা করে তার বিয়ের দিন ধাঘ্য করে ফেলে তার বাবা। বিন্দু কেঁদে কেঁদে প্রতিবাদ জানায়, — “দুটি পায়ে পড়ি বাবা, এসব বন্ধ করে দাও। কি জানি, আমার যেন দম আটকে আসছে বলে মনে হচ্ছে। বিয়েতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই বাবা বিশ্বাস করো।”

বিন্দু বিয়ের পর এলাহাবাদে যেতে চাইলে শ্বশুরের অনুমতিক্রমে তা জানাবে বললে বিন্দু প্রতিবাদ করে — “কেন ? তুমি কি আমায় তাঁদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছ বাবা ?”

বিয়ের পর বিন্দুকে নিয়ে যাওয়া হল না — শ্বশুরবাড়িতে লক্ষ্মীবধূ হয়ে থাকতে হল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়াও হল না। বিয়ের পর এভাবে সাত মাস কেটে যাবার পর সংবাদ এল এশিয়াটিক কলেরায় তার স্বামী কলকাতার হস্টেলে মারা গেছে। বিন্দু হল বিধবা। এরপর হিন্দু নিয়ম অনুসারে বিন্দুর সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুরলেখা ঘষে উঠিয়ে দিল স্নানের পর তাকে পরতে হল সাদা থান, চুল কেটে ফেলা হল, নির্জলা একাদশী, হবিষান্ন আহার ব্রত-উপবাস করতে হল। তার শরীরের সোনা গয়নাও খুলে ফেলা হল। বিন্দুর জীবনের অনেক ঘটনা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হয়েছে। স্কুল ছাড়া, কুমারী থেকে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ, বৈধব্য জীবন সব কিছু ঘটেছে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বে। তৎকালীন রক্ষণশীলদের কাছে তাকে শুনতে হয়েছে এই বৈধব্যের বোঝা নাকি ভগবানের মারফৎ এসেছে। মানুষের কোন হাত নেই এতে। এটা অদৃষ্ট নিয়তির লীলা মাত্র। সে তার ভাগ্য পরীক্ষা করতে চায়। কষ্ট স্বীকার করে সে ভাবে, — “এর কর্তা কে ? ভগবান না মানুষ ? জীবনটা আমার নিজের। সুখ-দুঃখ ভোগ করব আমি — অথচ এর নিয়ন্তা অন্য সকলে। এর অর্থ কি ? আমার ভালোমন্দ ভাববার দায়িত্ব আমার নিজের নেই কেন ? দুঃখ যদি ভোগ করতেই হয়, নিজের হাতেই তা গ্রহণ করব, স্বেচ্ছায় গ্রহণ করব — অন্যে কেন তার নিয়ন্তা হয়।”

বিন্দু পনেরো বছর বয়সেই বিধবা হল — সে মানুষ, ভগবান, সমাজ কিংবা নিয়তি

সব কিছুই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চেয়েছে, সনাতনপন্থী, কঠোর ও অনুদার সমাজকে বিন্দু ভেঙে দিতে চায়। এই গল্পটি রাধারাণী দেবীর ব্যক্তিগত জীবনের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবীর “শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে” গল্পেরও নায়িকা একটি বাল্যবিধবা মেয়ে। বিবাহের পর যখন বৈধব্যের অভিশাপ তার জীবনে এল তখন তার ধনী পিত্রালয়ে স্থান হল। সেখানে তাকে কুমারীর সাজ-সজ্জাতেই থাকতে হয়েছিল। পরিবারের বহু দায়দায়িত্ব সে পালন করেছে। তার প্রতি ছিল সকলেই সহানুভূতিশীল। স্নেহ-মমতা ও করুণার মধ্যে ভুলিয়ে রাখা হয়েছিল মিথ্যে মায়ার প্রলেপ দিয়ে। একটি বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে এসেছিল অনেক আত্মীয় পরিজন। শোভারাণীর বিয়ের দিনে কণে সাজানোর সময় বাল্যবিধবা সাবিত্রী চুল বাঁধতে এসেছিল, সেসময় একটি সদ্য বিবাহিতা কিশোরী মেয়ে বলে ওঠে - “ওমা ! তা কি হয় ? সাবিত্রী পিসিমা আজ আর কি করে চুল বেঁধে দেবেন ? গায়ে হলুদের পর থেকে কনেকে আর বিধবাদের ছুঁতে নেই যে।”

শকুন্তলা এবং তার সঙ্গে ঘরের সমস্ত মেয়েরা এমন কি শোভারাণী পর্যন্ত একযোগে তর্জ্জন করে এই কিশোরী মেয়েটিকে ধমক দিয়ে উঠল - “কে বললে তোকে ? ভারী গিন্নী হয়েছেন! নে নে চুপ কর - যতসব বাজে কথা ! ছুঁতে নেই না হাতি !”

এমনই বিভিন্ন মন্তব্য শুনতে হয়েছিল সাবিত্রীকে। সাবিত্রী এরূপ উপহাসে বিদ্রূপে কাঁদো কাঁদো হয়ে মেনতিকে জানায় যে সে অপ্রিয় সত্য কথাই বলেছে এতে লজ্জার কিছু নেই। তখন থেকেই সাবিত্রী গম্ভীরভাবে থেকেছে। বাড়ির সকলেই তাকে আদরে যত্নে মাথায় তুলে রাখলেও মানসিক যন্ত্রণা তার মনকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। অভিমানবশত মিথ্যে মায়ার বুঝঝুঁমি পড়ানো পোষাক পরিচ্ছদ সবকিছুই তার কাছে বেসুরো লাগছিল। একান্ত সত্যকে মিথ্যার আবরণে আবৃত করে রাখবার জন্য তাকে পরিয়ে রাখা হয়েছিল কুমারীর সাজ। সেদিনকার উৎসব অনুষ্ঠানের দিনে তোরণশীর্ষে যখন নহবতের পূরবী রাগিণী বেজে উঠছে সে সময় তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু বিন্দু গড়িয়ে পড়ে। তারপর —

“প্রকোষ্ঠের চুড়িগুলি, গলার হারছড়া ও কানের টপ দুটি খুলে নিরাভরণা হয়ে সিমলার কালোপাড় শাড়ির উভয় প্রান্ত হতে কুচকুচে কালো পাড় দু’খানি ছিঁড়ে ফেলে দেয়। একখানা কাঁচি সংগ্রহ করে এলো খোঁপা সুদৃঢ় ঘন কালো চুলের রাশি মুঠা করে বাম হাতে চেপে ধরে — ডানহাতে কাঁচি চালিয়ে খোঁপাসমেত চুলের রাশি নিম্নমূল করে ফেলে।”

— কিছুক্ষণ পরে আয়নায় দেখতে পায় কার যেন মৃত্যুর ছবি। এই ছবিটি যে তার প্রয়াত স্বামীর একথা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না। বাল্যবিধবা মেয়েদের জীবন যে ব্যর্থ এবং সবই যে মিথ্যে এর বিরুদ্ধে রাধারাণী দেবী প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘আলো-কোথায় ওরে আলো’ রাধারাণী দেবীর কুন্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি সার্থক

গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি সিফিলিস্ রোগগ্রস্ত স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীর প্রতিবাদ। এই গল্পের নায়িকা অমলা এবং তার স্বামী হেমেন্দ্রনাথ মোরাদাবাদ শহরের বড় ডাক্তার তার নাম যশ, তার আয় মোটেই কম নয়। সে দেখতে সুপুরুষ এবং পত্নী প্রেমিক। তাদের কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। স্বামী হেমেন্দ্রনাথ একসময় অসংযত জীবন কাটিয়েছিলেন। তাই সিফিলিসের মত বিষময় ব্যাধির শিকার হয়েছিল সে।

এরফলে জন্মরুগ্ন ছেলেটিও অকালে ঝরে গিয়েছিল। এরপর খুকির জন্ম হলে পুত্রহারা অমলা খুকিকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু খুকিও ছোঁয়াচে রোগ এগজিমায় আক্রান্ত। মুখের ভিতরে ঘা এবং ডান চোখ দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ে। হেমেন্দ্রনাথের অনিন্দ্যসুন্দর স্ত্রী অমলা তার সন্তানের জন্য চিন্তিত হয়।

“হেমেন্দ্রনাথ গভীর উদাস্য ভরে বলিলেন জন্মরুগ্ন হলে অমনি একটা না একটা লেগেই থাকে, কথাটায় অমলা আহতা হইলেও কুণ্ঠিতা হইয়া পড়ল বেশি। তার সন্তান যে জন্ম রুগ্নই হয় এবং সেজন্য স্বামীকে যে তার অনেক অসুবিধে ভোগ করিতে হয় তার জন্য অমলা সর্বদা মনে মনে নিজেকে অপরাধিনী মনে করত।”

তারপরে একদিন এই খুকি মারা যায়। তার মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয় তার অন্য ছেলে। এই ছেলেটিরও চোখের দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। তার সুচিকিৎসার জন্য বহু প্রচেষ্টা চলে কিন্তু কোনোভাবে তাকে সুস্থ করা যায় এর প্রকৃত কারণ অমলার বুঝতে বাকি নেই। দুশ্চরিত্র, সিফিলিস, ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে একের পর এক সন্তান হারাতে হচ্ছে তাকে একদিন হেমেন্দ্রনাথ প্রচুর অর্থ-উপার্জন করে শিশু দিতে দিতে গৃহে প্রবেশ করে কালো রঙের সাহেবি পোষাকের কোটের বুকে একটি গোলাপ নিয়ে। তারপর সাহেবি ভঙ্গিতে পত্নীকে আলিঙ্গনের জন্য দুই হাত প্রসারিত করে দেয়। স্ত্রী অমলা ব্যাপ্তভীত হরিণীর মতো চিৎকার করে ঘর থেকে পালিয়ে যায়। তারপর তার ছেলের চোখের পুঁজ লাগা নোংরা তুলো দিয়ে মুছে পুত্রকে জানায় সেও তার মতো অন্ধ হয়ে যাবে। বলে —

“ছুঁয়োনা, আবার ছুঁয়োনা - তুমি, তুমি ছেলে মেরেছো - না,

না আমি - আমি মা হয়ে সন্তান হত্যা করেছি।”

— অমলা গভীর যন্ত্রণায় স্বামীকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছে। এর মধ্যেও প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় মেলে।

‘বিমাতা’ রাধারাণী দেবীর একটি বিখ্যাত গল্প। দশটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই গল্পটিকে বড়গল্প বলা যেতে পারে। গল্পের নায়িকা মাধুরী। ছোটবেলা থেকেই মাধুরী হয় মাতৃহারা। তার মা রেখে যায় দু’বছরের এক শিশুকুমার তপনকে। তপন মাধুরীকে মা বলে ডাকত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর বাবা মাধুরীর বিয়ের জন্য সচেষ্ট হয়। মাধুরীর বিয়ের আগে মাধুরীর বাবার চেয়ে

দেড় বছরের বড় অন্নতারাকে বিয়ে করে আনে। অন্নতারা মাধুরী ও তপনের প্রতি দুর্ব্যবহার শুরু করে দেয়। যখন মাধুরীর তেরো বছর বয়স তখন এক দোজবরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। মাধুরী তার ভাইকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেনি। মাধুরীর শাশুড়ী এবং ননদ তার প্রতি সদয় ব্যবহার দেখায়নি। তার স্বামী সন্তোষকুমারের একটি পুত্র ছিল যার নাম অমিয়েশ। অমিয়েশকে মাধুরী সন্তান স্নেহে ভালবাসত। সেই গৃহে সন্তোষের এক বালবিধবা বোন আশ্রয় পেয়েছিল। যে কোন বিষয় নিয়ে সে শুধী মাধুরী সম্পর্কে অহেতুক বিদ্বেষভাব পোষণ করত —

“মাধুরী পরের মেয়ে, কোথা হইতে ‘উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া’ গৃহলক্ষ্মী — সর্বময়ী হইয়া এ গৃহে পূর্ণাধিকারে সম্রাজ্ঞী হইয়া উপবিষ্টা হইবে, আর তৃপ্তি ঘরের মেয়ে পরের মত মাধুরীরই অনুগ্রহজীবিনী - কৃপার পাত্রী হইয়া দীনভাবে নত মস্তকে জীবন কাটাইবে, ইহা যেন অত্যন্ত অন্যায় ও অসহ্য বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।”

এদিকে অন্নতারার এক পত্র আসে মাধুরীর কাছে। পত্রে জানানো হয় তপন অত্যধিক অবাধ্য, দুষ্ট ও দুরন্ত হওয়ায় তার চরিত্র সংশোধন এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাঁচীর এক বোর্ডিং-এ পাঠানো হয়েছে। একবার মাধুরী সন্তোষকুমারকে নিয়ে পিত্রালয়ে এসেছিল। অন্নতারার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে তপন সন্তোষকুমারকে বলেছিল বিমাতা কখনও ভালো হয়না। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাধুরীর কাছে সন্তোষ তার নিজের পুত্র অমিয়কে আসতে দেয়নি। কিন্তু যেদিন অমিয়েশের বসন্ত জ্বর হোল সেদিন তাকে সেবা- গুশ্রুশ্বা করে ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে মৃত্যু সুস্থ্য করে তুলল। ডাক্তাররাও বুঝতে পারেনি মাধুরী অমি-র মাতা নয়, বিমাতা। তার কিছুদিন পর একটি পত্র অন্নতারা মাধুরীকে লিখেছে। সেই পত্রে ছিল তপনের মৃত্যু সংবাদ। এই সংবাদ শুনে মাধুরী শোকাহত হয়েছে, এবং তার শরীর হয়েছিল কৃশকায়। ভ্রাতৃহারা মাধুরী অমিয়কে নিয়ে সে তার বেদনাকে প্রশমিত করতে চেয়েছিল। অমিয়কে মাধুরীর কাছে নিয়ে আসবার জন্য সন্তোষকুমার তৃপ্তি ও তার মার কাছে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে শুনতে পেরল তৃপ্তি ও বরদাসুন্দরী অমিয়শকে বোঝাচ্ছে —

“দূর বোকা ছেলে! ওয়ে তোর সৎ মা! বড় হলে বুঝতে পারবি, ও তোর কে হয়? তোর মা ও কেন হবে? তোর মা স্বর্গে গেছে।”

দেখা যাচ্ছে পরিবারের বিমাতারা হয় নির্মম অত্যাচারী। মাধুরী এমনি একটি চরিত্র, যে সমাজের এরূপ ধারণাকে ভাঙতে চেয়েছে। রাধারাণী দেবী ‘বিমাতা’ গল্পে একদিকে বিমাতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অপরপক্ষে মাধুরীর মতো নারী চরিত্র সৃষ্টি করে বিমাতার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন।

রাধারাণী দেবীর ‘পাতানো মা’ গল্পে তথাকথিত সমাজের ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বামুনের ছেলে নিতু ছোটবেলায় হারিয়েছিল তার মাকে। পাড়ার সহায় সম্বলহীন

এক তরুণী বিধবা কায়স্থ কন্যাকে সে মা বলে ডাকত। কিন্তু সমাজ এটা ভালো চোখে দেখেনি। অনসূয়া চরিত্র নির্মাণ করে রাধারাণী নানা সামাজিক অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘মা’ রাধারাণী দেবীর একটি সার্থক গল্প। এই গল্পে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। পিতা তার পুত্র কন্যার ছোটখাট ভুলের জন্য দায়ী করছে তার স্ত্রীকে। এভাবে বঙ্গদেশের অপার ধৈর্য্যশীলা, স্নেহময়ী, জননীর রক্ষ কঠোর প্রকৃতির পিতার রক্তচক্ষু সহ্য করতে হয়েছে। মায়েদের সহ্য করতে হয়েছে পিতার নির্যাতন। একদিন পিতারও ভুল ভেঙে যায়। সে অনুতপ্ত হয়। তাই বিকাশ ললিতাকে ব্যথিত কণ্ঠে বলেছে —

“তোমার ছেলে চশমা ভেঙ্গেছে বলে এত কুণ্ঠিত হ’চ্ছ লতা ?কিন্তু ও যে আমারও ছেলে। ছেলের চশমা ভাঙায় অপরাধ হয়ে থাকলে তোমার একলারই হয়নি — আমিও তার সমান ভাগী তাই নয় কি ?”

পিতা-মাতার মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠার প্রসঙ্গ রয়েছে গল্পের পরিণতি অংশে। ছোট ছেলেটি আধো আধো স্বরে বলে উঠেছে - ‘স্মা-স্মা-স্মা-কা’।

‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’ গল্পটির নায়িকা রেণী, নায়ক সমীর। উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছিল মধুর সম্পর্ক। একে অপরকে ভালোবেসেছিল, যে ভালোবাসা দিনের আলোর মত সহজ এবং পবিত্র। কিন্তু ভ্রমর জাতির মতো পুরুষরা কখনো কখনো সে প্রেমের যথার্থ মূল্য না দিয়ে তার গানের ছাত্রী লীলার রূপে মুগ্ধ হয়েছে। সে ভুলে গেছে রেণুর গভীর ভালোবাসা। রেণুর মুখে আঘাতের কালো ছায়া নেমে এসেছিল। যেদিন বাগদত্তা ভাবী বধূকে সমীর বিয়ে করতে অস্বীকার করে। রেণুর অসুস্থতার কারণে সমীরের এই মনবদল ও বিয়ে ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত করুণ। যে সংক্রামক ব্যাধি রেণুকে রোগশীর্ণ ও কুরূপা করে তুলেছিল তার জন্য সমীর এতটুকু সহানুভূতি দেখায়নি। রেণু যক্ষ্মারোগে মারা যাবার আগে উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক সমীরকে বলেছিল, - “ওগো আমার প্রিয়! আমি হাসিমুখে তোমায় মুক্তি দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তোমার মুক্তি কোথায় ? তোমার অন্তরের প্রেম একদিন যার পানে চেয়ে সর্বপ্রথম আঁখি মেলেছিল, একদিন যার স্পর্শে তার মুদিত দলগুলি প্রথম বিকশিত হয়ে উঠেছিল, - তাকেই যে তোমার অতৃপ্ত মন জন্ম-জন্মান্তরে যুগে যুগে চিরদিন সন্ধান করে ঘুরবে! কত লীলার মাঝেই সে প্রতি জীবনেই তার হারানো রেণুকে খুঁজে ফিরবে। তুমি যাকেই বিবাহ কর না কেন, কিছু আসে যায় না- তাদেরই মাঝে তুমি ব্যাকুল হ’য়ে পেতে চাইবে তোমার এই রেণুকেই - আমি বেশ জানি।”

এই গল্পে পরোক্ষভাবে সমীরের প্রতি রেণুর প্রেম মৃত্যুলোকে উত্তীর্ণ হলেও প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল বারে’ একটি সার্থক প্রেমের গল্প। এই গল্পের নায়িকা সুধা

নায়ক প্রভাত। তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালবাসত। একদিন শিক্ষা সূত্রে প্রভাতকে যেতে হয়েছিল বিলেতে। কথা ছিল সে বিলেত থেকে ফিরে এসে সুধাকে বিয়ে করবে। সুধাও বোর্ডিং-এ থেকে আই. এ. পড়ছিল। প্রভাত সুধাকে বিয়ে করবার জন্য এডেন থেকে টেলিগ্রাম করে তার আগমন সংবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বোম্বে নামবার আগেই জাহাজের ঠান্ডা লাগে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে প্রভাতের আকস্মিক মৃত্যু ঘটল। সুধা নিজেকে বিধবা মনে করেছে। রূপ ও লাভণ্যবতী সুধার জীবনে আরও একাধিক প্রেম এসেছিল প্রভাতের কথা ভেবে সে প্রেমকে চির অমর করে রাখবার জন্য অন্য প্রেমিকের প্রেমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। তার পূর্ব প্রণয়ীর ভালোবাসার প্রতি জানিয়েছে গভীর শ্রদ্ধা। এই সতী-সাদী নারীটি জীবনে আর নতুন কোনো রঙীন স্বপ্ন দেখেনি। একই ফুল দিয়ে সে দু'টি দেবতার পায়ে পূজা করেনি। প্রথম দেবতাকেই সে পূজা করেছিল। দ্বিতীয় দেবতার বিরুদ্ধে সে জানিয়েছিল প্রতিবাদ।

‘পরম তৃষ্ণা’ গল্পটি আদ্য, মধ্য ও অন্ত এই তিনটি পর্বে বিন্যস্ত। এই গল্পে সুভাষিনীর সঙ্গে খুব অল্প বয়সেই নন্দলালের বিয়ে হয়। সুভার বাবা মৃত্যুর পূর্বে তার স্ত্রীকে বলে গিয়েছিল — “আমার নন্দকে যেন তুমি পর করে দিয় না। বিষয় থেকে বঞ্চিত কোরোনা। সুভার সঙ্গে নন্দর বিয়ে দিও তাহলে আর কোনো গোল হবে না।”

পূর্ণযৌবনা সাতাশ বছরের সুভা একত্রিশ বছরের যুবক নন্দলালের মধ্যে ছিল মধুর সম্পর্ক। একবার তারা গিয়েছিল শ্রীক্ষেত্র তীর্থ ভ্রমণে। সেখানে তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দূরসম্পর্কীয় দিদিমার সঙ্গে থাকা চিত্রা নামে একটি মেয়ের। শ্রীক্ষেত্রের সমীপের ধারে চক্রতীর্থে এক মস্তবড় জ্যোতিষী চিত্রার ভাগ্য গণনা করে জানাল, চিত্রা হবে সৌভাগ্যবতী খুব ধনী ঘরের গৃহিণী হবে সে। তার গর্ভে সুলক্ষণ দীর্ঘায়ু রাজচক্রবর্তী ছেলে হবে। নন্দলাল ও সুভাষিনীর সৌভাগ্যের চেয়েও চিত্রার সম্ভান সৌভাগ্য আরো বেশী উজ্জ্বল। চিত্রা ও সুভার প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠল সেখানে। সুভাষিনী দেখল এরকম শান্ত, লক্ষ্মীশ্রীযুক্ত অপরূপ লাভণ্যময়ী কাঞ্চন বর্ণা, ক্ষীণ তনুযুক্ত মেয়েটিকে সঙ্গে পেলে খুবই ভালো হবে সেবায়ত্রে, সংসারের গৃহকর্মে নিপুণ এই মেয়েটির প্রতি সুভা এবং নন্দলালের সু-সম্পর্ক গড়ে উঠল। ধীরে ধীরে চিত্রার আচরণভঙ্গি, চাহনি, কথাবলা সবকিছুই নন্দলালের ভালো লাগতে শুরু হল। চিত্রা আসবার পর সুভার অন্তরমহলে নন্দলাল আসা কমিয়ে দিয়েছে।

সাবিত্রী রায় একজন নারীবাদী সাহিত্যিক। নারীদের প্রতি বঞ্চনা, নির্যাতন, তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করেছিল। এই যন্ত্রণাময় জীবনকথাকে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর কথাসাহিত্যের প্রধান ভাবমূর্তিটি হল প্রতিবাদী চেতনার সার্থক প্রকাশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, মনুষ্যের দুর্ভিক্ষ, উদ্বাস্তুস্রোত প্রভৃতির ফলে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। এর বিরুদ্ধে চতুর্দিকে জ্বলে উঠেছিল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আগুন। পণপ্রথার বিষময় পরিণাম

তিনি উপলব্ধি করেছেন এক দুরারোগ্য ব্যাধির মত এই প্রথা সমাজে প্রচলিত ছিল। এজন্য নারীরা অসম্মানিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের এই অমর্যাদা বধূনির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে জাতপাতের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন অনেক শিল্পীরাই। সাবিত্রী রায়ও তাঁদেরই একজন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে রাজনীতির প্রসঙ্গ ও সমাজজীবনের নিখুঁত বাস্তবায়ন ঘটেছে। সাবিত্রী রায়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ঔপন্যাসিক হিসেবে হলেও তিনি একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার। সংখ্যার দিক থেকে হয়তো তাঁর গল্পের সংখ্যা বেশি নয় কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে ও শিল্পমূল্য বিচারে সময়ের বৃত্তে তাঁর গল্পগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘নতুন কিছু নয়’ সাবিত্রী রায়ের বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। এই গল্পগ্রন্থ তিনি উৎসর্গ করেছিলেন ১৩৫০ সালের মনুস্তরে যারা প্রাণ হারিয়েছিলেন তাদেরই স্মরণে। এক বিপন্ন সময়ের দিনলিপি তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যের অঙ্গনে। একসময় যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিল, মনে ছিল আনন্দ, মুখে ছিল হাসি, মনস্তরের কবলে পড়ে আনন্দ-হাসি-গান কিভাবে মিলিয়ে গেল সে কথাই সাবিত্রী রায় তুলে ধরেছেন —

“সময়ের ঘোড়সওয়ার ডিঙিয়ে গেছে কত যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। কত কাঁটা বন, হাড়ের পাহাড়, দুধসমুদ্র, রক্ত সমুদ্র পেরিয়ে” —

লেখিকা সাবিত্রী রায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ধরা পড়েছে অসংখ্য গল্পে। তাঁর ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পগ্রন্থের ‘মাটির মানুষ’ একটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্প। এগল্পে তিনি আক্রমণ করেছেন পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে। এই গল্পের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই, চৈত্র মাসে নীলপূজা উপলক্ষে হর-পার্বতীর সঙ-সাজার দৃশ্য নতুন কিছু নয়। নিকুঞ্জ রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দুলিয়ে মাথায় জটা ও বাঘছাল পরিয়ে ছাইভস্ম মেখে ত্রিশূল হাতে নিয়ে উন্নত বক্ষে পার্বতীকে নিয়ে সে যখন ফিরছিল, তখন যমুনা অপলক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলো নিকুঞ্জকে। নিকুঞ্জরা ছিল ভূমালী শ্রেণিভুক্ত। নিকুঞ্জ যমুনাকে দেখে পছন্দও করেছিল, নিকুঞ্জের বাড়ির লোকেরা নিকুঞ্জের সঙ্গে যমুনার বিয়ে দেবার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়েছিল। উভয়ে উভয়কে পছন্দ করে। কিন্তু বাধ সাধলো যমুনার বাবা। এই ভূমালী সমাজে প্রচলিত প্রথা ছিল বিয়েতে কন্যাপণ গ্রহণ। বর-পক্ষকে কন্যার পিতাকে পণ দিয়ে বিয়ে করতে হত। যমুনার বাবা নিকুঞ্জদের সামর্থ্যের বাইরে কন্যাপণ চেয়ে বসেছিল। বহু অনুনয় বিনয় করেও নিকুঞ্জর বাবা তিনকুড়ি এক টাকার বাইরে দিতে রাজি হয়নি। এই কন্যাপণের কারণে যমুনার পছন্দের পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এরপর যমুনার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল বয়সে প্রৌঢ় যৌবন অতিক্রান্ত শশী ভূমালীর। শশী ভূমালী ছিল অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, যমুনার বাবার সঙ্গে কন্যাপণের দর কষাকষি হবার পর দরে বনে যায়। অর্থলোভী যমুনার বাবা অসম বয়সের পাত্রের হাতে তুলে দিল তার নিজ

কন্যাকে। যমুনার মতামত নেবারও কোন প্রয়োজন বোধ করলে না। শশী ভূমালী যমুনাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবার পর শশী যমুনাকে দেখে কামনার বহিঃস্থায় জ্বলতে থাকে।

সাবিত্রী রায় ‘মাটির মানুষ’ গল্পে তারই বর্ণনা দিয়েছেন অনবদ্যভাবে —

“শশী বারেবারে তাকাইয়া দেখে যমুনার দেহের গড়ন বাড়ন্তই আছে মেয়েটা, কামাতুর মৃদু হাসি খেলিয়া যায় বৃদ্ধের গৌফের আড়ালে। লোল চামড়ার ভিতর হইতে নিস্প্রভ চোখ দুইটিতে একটা লোভী দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিয়া উঠে।”

যমুনাও দেখে নেয় শশীকে। শশীর চকচকে টাকমাথা বয়সে প্রবীন আর ঘনঘন বিশ্রি কাসির শব্দ। তার শিথিল হাতে দশগ্রন্থির হলুদ সুতা।

ভয়ে ভয়ে সে শৃঙ্গরগৃহে যাত্রা করে শশীর ঘনঘন কাসির শব্দ তাকে অনেকটা বিব্রত করে তোলে। এরপর দুটিমাস কেটে যায়। এদিকে যমুনার মা মেয়ের কথা ভাবতে থাকে —

“এই বাড়ি জলে যমুনা কেমন আছে কে জানে। সুখেই আছে নিশ্চয়। বুড়া হইলে কী হইবে অবস্থা তো ভালোই, মনকে প্রবোধ দেয়।”

এদিকে কামনা জর্জর বৃদ্ধশশীর শয্যায় প্রত্যহ ধর্ষিত হয় যমুনা। যমুনার দুঃসহ দিনের ছবি ভেসে ওঠে শশীর গায়ের বুলে পড়া চামড়ার স্পর্শে। যমুনার গা ঘিনঘিন করে। সাদা লোমে ভরা শশীর বুক দেখে যমুনার অন্তর ভরে যায় গ্লানিতে। সে গ্লানিভার বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব। অন্যদিকে বুড়াশশীর ছেলে ও ছেলে বৌ-এর মধুর দাম্পত্য জীবন দেখে যমুনার মনে আনন্দের সঞ্চার ঘটে। ছেলে বৌটি একটি পাখার সুতো দিয়ে ফুল তোলার দৃশ্য দেখে। কখনো যমুনা তার কাপড়ের পার থেকে সুতো তুলে দেয় ফুল তোলার জন্য। ঘনঘন ছেলে বৌ-এর ঘরে যাওয়া পছন্দ করে না শশী। সে অগ্নিশর্মা হয়ে যমুনাকে বলে - “ছেলের ঘরে অত আনাগোনা কিসের?”

এই অসম বিবাহের শিকার হয়েছে যমুনা। বৃদ্ধ শশীর সঙ্গে এক একটি রাত্রি যাপন তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। সাবিত্রী রায় যমুনার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন নিম্নলিখিত অংশে —

“রাত্রিতে ব্যর্থ কামনার বহিতে জ্বলিয়া এক হিংস্র মত্ততায় শশী দুয়ারে খিল আঁটিয়া দেয় সশব্দে। ভয়াত যমুনা ঘরের বেড়াটাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া শুধু কাঁপিতে থাকে। তাহার ছোট মুখখানা ভয়ে বিবর্ণ পাংশু হইয়া ওঠে। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর হইতেও শশীর সেই দৃষ্টি জ্বলজ্বল করিয়া উঠে - হিংস্র বাসনার শাণিত লালসা.....।”

এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য লেখিকা বাস্তব সচেতন দৃষ্টি নিয়ে এই গল্পটি তুলে ধরেছেন। এভাবে দিন যাপন যমুনার কাছে ছিল মৃত্যুর সমতুল্য। এই বুড়ার পাশে অন্ধশায়ী হয়ে আর থাকতে চায়নি যমুনা। একাধিক দিন শারীরিক কারণে কামাতুর স্বামীর মনোরঞ্জে অসমর্থ হলে তা যমুনার

কচি গালে শশী সোহাগের চিহ্নরূপ গরম কলকের ছাপ ঐকে দেয়। সেই ছাপের যন্ত্রণা হয়তো যমুনাকে চিরদিন সহ্য করতে হবে। এরপর যমুনা বেছে নেয় তার নিজের পথ। একদিন শশীর কবল থেকে মুক্ত হবার জন্য যমুনা শৃঙ্গরবাড়ী থেকে পালিয়ে যায় তার বাল্য কৈশোরের জন্মভূমি অতিপরিচিত গ্রামের উদ্দেশ্যে। সে দ্রুত পদে এগিয়ে চলে ভয়ে ভয়ে কখনো পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে শশী হয়তো তার হাত দুটি চেপে ধরে নিয়ে যাবে তার গৃহে।

পরিশেষে যমুনার এই যাত্রাপথ দুর্গম হলেও চেনা পথ ধরে সে এগিয়ে চলে। তার সেই পথ হতে পারে তার বাপের বাড়ি অথবা সমবয়সী নিকুঞ্জ? এভাবে লেখিকা অসম বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্প মূলতঃ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

‘নূতন কিছু নয়’ গল্পে সাবিত্রী দেবী যুদ্ধকালীন মানুষের মনস্তর পীড়িত আত্মনাদের ছবি অত্যন্ত বাস্তব সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তুলে ধরেছেন। এটি একটি প্রতিবাদী গল্প। একশ্রেণির সহানুভূতিহীন মানুষ তথা তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। মনস্তরের প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখা এক নিষ্ঠুর পৃথিবীর রূপ তুলে ধরেছেন লেখিকা। এই গল্পের নায়িকা কিংবা নায়ক কোন একক ব্যক্তি নয়, মনস্তর পীড়িত সমাজ। শোভনলালের দৃষ্টিতে মনস্তরের রূপটি লেখিকা তুলে ধরেছেন। একটুখানি ভাতের গন্ধ পেয়ে ফ্যানের জন্য কাড়াকাড়ি ছিল গ্রাম ছেড়ে আসা নিরন্ন মানুষের দৈনন্দিন ছবি।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে যখন বঙ্গভূমির গ্রামগুলি মহাশুশানে পরিণত হয়েছিল একটু ফ্যান খেয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল নগরের পথে পথে। মনস্তরের এই ভয়াবহ রূপ খুব কাছ থেকে দেখেছেন সাবিত্রী দেবী। নিরন্ন মানুষের দল সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরের রান্নাঘরের নর্দমার পাশে এসে ফেলে দেওয়া পচা দুর্গন্ধযুক্ত ফ্যান-এর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ফ্যান না পাবার আতঙ্কে কখনো বা কোন একটি মেয়ে কামড় দেয় পুরুষের হাতে। এভাবে হাজার হাজার মানুষ কলকাতার ফুটপাথে পড়ে থাকে। কোন সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষ তাদের জন্য এতটুকুও এগিয়ে আসেনি। কখনো দেখা যায় একটি নবজাত শিশু ও তার মার মৃতদেহ। প্রসব যন্ত্রণায় সারারাত হটফট করছিল সেই জননীটি। সে চিৎকার করছে মাগো মাগো বলে। এই কাতর গোঙানি শুনে শোভনলাল ও তার স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায়।

‘তাহার স্বামী ঘুম জড়ানো চোখে বলিতেছে, ‘এইজন্য আবার রাত দুপুরে ঘুম ভাঙানো - নিজেই তো দেখছো কি হচ্ছে।’ তবু বৌটি বলিল - ‘তুমি একবার যাও, একটা ইনজেকশন না হয় দিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি খালাস হোক।’ ভক্তার আরো বিরক্ত হইয়া উঠে, ‘হাঁ এখন যত রাজ্যের নোংরা এই দুপুর রাতে ঘাটতে যাই। ও আর নূতন কিছু নয় - শুয়ে পড়ো।’

নীচ হইতে ক্রমাগত - ‘মা-মাগো’ - চিৎকার শোনা যাইতেছে তখনও।

ডানদিকের একতলা বাড়ীটার জানালাটাও খুলিয়া যায় - শোনা যায় পুরুষের উত্থাপ্ত গম্ভীর গলা, ‘যতসব নুইসেন্স, ভদ্রলোকের পাড়ার মধ্যে।’

মেয়েটির অসহায়তার এই চিৎকার শুনে করুণা মিশ্রিত বেদনায় শোভনলালের মন ভরে যায়। সে ভাবতে থাকে হয়তো ভোরবেলা দেখা যাবে ক্রন্দনরতা এই মেয়েটি সদ্যোজাত শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে, নিয়ে মাতৃহৃৎ হাসি হাসছে। কিন্তু সে দেখতে পেল সেই মেয়েটি ও ক্ষুদ্র শিশুটি দুজনেই মৃত অবস্থায় পরে থাকতে। কানে তখন ভেসে উঠল ঘৃণা মিশ্রিত তাচ্ছিল্যের সুর - ‘ও আর নূতন কিছু নয়।’ এটা অতি সাধারণ ব্যাপার। কতটা অমানবিক হলে আর্তচিৎকার শুনেও ঘরের জানালা বন্ধ করে দেওয়া, নুইসেন্স গাল দেওয়া যায় সেকথা ব্যক্ত করেছেন সাবিত্রী রায়।

তথাকথিত সময়ের প্রেক্ষাপটে মনুস্তর-পীড়িত মানুষের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা ও ঘৃণা করা নিঃসন্দেহে অমানবিকতার একটি দিক। লেখিকা ভদ্রবেশী এই অমানবিক মানুষগুলির বিরুদ্ধে জানিয়েছেন সুতীব্র প্রতিবাদ।

সাবিত্রী রায় ‘নূতন কিছু নয়’ গল্পগ্রন্থের ‘রাধারাণী’ গল্পে রাধারাণীর সঙ্কল্প জীবনের ছবি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে আঁকেছেন। চরিত্র প্রধান এই গল্পটির নায়িকা রাধারাণী পরিচারিকা বৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করে। প্রথমে সে খামার বাড়ীতে কাজ পেয়েছে। চায়ের কেটলি নিয়ে পুকুরের ঘাটে গিয়ে কেটলি মাজতে মাজতে সে গুণগুণ করে গান গায়। সে যখন জমিদারের বিশাল বাড়ীতে কাজ নেয় তখন ঠাকুর চাকর মহলে লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আর ইঙ্গিতভরা চাহনি নিয়ে রাধারাণীর চারপাশে ঘুরঘুর করে। কিছু হ্যাংলা লোক তাকে দেখে কুকুরের মতো জিভ চাটতে থাকে। রাধারাণী খুবই সুরূপা। কৈশোর ও যৌবন সবকালেই তার রূপের জন্য অনেকেই অস্থির। জমিদারের প্রিয় চাকর প্রতিনিয়ত তার দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে। রাধারাণী তা দেখে লজ্জায় চোখ নীচু করে ও গায়ের কাপড় ভালোভাবে ঢেকে নেয়। পচু একদিন হাঁট থেকে একটি চিরুনি এনে ভাঙার ঘরে কর্মরত রাধারাণীকে প্রেম উপহার হিসেবে দিয়ে আসে। রাধারাণী তার কাপড়ের ভিতর লুকিয়ে রাখে সে চিরুনি। এরপর পচু মনোহারী দোকান থেকে লাল সুগন্ধযুক্ত তেল কিনে দেয়। তার তেল চক্চকে মাথার চুল দেখে শ্রমিকরা কি যেন বলাবলি করছে। তাকে দেখে অনেকে অকুণ্ঠিত কুণ্ঠসিত হাসি হাসে। একদিন তারা রাধারাণীর ঘর থেকে পচুকে বের হতে দেখে। এরপর একদিন পচু একখানা ছোট্ট আয়না রাধারাণীর জন্য নিয়ে আসে এবং তার হাতটি ধরে ফেলে। রাধারাণী সে আয়নাটি নিতে চায়নি। পচুর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে বলে পচু গর্জে উঠে জানায় —

“সতী আমার! মাথায় যে তেল চপচপ করছে — তখন তো লজ্জা করে নাই নিতে। মনে মনে অভিষাপ দেয় — মাগী দেখি কি করে ভাত পায়। এ বাড়ীতে থেকে তাড়াব ওকে — তখন বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে এই পাই চাটবে এসে।”

আক্রোশ বশতঃ পচু আফিমের নেশায় ভরপুর জমিদারকে রাধারাণীর বিরুদ্ধে কুৎসিত কথা জানায়, জমিদার রাধারাণীর চরিত্র ভালো নয় জেনে শান্তি হিসেবে মাথা মুড়িয়ে গ্রাম থেকে বিদায় করে দিতে চায়।

পরদিন আফিমের নেশা কাটবার পর বৃদ্ধ জমিদারের মনে কামনার উদ্রেক ঘটে। এক নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কাছারি ঘর যখন শূন্য, তখন জমিদার রাধারাণীকে পাখার বাতাস করতে বলে, এবং তাকে কর্করা একটি নোট বের করে দেয় - পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা মনিবের দেয়া এই নোট সে ভয়ে ভয়ে গ্রহণ করে। রাধারাণী তখন সতেরো বছরের যুবতী। তার রক্তের মধ্যে প্রকাণ্ড সরীসৃপটা ঘুমিয়েছিল জমিদারের ডাকে তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। জমিদারের লীলাসঙ্গিনী হবার পর তার দেহের শিরাগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

অতঃপর অপমানিত রাধারাণী বসে বসে কাঁদতে থাকে। এদিকে জমিদারের ডাক্তারি পাশ করা ছেলে সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে রাধারাণী কাঁদছে কেন এই প্রশ্ন করে। এরূপ যোগ্য পুরুষের সান্নিধ্যলাভ করতেই চেয়েছিল সে। ধীরে ধীরে স্বপ্নের জাল বুনে থাকে ডাক্তার ইন্দ্রজিৎ। ধীরে ধীরে স্বপ্নের জাল বুনে থাকে ডাক্তার ইন্দ্রজিৎ। নিম্নজাতি, অশিক্ষিত, বিধবা রাধারাণীর সঙ্গে প্রেম বন্যায় ভেসে যেতে চায় সে। ধীরে ধীরে রাধারাণীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় ইন্দ্রজিৎ। এক নিবিড় মমতাভরা ইন্দ্রজিতের হাতের স্পর্শ অনুভব করে রাধারাণী। রাধারাণী যেন একটা কিছু বলতে চায়, ইন্দ্রজিৎকে অবশেষে সে বিষ চেয়েছে আত্মহত্যার জন্য। কেননা সে তখন অন্তঃসত্তা, কার ঔরসে তার গর্ভে সন্তান এসেছে ইন্দ্রজিৎ -এর প্রশ্নের উত্তরে রাধারাণী জানায় তার বাব। একথা শুনে ইন্দ্রজিৎ রাধারাণীকে তাড়িয়ে দেয় তাদের গ্রাম থেকে। বাধ্য হয়ে বেঁচে থাকবার তাগিদে সাহেব কোম্পানীর নতুন ম্যানেজারের কুঠিতে তাকে দেখা যায়। ঝকঝকে এই বাংলো বাড়ীতে ম্যানেজারের বউ থাকেনা। রাধারাণী ম্যানেজারের গৃহ মনমতো সাজায়, একটি বছর থেকে রাধারাণীর সৌখিন মূল্যবান কাপড়, সুগন্ধযুক্ত তেল, সাবান ও শরীরের চাক্চিক্য দেখে গ্রামের বউরা হিংসা করে।

কখনো সে ভাবে অতীতের কথা। পূর্বেকার মতো সেও হয়ে ওঠে ম্যানেজারের লীলাসঙ্গিনী। একদিন সে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে একটি মজুর পরিবার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একটি তারুর নীচে শান্তিতে বাস করছে। তাপপর একদিন ফিরে আসে সাহেবের বউ।

“বৌ খুশি হইয়া বলে - ‘বেশ ঝি টা তো, খুব চটপটে।

তবে একটু গৈয়ো - কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে.....সব সময়।’

সাহেবের কণ্ঠেও তাক্ষিল্যের সুর : ‘এই অজ পাড়াগাঁয়ে এই যে পেয়েছি এই ঢের।’

অবাক হয়ে রাধারাণী জানালা দিয়া তাকাইয়া দেখে রেললাইনের ধারে কুলির কোলের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া কেমন গল্প করিতেছে বৌটি। অদূরে ছেলেমেয়েগুলি নুড়ি দিয়া খেলিতেছে।”

“গম্ভীরভাবে বৌটি ওকে ডেকে নিয়ে বলে : ‘একজোড়া দুল হারিয়েছে, দেখেছ কি?’

গোলাপী কি করে জানবে দুল কোথায়? আর কিছু বলে না। বকলেও না, শাসালেও না।

গোলাপী বাসনের পঁজা নিয়ে মাজতে বসে যায়।

হঠাৎ কানে আসে ঘরের ভেতর থেকে বাবুটির গলা -

“আর কে নেবে। ও-ই নিয়েছে। কেউ তো আর নেই বাড়ীতে।”

গোলাপীর তখন বাসন মাজতে মাজতে হাত অবশ হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বিশ্বস্ততার সঙ্গে গোলাপী কাজ করা সত্ত্বেও হৃদয়হীন মাস্টারবাবু ও তার স্ত্রী তার সততাকে এতটুকুও বিশ্বাস করেনি। হারানো দুলের জন্য গোলাপীকে দায়ী করেছিল তারা। বলেছিল ওরা সব পারে, ওরা সব পারে। চোখের জল মুছতে মুছতে গোলাপী ভাবছে কি করে তাকে চোর ভাবলো। যে বাবুর প্রশংসা সে প্রতিনিয়ত করে যেত, সেই বাবুর মুখ থেকে কিভাবে এমন কথা বেরিয়ে এলো। সেই প্রশ্নই করেছিল গোলাপী। গোলাপী দীন হতে পারে কিন্তু সে হীন নয়। অভাবের তাড়নায় পরের বাড়ীতে কাজ করতে পারে কিন্তু সে তার আদর্শ থেকে কখনো সরে আসেনি। কোনো অসামাজিক কাজের সঙ্গে সে কখনো যুক্ত থাকেনি। তার কাছে সত্যই ছিল সবচেয়ে বড়। গোলাপীর মনের গভীরে সততার এতটুকু মূল্য দিলনা কেউই।

সাবিত্রীদেবী এই হতভাগ্য পরিচারিকা চরিত্রটি যেভাবে নির্মাণ করেছেন তা আমাদের মনের সহানুভূতি জাগ্রত করে।

‘স্বর্গ হতে বিদায়’ গল্পে ‘হিন্দু-মুসলমান’ এই দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা, রক্তপাত, প্রভৃতি নিষ্ঠুর ঘটনার বিরুদ্ধে সাবিত্রীদেবী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র হল ৭০ বছরের বুড়ি দাই পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত একটি সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারে। তাদের দিন ভালই চলছিল। ঠিক এসময় বঙ্গদেশে দেশবিভাগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি মানুষ নিরাপত্তার প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ভিটেমাটি ছেড়ে যাত্রা করে। কিন্তু যাবার বেলায় সেই সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের কর্তা তার স্বর্গভূমি তথা মাতৃভূমি ছেড়ে কলকাতার অভিমুখে যাত্রা করে ফেলে রেখে যায় বাড়ির পরিচারিকা তারাকে। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে নেমে এসেছিল আতঙ্কের ছায়া। সে সময় অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নারী অপহরণ প্রভৃতি ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। গল্পকার সাবিত্রী রায় এভাবেই আলোচ্য গল্পে উদ্বাস্ত সমস্যার চিত্র তুলে ধরেছেন।

সাবিত্রী দেবীর ‘হাসিনা’ গল্পটি চরিত্র প্রধান এই গল্পেও উদ্বাস্ত সমস্যার কথা বর্ণিত হয়েছে। হাসিনা সবকিছু হারিয়ে স্থান নিয়েছিল ফুটপাতে। তার পুত্র টোকানীকে নিয়ে সে ভিক্ষে

করে। একদিন তার অন্ধের যষ্টির মত পুত্র টোকানীকে পুলিশ ধরে নিয়ে কারাগারে নিষ্ক্ষেপ করে। নিরপরাধ পুত্র টোকানী খেতে চেয়েছিল, সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় থাকার পর। এদিকে বস্তা বস্তা চাল মজুত রয়েছে অথচ অভুক্ত লোকদের চাল বন্টনের জন্য এতটুকু ব্যবস্থা হয়নি। তৎকালীন সমাজের ধারক ও বাহকরা অভুক্ত মানুষের মুখে এতটুকু অন্ন তুলে দেয়নি। এমনকি নিরপরাধ যারা তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে, এর বিরুদ্ধে সাবিত্রী রায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন এই গল্পে।

‘সমবাদার’ গল্পের নায়ক এক ভিখারী বাউল। সে গান গেয়ে দিন অতিবাহিত করে। বড়লোকদের ছুঁড়ে দেওয়া ভিক্ষা পেয়ে সে অতিকষ্টে দিন অতিবাহিত করে। এই সুর সাধক অন্ধ ভিক্ষুকটি রাজনন্দিনী স্বরূপ বালিকার ফরমাসের গান গেয়ে যায়। তার বেসুরো জীবন হয়ে ওঠে সুরময়। প্রকৃতই যুদ্ধকালীন অবস্থায় প্রকৃত শিল্পীর কেউ মর্যাদা দেয়নি। শিল্পীদের প্রতি অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘সাময়িকী’ গল্পে এক মুকবধির খঞ্জ ভিক্ষুকের জীবন কথা উপস্থাপিত হয়েছে। একদিন তার সুখের সংসার ছিল, মনের মত বউ ও শিশুপুত্র ছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের তাড়নায় তারা পথে বসেছে। শহরের অলিতে গলিতে নিজের আহার খুঁজে বেড়ায় সে। বাবুরা যে উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দেয় সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে মানুষ ও কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যায়। দেশের এই সংকটকালে তাদের জীবন হতাশা, নৈরাশ্য ও বেদনায় ভরে থাকে।

‘প্যারামবুলেটর’ গল্পে দাঙ্গার শিকার হয়েছে একটি ছোট্ট শিশু। শিশুটির বাবা ও মা তার ছোট্ট মেয়েটির জন্য একটি নতুন প্যারামবুলেটর এনে দিয়েছিলেন। সে মনের আনন্দে খেলছিল সেটি নিয়ে। এরপর মেয়েটির বাবা ও মা বেড়িয়ে পড়েছিল বাইরে। হঠাৎ কলকাতা শহর অশান্ত হয়ে উঠেছিল, ট্রাকে ট্রাকে বন্দুকধারী মিলিটারী ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণ করে। বহু মায়ের কোলকে শূন্য করে দেয়। প্যারামবুলেটর নিয়ে খেলতে থাকা সেই ছোট শিশুটির দেহ আকস্মিকভাবে গুলি বিদ্ধ হয়। তৎকালীন ইংরেজদের পোষা মিলিটারী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাবিত্রীদেবী জানিয়েছেন প্রতিবাদ।

‘অন্তঃসলিলা’ সাবিত্রী রায়ের একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। এ গল্পের নায়ক দেবব্রত নায়িকা শকুন্তলা। তৎকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের উপর কালোবাজারির দৌরাত্ম্য আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যের জন্য জীবন হয়ে উঠেছে বিষাদময়। যাদের প্রতিভা ছিল, সাহিত্য রচনায় স্বপ্ন ছিল সে স্বপ্ন বারবার ভেঙে যচ্ছিল, ব্যাহত হচ্ছিল। এভাবেই যুগযজ্ঞগার হবি তুলে ধরেছেন সাবিত্রী রায়।

সাহিত্য সারদা আশাপূর্ণা দেবী সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করে নিজস্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট গল্পকার। যথার্থ অর্থে তিনি নারীবাদী নন।

নারীবাদী না হলেও নারীর স্বাতন্ত্র্য তাঁর ছোটগল্পে বিধৃত। সামাজিক, ন্যায়-নীতির যূপকাঠে নারীরা বঞ্চিত হয়েছে। সেই বঞ্চিত নারীদের কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর ‘যা দেখি তাই লিখি’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন —

“আমি কখনো আমার জানা জগতের বাইরে কোথাও পা ফেলতে যাইনা এবং আমার সেই জগৎটি একেবারে চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ।কেবলমাত্র নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যেই নয় পারিবারিক জীবনের অন্যান্য সম্পর্কের মধ্যেও কত টানাপোড়েনের কত ভেজাল নির্ভেজাল কারবার। নিরন্তর এই অফুরন্ত জীবনকে দেখে চলেছি। অনুভব করেছি এবং বলেও চলেছি আমার গল্পগুলির মধ্যেই বেশী।”

তিনি নারীদের চোখে মধ্যবিত্ত জীবনকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। এই নারীরা কিন্তু কোন রাজনৈতিক ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়নি এবং অন্যান্য প্রতিবাদী লেখিকার নারীচরিত্রের মত বিপ্লবের পথে পা বাড়ায়নি। নারীরা নিজস্ব গভীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে তাদের চারপাশের ক্ষুদ্রতা সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাই বলে নারী স্বাধীনতার নামে নারী প্রগতির দিক থেকে বর্তমানে যে স্বৈচ্ছাচার লক্ষ করা যায় সেই স্বৈচ্ছাচারকে তিনি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেন নি।

তিনি মূলত বিংশশতাব্দীর বাঙালি জীবনের ভাঙা-গড়ার নীরব সাক্ষী। তাঁর গল্পের বিষয় গ্রাম, মফঃস্বল, কিংবা কলকাতা শহর।

সারদানন্দ মুখার্জি আশাপূর্ণার গল্প : “জীবনের সংকল্প” প্রবন্ধে লিখেছেন —

“আশাপূর্ণার গল্পে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভাঙাগড়ার বহু মাত্রিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সমাজ জীবনের নিয়ত পরিবর্তনশীলতা, মূল্যবোধের বিপর্যয়, রুচির বিকার, ভদ্রতার আবরণ, ধর্মসংস্কার, নীতির রক্ষাকবচ, উদ্বাস্তু সমস্যা, ধর্মিতার কান্না — এই সবই তাঁর গল্পের আখ্যান হিসাবে এসেছে। ভাষা ও বাক্যশৈলী তৈরি হয়েছে ওই বিষয়ের প্রয়োজনের নিরিখে। কোথাও পাণ্ডিত্যের অভিমান পাঠককে বিব্রত করে না।”

আশাপূর্ণা দেবীর সার্থক প্রতিবাদী গল্প ‘ছিন্নমস্তা’। এই গল্পে প্রাচীন ও নবীনের সংঘাত দেখানো হয়েছে। এই গল্পটি রচিত হয়েছে ব্যক্তিত্বময়ী নারী জয়াবতী, তার পুত্র ও পুত্রবধূ এই ত্রয়ী চরিত্র অবলম্বনে। পুত্র বিমলেন্দুকে জয়াবতী এক আধুনিক নারীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। এরমধ্যে মায়ের দায়িত্ব কর্তব্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের পরপরই প্রতিভার সঙ্গে জয়াবতীর সংঘাত শুরু হয়। প্রতিভা প্রতিনিয়ত শাশুড়িকে অগ্রাহ্য করেছে। পুত্রবধূ আসবে বলে জয়াবতী ঘর-দুয়ার সামর্থ্যের মধ্যে থেকে সাজিয়েছে। সেই সাজ-সজ্জা প্রতিভার কাছে গ্রাম্যতা ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। প্রতিভার উক্তি —

“বাড়িতে এমন একখানা আয়না নেই যে দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধি। ঘর সংসার গুছিয়ে

তবে ভদ্রলোকের মেয়ে ঘরে আনতে হয় বুঝলে? বাহারের মধ্যে দরজা জানলার ছেঁড়া কাপড়ের পর্দা ঝোলানো! হাসি পায়।”

“এই বউ হল বিমলেন্দুর।”

রান্নাঘরের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও শুরু হয় শাশুড়ি পুত্রবধূর বিরোধ। এদিকে প্রতিভা তার শাশুড়ির সম্পর্কে অভিযোগ জানায় তার স্বামী বিমলেন্দুর কাছে —

“আসল কথা হিংসে ! হিংসে! বিধবারা ভারি হিংসুটে হয়পরের সুখ দেখলে হিংসেয় প্রাণ ফাটে, এই যে — তুমি আমার কাছে, একটু বসো কি দুদন্ড গল্প করো — সহ্য হয় না। বুক ফেটে যায়।এতো বলে মরে যাচ্ছি, কলকাতায় নিয়ে চলো আমায় —

— আমিও তো খুঁজে মরে যাচ্ছি গো প্রতিভারানী। বাড়ি পাচ্ছি কই ?

কে বলিল কথাটা ?

বিমল ?

জয়াবতী বাঁচিয়া আছেন তো ?আরো বাঁচিবার প্রয়োজন আছে ?”

এরপর জয়াবতী ও বিমলেন্দুর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে স্ত্রীকে রেখে বিমলেন্দু কর্তব্যসূত্রে চলে যায় কলকাতায়। শাশুড়ি কখনোবা প্রতিভাকে ভাত খেতে ডাকেন সে ডাকের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল।

“কিগো বড় মানুষের মেয়ে ভাতটাও খাওয়ার ফুরসৎ হবে ? নাকি বাঁদী হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে বেলা বারোটা অবধি ?”

প্রতিভা স্ব-শব্দে চলে আসে রান্নাঘরে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভাত-তরকারি খেয়ে সাধারণ খাদ্যের উপকরণ দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলে — “তাহার বাপের বাড়িতে নাকি তিন রকম মাছ রান্না না হলে পাতের কাছেই আসে না কেউ, ভাতের চাইতে তরকারির পরিমাণ বেশী না হলে যে আবার খাওয়া যায়, বিয়ের আগে নাকি জানাই ছিলনা প্রতিভার ইত্যাদি।”

এই জাতীয় রুঢ় মন্তব্য শুনে জয়াবতী এক কাঁশি সজনের চচ্চড়ি দিলে প্রতিভা পাত্রটি দূরে ঠেলে দিয়ে আরো রুঢ় ভাষায় বলে — “বিধবা মাগীদের মতো গাদা গাদা চচ্চড়ি খাবার এত শখ নেই আমার। নামিয়ে দিয়ে নষ্ট করবেন কেন, রাখতেই পারতেন নিজের জন্য। আপনার লোভের জিনিস। কী ! কী বললতে বউমা !”

এরপর জয়াবতী বিকৃত চিৎকার করে ওঠে। রাগে ক্ষোভে এই অহংকারী পুত্রবধূ স্বামী সৌভাগ্যের জন্য দম্ভযুক্ত পুত্রবধূর শান্তি কামনায় দর্পহারী মধুসূদনের কাছে, মধুসূদন যেন প্রতিভার প্রতিভার দর্প হরণ করেন। বিমলেন্দুর চলন্ত বাসের তলায় চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে। প্রতিবেশীরা ভেবেছিল হয়তো জয়াবতী এ-ধাক্কা সামল দিতে পারবেন। সে হয়তো পাগলিনী হয়ে যাবে, জয়াবতী

কিন্তু পাগলিনী হয়নি। পুত্র-পুত্রবধূকে বিশেষ যত্নে খাইয়েছে খাবার সময় সে জানিয়েছে শাক-পাতা-ডাল-চচ্চড়ি খেতে পারছি না একথা বলা চলবেনা। ভগবান যা জুটিয়ে দেবেন তাই খেতে হবে। জয়াবতী তার পুত্রবধূকে অন্যান্য শাশুড়িদের মত অপয়া ভাবেনি তার পুত্রের অমঙ্গল কখনো মা হয়ে সে চায়নি কিন্তু পুত্রবধূর আচরণে ব্যথিত হয়ে সে মধুসূদনের কাছে সুবিচার চেয়েছিল মাত্র।

সুস্মিতা ঠাকুর ‘হিন্মস্তা’ : একটি অণ্বেষণ প্রবন্ধে জয়াবতীর পরিণতি সম্পর্কে লিখেছেন —

“জয়াবতীর পরিণতি পাঠককে যেন এক নিঃশ্বাস বায়ুহীন পৃথিবীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। আসলে জয়াবতী নিজেও জানেন না, ভয়াবহ অহংবোধে তিনি মানুষী সম্পর্কের যাবতীয় অন্ত্যর্থক সীমাকে ভেঙে চুরমার করে, অবশেষে নিজেই একটি জীবন্ত শবদেহ হয়ে গেছেন।

— যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের শেষ বিন্দুও অপসৃত, সেই মানুষটিকে কোন অভিধায় সীমায়িত করা যাবে ? গল্পের শেষ পঙ্ক্তিটি নির্মমভাবে এই সত্যটিকে উন্মোচিত করেছে, — জয়াবতী ‘হিন্মস্তা’, বস্তুত এছাড়া আর কোন বিশেষণেই তাকে নামাঙ্কিত করা যায় না।”

‘বিপন্নসুখ’ আশাপূর্ণা দেবীর সমাজচিত্তামূলক গল্প। এই গল্পের নায়ক নিখিল সে সাধারণ ঘরের ছেলে। নিজপ্রচেষ্টায়, আপন যোগ্যতায় সে চাকরি পেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তার জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত হয়েছিল। কিন্তু নিখিল সহজ সরল ভাবে জীবন কাটিয়েছে। তার বিধবা মা তার বোন, তার ভাগ্নি, কিংবা তাদের আত্মীয় বর্গ এবং নিখিলের স্ত্রী ও কন্যা পর্যন্ত সকলেই নিখিলের ঘাম ঝড়ানো অর্থে বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। যার আয়ে তাদের জীবন যাত্রার মান পরিবর্তন ঘটল অথচ তার মূল্য তারা দিতে শেখেনি এমনকি প্রত্যেকেই সহজ সরল জীবন যাত্রার অধিকারী নিখিলকে তারা প্রতি নিয়ত অপমান করেছে, নিখিলের জাগ্রত বিবেক বারবার হয়েছে আহত অভিমানাহত। নিখিলের সহ্যসীমা যখন লঙ্ঘিত হল তখন তাদের অপমানের যোগ্য জবাব দেবার জন্য সে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিল। এরফলে তার স্ত্রী-কন্যা সকলের স্ট্যাটাস ধূলায় হল ভূ-লুপ্তিত। নিখিল নিজেকে বিপন্ন করে এই অপমানের জবাব দেবার সুখ অনীভব করেছিল। এটাই ‘বিপন্ন সুখ’ গল্পের বিষয়বস্তু। আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত এই গল্পের পরিণতি শিল্প সফল। এই গল্পটি আশাপূর্ণা দেবীর অনবদ্য সৃষ্টি।

‘শান্তি’ গল্পে আশাপূর্ণা দেবী সমাজের লম্পট পুত্রদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই লম্পট পুত্র হল ইন্দ্রনারায়ণ। তার পিতা নরনারায়ণ ও মাতা মহালক্ষ্মী। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র ইন্দ্র নারায়ণ উশৃঙ্খল আচরণ করে। সে মদ্যপ, অসভ্য, বর্বর, চরিত্রহীন। ইন্দ্রনারায়ণ বাগ্দীপাড়ার চোদ্দবছরের একটি মেয়ের শ্রীলতাহানি করে। এরফলে চাঁপা নামে মেয়েটির মৃত্যু ঘটে। এরপর সদলবলে বাগ্দীপাড়ার লোকেরা জমায়েত হয়ে ইন্দ্রনারায়ণের বাড়ীতে প্রাচীর টপকে ঢুকে পরে।

ইন্দ্রনারায়ণের ঘর বন্ধ দেখে প্রত্যেকেই ছুঁড়তে থাকে ইট, পাটকেল। এইসময় মহালক্ষ্মী নির্ভয়ে বেরিয়ে এসে উত্তেজিত লোকদের কাছ থেকে শুনতে চেয়েছে তাদের অতর্কিত আক্রমণের প্রকৃত কারণ। মৃত কিশোরী মেয়েটির বাবা কেঁপে ভয়ানক চিৎকার করে মহালক্ষ্মীকে জানায় — “বের করে দ্যান ওই কুকুরটারে; ওর মুড়ুটা নখে ছিঁড়ে ফেলাই। আমার কচি মেয়েডারে ওই কুকুরটা —।” হাউ-হাউ করে কেঁদে ওঠে কেঁপে। চাঁপার আমার এখনো চোদ্দ পুরোয়নি মা, সব বে’-র কথা উঠছিলো, আমার সেই সোনার পুতুলডারে আমবাগানে একা পেয়ে ওই রাকোসডা তারে অ্যাকেবারে — ওগো মাগো, জলজ্যান্ত মেয়েডা আমার ঘরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে মা, মুখদে ফেনা কাটছে।”

ইন্দ্রনারায়ণের মা মহালক্ষ্মী চাঁপার বাবার মুখ থেকে একথা শুনে বাড়ীর দারোয়ানকে বলে দিলেন ইন্দ্রনারায়ণকে ঘর থেকে টেনে এনে বাগ্দিপাড়ার লোকদের হাতে তুলে দিতে। দারোয়ান রামলগন একাজ করতে চায়নি। তারপর বাগ্দিদের ডেকে বললেন — “এই তোমরা উঠে এসো, চলে এসো, আমার সঙ্গে। দরজা ভেঙে তোমাদের আসামীকে বের করে নিয়ে যাও। নিয়ে যা তোদের আসামীকে, কুকুরকে খাওয়া, আগুনে পোড়া, যাখুশি করগে যা কেউ বাধা দেবে না।”

বাগ্দিপাড়ার লোকদের উদ্দেশ্য করে মহালক্ষ্মী জানালেন, তাদের আস্পর্শ দেওয়ার কারণেই বদমাইসরা এধরনের ঘটনা করে যাচ্ছে। তখন দ্রুতবেগে দরজা খুলতে গেলেন মহালক্ষ্মী।

এভাবে দুর্বল, অসহায় তথাকথিত নিম্নশ্রেণির মানুষদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চলেছিল তার বিরুদ্ধে লম্পট পুত্রের মা যে কঠোরভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে এরমধ্যে লেখিকার বলিষ্ঠ প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় মেলে।

‘সর্পশিশু’ গল্পে আশাপূর্ণাদেবী উচ্চশ্রেণির নির্মম ব্যক্তির বিরুদ্ধে তীব্র কশাঘাত করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দস্ত ও হৃদয়হীন আচরণকে লেখিকা কখনো ভালো চোখে দেখেননি। ‘সর্পশিশু’ গল্পে আমরা দেখি বিরিঞ্চি পাগলা একটি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুকন্যাকে আঁস্তাকুড় থেকে তুলে এনে এক ব্রাহ্মণীর পায়ের সামনে রেখে যায়। ব্রাহ্মণীটি শিশুকন্যাটিকে দেখে ক্রোধ প্রকাশ করে কিন্তু নীহার নামে পুত্রবধূটি তাকে তুলে এনে স্তন্যপুষ্টে লালিত-পালিত করে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর ব্রাহ্মণীটি তার নাম রাখে ফেলি। নামকরণের মধ্যেই প্রকাশ- সকলেরই ফেলনা বলে, সকলের অবজ্ঞার পাত্র বলে ফেলির জীবন হয়ে উঠল বিষময়। তবুও ফেলির অন্যান্যদের মতো স্কুলে যাবার ইচ্ছে হয়, সে পড়তে চায় বলে একমাত্র নীহার ব্যতীত আর সকলেই ছোটলোক বলে ছি-ছি করে। ফেলিকে কিন্তু পড়ার সুযোগ দেয়নি তারা। তাকে বিনে পয়সার কাজের ঝি করে রেখেছিল। ফেলি গোপাল ঠাকুরের পূজা করতে আগ্রহী হলে তাকে শুনতে হয় ভর্ৎসনা। বাড়ীতে বিয়ের অনুষ্ঠানে নতুন বস্ত্র পরে যোগ দিতে চাইলে কেউ-ই আঁস্তাকুড় থেকে তুলে আনা এই মেয়েটির কাতর অনুনয় শোনেনি। বরং তার আস্পর্শ দেখে, ছোটলোকের সাধ-আহ্বাদের কথা শুনে তাকে মারতে উদ্যত হয়। তার বিরুদ্ধে মিথ্যে

ছেলে ঢলানির অভিযোগ এনে দূর-দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়। কালসাপকে দুধকলা দিয়ে তারা পুষতে চায়নি। আশাপূর্ণাদেবী গল্পটি শেষ করেছেন নিম্ন লিখিতভাবে —

“জনুলগ্নের নিষ্ঠুরতার শোধ লইতে একদিন হয়তো
সর্পিণীর মতই ত্রুর হইয়া উঠবে ফেলি বিষের থলি
পুঁজি করিয়া — গৃহস্থের আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া নীতি আর ধর্ম,
সমাজ আর শৃঙ্খলার গায়ে ছোবল হানিয়া বেড়াইবে।”

‘প্রতিশ্রুতি’ গল্পে আশাপূর্ণাদেবী বধূহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র-তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন। এই গল্পের নিতাইয়ের বউ ভামিণীর বোনের অকাল মৃত্যু ঘটেছিল। মেয়েটিকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল মেয়েটির স্বামী ও শাশুড়ি উভয়ে মিলে। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড সত্যবতী মেনে নিতে পারেনি। সত্যবতী এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সবিশেষ জানত। একদিন তার প্রতিবাদ স্বরূপ পুলিশের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল এই দানবীয় অত্যাচারের সুবিচার চেয়ে। এই খুনী যুগলের যোগ্যবিচার সে চেয়েছিল। এরযোগ্য বিচার যদি না হয় তাহলে আদালতের কোন প্রয়োজন নেই।

নবকুমার সত্যবতীর উপর বিশেষ আন্তরিকতা দেখায়নি। বরং তাকে তার চালাকি বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী জানিয়েছিলেন যারা নির্যাতিত, অবহেলিত তাদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এধরনের জোরালো প্রতিবাদ।

‘আত্মহত্যা’ গল্পে দেখি অসহায় নারীর অবস্থার করুণ ছবি। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের উপর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন লেখিকা। একটি অভাবগ্রস্ত পরিবারের তিনজনকে নিয়ে সংসার। মা, মেয়ে ও ছেলে অতিকষ্টে দিন অতিবাহিত করে। ছেলের নাম মোহন — সে ছোট্ট একটি চাকরি করে। জয়ন্তী তার বয়স্কা বোন। সে কোন রোজগার করে না। এজন্য পরিবারে সে মূল্যহীন। একটি ছোট্ট ঘরে সে রাত কাটায় হৃদয়ের যন্ত্রণা নিয়ে। এর মধ্যে প্রতিনিয়ত কলহ লেগেই থাকে ভাই বোনে। মা তরুলতাও কোনরূপ ভালো ব্যবহার করে না জয়ন্তীর সঙ্গে।

বরংসে ছেলের পক্ষ অবলম্বন করে মেয়েকে গালাগাল করে। জয়ন্তী যেন সংসারের বোঝা — এই ভেবে সে আত্মহত্যা করে। মা মনে করে মনের ঘেম্নায় সে আত্মহত্যা করেছে। তার আবার মন আছে যে জন্য সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল।

আশাপূর্ণা জয়ন্তীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে নিষ্ঠুর মন্তব্য করেছেন —

“মরে ঘেম্নাকে পরিপাক করতে না শিখলে আর শিক্ষা কি ? সভ্যতা কি ? ভাড়ার মেয়াদ বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত হয়তো শয়তানির কাছে বিক্রি হয়ে যাবে আত্মাকিন্তু তাই বলে আত্মহত্যা ? ছিঃ ! যেন একটা সস্তা নাটকের বাজে অভিনয়!”

মানবিক মূল্যবোধের অবমাননায় লেখিকা ব্যঙ্গের বাণ এভাবেই নিষ্ক্ষেপ করেছেন।

‘আহত ফণা’ গল্পটিতে ছোটলোকদের প্রতি তথাকথিত শয়তানবেশী ভদ্রলোকদের অমানবিক আচরণের পরিচয় রয়েছে। এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র পাখি। সে এক মেমসাহেবের বাড়িতে পরিচারিকা। মেমসাহেবের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে। এসময় বাড়িতে থাকবেন সাহেব। মেমসাহেব পাখিকে জানালো সাহেবের দেখাশোনার ভার তাকে নিতে হবে। পাখি জানিয়েছে সাহেব একা বাড়িতে থাকবে এজন্য এই কয়েকদিন তার পক্ষে কাজে আসা সম্ভব নয়।

পাখি নারী -ঝি হলেও তার একটা আত্মসম্মানবোধ আছে। সে দীন হতে পারে কিন্তু হীন নয়। ছোটলোকদেরও তো নারীত্ব আছে। পাখির আপত্তি শুনে মেমসাহেব যেন আকাশ থেকে পড়ল। অবাক হয়ে বললো — “এরকম অদ্ভুত কথা বলছে কেন পাখিএমন কথা তো শুনি নি কখনো।”

যারা কাজের ঝি তাদেরও লজ্জাবোধ, আত্মসম্মানবোধ থাকতে পারে এই সত্যটি মেমসাহেবের মতো ভদ্রমহিলারা উপলব্ধি করে নি। সে ভেবেছে তাদেরই লজ্জা, সম্মানবোধ আছে অন্যদের নেই। পাখি বলেছিল —

“এমন কথা কখনো শোনেনি ঝুঝি ?

— দুজনেই বললেন, অদ্ভুত।”

এরপর পাখি মেমসাহেবের বাড়িতে কাজ করেনি। তার আত্মসম্মানবোধ ছিল বলেই রাসবিহারীকে গুনিয়েছে প্রতিবাদী ভাষা :

“আসলে কী জানিস, ওরা আমাদের ‘মানীষ’ বলে গণ্য করে না। ওরা জানে ওরা যেখানে আমরা তার থেকে হাজার সিঁড়ি নিচুতে। তাই দুজনায় গলা মিলিয়ে বলে ‘অদ্ভুত’। এরপরও থাকবো সেখানে এই কথা বলিস তোরা ? দুঃখি অভাগী বলে কি, চামড়ার নিচে রক্ত বয় না।”

এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী একটি সফল প্রতিবাদী নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন। সামাজিক আচার সংস্কারের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদী গল্প আশাপূর্ণা দেবীর ‘অনাচার’ গল্পে আমরা দেখি সুভাষ-কাকীমা নিজে কষ্ট স্বীকার করেও বৃদ্ধ শ্বশুরকে পুত্র শোকের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। সুভাষ কাকা বয়ে গিয়ে এক কুহকিনীর জালে ধরা পড়ে স্ত্রী ও পিতার প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গেলেন।

সুভাষ কাকীমা বহু কষ্টে বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায়ত্ন করলেন। এরপর একদিন সংবাদ এলো সুভাষ কাকার মৃত্যু ঘটে। হিন্দু সংস্কার বশত সুভাষ কাকীমাকে বৈধব্যের বেশ পরে থাকতে হয়। বৃদ্ধ শ্বশুর জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছেন-জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তিনি যাতে আর

কোন মানসিক কষ্ট না পান এজন্য এই মৃত্যুসংবাদ গোপন করে রেখেছিলেন। বৃদ্ধ শ্বশুরের মৃত্যুর দিনে সুভাষ-কাকীমা বৈধব্যের বেশ ধারণ করেছেন এজন্য গ্রামের মাতব্বর সুরেন সরকার ও অন্যান্য প্রতিবেশীরা সমালোচনায় মুখর হয়েছে। নিজের আত্মাকে কষ্ট দিয়ে পরের জন্য তিনি যা করছেন তার প্রশংসা না করে বরং তাকে অপবাদ দেওয়া হয়েছে। এটা তো আচার নয় অনাচার। সমাজের চোখে সুভাষ কাকীমার কাজটি অনাচার বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে জোড়ালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন লেখিকা। সবার উপরে মানীষ- মানবিকতার কারণেই সুভাষ কাকীমার এই প্রতিবাদ আসলে অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

‘ইজ্জত’ আশাপূর্ণা দেবীর আর এক প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে বিবেকবর্জিত ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। বাসন্তীবালা নামে এক কাজের ঝি সুমিত্রার বাড়িতে কাজ করত। বাসন্তীর একটি মেয়ে ছিল - বয়সে সে ছিল যুবতী। সুন্দরী বলেই অনেকের প্রলুব্ধ দৃষ্টি পড়ত মেয়েটির উপর। মেয়ের নিরাপত্তার কারণে বাসন্তী সুমিত্রার ঘরের এককোণে আশ্রয় দেবার অনুরোধ জানিয়েছিল। সুমিত্রা প্রতিশ্রুতি দিলেও স্বামী মহীতোষ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি। বাসন্তী অনুন্নয় বিনয় করলেও সুমিত্রা তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি, তখন বাসন্তীবালার মেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে —

“থাক, থাক মা, চলে আয়, আর বৌদি বৌদি করে কাঁদতে হবে। !বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের ইজ্জতের কোন দাম নেই।”

বস্তুত যাদের শ্রমে সংসারজীবন সুখের হয় — তাদের প্রতি তথাকথিত ভদ্রলোকেরা কোনরূপ সহানুভূতি দেখায় না। বাসনমাজা ঝির উক্তির মাধ্যমে লেখিকা জানিয়েছেন তীব্র প্রতিবাদ।

‘অভিনেত্রী’ গল্পে আছে বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীদের বিদ্রোহ। সংসাররূপ রঙ্গমঞ্চে বেশিরভাগ এই নারীরা অভিনেত্রীর ভূমিকা পালন করেন। এগল্পের নায়িকা কিশোরী নববধূ অনুপমাকে সংসারের কাজকর্ম গুছিয়ে স্বামী শ্বশুর ও আত্মীয় পরিজন সকলেরই মন যুগিয়ে চলতে হয়। মনে হয় অনুপমা একটি খেলনার পুতুল। যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে সকলের মনরাখতে অনুপমাকে অনেক সময় মিথ্যেরও আশ্রয় নিতে হয়। অনুপমার বাবা এসেছিল মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্য। শ্বশুরের অনুমতি ছাড়া সে তো পিত্রালয়ে যেতে পারেনা। শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে সে যাবে কি করে ? বামনঠাকুর যাবে দেশে, ঠাকুরঝি আসবে, শাশুড়ির শরীর খারাপ এসমস্ত কত কথাইনা অভিনেত্রীর মত বলতে হয়েছে অনুপমাকে। বাপ, শ্বশুর ও স্বামীর মনযুগিয়েও চলতে হয়েছে তাকে। এভাবে এই তিন পুরুষকে সে সামলিয়েছে অভিনয় দক্ষতা দিয়ে। ঠিক তার ২৫ বছর পরে স্বামী তারানাথ ও তার বেকার পুত্রকে সামলাতে হচ্ছে। এজন্য তাকে স্বামীর বিদ্রূপ, ছেলের বায়না কতকিনা সহ্য করতে হয়। নানান ছলনা নানান অভিনয়ের মাধ্যমে সংসারের

শান্তি বজায় রাখতে হয়। এভাবেই অনুপমা অনুপম অভিনয় করে সুখী গৃহকোণ রচনা করেছে। এটাই তার শ্রেষ্ঠ মূলধন। সে পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে হয়ত বিদ্রোহ করেনি কিন্তু বিদ্রোহের আভাস আমরা খুঁজে পাই ‘অভিনেত্রী’ গল্পে —

“ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা।এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বেপরোয়া শিশু ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হত — কদিন লাগত পৃথিবীটা ধুংস হতে ?”

‘সীমারেখার সীমা’ একটি প্রথম শ্রেণির প্রতিবাদের গল্প। এই গল্পে দেখানো হয়েছে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সতীনাথ পরিবারের প্রধান তার অন্যায় অমানবিক আচরণ সমর্থন যোগ্য নয়। যেদিন তার মেয়ের বিয়ে হয় সেই বিয়ের দিনে তার বোন ছবি ও তার স্বামী ক্ষিতিশ আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। ক্ষিতিস বরযাত্রীদের আসরেই খেতে বসার অপরাধে সতীনাথ ক্ষিতিসকে প্রথমে ধমক দেয় পরে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বেরকরে দেয়। এরূপ অনুচিত আচরণ কাম্য ছিলনা। ছবি এই বিষয়টিকে সহজভাবে মেনে নেয়নি। স্বামীর প্রতি এই অপমান, নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ ছবিকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছে। দাদার অগ্নে সে ও তার স্বামী প্রতিপালিত হয়েছে এব্যাপারে কৃতজ্ঞতার কোন অভাব ছিলনা তার। তার স্বামী যদিও মানসিক রোগগ্রস্ত, মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলে তার মানসিক ভারসাম্য তবুও সে তো তার স্বামী। সে পাগলই হোক, ছাগলই হোক তাকেইতো লক্ষ্মী নারায়ণ সাক্ষী রেখে সে বিয়ে করেছিল। এই অপমানের জ্বালায় অভিমানহত ছবি নিজ হাতে ঘুমের ঔষধ খাইয়ে দিয়ে স্বামী ক্ষিতিসকে হত্যা করেছিল যাতে দাদার অগ্ন কোনদিন গ্রহণ করতে নাহয়। নিজে মনে গভীর যন্ত্রণানিয়ে। ছবি মৃত স্বামীর পাশে সতীনাথের মেয়ের বিয়ের দিনে ঘরবন্ধ করে অন্ধকারে কাটিয়েছিল। কেননা সে বোঝে ভাই -এর আশ্রয়ে থেকে ভাইবির বিয়ের দিনে সীমা রেখার তাৎপর্য।

‘নিখাদ’ গল্পটি ভিন্ন স্বাদের একটি প্রতিবাদী গল্প, এ গল্পে বিবাহিতা সমিতা একটি প্রতিবাদী চরিত্র। প্রেমরঞ্জন সচ্ছল পরিবারে মানুষ। তার স্ত্রী সমিতা গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করত। সন্দেহবশত তার পরিবারের লোকেরা ও প্রেমরঞ্জন সেই গৃহশিক্ষককে প্রহার করে। প্রতিবাদ স্বরূপ সমিতা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। গল্পের পরিণতিতে লেখকের মন্তব্য এরূপ — “বড়লোকের বাড়ীর বউয়ের প্রাইভেট টিউটর অথবা ড্রাইভারের সঙ্গে প্রেমের গল্প নতুন না। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে ট্যাক্সি ডাকিয়ে কুলত্যাগ করা একেবারে নতুন মারাত্মক গল্প বৈকি।”

‘তাসের ঘর’ গল্পটিতে রয়েছে প্রতিবাদ। মমতা সংসাররূপী বদ্ধতাকে ছেড়ে দিয়ে বৃহৎ পৃথিবীতে নিজের আশ্রয় খুঁজতে বেড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ত্রীর পত্র’ র মৃণাল আর ‘তাসের ঘর’ গল্পের মমতার প্রতিবাদ যেন একই। সংসারের অবিচারের বিরুদ্ধে।

‘পৃথিবী চিরন্তনী’ গল্পে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে আভিজাত্যের বিরুদ্ধে, শাসনের

বিরুদ্ধে। অবনীশ ও পারমিতার একমাত্র কন্যা পাণ্ডি। সে এক স্বাধীনচেতা নারী। তার মা, স্বামী অবনীশের কথা মুখ বুঝে সহ্য করে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে কিন্তু পাণ্ডি তার পিতার শাসনকে অগ্রাহ্য করে চলে। তাই গল্প পড়তে পড়তে আমরা দেখি একদিন রাতে যখন পারমিতার প্রিয়বান্ধবী রীতার স্বামীর মৃত্যু ঘটে তখন পারমিতা সেখানে যাবার অনুমতি পায়নি। কিন্তু স্বাধীনচেতা মেয়ে ঐ একই রাতে দুইবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ শুনে বেড়িয়ে পড়েছে পথে তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী পাণ্ডির মধ্যদিয়ে শাসনের নামে নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘জালিয়াত’ গল্পে প্রতিবাদ এসেছে ভিন্নস্বাদে। আধিপত্যের বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে। সান্ত্বনা স্বামী শক্তিনাথকে ভয় করে চলে। তাই সে ছেলেমেয়েদের অন্যায়ও স্বামীর কাছে বলত না ভয়ে পাছে অশান্তি হয়। শেষে একদিন তার স্বামী শক্তিনাথ সান্ত্বনাকে ভর্ৎসনা করে বলে, সান্ত্বনা সবকিছু লুকিয়ে গেছে। সে নিজের অন্তরে মাকড়সার মত জাল বুনে বুনে নিজেই জালিয়াত হয়ে গেছে।

স্বভাবতই সান্ত্বনা এতে কষ্ট পায় এবং স্বামীর বিরুদ্ধে গর্জন করে প্রতিবাদ জানিয়েছে

—
“উঃ সব জেনেছো, সব বুঝেছো ? তবু এতটুকু দয়া হয়নি তোমার ? তবু কোনদিন বলে উঠতে পারোনি, ‘সান্ত্বনা’ আর কষ্ট কোরো না তুমি, তোমার ঐ জাল থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার আমার তো একই জ্বালা, এসো দুজনে একই সঙ্গে সেই জ্বালা বহন করি।না, তা তুমি বলো নি, শুধু বসে বসে আমার যন্ত্রণা দেখেছো, আমায় না দেখার ভাণ করেছো। তারমানে তুমিও একটা জালিয়াত, হ্যাঁ হিংস্র নিষ্ঠুর পাকা একটা জালিয়াৎ।”

‘তাসের ঘর’ গল্পটিতে প্রতিবাদ রয়েছে। এই গল্পে মমতা জানিয়েছে প্রতিবাদ, পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে। ননদ, জা, শাণ্ডিদের নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। সেই পরিবারের যেদিন মমতার স্বামী ব্যক্তিগত কারণে বাইরে গিয়েছিল, সেদিনই রাতের বেলা মমতার মামাতো ভাই জেল পালিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য মমতার শোবার ঘরে আশ্রয় নেয়। ননদ তরঙ্গিণী কি যেন সন্দেহ করতে থাকে। তার শাণ্ডি ও দেওর ছুঁড়ে দেয় সন্দেহের তীর। তার দেওর বলেছিল, নারী জাতিকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। তার বউ এরকম ঘটনা করলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিত। দেওর মমতাকে ব্যঙ্গ করে বলে।

“অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে তার সঙ্গে তর্ক করার রুচি আমার নেই। চালাকি শিখেছিল বটে, তবে শেষ রক্ষা হল না।”

মমতার স্বামী সুধাংশুর সঙ্গে ভালোবাসার বন্ধন অনেকটা ছিন্ন হয়ে যায়। পরিবার ছেড়ে সে চলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সুধাংশু তার বিবাহযোগ্য মেয়ের কথা ভেবে তাকে যেতে

দেয়নি। মমতার সম্মান এখানে বিঘ্নিত হয়েছে। মমতা এ ঘটনার বিরুদ্ধে জানিয়েছে প্রতিবাদ। তার কাছে সত্য রক্ষাটাই ছিল সবচেয়ে বড়।

‘অপরাধ’ আশাপূর্ণা দেবীর একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদী গল্প। একটি কারখানার শ্রমিক পরেশ ও তার স্ত্রীকে নিয়ে এই গল্পের কাহিনি আবর্তিত হয়েছে। একদিন পরেশের এক ভাই নীরেন এসেছিল তাদের বাড়ীতে দশদিন থাকার জন্য। অভাবের সংসারে নীরেনের আদর-আপ্যায়নের কোনো ক্রটি রাখেনি কল্যাণী। বাজারের ফর্দ দেখে কল্যাণীকে রুঢ়ভাষা প্রয়োগ করেছে পরেশ। কল্যাণী পরেশকে বাজার খরচ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দেয়। ইতিমধ্যে নীরেনের জামার পকেট থেকে একটি সোনার বোতাম চুরি হলে অভিযোগের তীর এসে বিদ্ধ হয় কল্যাণীর পায়ে। পরেশ কল্যাণীকে অপমান করে —

“মুখ তোলো, তোলো মুখ, ছিঃ ছিঃ কল্যাণী। এত ইতর হয়ে যেতে পারো তুমি, এয়ে কল্পনার বাইরে।উফ্।”

এই কথায় কল্যাণী অপমানিত মনে করে। পরেশ স্ত্রীকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। কিন্তু যাবার আগের দিন নীরেন পরেশের কারখানায় গিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আসলে বোতামটি চুরি হয়নি সেটি নীরেনের জামার পকেটেই ছিল। পরেশ অনুতপ্ত হয়। ঘরের বউকে অভিযুক্ত করা পুরুষদের একটি প্রধান দোষ, এর বিরুদ্ধে আশাপূর্ণা দেবী প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। ‘ছুটি নাকোচ’ গল্পেও রয়েছে প্রতিবাদ। এই গল্পে আমরা দেখি মালতী তার স্বামী অমূল্যকে নিয়ে শহরের একটি বস্তিতে বাস করে। মালতী একটি বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করে। সেই বাড়ীর মালিকের কন্যার সন্তান হয়নি বলে শ্বশুর বাড়ীতে নির্যাতন সহ্য করতে হয়। এজন্য বাড়ীর কর্তা মালতীকে লোভ দেখিয়ে হাসপাতাল থেকে একটি ছেলে চুরি করবার নির্দেশ দেয়। মালতী একাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে। শাস্তি হিসেবে তাকে তিনবছরের জন্য জেলে থাকতে হয়।

জেলে থাকাকালীন অবস্থায় অমূল্য মালতীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এখান থেকে ছুটি পাওয়ার পর তাকে বাড়ী নিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল জেল থেকে মুক্তির দিনে অমূল্য আসেনি। এমনকি সে সেই বস্তি ছেড়ে নিজগ্রামে চলে যায়। বহু আশার আলো নিয়ে মালতী অমূল্যর গ্রামে ফিরে যায়, কিন্তু সেখানে স্থান পায়নি। গ্রামে এই খবরটি প্রকাশের পূর্বেই অমূল্য মালতীকে —

“দাঁতে পেঁষা চাপা গলায় বলে, কাল ‘ছুটি’ হয়ে গেল তাই আজই ছুটতে ছুটতে এখাতে এসে ধাওয়া করা হল ? আচ্ছা আসপদ্দা তো।কয়েদখাটা মেয়েছেলে, গড়াই বাড়ি ঢুকতে এসেছ ?কেন যমের বাড়ি ছিল না ? যমের বাড়ি ? গলায় দড়ি দিতে পারনি ? যাও যাও। খবরদার আর এগোতে চেষ্টা করবে না।”

কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে মালতী জেল ফেরৎ ভাড়াটে গুন্ডা নিকুঞ্জের সঙ্গে সংসার জীবন

করতে শুরু করে। নিকুঞ্জ মালতীকে জীবনসঙ্গী করে নেয়। সংসারের সংকীর্ণতা থেকে সে অনেকটা মুক্ত। মালতী পূর্ব স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গের বিরুদ্ধে তথাকথিত সভ্যসমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

‘দুঃসাহস’ গল্পে আশাপূর্ণা দেবী পিতা ও পুত্রের মধ্যে প্রতিবাদের চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রবীরের বাবা একটি উপন্যাস লিখেছে যার নাম ‘খাদ্য-খাদক-ক্ষুধা’ অর্থের লোভে কিছু কিছু অশ্লীল অংশ লিখতে হয়েছিল। প্রবীরের স্কুলের সহপাঠীরা এনিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকে। কোনো কোনো দিন বন্ধুদের সঙ্গে মারপিঠও হয়। একদিন প্রবীর বাড়ীতে অনেক দেরিতে ফেরে এরকারণ তার বাব-মা জানতে চাইলে প্রবীর পিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় —

“.....ভেবে পাচ্ছ না ? অবাক হয়ে যাচ্ছ ? অসভ্যর ছেলে অসভ্য হবে নাতো আর কি হবে?কেন ? কেন বাবা লিখবে এইসব বিচ্ছিরি?”

বাবাকে অসভ্য বলে অভিযোগ করায় প্রবীরের বহুদিনকার গ্লানি প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

এছাড়া ‘বিবি-বেগমের শিবতলা’, ‘ভয়’, ‘পৌরুষ’, ‘স্টিলের আলমারী’, ‘ঘুষ’, ‘নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য’, ‘মাথা ধরা’, ‘বরফজল’, ‘অঙ্গার’ প্রভৃতি গল্পেও আশাপূর্ণাদেবী প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত শিল্পসফল গল্পকারদের মধ্যে মহাশ্বেতাদেবী একটি স্মরণীয় নাম। সমাজ সচেতন এই শিল্পী প্রতিবাদ-মনস্কতা নিয়ে বিপুল পরিমাণ গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন। মহাশ্বেতাদেবী তাঁর গল্প লেখার লক্ষ হিসেবে বেছে নিয়েছেন সমাজের নীচতলার মানুষের জীবন। দেখা যাচ্ছে সমাজের নিম্নবর্গস্থিত মানবগোষ্ঠী আবহমান কাল ধরে উচ্চকোটির মানুষের দ্বারা শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত। সমাজ পরিবর্তনশীল, যুগে যুগে শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের পদ্ধতিও পরিবর্তনশীল। যুগযুগ ধরে সাঁওতাল, মুন্ডা, শবর, ওঁরাও ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির নির্যাতিত মানুষরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই বিদ্রোহের আওনে রক্তপাত ঘটেছে হাজার হাজার মানুষের। সমাজের এই চেহারা প্রতিবিস্তৃত হয়েছে গল্পের আয়নায়।

প্রতিবাদী ধারার রূপকার মহাশ্বেতাদেবীর প্রত্যেকটি প্রতিবাদী গল্পই যেন এক একটা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। মূল্যবোধহীন অবক্ষয়গ্রস্ত, অবহেলিত, সর্বহারা শ্রেণির মানুষদের বিবিধ সমস্যা সমাজ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন লেখিকা। তাঁর গল্পের বিষয় বাস্তবধর্মী। সমাজের ক্ষতগুলিকে আপসহীন ভাষার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতাদেবী। তিনি লিখেছেন — “স্বাধীনতার

একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, জমি, ধান, বেঠেবেগারি, কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, গুপ্ত ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।মানুষের কথাই লিখে গেলাম, নিজের মুখোমুখি হতে যেন লজ্জা না পাই সে জন্য। কেননা লেখক জীবনকালেই শেষ বিচারে উপনীত হন এবং উত্তর দেবার দায় থেকে যায়।

এছবি শুধুমাত্র স্বাধীনতা উত্তর বঙ্গদেশেরই ছবি নয়; বিহার, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের যারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে গ্রামের মানুষের অন্ন সমস্যা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সমস্যা, জোতদারদের সঙ্গে খেতমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির লড়াই, ফসল লুণ্ঠন, ঋণের দায়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, জমির লড়াই, নারী নির্যাতন, অস্পৃশ্যতা, পুলিশি অত্যাচার, সৈন্যদের নারীধর্ষণ এর বিরুদ্ধে প্রতারিত, নির্যাতিত হতে হতে একদিন তারা তীর, টাঙ্গি ও বর্শা হাতে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সেই বিদ্রোহের ছবি এত বাস্তবসম্মতভাবে মহাশ্বেতাদেবী ভিন্ন অন্য কারও লেখায় তেমনভাবে চোখে পড়েনি।

বাংলা কথাসাহিত্যে নবজীবনের রূপকার মহাশ্বেতা দেবী তাঁর সাহিত্যে কোন সৌখিন মজদুরির জন্য লেখেননি। রবীন্দ্রনাথ ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থের ‘ঐক্যতান’ কবিতায় লিখেছিলেন —

“ কৃষানের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।”৪

রবীন্দ্রনাথ কাঙ্ক্ষিত মাটির কাছাকাছি যথার্থ সাহিত্যিকের নাম বলতে গেলে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয় মহাশ্বেতা দেবীর কথা।

ডঃ সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

“মহাশ্বেতা দেবীর গল্প একশ্রেণির জীবন সংগ্রামের কাহিনী অন্ত্যজ আদিবাসী দোষাদদের জীবন কথা তাঁর অধিকাংশ গল্পের বিষয়বস্তু। বিহারের এই অন্ত্যজ দোষাদ শ্রেণির সরলতা, দৈবী বিশ্বাস, সংস্কার, আনুগত্য যেমন তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তাদের নিত্য দিনের বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা, দারিদ্র্যের শোচনীয় নগ্নতা, জোতদার ও মহাজনদের নির্মম অত্যাচার, পুরুষানুক্রমে কর্জের ভার বহন করা এবং বেগার প্রথার আনুপূর্বিক ইতিহাস গল্পাকারে বিবৃত হয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর গল্পগুলি নিম্নবর্ণের দোসাদ শ্রেণির সমাজ চিত্রণ। মহাশ্বেতা দেবী সময়ের ‘দলিলীকরণে’ বিশ্বাসী। যা সময়ের দলিল বা রিপোর্ট, তাকেই সাহিত্যের শিল্পলোকে তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রূপান্তরিত করেছেন।”৫

এই জনপ্রিয় লেখিকা সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পালন করে তিনি তাঁর উপন্যাস,

ছোটগল্প ও প্রবন্ধগুলি রচনা করেছেন। ডঃ অনন্যা বড়ুয়া সঙ্গত কারণেই লিখেছেন —

“লেখিকার প্রায় প্রতিটি উপন্যাস ও ছোটগল্পে অস্ত্র্যবাসী জীবন বিশিষ্ট মাত্রা পেয়ে থাকে। সমাজের অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবহেলিত জনসাধারণের জীবনভাষ্য রচনাতেই তাঁর লেখনী চিরকালই সোচ্চার। ঘুণধরা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গে কোনদিনই তাঁর লেখনী আপোষ করেনি।”৬

নিম্নে মহাশ্বেতাদেবীর প্রতিবাদী গল্পগুলি বিশ্লেষণ করছি — ‘সুভগা বসন্ত’ গল্পগ্রন্থের ‘রোম্‌থা’ একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্প। এই গল্পের উপাদান তিনি সংগ্রহ করেছেন ইতিহাস থেকে। দুর্গাচরণ সান্যাল তাঁর ‘সামাজিক ইতিহাস’ গ্রন্থে রোম্‌থা প্রথার উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্মণ সেনের আমলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার প্রসারের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে কবিরাজের হাতে তুলে দেওয়া হত। কবিরাজ গরম তেলে জীবন্ত অবস্থায় অপরাধীকে নিক্ষেপ করে তাকে ভেজে মহামাস তেল তৈরী করত। ওই তেল মাখলে দেহের সৌন্দর্য ও শারীরিক বল বৃদ্ধি হত। এই গল্পের নায়ক শরণ। নগরীর গণিকা শ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলীকে সে হত্যা করেছিল, সেই অভিযোগে শরণের বিচার হয়। বিচারকালে শরণ বলেছিল, সে চন্দ্রাবলীকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল। কিন্তু গৌড়ের প্রধান নগরলক্ষ্মী গোপাল তার মনোরঞ্জননের জন্য চন্দ্রার ঘরে প্রবেশ করায় শরণ তার গলা টিপে হত্যা করেছিল। এই হত্যার অভিযোগে শরণের প্রাণদণ্ড হয়। শরণকে একুশদিন কারাগারে রাখা হয়েছিল। একুশদিন পর রোম্‌থাকে হাত-পা বেঁধে কড়াই -এ ফেলবে কবিরাজ। জালা-জালা তেলের ফরমাস দিয়েছে কবিরাজ। উনুন জ্বলবে, তেল টগবগ করে ফুটবে তার মধ্যে শরণকে ফেলে দেবে। শরণ কারাগার থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল। ভাগীরথীর নদী বক্ষে একটি নৌকায় চেপে পালাবার সময় এক মাঝি শরণের বুকে ত্রিকোণ চিহ্নের মধ্যে ‘রোম্‌থা’ লেখা দেখে ভয় পেয়েছিল। এ সংবাদ জানবার পর যখন গ্রামবাসীরা তাকে ধরে আনবার জন্য এগিয়ে এসেছিল, তখন —

“কোমর থেকে কাটারিটা নিয়ে শরণ চেষ্টায় হ্যাঁ, আমি রোম্‌থা। মানুষ মারতে ডরাই না। যে এগোবে, সে প্রাণের মায়া ছেড়ে এসো। মানুষগুলো একটু পিছোয় এবং ‘জাল আন, জাল আন, বাঘ ধরা জাল আন, মাথার ওপর ফেলে দে।’ বলতে বলতে ক’জন দৌড়ায়। ‘জাল আনবে’? আমায় জানোয়ারের মতো ধরবে ? শরণ দাঁত বের করে চেষ্টায়। তোমরা সবাই যে যার মতো আছ, খালি রোম্‌থাকে মারবে পশুর মতো, কেন ? রোম্‌থার দেহ দেহ নয় ?”

— এরপর মানুষ সমস্তরে চেষ্টাতে থাকে রোম্‌থা পালিয়ে যাচ্ছে, এই বলে। মাঝ নদীতে মানুষ লাঠি, গাছের ডাল, নৌকার লগি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে শরণের কাছে। পরপস্পরের মধ্যে মারামারি চলতে থাকে। এরপর রোম্‌থা ঝপ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন দিক থেকে শরণের ওপর আক্রমণ হয়। উন্মত্ত জনতা ঝপাঝপ করে তার মাথার উপর লাঠি ও দাঁড় দিয়ে আঘাত করতে থাকে। এরপর শরণের রক্তে লাল হয়ে যায় নদীর জল। তারপর তার লাশ জলে ভাসতে

থাকে। তৎকালীন সমাজের এরূপ নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে মহাশ্বেতাদেবী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মহাশ্বেতাদেবীর ‘দ্রৌপদী’ একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পটি তাঁর ‘অগ্নিগর্ভ’ গল্পগ্রন্থ থেকে গৃহীত। এটি তাঁর নকশাল বাড়ী আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা। ঝাড়খন্ডের গভীর অরণ্যে সাঁওতালদের সংগঠিত শক্তির কাহিনী হল ‘দ্রৌপদী’। যারা নকশাল আন্দোলন করেছিল, তাদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তারই জ্বলন্ত দলিল হল আলোচ্য গল্পটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী, জাতিতে মেঝেন। প্রশাসন তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য মরিয়া। জীবিত বা মৃত অবস্থায় দ্রৌপদীকে ধরিয়ে দিতে পারলে প্রশাসন তাকে একশ টাকা পুরস্কার দেবে। বাঁকড়াঝার থানা আক্রমণ, বন্দুক অপহরণ, হাঁদারা এবং টিউবয়েলের দখল, জোতদার ও মহাজন হত্যা প্রভৃতি ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিল দ্রৌপদী। তার স্বামী দুলনও নকশাল আন্দোলনের নেতা। তারা টাঙ্গি-হেঁসো, তির-ধনুক প্রভৃতি নিয়ে নিধন কার্য চালিয়ে ঝাড়খন্ডের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। তাকে ধরবার জন্য সৈনিকরা এ জঙ্গলের ম্যাপ ঐকে চিরুনি তল্লাশি করতে থাকে। একদিন সকালে এক সৈনিক চ্যাটাল পাথরে উপর হয়ে শুয়ে ছেকে দুলনকে ঝরনার জল পান করতে দেকে। তারপর চালায় গুলি। গুলিবিদ্ধ হয়ে ‘মা.....হো’ বলে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। এরপর সন্ধান চলতে থাকে দ্রৌপদীকে ধরবার জন্য। পরিশেষে প্রশাসন-এর হাতে ধরা পড়ে দ্রৌপদী, একঘণ্টা ধরে চলতে থাকে জেরা। সেনানায়ক সেনাদের আদেশ দেয় — “ও কে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল।”

— এই বানিয়ে নিয়ে আসা বিষয়টা অত্যন্ত মর্মান্তিক। দ্রৌপদীর ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চলেছিল তার বিরুদ্ধে প্রতিটি মানুষই ঘৃণায় ধিক্কার জানাতে বাধ্য হলেন। এক ভয়ঙ্কর জ্বলন্ত ছবি মহাশ্বেতর লেখনীতে জীবন্তভাবে উঠে এসেছে।

“নড়তে গিয়ে ও বোঝে এখনো ওর দু’হাত দু’খুঁটোয় এবং দু’পা দু’খুঁটোয় বাঁধা। পাছা ও কোমরের নীচে চটচটে কি যেন। ভীষণ তেষ্ঠা। পাছে ‘জল’ বলে ওঠে, সেই ভয়ে দাঁতে নীচের ঠোঁট চেপে। বুঝতে পারে যোনিদ্বারে রক্তস্রাব। কতজন ওকে বানিয়ে নিতে এসেছিল?”

— এরপর তার কোমল স্তন দু’টি কামড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে সেনারা, এমনকি বৃত্ত দু’টিও ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে তাদের বাঁধেনি। চার-পাঁচ-ছয়-সাতজন সেনার ধর্ষণে দ্রৌপদী তখন অচৈতন্য অবস্থায় পড়েছিল ভূমিতে। জ্ঞান ফিরে পাবার পর বড় সাহেরের তাঁবুতে আনা হয় দ্রৌপদীকে। ধর্ষিতা দ্রৌপদী সামনে এগিয়ে আসে সে তখন বিবস্ত্র। তার উরু ও যোনিকেশে চাপ-চাপ রক্ত। দ্রৌপদী আরও কাছে আসে। কোমরে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে থেকে হাসতে হাসতে পুলিশ অফিসার অর্জুন সিংকে বলে — “তু সাঁধানের মানু, দোপদ মেঝেন। বানিয়ে নিতে বল্যেছিলি, তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?”

কাপড় কই ওর -”

— দ্রৌপদী কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তীক্ষ্ণ গলায়

বলে —

“কাপড় কী হবে, কাপড় ? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?

চারিদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আ কী করবি ? লেঃ কাঁউটার কর্ লেঃ কাঁউটার কর্ ?

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিবন্ধ টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।”

একটি বিশেষ সময়ের প্রশাসন এই পাশবিক অত্যাচার প্রতিনিয়ত যেটা চলেছিল সেই জ্বালা ও যন্ত্রণা মর্মে-মর্মে অনুভব করেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। প্রশাসনের এই পাশবিকতাকে কালজয়ী করে রাখবার জন্য তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এমন প্রতিবাদী গল্প বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা এ- ব্যাপারে সংশয় আছে।

‘রুদালী’ মহাশ্বেতা দেবীর একটি অন্যতম গল্প। এই গল্পের বিষয়বস্তু অভিনব। পেশাদার কাঁদিয়ে যারা তারা রুদালী নামে পরিচিত। বক্ষ্যমান গল্পটিতে শনিচরী নামে একটি মেয়ের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের চিত্র অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেছেন লেখিকা। সে জাতিতে গঞ্জ, টাহাড় গ্রামে তার বাস। শনিবারে জন্মেছিল বলে তার নাম রাখা হয়েছিল শনিচরী। শনিচরী যখন বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে আসে, তখন তার শাশুড়ী শনিচরীকে বলত শনিবারে জন্মেছিল বলে ওর কপালে এত দুঃখ। এমনকি বউ অপয়া। শনিচরী এরজন্য প্রতিবাদ করেনি। তার শাশুড়ীর মৃত্যু হলে সে কাঁদেনি। তার দুই ছেলেকে মালিক-মহাজন রামাবতার সিং একটাল গম চুরির অভিযোগে জেলে ঢুকিয়ে ছিল। সেই শোকে এবং আকস্মিক জ্বরে যেদিন শাশুড়ীর মৃত্যু ঘটেছিল, সেদিন শনিচরী ও তার জা দুজনে রাতের মরা রাতেই দাহ করবার জন্য প্রতিবেশীদের ডেকে এনেছিল। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর সে এত ব্যস্ত ছিল যে শাশুড়ীর জন্য শনিচরী কাঁদতে পারেনি। তিনবছর যেতে না যেতেই তার ভাসুর-জা তাদেরও মৃত্যু হল। ভাসুর ও জা-এর মৃত্যুতে শনিচরীর কাঁদা হয় নি।

স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর লাশ খোঁজার ব্যস্ততা এবং অসুস্থ ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রচেষ্টায় শনিচরীর কাঁদা সম্ভব হয়নি- “একদিন ঘোর গ্রীষ্মে পুড়তে-পুড়তে রামাবতারের ক্ষেতে নিড়িনি দিতে-দিতে শনিচরী হঠাৎ নিড়িনি ফেলে একটা পিপ্পল গাছের ছায়ায় বসেছিল গিয়ে। অন্য মজুরদের বলেছিল, আজ আমি বুধুয়ার বাপের জন্য কাঁদবো বুকফাটিয়ে কাঁদবো।”

তারপর তার ছেলে বুধুয়ার মৃত্যু ঘটে। বুধুয়ার মৃত্যুর পর তার বড় জা যায় পালিয়ে।

এত দুঃখের মধ্যেও শনিচরীর কাঁদা হয়ে ওঠেনি। শনিচরীর এই কঠিন হৃদয় প্রসঙ্গে গ্রামের লোকদের মধ্যে থেকে কথা উঠে আসে। তার নাতি খুরোয়ার মৃত্যু হলে সে কাঁদেনি। পেটের জন্য অন্নসংগ্রহের নিমিত্তে সে ব্যস্ত ছিল। সে না কাঁদলেও তার দু'চোখ জ্বলে উঠেছিল। এতগুলো প্রিয়জনের মৃত্যুতে যে শনিচরী কাঁদেনি কিন্তু আজ পেটের দায়ে শনিচরী কেঁদে কেঁদে অর্থ রোজগার করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার এই কান্না দুঃখ কিংবা শোকের কান্না নয় এ কান্না হল রুটি-রুজির জন্য কান্না। এই কান্না বিক্রি করে রুদালীকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে এজন্য তার চোখের জল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। এই রোজগার অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে যুক্ত। কতরকম ভাষা দিয়ে মৃত মানুষের প্রশংসা সূচক বাক্য উচ্চারণ করে কাঁদতে হত। এই কাঁদার আবার রকমফেরও আছে মহাশেতা দেবী 'রুদালী' গল্পে তার বর্ণনা দিয়েছেন —

“শুধু কাঁদলে একরকম রোট, কেঁদে লুটালে পাঁচটাকা এক সিকে, কেঁদে মাথা ঠুকলে পাঁচটাকা দু'সিকে, কেঁদে বুক চাপড়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয়টাকা দিতে হবে।”

এছাড়া রুদালীদের ভাগ্যে জোটে বাড়তি চাল, খাবার এবং কাপড়। এটি একটি পেশাদারি কারবার অনাত্মীয় মৃতের জন্য এই কাঁদা। বড় বড় শহরে এরূপ বহু পেশাদারি রুদালীরা রয়েছে। কারও মৃত্যু হলে বউরা, ছেলেরা, নাতি-নাতনিরা জিনিসপত্র বাটোয়ারার কাজে এতটাই চিত্তিত থাকে যারজন্য তাদের পক্ষে কাঁদা হয়ে ওঠেনা। অনেকে আবার কাঁদার কথাও যায় ভুলে। তৎকালীন আদিবাসী সমাজে এরূপ প্রচলিত বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর না কাঁদলে তার আত্মার চিরশান্তি লাভ হয়না। তাই সম্পন্ন গৃহস্থরা বাধ্য হয়ে রুদালীদের দ্বারস্থ হত। যে যতবেশী রুদালীকে সংগ্রহ করতে পারত সমাজে তার স্থান ছিল সবার উপরে। শনিচরী, মহাজন ভৈরব সিং, নাথু সিং ও গম্ভীর সিং দের সমাজে কেঁদে কেঁদে অর্থ রোজগার করে। এই পেশায় বহু বেবুশ্যে যোগ দেয়। শনিচরী ও বিখনি রুদালি হতে বাধ্য হয়। পেটের জ্বালা মেটাতে এই অদ্ভুত জীবিকা গ্রহণ করেছিল, রুদালীর মত আরও অনেকে। যুবতি পতিতারাও ভবিষ্যতে রূপ জৌলুস হারিয়ে ফেললে তাদের খোদের মিলবেনা, এই ভবিষ্যত চিন্তা করে শনিচরীর সঙ্গেও তারা কেঁদে কেঁদে জীবিকা নির্বাহের পথকে গ্রহণ করে।

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখা একটি সফল প্রতিবাদী গল্প 'বায়েন'। বাস্তবধর্মী এই গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র চণ্ডী, সে মলিন্দরের জী। তার পুত্রের নাম ভগীরথ। একদিন সমাজের প্রতিভূরা চণ্ডীকে বায়েন বলে আখ্যা দিল। এরপর সমাজচ্যুত চণ্ডী স্থান বেছে নিল লোকালয় থেকে দূরে রেললাইনের থেকে কিছুটা কাছাকাছি একটি ঘরে। তার ঘরে পাশে উড়ল একটি লাল নিশান। এই নিশানটি একটি বিপদ সংকেত যাতে কোনো লোক সেখানে না আসতে পারে। বায়েন অনেকটা ডাইনীর মতো। চণ্ডী বায়েনের কুদৃষ্টিতে রয়েছে মৃত্যুর বিষ। সুতরাং তার কুদৃষ্টি যার উপর পড়বে তার মৃত্যু অনিবার্য।

কুসংস্কারে আবদ্ধ নিষ্ঠুর শ্রেণিরলোকেরা গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল যাকে, সেই একদিন ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার জন্য ট্রেন লাইনের উপর শুয়ে ট্রেনের চাকার তলায় তার জীবন দিল। সমাজের উঁচু তলার নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে ট্রেনদুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তার এই আত্মোৎসর্গের ঘটনা ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। স্থানীয় দারোগা বি.ডি.ও. ও রেল কর্মচারীর উচ্চপদস্থ লোকেরা মৃত চণ্ডীকে দেখবার জন্য এসেছে। চণ্ডীকে রেলকোম্পানী মরণোত্তর একটি মেডেল প্রদান করেছিল। এই দৃশ্য দেখে গ্রামের লোকেরা জানালো চণ্ডী তাদেরই জ্ঞাতি। পাশেই উপস্থিত ছিল চণ্ডী পুত্র ভগীরথ। সে ভাবল বেঁচে থাকাকালীন অবস্থায় তার মাকে বিতাড়িত করেছিল আর তারাই আজ তাদের জ্ঞাতি হিসেবে পরিচয় দিচ্ছে। আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন —

“ভগীরথ এগিয়ে এল.....উনি আমার মা।’ ভগীরথ বংশ পরিচয় দিল, আমার নাম ভগীরথ গঙ্গাপুত্র.....নিবাস ডোম পাড়া, মা ঈশ্বরী চণ্ডী গঙ্গাদাসী।”

লেখিকা এই গল্পে সমষ্টির বিরুদ্ধে একদিকে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অন্যদিকে মানুষের শুভবোধ জাগিয়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন।

‘স্তনদায়িনী’ গল্পে আমরা দেখি একটি সর্বরিক্ত নারীর জীবন কাহিনী। একশ্রেণির মানুষরা সবকিছু কেড়ে নিয়ে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের তার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ। সমাজের ঘৃণ্য রাজনৈতিক নেতারা এবং সমাজের স্বার্থপর জনগণ যশোদার মতো নারীদের নিগৃহীত করছে। কিন্তু তাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি প্রকাশ করেনি।

যশোদা নিজেকে জগন্নাথ সিংহবাহিনীর অংশ বলে মনে করত। তার স্বামী কাঙালীচরণ অভাবের মধ্যে স্ত্রীর স্ফীত স্তন নাড়াচাড়া করে স্বর্গসুখ পায়। যশোদার বুকের দুধ ছিল অফুরন্ত একের পর এক সে সন্তানের জন্ম দিয়েছিল। তার কুড়িটি সন্তানকে বুকের দুধ খাইয়ে জিইয়ে রেখেছিল। এমনকি হালদার কর্তার সবছেলেদেরও বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে তুলেছিল। এরপর যশোদা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়। তখন তার পাশে কাউকেই দেখা যায়নি। একটি নারীর মর্মান্তিক যন্ত্রণা ও একাকীত্বের মধ্যে তাকে শেষ মুহূর্ত কাটাতে হয়েছিল। মৃত্যুর সময় — “যশোদার মনে হল সে ত বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে তবে সে কি একা-একা মরতে পারে ? যে ডাক্তার রোজ ওকে দেখছে সে, যে ওর মুখে চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে -ডোম, সবাই তার দুধ ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বাক্বে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না। অথচ শেষ সময়টা কারো থাকার কথা ছিল। সে কে ? কে সে ? সে কে ?”

মৃত্যু যন্ত্রণা নিয়ে সে ভেবেছিল, ঈশ্বরের অংশ বলেই মানুষের সঙ্গে দেবতা সংসার করতে পারেনা এজন্যই হয়তো মানুষরা তাকে ত্যাগ করেছে। পরিশেষে যশোদাকে দাহ করেছিল

একটি ডোম।

‘বিহন’ একটি সফল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে আদিবাসী হরিজন চাষীদের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিরোধও দেখানো হয়েছে। লছমন সিং ও দৈতারি সিং-এর নেতৃত্বে চলে অর্থনৈতিক শোষণ। বন্দুকের ভয় দেখিয়ে চাষীদের ফসল কেটে নেয় তারা, এমনকি তাদের ভীষণভাবে খাটিয়ে নেয় মাত্র চার আনা দৈনিক পারিশ্রমিক দিয়ে। একদিন সে শ্রমিকরা পাঁচিশ পয়সা বাড়িয়ে দেবার জন্য আবেদন জানালে গুরু হয় হাঙ্গামা। এর জেরে এস. ডি. ও. পুলিশ নিয়ে আন্দোলনকারীদের ধরে আনে। এই গল্পের করণ হরিজনদের সংগঠিত কোরে আন্দোলনে নামে। তারা নিশ্চিন্তে ভুট্টা কেটে নেয়, এমনকি আট আনার মজুরির দাবী সফল হয়। এদিকে লছমন, দুলন গঞ্জকে জানায় কাল জমিতে না থাকবার জন্য, যদি সে থাকে তাহলে তার লাশ ফেলে দেবে। ঘোড়ার পিঠে দশজন অনুচর নিয়ে লছমন দুলন গঞ্জকে নির্দেশ দেয় করণ ও বুলকির লাশ ফেলে দেবার জন্য। ইতিমধ্যে পুলিশ সেখানে আসে কিন্তু তারা অগ্নি সংযোগের হাতে থেকে হরিজন এলাকাকে বাঁচাতে পারেনি। পরিশেষে ন্যায় অধিকারের দাবীতে করণ ও বুলকি যে লড়াই শুরু করেছিল লছমনের নির্দেশে দুলন তাদের গুলি করে হত্যা করে এবং লাশটিকে তার অফলা জমিতে পুঁতে রাখে। এরপর লছমনের প্রতাপ বাড়তেই থাকে। তার বিরুদ্ধে আশরফি মাহাতো হরিজনদের সংঘবদ্ধ করে। লছমন দুলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় সে জমি চাষ না করে বছর বছর সে শুধু বিহনই নেয়। দুলনের মনে অনুশোচনা জাগে তার জমিতে করণ ও বুলকির কবর দেওয়া হয়েছে। সে জমিতে চাষ না করে অন্যত্র চলে যেতে চায়, যেখানে লছমন সিং-এর দৌরাত্ম্য নেই। আশরফির সঙ্গে লছমনের তর্কবিতর্কের পর শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি আড়াই টাকা ও জল খাবার স্থির হয়। সে সময় পুলিশ উপস্থিত ছিল লছমন সিং-এর নির্দেশে আশরফি সহ এগারো জনকে গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়।

এই এগারো জনের লাশও পুঁতে ফেলা হয় দুলনের জমিতে। এদিকে লছমন ও অন্যান্য মহাজনরা হনুমান মিশ্রের মন্দিরে পূজোর আয়োজন করে। সেখানে ১০৮টি রূপোর বেলপাতা দেওয়া হয়। এছাড়া সেখানে ঘোষণা করা হয় একটাকা মজুরীতে জল খাবার ছাড়া যেসব কুত্তার বাচ্চা ও কুত্তীর বাচ্চি কাজ করতে আগ্রহী তারা যেন চলে আসে। সে সময় কিছু মস্তানরা ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের কাছ থেকে চার আনা করে কেটে নেয়। এরপর আসে দুলন গঞ্জের ছেলে ধাতুয়া নেতৃত্ব দিতে। ধাতুয়া লছমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় দিনমজুরদের কাছ থেকে টাকা কেটে নেবার বিরুদ্ধে। এরপর ধাতুয়াকেও মরতে হল লছমন সিং-এর গুলিতে। পুত্রের মৃত্যুতে এক চাপা আক্রোশে দুলনের প্রতিবাদী কণ্ঠ ভেসে ওঠে —

“আমার ধান তোমাদের লেগে বিহন। এই বিহন নাও।সার দিয়েছে ?

.....হ্যাঁ সার, খুব দামী সার।তোমরা কাট। আমকেও চারটি দিও। আবার রুইব, আবার। করণ, আশরফি, বুলকি ও ধাতুয়ার মাংস মজ্জার সারে পুষ্ট পাকা ধানে আশ্চর্য প্রসন্নতা। বিছন হবে বলে। বিছন মানে বেঁচে থাকা।”

লহমেন সিং-কে হত্যার পূর্ব মুহূর্তে দুর্লভ জানিয়েছিল —

“কা আফশোস মালিক! গন্জুর হাতে মরলে!”

মহাশ্বেতা দেবী ‘বিছন’ গল্পে এভাবেই সংগ্রামী দুর্লভের মাধ্যমে লহমেন সিং-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। দুর্লভ বেঁচে ছিল সংগ্রাম করে। তার অগ্নিশপথ ব্যর্থ হয়নি। তৎকালীন শ্রেণিশত্রুর হত্যার মধ্য দিয়ে কৃষকদের ওপর অত্যাচার অনেকটা শুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘রাবণ’ গল্পে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতিবাদ বলসে উঠেছে। শুধু যন্ত্রণাবোধ নয় — শুধু হেরে যাওয়া নয় — সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিশোধ স্পৃহা জ্বলে উঠেছে — এই গল্পের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত।

‘রাবণ’ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র কেতন গলসি। রাজনৈতিক নেতারা তাকে জেলে পাঠিয়েছে চক্রান্তের জাল বিস্তার করে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে ফিরে এসেছে তাদের গ্রামে। সেখানে এসে দেখে তার বৃদ্ধ পিতার সমস্ত জমি কুক্ষিগত করে ফেলেছে রাজনৈতিক নেতারা। আজ তারা নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বহারা। কেতন গলসি পিতাকে সান্ত্বনা দেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কেরোসিনের গুঁমটিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সে। গলসি এখন —

“রাবণ প্রজ্বলন্ত রাবণ আকাশের পটে।”

রাবণ জ্বলন্ত অগ্নির লেলিহান শিখায় আকাশকে ধরে ফেলেছে — কেতন এভাবেই ভণ্ড রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে জানিয়েছে প্রতিবাদ।

‘হীরামোতি’ মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। হীরামোতি এই গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। তার শিক্ষিত বাবা দুটি রত্নের নামে ওর নাম রেখেছিল। হীরামোতি ভাইদের মতো বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায়নি। সে ঘরগৃহস্থালীর কাজ করে এবং অর্থরোজগারের জন্য ঘাস কাটে ও তা বিক্রি করে। তার মা হীরামোতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্বামী দেবতামণ্ডলকে জানায়— “কচি মাইয়্যাটার টাকাও খাও অমনিষ্যাটা। কেন, ঐ টাকা অর নামে খাতায় রাখা যাইত না।”

এরপর পঞ্চাশ বছর বয়সের এক পাত্রের সঙ্গে হীরামোতির বিয়ে হয়। এতে দেবতামণ্ডল কন্যাপণ পেয়েছিল একশো টাকা। হীরামোতি জানিয়েছিল তার বাবাকে —

“বুড়া বরে দিয়া বড় হইলে যাইবো। অহনো পরথম বৌ তাজা আছে।”

হীরামোতি শাঁখা, সিন্দুর ও ফ্রক পড়ে ঘাস কাটে, ছাগল চড়ায়, মোক্তার বাড়ি যায়, কন্যাপণের টাকা সুদে খাটাবে পরিকল্পনা নেয় তার বাবা। পিতৃগৃহে থেকে থেকে হীরামোতির

যৌবনকাল উপস্থিত হল। এরপর রাজারাম নামে এক যুবকের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয় তার বাবা -

‘তুমি আমার মাইয়্যারে বিয়া কর একটা বকন দিও।

করবা ?

রাজারাম যদিও হীরামোতিকে গোপনে বলে,

তর্ নাগাল পাইলে বিয়া করতাম রে।”

এরপর বকন বাছুর ও একশত টাকা নিয়ে দেবতা ঘরে ফেরে। রাজারামের এটি প্রথম বিয়ে। এরপর রাবণ মন্ডল হীরামোতিকে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়। তার বাবা কন্যা পণ নিয়ে আবার তার সঙ্গে রাবণের বিয়ে দেয়। কিন্তু এই বিয়েও স্থায়ী হয়নি। আবার যখন গোপালের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব আসে হীরামোতি নিজ নির্বাচনে গোপালকে বিয়ে করে। রাজারাম এব্যাপারে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে পুলিশ গোপাল ও হীরামোতিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ হীরামোতিকে শাসায়। জেল থেকে ফিরে আসার পর রাজারামের সঙ্গে হীরামোতির বচসা শুরু হয় —

“আউগাইলে গলা ফেলাইয়া দিমু।”

পারে, তা পারে হীরামোতি, সেদিনও হাতে দা’ ছিল। রাজারাম কপাল ও মুখের ধুলো মোছে। — পাড়ায় ঢুকতে আসিস তুই! ঢিল মাইরা খেদাইতাম। আমাগো ইজ্জত আছে, এটা বারোভাতারির পাড়া নয়।

— আমি বারোভাতারি ?

হীরামোতি হাতের ব্যাগ দিয়ে ওর মুখে মারে, ওর কলার ধরে হিঁচকে নামায়, কলার পিছন দিকে টানে, ফলে রাজারাম গলায় হিক্কা তোলার মতো শব্দ করে ও ওর চোখ বিস্ফারিত।

— অরে ইজ্জতের বেপারি ! বারোভাতারি হীরামোতি নয়। যা, তগো দ্যাবতা মন্ডলের ডাক। আমার ঘর ভাঙছিস তুই। ন্যাশার কারবারি কে ? পাড়ার ন্যাতা কে ? আমার পিছে ল্যালাঠাইত কে ? জবাব ক’নে তোর ?

হীরামোতি ওকে ভীষণ আক্রোশে মারতে থাকে, মরতে থাকে।

— ইজ্জত মাইয়া বেচে বাপ, আর রায় দেয় সমাজ। তগো অশুচের পাড়ায় আমি যাইনা। আমারে পথে নামাইছে কে ? আমার ঘর নাই ক্যান ?

লোকজন জমতে থাকে জমতে থাকে। অবশেষে রাজারামকে মাটিতে ফেলে হীরামোতি ওর মুখে থুতু দেয়। এরপর পুরলিশ এলে হীরামোতি রাজারামের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় সে কুপ্রস্তাব দিয়েছিল। এভাবেই পুরুষ শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে হীরামোতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

‘ভূমিদাত্রী’ গল্পে সমাজ বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের মদতে সমাজ বিরোধীরা অন্যায়মূলক কাজ প্রতিনিয়তই করে চলেছে। এমনকি পুলিশ

প্রশাসনও সমাজ বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে যখন রাজনৈতিক নেতারা মুখে বড় বড় বুলি আওড়ায়, রাজ্য শাসনের নামে অপশাসন চালায়, বেকারত্বের অন্ধকারে ঠেলে দেয় লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীদের, তখন এই ঘুণধরা সমাজে অপরাধ জগৎ-এর দৌরাভ্য প্রাধান্য পায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য লিগু হয় সমাজ বিরোধী কার্যকলাপে। এভাবে দিনের পর দিন খুন, যখম, লুণ্ঠরাজ, নারী অপহরণ প্রতিনিয়ত চলতে থাকে। এর বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবী তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি যা ঘটেছে সে ঘটনাকেই ‘ভূমিদাত্রী’ গল্পে তুলে ধরেছেন।

‘জাতুধান’ গল্পে নিরন্ন মানুষের খাবার অনুেষণের ব্যাকুলতা দেখানো হয়েছে। ভাতের কথা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। সাজুয়া তিওর এই গল্পে প্রধান চরিত্র। আশুরিক ক্ষুধা তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। দুবেলা সে পেটপুরে খেতে পারেনা। এজন্য তার খাদ্যের প্রতি লোভ তার বেশি। রাক্ষসের মতো তার ক্ষুধা বলে এক ব্রাহ্মণ তাকে ‘জাতুধান’ বলে ডাকত, যার প্রকৃত অর্থ রাক্ষস। এক প্রবল বন্যায় ধনপ্রাণের ব্যাপক ক্ষতি ঘটে। অনেকে ভেবেছে সাজুয়া বন্যার জলে ভেসে গেছে। এবং তার মৃত্যু ঘটেছে। এই মৃত্যু সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার জ্ঞাতিরা সাজুয়ার কুশপুতলিকা দাহ করে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। তার শ্রাদ্ধের জন্য চাল সংগৃহীত হয়। মহাজন রামসিং এই চালের বস্তা সরবরাহ করে। কিন্তু সাজুয়া ফিরে আসে এক গভীর রাতে। তখন গোষ্ঠী প্রধান সেই চাল ফেরৎ দিয়ে আসতে বলে কিন্তু খাদ্য লোভী সাজুয়া তা ফেরৎ দিতে চায়নি সে চালের বস্তা নিয়ে বহুদূর চলে যেতে চেয়েছে। গোষ্ঠী প্রধান তাকে জানায় —

শ্রাদ্ধের চাল খেলে সে দেবতার রোষে পড়বে।

কিন্তু ক্ষুধায় কাতর সাজুয়া জানায় —

“পড়লে পড়ব পেটে ভাত বলে বুড়া,

সকল দেবতার বিষ বেরখা খায়।”

— পরিশেষে এই চাল নিয়ে সাজুয়া পালিয়ে যায়। ক্ষুধা নিবারণের তাড়নায় মানুষের সমস্ত সংস্কার ভেঙে যায়। মহাশ্বেতা দেবী ‘জাতুধান’ গল্পে এই সত্যই তুলে ধরেছেন।

‘রাক্ষস’ গল্পেও রয়েছে ক্ষিধের জ্বালার কথা ভবতারণ বাবু খেত অপরিমিত এজন্য তার অপর নাম হয়েছে রাক্ষস। এই ব্যাপারে তার জীবন সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়, ভবতারণবাবু যুক্তি হিসেবে দেখান তিনি ভালো, ভালো খাদ্য পেটপুড়ে খেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সংসারের সবাইকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি বয়সে প্রবীণ তাঁর পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। তার বেশি খাবার রহস্যটো এভাবেই তিনি ব্যক্ত করেন। কর্মক্ষেত্র থেকে তিনি অবসর নিয়েছেন। তার পেনশনের টাকাতেই সংসারের যাবতীয় খরচ চলে। তিনি যদি না খেয়ে কিংবা কমখেয়ে অপুষ্টিতে ভোগে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হন তাহলে তো সংসারটা ভেসেই যাবে।

‘জন্মতিথি’ একটি প্রতিবাদী গল্প। বড়লোকের বাড়িতে জন্মদিন উপলক্ষে বিপুল খাদ্যের আয়োজন করা হয়। সে খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ ফেলে দেওয়া হয় ক্ষুধায় কাতর মানুষদের কাছে সেই উচ্ছিষ্ট খাদ্যই প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কুড়োন ও তার মা খাদ্য সংগ্রহের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়।

উচ্ছিষ্ট খাদ্য পরিস্কার করে নিয়ে যায় গাড়ি। তখন ভাগ্যহত ক্ষুধার্ত কুড়োন ও তার মার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায় টিপকলের ঠান্ডা জল। ক্ষিধের জ্বালায় কাতর মানুষদের প্রতি তথাকথিত সহানুভূতিহীন বিত্তবান মানুষেরা যে নিমর্মতার পরিচয় দিয়েছে মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে তারই প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বাণ’ গল্পেও রয়েছে খিদের প্রতি প্রবল আগ্রহ। ক্ষিধের জ্বালায় জর্জরিত চিনিবাস ভাতের গন্ধ অত্যন্ত প্রিয়। চিনিবাসের বাগদীর ছেলে। দীর্ঘদিন ধরে চিনিবাসের সঙ্গে বড় আচার্যীর বাড়ির গভীর যোগ। সে খাদ্যের লোভে মনসা গাছ এনে দিতে চায়। এই বাড়িতে চিনিবাস লাউঘন্ট, নারকেল ঘন্ট, এগুলো প্রিয় খাদ্যের কথা কল্পনা করে। এক বার বড় আচার্যীর বাড়িতে গৌরাজ আসবেন, এজন্য ভোগপ্রসাদ তৈরী হবে। চিনিবাস পেটপুড়ে খাবে কিন্তু দেখা গেল আচার্যীরা অনুগত লোকদের ভোগ প্রসাদ না দিয়ে মুড়ি, বাতাসা বিলি করতে থাকে। ক্ষুধার্ত চিনিবাস তার মাকে মেরেধরে রাগে মুড়ি ফেলে দিয়ে চলে যায়। তার কাছে একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত খাদ্য ছিল ভোগ প্রসাদ। তা না পেয়ে অন্নের জন্য সে কেঁদেছে। অল্পময় ভুবনের কথা সে ভেবেছিল। মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে ক্ষুধার্তের প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে দেখিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পের প্রধান চরিত্র সাধন। এই গল্পে খাদ্য সংকটের সময় লড়াই করে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। সাধনের মা এক অসহায়নারী। তিনি তার পুত্রের মুখে অন্ন তুলে দেবার জন্য শত প্রলোভনকে অস্বীকার করেছে, বেছে নিয়েছে কঠিন জীবন সংগ্রাম। ঠাকুরাণী সেজে নিজেকে সে দেবাংশী ভেবেছে। পাখমারা সম্প্রদায়ভুক্ত এই গল্পে ঠাকুরাণী পরিচয় দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে যে চাল সংগ্রহ করত সেই চাল রান্না করে সাধনের মা সাধনের মুখে তুলে দিত। সাধন ভাতের গন্ধ খুব ভালোবেসে। তারকাছে তার মা হল —

‘চন্দ্র-সূর্য, সমগ্র জগৎ সংসার।’

সাধনকে ভালোভাবে খাওয়াতে গিয়ে তার মাকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়েছে অনাহারে থেকে থেকে তার মা জটি অপুষ্টি জনিত রোগে আক্রান্ত হয়। ডাক্তারখানায় পাঠানো হলে ডাক্তার তার রোগ ধরতে পারেনা। লেখিকা উল্লেখ করেছেন —

“জটির রোগ বড় ছোঁয়াচে, আজও ভারতভূমিতে তার চিকিৎসা বেরোয়নি এ রোগের নাম অনাহার।”

ডাক্তারদের অসৎ উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে লেখিকার প্রতিবাদ এখানে সোচ্চার।
ব্যক্তির সমস্যা এখানে সমষ্টির সমস্যার রূপান্তরিত হয়। জটি একদিন সাধনকে বলেছে —

“খুব বিয়ান বেলা সূর্য না উঠতে মা বলে ডেকে নিবি মা, দিনমানে ঠাকুরাণী।”

এই সংস্কারবোধ গড়ে উঠেছিল সাধনের মধ্যে। সেই জটি মৃত্যুপথযাত্রী ভয়ানক দুর্গন্ধ জটির ঘরে

—
“তত্তপোষে লালরঙের ময়লা চেলি পড়ে জটি ঠাকুরাণী রূপকথার রাক্ষসির মত চিৎ হয়ে পড়েছিল পেট ফুলে উঁচু, হাত-পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরাণীর চোখে শুধু আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল।”

এরপর জটির মৃত্যু ঘটে। সাধন ভোগে খাদ্য সংকটে। মায়ের শ্রাদ্ধের দিনে চোখের জলে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় সাধন —

“মা, তুমি যেমন তেমন করে স্বর্গে যাও সাধন এখন ভাত রৈঁধে খাবে তুমি দোষ নিওনা।”

মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দান হিসেবে পুরোহিতকে যে চাল দিয়েছিল পুরোহিতের দুর্ব্যবহার অগ্রাহ্য করে ক্ষুধায় কাতর সাধন ক্ষাপা মোষের মত পুরোহিতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রাদ্ধের চাল কটি কেড়ে নিয়েছিল।

সেই অল্পেই সাধন বেঁচে থাকতে চেয়েছে। ক্ষুধার্ত সাধন তার মাকে হারিয়ে সে একাই পথ চলতে চেয়েছে। মহাশ্বেতা দেবী আলোচ্য গল্পে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘ভাতুয়া’ মহাশ্বেতা দেবীর একটি উজ্জ্বল প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পে আমরা দেখি মহাজন কালীবাবুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হত। গল্পের নায়ক পবন সে সুদখোর চাষীদের শোষক কালীগড়াই-এর বাড়ীর ভাতুয়া। পবনের বাবা আটশো টাকা ধার নিয়েছিল গরাই-এর কাছ থেকে। এই টাকা ধার না নিলে তাদের জমি আর রক্ষা করতে পারতনা। কিন্তু গরীব বাবা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবেনা ভেবে তা ছোট ছেলে পবনকে ভাতুয়া করে তুলে দিল গরায়ের হাতে। তার বাৎসরিক মায়না হল ১২০ টাকা। একবেলা সে ভাত খেতে পারবে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বারোবছর পরে সে যে মাইনে পাবে সেই টাকা হাতে না দিয়ে ঋণ পরিশোধ হিসেবে কেটে নেবে। পবন হাঁস ও ছাগল চরাতো; ঘরের কাজ-কর্ম করে দিত। সাতবছর বয়স থেকে পবন হয়েছিল ভাতুয়া উনিশ বছরে সে ভাতুয়া থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু দেখা গেল পূর্বশর্ত না মেনে বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত গরাইদের ভাতুয়া হয়ে থাকতে হল পবনকে। পবনের বউকে গরাই ভাতুয়া করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে পবনের বউ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়,

“ভাতুয়া হব নাই গুলাম করে রেখে দিবে গ!

ভগীরথের বাপ মোরে জনম দুখ দিলে।”

কঠোর পরিশ্রম করতে করতে পবনের দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। পবনের ছেলে নকশাল নেতা অধরবাবুর স্কুলের ছাত্র। সে পিতার এই করুণ অবস্থা সহ্য করতে পারেনি। পড়াশোনার জন্য কেরোসিন আনতে গিয়েও সে বঞ্চিত হয়। কালী গরাই তার খাতিরের লোকদেরই কেরোসিন দেয়। ভগীরথ এজন্য প্রতিবাদ করে

“উ কুখা হতে পেল ?”

ভীতু পবন বিরোধ থেকে ছেলেকে বিরত থাকতে বলে। ছেলে পবনকে নকশাল নেতার স্মরণাপন্ন হতে বলে। অধরবাবুকে পবন বলতে চায়,

“ভাতুয়া টো, গুলাম টো করি দিচ্ছে বাপ — ভাতুয়া জীবন হতে বাহার করি আন্তি তুমি ভি পার না গ অধর বাবু।এত আইন দেখতেছ, ভাতুয়ার পরে আইন নাই।”

ভাতুয়াও তো মানুষ। সরকারকি ভেবেছে এই ভাতুয়াদের জীবনের যন্ত্রণাকে। ভগীরথ তার বাবাকে চক্ষু চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গিয়েছে। এই ভাতুয়া হল দাসদের মতো। ঋণের দায়ে পবন ভাতুয়া দাসে পরিণত হয়েছে। অথচ গড়াই তার চোখের চিকিৎসার জন্য এতটুকু দায়িত্ব পালন করেনি। পবন ২৪ ঘন্টার জন্য গোলামই থেকে গেল। ঋণ নিল তার বাবা অথচ পবনকে ভাতুয়াই থাকতে হল। ভগীরথ প্রতিবাদ করে —

“গরাই বাবু তুমারে বে-আইনে খাটাচ্ছে, মজুরি ভি হিসাবে কাটে নাই, উর করজ দশ দফা শুধে গিছে বুঝলা ? দশবার শুধছ তুমি। এসব ভেবে ভেবে অন্ধ হয়ে আসা পবন একটু একটু করে পালটাতে থাকে। একা একা বিড়বিড় করে সর্বক্ষণ। পরিবর্তিত পবনকে দেখে তার বউ ভয় পায়। ছেলেকে ডেকে বলে, ‘ইকেমুন হয়ে যেছেরে ভগীরথ?’

পবন ভাবে, ‘কত খাটলাম, বর্ষার আল ভাঙলে বান্‌তাম, তাতের কালে গরাই বাবুর মাথে ছাতা ধরে দৌড়াতাম।খালি গতরটা মাটি করি দিল, চখ দুটা —।’

— অথচ প্রতিশোধের তীব্র ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল বলেই সে অধরকে বলতে পেরেছিল তাকে বে-আইনীভাবে খাটিয়েনিচ্ছে। অধরবাবু ও ভগীরথ দু’জনেই পবনকে সচেতন করে তোলে। একদিন পবন গরাইবাবুর ধানের খেত দেখার জন্য এলে তাকে চোর বলে থানায় নিয়ে যেতে চায়। তখন পবন মনিবকে নির্ভয়ে জানায় —

“আজ দেড় কুড়ি বছর খাটি, তুমর সি আটসৎ টাকা উঠল

নাই, আমার কড়ারের টাক ভি দিলানা কুনোদিন.....বেআইনে

খাটায় নিছ বাবু। চক্ষু চলি যায়, কুনো বেবস্থা কর নাই।”

নির্দোষ পবনকে চোর বলে চিহ্নিত করায় সে উত্তেজিত হয়। সে মনিবের এত উপকার করেছিল, মনির বউয়ের চুরি করা হার সে উদ্ধার করেছে, মনিবের মানিব্যাগ হারিয়ে গেলে বহু চেষ্টা করে সে খুঁজে এনেছে। এছাড়া যখন নকশাল আন্দোলনের জেরে গরাই যখন আতঙ্কিত, তখন মনিবের গৃহ পাহারা দিয়েছে, মনিবপত্নীর সম্মান রক্ষা করেছে। আজ কিনা তাকেই বলছে চোর। এর প্রতিবাদ হিসেবে পবন গরাইদের টালের চাল দা দিয়ে কেটে ফেলে এবং ধান গুলো ভিজতে থাকে। এরপর মাথা হেঁট করে থাকা পবন, মাথা উঁচু করে চলতে থাকে —

“পবন আর একবারও পেছনে না চেয়ে মাথা উঁচু করে হেঁটে চলে গেল জামুগ্রাম থেকে। কালী গরাইকে অস্বীকার করে। মনিবকে অগ্রাহ্য করে। আর সে পবন ভাতুয়া নয়। আপন নাম সার্থক করা, পেছন ফিরে না — তাকানো, কেবলই মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে চলা এক অন্য মানুষ।”

‘মানত’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সমাজের সেই অন্ধকারময় কুসংস্কারে আবদ্ধ বিষয়গুলির বিরুদ্ধে লেখিকা তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে সমাজ চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। যারা নিরক্ষর, সহজ-সরল এবং শ্রম করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে এমনি একটি নারীচরিত্র যে সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। সন্তান হারানোর পেছনে প্রতিবেশীরা অনেকটাই দায়ী। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অসুস্থ সন্তানের মৃত্যুর পথকে তারা তরান্বিত করেছিল। এছাড়া মৃত্যুর জন্য দায়ী আর-ও অনেকে। সমাজ যেখানে নীতিভ্রষ্ট, মন্দিরের পাণ্ডাদের দৌরাত্ম্য এবং তাদের বুজরুকি দেখিয়ে লোককে প্রতারিত করা প্রভৃতি প্রসঙ্গ সন্তানটির মৃত্যুর কারণ। লেখিকা আলোচ্য গল্পে এভাবেই অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘সংরক্ষণ’ মহাশ্বেতা দেবীর একটি শ্লেষাত্মক গল্প। তৎকালীন প্রশাসনযন্ত্রের দুর্বলতার বিরুদ্ধে এই গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছেন লেখিকা। প্রশাসনের নির্দেশানুসারে অরণ্যের ইউক্যালিপটাসের বন কেটে ফেলা হয়। অথচ সেই গভীর বনে হাতির ছিল অবাধ বিচরণ সেখান থেকে তারা খাদ্য সংগ্রহ করে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে বিচরণ করত। কিন্তু এমন ধ্বংসের কারণে বন্য হাতিরা অস্বস্তিতে পড়ে। তারা বেরিয়ে আসে লোকালয়ে সেই হয় জঙ্গল হাতিশূন্য। এভাবে অরণ্য ধ্বংস করে বন্য পশুর সংরক্ষণের অন্তরায় সৃষ্টি মূলত প্রশাসনিক ত্রুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রশাসনের এই অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

নারী ধর্ষণের বিরুদ্ধে লেখা মহাশ্বেতা দেবীর ‘এজাহার’ একটি অন্যতম গল্প। মুসাম্মিন নামে একটি সহজ, সরল মেয়েকে মিথ্যে সন্দেহের বশবর্তী হলে পুলিশ প্রশাসন পাশবিকভাবে ধর্ষণ করে এবং তার জীবন বিষময় করে তোলে। এর আগে পল্টন নামে এক মস্তান মুসাম্মিনকে বলপূর্বক

উঠিয়ে আনে। তারপর পল্টন, মহিন্দর ও লছমন নামে সমাজ বিরোধীরা একাধিক বার করে সরলা, অপাপবিদ্ধা, শান্তিপ্রিয়া মুসাম্মিনকে ধর্ষণ চালিয়ে থানায় তার বিরুদ্ধে এজাহার দিতে আসে। পুলিশ প্রশাসন থানায় তুলে দেওয়া লোকদের বিরুদ্ধে কোনরূপ জিজ্ঞাসা না করে নির্দোষকে দোষী এবং দোষীকে নির্দোষ হিসেবে প্রতিপন্ন করে। এই পুলিশ প্রশাসন ও মস্তানরা একটি মুদ্রার এ-পিঠ ও ও-পিঠ। তাদের চরিত্রের কোনো পার্থক্য নেই তারাও একদোষে দুষ্ট। মস্তানদের উদ্দেশ্য করে পুলিশি প্রশাসন জানায় —

“.....চতুর্বেদী দারোগা বলে, রেখে যান। আমাকে তো এর ইজাহার নিতে হবে। পল্টন ও তার মস্তানরা খুব হাসল। বলল, হাঁ হাঁ, নিন। আমরা তো দো-তিন দফে করে একেক জন ইজাহার নিলাম। খুব ভালো ইজাহার দেয়। একটু হাত-পা বেঁধে ইজাহার নিবেন, তাতে মজা উঠবে।”

গল্পের প্রতিবাদী নারী চরিত্র মুসাম্মিন পুলিশ ও মস্তানদের মধ্যে এজাহার সম্পর্কে কথোপকথন শুনে স্পষ্ট ভাষায় জানায় —

“ধরম নাশ করে বলাওতি করার নাম ইজাহার নেওয়া সে কথা সেদিন প্রথম শুনলাম। তারপরও মুসাম্মিন বলে চলে — ‘.....আধা রাত নিজে ইজাহার নিল এ।তারপরআমাকে তুলে দেয় হেড কনস্টেবলের হাতে। বলে, আভি তুইসাস ইজাহার লে। তুইতো ব্রাহ্মণ। কাল অন্য সেপাইদের দিব, আমি কী করব ? আমি তো নাজা, আমার তো হাত-পা বাঁধা। তখনও হেড সিপাহী লি ইজাহার। দফে দফে। হম বেহৌশ।”

দীর্ঘ সময় ধরে পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়ে মুসাম্মিন নামে মেয়েটির যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন তার হাতের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে। তারপর নারীর ইজ্জত হরণকারী হেডকনস্টেবলের পাশে পড়ে থাকা কাঁচের টুকরো দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলে। এভাবে তার অপমানের প্রতিশোধ নেয়। শান্তি-শৃঙ্খলার নামে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহিণী নারীদের জ্বালাময়ী ভাষা একমাত্র মহাশ্বেতা দেবীর কলমেই বলসে উঠেছে।

জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মহাশ্বেতা দেবীর অন্যতম গল্প ‘হারুন সালেমের মাসি’। ‘সুন্যদায়িনী ও অন্যান্য গল্প’ সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই গল্পটির প্রধান দুটি চরিত্র হল হারুন সালেম এবং তার মাসি গৌরবী। একজন মুসলমান অপরজন হিন্দু। মাতৃত্ববোধ সবধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে এই সত্য কথাটি লেখিকা এই গল্পে তুলে ধরেছেন।

গৌরবীর প্রতিদ্বন্দ্বী তার একমাত্র গর্ভজাত সন্তান নিবারণ। সে গৌরবীকে ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে একটি কারখানায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। জাতিতে মুসলমান কাঙাল ও আয়েছা বিবির একমাত্র পুত্র হারা। যার পুরো নাম হারুন সালেম। অল্প বয়সেই সে পিতৃ ও মাতৃহারা হয়। আয়েছা বিবিও গৌরবীর মতো শাকপাতা বিক্রয় করে অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করত। আয়েছা ছিল গৌরবীর প্রতিবেশী। হারা গৌরবীকে মাসি বলে ডাকত।

একদিন সকলাবেলা হারা গৌরবীকে খবর দেয় —

“মা ললে না মাসি। মা রা দেয় না।”

মার মৃত্যুর পর হারা তার কাকার দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মাসি গৌরবীর কাছে চলে আসে। গৌরবী ভেবেছিল —

জন্য। নিজ পুত্রের অভাব সে পূরণ করে হারাকে পেয়ে। আর গৌরবী হারার মার কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছিল। সেই ঋণ পরিশোধ এবং মাতৃত্বভাব জাগ্রত হবার ফলে গৌরবী হারাকে আশ্রয় দিয়েছিল। মৌলবাদীর মতো যশি গৌরবীকে পরামর্শ দেয় —

“সাতকূলে কেউ নেই, আমার ভরসায় ছেলে রেখে চোখ বুজল। এখন জাত বা কেমন করে থাকে, ধর্মের বা কী হয়।”

কিন্তু গৌরবীর করুণা জাগ্রত হয় হারার জন্য। নিজ পুত্রের অভাব সে পূরণ করে হারাকে পেয়ে। আর গৌরবী হারার মার কাছ থেকেও সাহায্য পেয়েছিল। সেই ঋণ পরিশোধ এবং মাতৃত্বভাব জাগ্রত হবার ফলে গৌরবী হারাকে আশ্রয় দিয়েছিল। মৌলবাদীর মতো যশি গৌরবীকে পরামর্শ দেয় —

“খাওয়া দাওয়া ছোঁয়া নেপা ছিষ্টি কোরোনা মাসি।”

হারাকে শহরে ছেড়ে আসার বুদ্ধি দেয় যশি। গৌরবী এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। সাম্প্রদায়িক ধর্মাত্মক সে নয়। তার কাছে ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত বিরোধ বড় হয়ে ওঠে নি। হারাকে লালন পালন করবার জন্য গৌরবী যশির কাছে লাক্ষিত হয়েছে, পুত্র নিবারণ তাকে অপমান করেছে, লাক্ষিতা হয়েছে মুকুন্দের কাছেও। হিন্দু-মুসলমানের সঙ্গে সহাবস্থান গ্রামের সঙ্কীর্ণ লোকেরা ভালো চোখে দেখেনি। অতঃপর গৌরবী হারাকে নিয়ে শহরে চলে আসে —

গৌরবী আর হারার সমাজ অনেক বড়ো। সমুদ্রের মতো। সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোনো ভয় থাকেনা।” মাতৃত্বের কাছে জাতপাত কিছু নেই। মাতৃত্বের গৌরবে গৌরবী অনন্যা।

‘লড়াই’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ভদ্র শবরের নেতৃত্বে বঞ্চিত শবর শ্রেণির লোকেরা ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। তাদের এই দাবি মিটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘ডাইনী’ গল্পে নিরক্ষর আদিবাসী সমাজের কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। ডাইনি সম্পর্কে অন্ত্যজদের মধ্যে একটি বদ্ধমূল সংস্কার দানা বেঁধেছিল। ডাইনিদের কুদৃষ্টি পড়লে দেশে মন্বন্তর শুরু হয়, বন্যা, খরা, দেখা দেয়, শস্যহানি ঘটে, ছেলেমেয়েদের প্রাণ নষ্ট হয়, গর্ভবতী মেয়েদের গর্ভে ডাইনি প্রবেশ করে ডাইনির বংশবৃদ্ধি ঘটায়। এই ডাইনির উপরে ভূত-পিশাচ ভর করে এধরনের ক্ষতি করে থাকে।

হনুমান মিশ্র জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি গঞ্জ দোসাদ ধোবী, ওঁরাও ও মুন্ডাদের বোঝাতে থাকেন তাদের পাপাচারের ফলেই ডাইনির আগমন ঘটেছে। এই আতঙ্ক হেসাড়ি, চাই টুরা, কুরুড়া প্রভৃতি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই অন্ত্যজ শ্রেণির ডাইনির আগমনকে কেন্দ্র করে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। তারা নিজেদের মধ্যে কে ডাইনি সেটা অনুসন্ধান করতে থাকে। হনুমান মিশ্র এটাও জানিয়ে দেয় ডাইনিকে হত্যা না করে পাথর দিয়ে ঢিল ছুঁড়ে আগুনের ভয় দেখিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে জিলাদের মাঠে তাড়িয়ে দিতে হবে।

সহজ সরল আদিবাসীদের মধ্যে যারা সাহসী তারা একত্র হয়ে – বহু প্রচেষ্টা চালানোর পর তারা বুঝতে পারে ডাইনির কোন অস্তিত্ব নেই, এটা মিথ্যা গুজব মাত্র। পরে আসল সত্য আবিষ্কৃত হয়। টুরা পহানের মেয়ের নাম সোমরি। তাকেই ডাইনি বলে মিথ্যা অভিযুক্ত করা হয়েছে। সে আসলে ডাইনি নয়। হনুমান মিশ্রের এটি একটি অপকৌশল মাত্র। হনুমান মিশ্রের লম্পট ছেলে বোবা অসহায় সোমরিকে গর্ভবতী করে। এই সংবাদ জানার পর হনুমান মিশ্র সোমরিকে ডাইনি বলে মিথ্যে গুজব ছড়িয়ে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে বলে।

পরে আসল সত্য প্রকাশিত হলে আদিবাসী শ্রেণির হনুমান মিশ্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এভাবে সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ করা হয়। মহাশ্বেতা দেবী এভাবেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে সমাজ পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

সমাজে যাদের অর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে –যারা উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ তাদের অপরাধপ্রবণতার বিরুদ্ধে মহাশ্বেতাদেবী ‘ধৌলী’ গল্পটি লিখেছেন। এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র ধৌলী এবং পুরুষ চরিত্র মিশ্রলাল- সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। সহজ সরল আদিবাসী মেয়ে ধৌলীকে মিশ্রলাল বধ্বনা করে।

ধৌলী বিধবা। ছোট বেলায় তার বাবা মা বিয়ে দিয়েছিল এক পাত্রের সঙ্গে। পাত্রটি বিয়ের পর ধৌলীর উপর অকথা অত্যাচার করতো। হঠাৎ একদিন কঠিন জ্বরে ধৌলীর স্বামীর মৃত্যু ঘটে। তারপর তার ভাসুরের কুনজরে পরে ধৌলী। নারীর মান মর্যাদ রক্ষার্থে সে শৃঙ্গুরবাড়ি ছেড়ে চলে আসে মায়ের কাছে। ধীরে ধীরে যৌবনের আগমন ঘটে। ধৌলীর সুদৃশ্য চোখ, তনু দেহ, পদ্মসদৃশ স্তন্যগলই তার শত্রু।

দোসাদ বালবিধবা মেয়ে ধৌলী ও ব্রাহ্মণ মিশ্রলালের প্রেমের অভিনয় এই গল্পের প্রতিপাদ্য বিষয়। মিশ্রলাল ফর্সা যুবক। বুঝারের মেলা থেকে একাকি ফেরার পথে ধৌলীকে দেখে প্রেম নিবেদন করে মিশ্রলাল। প্রথমে ধৌলী ভয় পেলেও দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে মিশ্রলালের কাছে ধরা দেয়। কিন্তু মিশ্রলাল প্রেমের অভিনয় করে যায়। তার সঙ্গে ধৌলীর দৈহিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মিশ্রলাল কামভূষণ পূরণ করে। ধৌলী সরল বিশ্বাস নিয়ে মিশ্রলালকে দেহ দান করে। অল্প

দিনের মধ্যেই সে গর্ভবতী হয়। এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণ মিশ্রলাল বাবার হুমকিতে ধৌলীর কাছ থেকে অন্যত্র পালিয়ে যায় তার কুকীর্তি ঢাকবার জন্য। পরে দোসাদদের চাপে পড়ে মিশ্রলাল ধৌলীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়। বিয়ের দুমাস ভালোভাবেই কাটছিল। ধৌলীর মা - ধৌলীর পেটের সন্তানকে নষ্ট করতে বলে। ধৌলী তা অস্বীকার করে। ধৌলীর ছেলে ভূমিষ্ঠ হলে ছেলেকে ফেলে রেখে তাকে রাঁচি যেতে হয়েছিল পতিতালয়ে নাম লেখার জন্য। পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করতে ধৌলী গভীর যন্ত্রণায় দক্ষ হতে থাকে।

ধৌলীর এই করুণ পরিণতির জন্য দায়ী ব্রাহ্মণ তনয় মিশ্রলাল। ধৌলী সমাজের চোখে দোষী হলেও আমাদের প্রশ্ন ধৌলী কি সত্যই দোষী। যে প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য মিশ্রলাল ধৌলীকে নরকের দিকে ঠেলে দিয়েছে - সেই মিশ্রলালের কোন বিচার হয় নি - সে কোনো শাস্তি পায়নি। তার অপরাধ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সমাজের যারা প্রতিভূ জনবলের জোড়ে যারা অপরের ক্ষতি করে চলেছে তাদের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর 'শিকার' একটি সমান প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকা মেরী। প্রতিশোধকামী এই নারীচরিত্রটি একটি মূর্তিমান প্রতিবাদ। সে কুরুডা গ্রামের এক আদিবাসী কন্যা। ওঁরাও শ্রেণিভুক্ত এই মেয়েটির জন্মবৃত্তান্ত রহস্যজনক। সবাই মনে করে মেরী ওর বাবার সন্তান নয়। এক ইংরেজ সাহেবের ওঁরসে ওঁরাও মায়ের গর্ভে তার জন্ম হয়। মেরী কুরুডার জীবন যাত্রাকে মেনে নিলেও মেরীকে কোন আদিবাসী বিয়ে করতে চায়নি। তাকে কেউ ভালোবাসলে সে নিজেকে ধন্য বলে মনে করত। কিন্তু তার ভাগ্যে সেটা জোটেনি। অবশেষে মেরী নিজে পছন্দ করে জালিম নামে এক মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করবে স্থির করে। কিন্তু তশীলদার সিং নামে একব্যক্তি জোরকরে মেরীকে পেতে চায়। মেরী কখনো শান্ত কখনো অশান্ত কখনো মধুর কখনো ভয়ানক। জন্মবৃত্তান্তহীন মেরীর মনে একটা ক্ষোভ ছিল। যখন বিহারের আদিবাসীদের মধ্যে বাৎসরিক শিকার পরব অনুষ্ঠিত হত যা ন্যায় বিচারের উৎসব হিসাবে পরিচিত সেখানে সমাজপতিরা অপরাধীদের ন্যায় বিচার করত।

এমনি একটি মেয়েকে শিকার পরবে দেখেছিলেন মহাশ্বেতা দেবী যার গায়েররং ফরসা হলদে শাড়ী পড়ে মোষের পিঠে সে বসেছিল আখ ও ভুট্টার খই সে খাচ্ছিল। পান ও বিড়ির প্রতি সে ছিল আসক্ত। এই পরবের গান একমনে শুনছে একটি মেয়ে। এই সত্য ঘটনা অবলম্বন করে লেখিকা আলোচ্য গল্পের মেরী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মেরীর প্রতিশোধকামী মন তশীলদার সিংকে যোগ্য জবাব দিয়েছিল। তশীলদারকে ধারালো ছুরিকা দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফলে দিয়েছিল একটি খাদে তারপর সে চলে যায় মুসলমান প্রণয়ী জালিমের কাছে। মেরী ছিল সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী তার পবিত্র প্রেমের উপর যে অধিকার অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী নারী মেরী যে ঘটনাটি করেছিল তা কার্যকর সূত্রে আবদ্ধ। তশীলদার প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিনিধি হলেও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মেরী ছাড়ে নি।

‘শ্রী শ্রী গণেশ মহিমা’ গল্পে মহাশ্বেতা দেবী লছিমা নামে একটি নারীর অপমানিত মাতৃত্ব এবং অন্যায় বৈধব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। লছিমা এক অন্ত্যজ রমণী। নারী হিসেবে তার একটি বিশেষ সম্মান আছে। কিন্তু মেদেনী সিং এর মতো স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের নিষ্ঠুরতায় লেখিকা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। অর্থবান রাজকর্মচারী মেদেনী নারায়ণের পুত্র গণেশ সিং। গণেশের জন্মের পর তাকে লালন পালন করবার জন্য মেদেনী সিং লছিমাকে বন্দী করে গৃহে আনে। মেদেনীর সংসারে সে শ্রম দিয়ে দেহ দিয়েও মেদেনীর মনের মানুষ হতে পারেনি। যে লছিমা মোহরকে বিয়ে করে ভবিষ্যতে সুখের জীবন কাটাতে চেয়েছিল মেদেনী সিং এর জন্য তার স্বপ্ন-ভঙ্গ ঘটে। মাতৃহীন গণেশকে যে লছিমা বুকের দুধ খাইয়ে বড় করে তুলেছিল লছিমার প্রতি তার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জন্মায়নি। মেদেনী সিং, গণেশ সিং ও বরকন্দাজ সিংরা লছিমার মত হরিজন রমণীকে রাখনি করে দৈহিক ক্ষুধা নিবৃত্তি করে কখনো বা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মতো হরিজন রমণীদের নেই কোন শক্তি। এই কুখ্যাত ব্যক্তিদের স্বার্থে আঘাত ঘটলে হরিজন বস্তি একের পর এক জ্বালিয়ে দেয়। এভাবে অত্যাচার চালিয়েও তারা সমাজের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন বিদ্রোহের বহিঃশিখা জ্বলে ওঠে হরিজনদের মধ্যে গণেশের অত্যাচার যখন সীমা লঙ্ঘন করে যায়, অপমানিত লছিমা সে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসে গণেশকে সে হত্যা করে। আলোচ্য গল্পে নির্যাতিতা নারীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন লেখিকা ক্ষুরধার লেখনীর মধ্য দিয়ে।

সামন্তান্ত্রিক মূল্যবোধের নগ্নরূপ জাতিগত অভিমান ধর্মবিদ্বেষ ও জাতপাতের বিভাজনের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবীর এক অনবদ্য গল্প ‘জগমোহনের মৃত্যু’। জগমোহন অজ্ঞ অশিক্ষিত ও অন্ত্যজ মানুষদের কিভাবে ভুল বুঝিয়ে শোষণ করত তার বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য জগমোহনের মতো মালিকেরা দায়ী করে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের। তাদের পাপেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। যজ্ঞানুষ্ঠান করবার জন্য দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণকে টাকা তুলে দিলে পাপ খণ্ডিত হবে। তারা সাধারণ মানুষদের অর্থ ঋণ দিয়ে খত লিখিয়ে নিয়ে চালিয়ে যায় শোষণ। এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে বালকৃষ্ণের মতো লোকেরা প্রতিবাদ জানায় ফলস্বরূপ তাকে মরতে হয় ব্রীজমোহন বা মিশ্রজীদের হাতে। এইসব প্রভাব প্রতিপত্তিশালী সমাজের ধারক ও বাহকেরা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। তাদের কথা পুলিশ মেনে চলে। যারা অত্যাচারিত তারা নালিশ জানাতে ভয় পায়। শোষিত ও নির্যাতিত মানুষেরা দাঁড়াতে পারেনা মেরুদণ্ড সোজা করে অশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাস এদের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। এদের পিঠে চাবুকের আঘাত পড়ে অনেকে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারায়। অনাহারে এদের দিন কাটাতে হয়। ছোটলোকরা ছোটলোকই থাকবে তারা কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেনা।

তৎকালীন জগমোহনের মত মানুষেরা এই মতবাদে বিশ্বাসী। যেদিন এক ঝালোক

ছেলে এতোয়া লেখাপড়া শিখতে আগ্রহী হল গোপনে তার আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এতোয়ার পড়াশুনা করবার আগ্রহের জন্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। এর কারণ হিসেবে লেখিকা স্পষ্ট জানিয়েছেন —

“কুন্দন ঝালোকে বলল, এ মহল্লার ছত্রিশটা গ্রামের মধ্যে কোনদিন আমরা গঞ্জ — দোসাদকে সরকারী ব্যবস্থায় স্কুলে পড়তে দিইনি, আজও দেবনা। উনাখারা বাত ভুলে জা। গঞ্জ পড়বে। তাহলে তো জুতিসে ছাতা বনত, মানুষ মাথায় দিত।”

একদিন আদিবাসী সমাজে জগমোহনরূপী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঘোষিত হয়। পরিশেষে জগমোহনকে মরতে হয় তাদের হাতে এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সমাজের ধারক ও বাহকদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মহাশ্বেতা দেবীর ‘নৈঋতে মেঘ’ গল্প সংকলনের ‘নুন’ একটি প্রতিবাদী গল্প জোতদার ও মহাজনেরা মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে নুনের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে করে খেত। আদিবাসী দোসাদদের সঙ্গে এই জোতদার মহাজনদের কোন কারণে বিরোধী গুরু হয় তার ফলস্বরূপ দোসাদদের সায়েস্তা করবার জন্য তারা ফন্দী করে। উত্তমচাঁদ নামে এক মহাজন দোসাদদের নুন বিক্রি বন্ধ করে দেয়, এরফলে দোসাদ অঞ্চলে লবণের সংকট গুরু হয়। হাতির জন্য সঞ্চয় করে রাখা লবণ এবং মাটির সঙ্গে মিশে থাকা লবণ সংগ্রহ করে দোসাদরা লবণের অভাব পূরণ করে। এই গল্পে লবণকে কেন্দ্র করে মানুষ ও মনুষ্যতর প্রাণীকে সমশ্রেণীভুক্ত দেখানো হয়েছে।

এছাড়া ‘শিবা’, ‘এম.ডব্লু. বনাম লখিন্দর’, ‘জল’, ‘বেহুলা’, ‘কান্না’, ‘অবলা’, ‘সরলা’, ‘বিস্ময়’, ‘জানোয়ার’, ‘অপারেশন-বাকুলি’, ‘ঘর’, ‘ওরা’, ‘শূন্য স্থান পূর্ণকর’, ‘পাপের উৎস সন্ধান’, ‘টোটকা’, ‘পরবাসী’, ‘কমলালয়’, ‘তীর : ১৯৯৩ : আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ’, ‘কুসুমা’, ‘মৃত্যুর কারণ’, ‘পণ্যা’ প্রভৃতি গল্পেও মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন।

নবনীতা দেবসেনের প্রতিবাদী চেতনা যুক্ত গল্প গুলোর মধ্যে ‘ধর্মভাই’ অন্যতম। এই প্রতিবাদ সামাজিকতার বিরুদ্ধে, ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই গল্পে দেখা যায় একটি খুনের ঘটনা এবং এই খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে নানান চরিত্র। পুলিশ সোমেশ এই খুনের তদন্তকারী অফিসার। সে তার বন্ধু দীপেন ও তার স্ত্রী রঞ্জনার কাছে গল্পটি বলছে জমিয়ে।

যে লোকটি খুন হয়েছ তার অবস্থা ভালো। কিছু তার দোষ এই যে কুলীন জামাইয়ের মত সে ছ’সাত খানা বিয়ে করেছে। কিন্তু বিয়ে করা মাত্রই সে তার পুরোনো বউদের খরচ যোগানোতো দূরের কথা তাদের খোঁজ-খবরও করে না। সব মিলিয়ে সন্তান সংখ্যা ডজন খানেক। আবার কোন জায়গায় পাত্রীর সন্ধান পেলে বিবাহ উন্মত্ত হয়ে ওঠে। যে গ্রামে খুন হয়েছিল

সেই গ্রামেও তার একটি শৃঙ্গুরবাড়ি আছে। সেখানেও ঐ একই অবস্থা স্ত্রীর কোঁজখবর করে না। তাই সেই স্ত্রী বাপের বাড়ীতে থাকে। কিন্তু যেদিন লোকটি খুন হয়, সেদিন তার শৃঙ্গুর বাড়ির কেউ ছিল না। ইতিমধ্যে সে এই গ্রামেই আরেকটি মেয়ের সন্ধান পেয়েছে। তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য নানান উপহার সামগ্রী দিয়েছে। হারুর সেই হাবা বোকাবোকা বোনটিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সে উঠেপড়ে লেগেছে। এমনি একদিন গ্রামে যাত্রা হচ্ছিল। এই যাত্রা দেখতে গ্রামের সবাই গেছে। হারুরও তার বোনকে শাস্তি দিতে তাকে ঘরে বন্ধ করে যাত্রা দেখতে গেছে। আর ঐ ‘বদ’ লোকটা যেই দেখেছে হারুর যাত্রা দেখতে এসেছে, তখনই সে আর বিলম্ব না করে ছুটে গেছে হারুর বোনের কাছে। হারুর গিয়ে পালান অর্থাৎ ‘বদ’ লোকটার শৃঙ্গুরকে সব জানালে পালানও হারুর বাড়িতে দৌড়ে যায় এবং ‘হাঁসুয়া’ দিয়ে জামাইয়ের খুন করে। পালান মেয়ের বৈধব্যের জন্য দায়ী হলেও সমাজকে রক্ষা করেছিল একটি শয়তান, বদ লোকের হাত থেকে। যার ফলে উপকৃত হয়েছিল গ্রামবাসী। তার এই যে প্রতিবাদ তা সোচ্চার প্রতিবাদ। তাই পালান খুনের স্বীকারোক্তি জানায় —

“আমার মেইয়্যাটার সর্বোনাশ কইরেও উয়ার হয় নাই

বাবু, আবার হতভাগা নেগেছে বোকাহাবা এটা সরল মেইয়্যার সর্বোনাশ করতি।

আমি আর থাকতি পারলামনি বাবুমশায় — আর থাকতি পারলামনি।”

নবনীতা দেবসেনের ‘দেশে যাওয়া’ গল্পটির মধ্যে ভিন্নধরনের প্রতিবাদ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই প্রতিবাদ নীরব। কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজের বিরুদ্ধে নয়। এ নীরব প্রতিবাদ কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা কালচার এর বিরুদ্ধে। এ প্রতিবাদ কলকাতা এবং কলকাতা নগরীর সাহেবীয়ানার বিরুদ্ধে। তাই কানাডাতে বসে একজন গৃহবধু স্পষ্টতই জানাচ্ছে যে —

“তাই বলছি, সামনের বছর দেশে যাবেনা। মেবিক্রকো, মরক্কো, যেখানে হোক একটা কোন অচেনা জায়গায় বেড়াতে যাবো, যেখানে আমার দেশের লোক কেউ থাকবে না, যেখানে আমার কলকাতা নেই, যেখানে গেলে আমার কান্না পাবে না।”

‘দেশে যাওয়া’ গল্পটিতে রয়েছে চাপা ক্ষোভ। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ কলকাতার হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি, আচার আচরণের বর্ণনা রয়েছে। বিদেশে থাকা একটি পরিবার প্রতিবছরই কলকাতায় আসে আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে কম্পিটিশন লেগে যায় কে তাদের কত বেশি পদ করে খাওয়ালো, কারা তাদের নিমিত্তে কতজন লোক খাওয়ালো। কিন্তু তারা যে আসে দেশে ফিরে দেশের মানুষর মতন করে থাকতে এদিকে কেউ নজর না দিয়ে তারা বিলেতি আতিথেয়তায় মত্ত হয়ে ওঠে।

আবার আত্মীয় পরিজনদের আশার বা চাওয়ারও শেষ নেই। বড় ভাগ্নে কিরণ আবদার করে বসে ন’লাখ টাকার একটি আধুনিক ফ্ল্যাট কিনবার নিমিত্ত। সে বলে —

“বালিগঞ্জে একটা ভাল ফ্ল্যাট আছে মামা, দশলাখে দেবে বলেছে। টাকাটা দিয়ে দাও, তোমার কাছে তো কিছুই না, কিনে ফেলি।”

নন্দপুরের দিকে গল্পকথকের খানিকটা জমি আছে। সবাই জোর করছে তাদের ন’কাঠা জমি দেওরদের বা ননদদের ছেলেদের নামে লিখে দেবার জন্য। কথকের অর্থাৎ প্রবাসী বাঙালি গৃহবধূটির বড় ননদ বললেন —

“তোমরা তো ফিরবে না — ওই জমিটুকুমাত্র ন’কাঠা, কতটুকুই বা দাম হবে ডলারে, ওটা খোকনের নামে লিখে দাও। তোমার শ্বশুরের বড় নাতি। হলেই বা দৌতুর।

ভাসুরপোরা তো ধরেই নিয়েছে সবমিলিয়ে তাদের আঠারো কাঠা জমি চার ভাসুরপো ভাগ করে নেবে। আর তিনজন দেওর বলছে তাদেরকে জমিটা দিয়ে দিতে। আবার তার উপর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুরা বলেছে —

“কাউকে দিওনা, পাগল প্রমোটারকে দাও। ফ্ল্যাটবাড়ি বানাবে। ন’কাঠা অনেকখানি জমি, ওতে বিরাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং হবে। তাতে করে যা তোমার রোজগার হবে, বুড়ো বয়সে দেশে এসে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকতে পারবে। অবশ্য তোমার তো দুজনেই ডাক্তার, ডাক্তারদের তো আমরণ রোজগার বন্ধ হয় না।”

কথকের ভাবে এ-এক নতুন অন্তঃসারশূণ্য কলকাতা, এখানে খালি কার কী নতুন গাড়ি হল, কার কোথায় কতগুলো ফ্ল্যাট হল, শাড়ি, গয়না, কাজের লোক। এই কি কালচারাল ক্যাপিটাল অব ইন্ডিয়ার নমুনা।

এভাবেই কলকাতা এবং সেখানকা বসবাসকারী বাঙালির কিভাবে তাদের সহজ-সরল জীবন থেকে সরে যাচ্ছে। কেবলমাত্র স্বার্থ, রেশারেশি হিংসা মানুষগুলোকে পাণ্টে দিচ্ছে তারই একটি জীবন্ত চিত্র এঁকেছেন লেখিকা এবং এই চিরপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্য ভুলে যাবার বিরুদ্ধে নম্রপ্রতিবাদ জানিয়েছেন — “অথচ আমাদের কলকাতা এরকম ছিল না। আমি সেই কলকাতাটাতে যতই ফিরতে চেষ্টা করি, সেটা আমার কাছ থেকে ততই দূরে সরে যায়।

নবনীতা দেবসেনের ‘ভালোবাসা করে কয়’ গল্প গ্রন্থের ‘মহানায়ক সুরজিৎদা’ গল্পে সুরজিৎদার সঙ্গে পাপিয়া বৌদির কথোপকথনের মধ্যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে। অর্থনৈতির মহাসংকট যখন শুরু হয় তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। মাছ, তেল, শাক-সবজি, মশলা-পাতি, সাবান, মাজন নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম এছাড়া জর্দা, দেশলাই, কেরোসিন, দুধ প্রভৃতির দাম প্রতিনিয়ত বেড়ে চলে। এই মূল্যবৃদ্ধি রুখতে না পারলে কালোবাজারিদের দৌরাণ্ড্য বেড়ে যাবে। অकारणे দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে লেখিকা সরব হয়েছেন।

‘ভালোবাসা করে কয়’ গল্পে নবনীতা দেবসেন ভালোবাসাকে অমর করে রাখবার

জন্য বিবাহের ওপর বীতশ্রদ্ধ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। মানুষের জীবনে প্রেমের গুরুত্ব সর্বাধিক। দিবাকর ও মন্দাকিনীর মধ্যে প্রেম বিষয়ে আলোচনায় একথাই প্রকাশ পেয়েছে, যে অনেক প্রেমের জন্যই বেঁচে থাকে। এই প্রেম হল একজন মানুষের জন্য আর একজন মানুষের হৃদয়ের ব্যাকুলতা। প্রেমিক-প্রেমিকাকে চোখে দেখার জন্য, তার কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য কিংবা তার স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হয়। দিবাস্থপ্নে কিংবা স্বপ্নে একে অপরকে দেখে এবং প্রতিনিয়তই একে অপরের কথাভাবে তাই হল প্রেম। প্রেম বিষয়টি অনেকটা রোমান্টিক। মন্দা দিবাকরকে জানিয়েছে,

“প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাজক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই প্রেম বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেই প্রেমে এল, তৃপ্ত হল, অমনি সুপ্তিও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন খুব বোরিং।”

এই বক্তব্যের মধ্যে লেখিকা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন প্রেম অনেকটা সূর্য-এর মতো এর উদয় ও অস্ত দুই-ই আছে তবুও বিবাহিত জীবনের প্রেম তারচেয়ে অবিবাহিতের প্রেম, অনেক বেশি সার্থক।

‘মেজদির কেছা’ নবনীতা দেবসেনের একটি অন্যতম গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মেজদি চরিত্রটি। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তার বিবাহ হয় তিরিশ বর্ষীয় এক যুবকের সঙ্গে। স্ত্রী, স্বামীকে প্রথম পুরুষে সম্বোধন করত অর্থাৎ ‘আপনি’ বলে। প্রতিবেশিনী বুলু এই অদ্ভুত সম্বোধনের কারণ জানতে চাইলে মেজদি জানায় —

“বাড়ির ছোটমেয়ে, হঠাৎ অন্য বাড়িতে গিয়ে অতবড় দামড়া অচেনা লোকটাকে গায়ে পড়ে ‘ওগো-হ্যাঁগো-তুমি কি কচ্চো গো’ বলতে পারে ? ফলে এজীবনে আমার আর ‘ওগো-হ্যাঁগো’ বলাই হল না। ‘এই যে’, ‘শুনুন’, ‘শুনচেন’ বড়জোড় ‘ও মশাই পর্যন্ত’।”

এরূপ সম্বোধন তার খুব একটা পছন্দের ছিল বলে মনে হয় না। তাই বড় ছেলের বউকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন — “আমার শুনে শুনে তুমিও যেন আমার ছেলেক আপনি আঙে কোর না বাপু। স্বামী-স্ত্রীতে ওরকম ডাক শুনতে বড্ড বিচ্ছিরি শুকনো লাগে।”

— অথচ স্বামীকে কখনও ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করেনি। কেননা এবিষয়ে স্বামীর তরফ থেকে কোন জোর আসেনি। তাই অভিমান বশত মেজদি নিজের জেদ থেকে এক পা সরে দাঁড়ায়নি। বরং প্রতিবাদ জানিয়েছে, বুলু যখন বলে জামাইবারু এখন যদি তুমি বলতে বলে, উত্তরে সে জানায় — “এখন, এখন.....না পারলেও, বলব না।”

নবনীতা দেবসেন রচিত ‘মোসোমশায়ের কন্যাদায়’ নামক গল্পে দেখা যায় এক বিয়ে বাড়িতে পরিবেশে। বাড়ির কর্তা অর্থাৎ কন্যার পিতা মোসোমশায় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কাজের তদারকি করছেন। তার অদ্ভুত আচরণের জন্য স্ত্রী অস্বস্তিবোধ করে, সকলের সামনে লজ্জাও পায়।

“ক্যান ? লজ্জার হইলটা কী শুনি ? চিংড়িমাছ খাওয়াইতে না পারলেই লজ্জা ? এইয়ার মধ্যে লজ্জার আছটা কী।”

কিন্তু লজ্জার কারণ লুকিয়ে না রেখে জানায়, “লজ্জার এই যে, তোমার বাক্য শুনে সকলে ভাবলো যে চিংড়ি থাকা সত্ত্বেও আমরা ইচ্ছে করেই এই বাচে ওটা দিলুম না। এটাই ভাবলো সকলে। ছিঃ ছিঃ।”

মেসোমশাই জোর করে উপবাসী মেয়েকে একটুখানি হরলিক্স ও দই খাইয়ে দেয়। চিনুর ইচ্ছা না থাকলেও বাড়ী সুদ্ধ লোকের সামনে পিতার সম্মান রক্ষা করতে হয়। একটু দই বেনারসীতে পড়ে গিয়ে শাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এ ঘটনায় মাসিমার সহ্যের বাঁধ ভেঙে যায় ক্ষুদ্র কণ্ঠে বলে ওঠে —

“তোমাকে কে বলেছিল শত্রুতা করে মেয়েটাকে এক্ষুণি হরলিক্স আর দই গেলাতে ? কেন খাইয়েছ ? কেন ওর মতো দামী বেনারসীতে দই ফেলে দিলে তুমি ? অত কষ্টের সাজ-গোজ নষ্ট করে দিয়েছে, কিসের জন্যে ? কে বলেছিল তোমাকে ? কে ?”

— এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে জোরালো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে স্বামীর বিরুদ্ধে। এইভাবে পুরুষের স্বৈচ্ছাচারীতার বিরুদ্ধে নবনীতা দেবসেন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

গল্পকার ছবি বসু বাংলার নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে সমাজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়েছেন। সত্যের পূজারী ছবি বসু সংবেদনশীল মন নিয়ে অত্যাচারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর গল্পে মানবপ্রেমের যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে।

ছবি বসু একটি সার্থক প্রতিবাদী গল্প ‘প্রশ্ন এড়িয়ে’। এই গল্পের নায়িকা রেবতী চরিত্রটি তিনি অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অঙ্কন করেছেন। সরকার তথা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাস ভাড়া অনেকটা বাড়ানো হয়েছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে ভাড়া দেওয়া ছিল কষ্ট সাপেক্ষ। এই বাস ভাড়ার বিরুদ্ধে যাত্রী সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। বাস আটকিয়ে যান চলাচল ব্যহত হল। পুলিশ সাধারণ মানুষের প্রতি আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়। পুলিশের এই আক্রমণ উপেক্ষা করে সাধারণ মধ্যবিত্তরা যে প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল, রেবতী তার নেতৃত্ব দান করেছিল। রেবতীর নেতৃত্বে এই আন্দোলনের চাপে সরকার তথা প্রশাসন বাস ভাড়া কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

‘পিতৃঘাতিনী’ ছবি বসুর একটি অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। এই গল্পের নায়িকার নাম শতদল, ডাকনাম ছিল বুঁচি। ‘আমি’-র জবানিতে এই গল্পটি উপস্থাপিত হয়েছে। নায়িকার বাবা কথক। বিভিন্ন স্থানে তিনি যাত্রাদলের পালা গাইতেন। তার কন্যা রূপবতী হলেও তার বিয়ের ব্যাপারে

পিতা-মাতা চিন্তিত। যোগ্য পাত্র না পাওয়ায় দোজবরের সঙ্গে কন্যার বিয়ের দিন ধার্য করেছিল। বরের পরিবারটি ছিল আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল জোতদার শ্রেণিভুক্ত। গোয়াল-ভরা গরু, পুকুর-ভরা মাছ, গোলাভরা ধান ছিল তাদের। কিন্তু পাত্রটি নেশাভাঙ করে। এরূপ পাত্রের সঙ্গে শতদলের বিয়ের জন্য বরপাণে রাজি হয়েছিল তার বাবা। বিয়ের দিনে জামাই এসেছে, বরযাত্রী ও আত্মীয় সমাগম হয়েছে, বাদ্যি বাজছে, উলুধ্বনিতে মুখর বিবাহ প্রাঙ্গণ। বরপক্ষকে পণের টাকা তখনও দেওয়া হয়নি। পণের টাকা কিছু কম পড়েছিল। চিন্তাগ্রস্ত পিতা শিবেন বাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা পাবে এরূপ আশ্বাস পেয়েছিল। কন্যা সম্প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ভাই নিবারণের উপর। টাকা আনতে যাবার আগে নিবারণকে জানিয়ে যায় যাতে বিবাহ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পরেও শতদলের বাবা টাকা নিয়ে ফিরে আসেনি। শতদল তার বরের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ীতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের আগমন ঘটে। পুলিশ বহন করে এনেছে দুঃসংবাদ। লক্ষ্মীকান্তপুর স্টেশনের একটি প্রস্রাব ঘরে শতদলের বাবা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়। এভাবে পণপ্রথার বিষময় পরিণতি হিসেবে পিতার এই আত্মঘাতী হওয়ার ঘটনা গভীর বেদনাদায়ক। ছবি বসু ‘পিতৃঘাতিনী’ গল্পে পিতৃহত্যার গভীর বেদনার দিকটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

‘নির্বাক যৌবন’ গল্পে ছবি বসু এক বর্মীয়সী বিধবা যোগমায়া নামে একটি নারীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে আত্মহত্যার করুণ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। একটি জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠির আগুনে তাঁর কাপড়ে আগুন লেগে যায়। মৃত্যুর আগে যোগমায়া একটি চিঠি লিখে পাশের টেবিলে রেখে যায়। যোগমায়া দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল। জীবন সংগ্রামে পরাজিত হয়ে তার এই আত্মহত্যার নিঃসন্দেহে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

‘বিভাবৌদি’, ছবি বসুর একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। এই গল্পে লেখিকার প্রতিবাদী মানসিকতার পরিচয় মেলে। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা, ধিক্কার ও প্রতিবাদ এই গল্পে পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজ আমলের শিক্ষক ও অফিসের কেরানীদের অর্থনৈতিক দৈন্যতা ছিল বেশি। বৃটিশদের আয়ের একটা বৃহৎ অংশ পুলিশকে পোষার জন্যই ব্যয়িত হত। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোনো উদ্যোগ তারা নেয়নি। শ্রমিকরাও তাদের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এরূপ শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেই আন্দোলনে শিক্ষিকা বিভাবৌদির সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে।

সেই আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য পুলিশ বাহিনীর সক্রিয় ভূমিকাকে মেনে নিতে পারেনি তেরো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলে। হাত মুঠো করে শ্লোগান দিয়েছে ‘পুলিশি জুলুম চলবে না।’

‘প্রবহমান’ একটি রাজনৈতিক গল্প। দীর্ঘ এই গল্পে তরুণ-তরুণীদের রাজনৈতিক

মতাদর্শ, অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। বাস্তবহারা মানুষদের প্রসঙ্গ এসেছে এই গল্পে। সুলেখা, বুলটুনি, যোগমায়া, কল্পনা, জয়ন্ত প্রভৃতি নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি একাধিকবার বিভিন্ন আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ করেছে। এমনকি অনেকে শহীদ হয়েছেন। সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য স্বদেশ প্রেমিকদের আত্মদানকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখিয়েছেন ছবি বসু। সেই সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৎকালীন বৃটিশ প্রশাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে।

‘আগুন রাঙা’ গল্প গ্রন্থের ‘কান্না’ একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে বঙ্গদেশের এক অবজ্ঞাত মেয়ে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যে অভাবী, দুঃখী মেয়ে সুন্দরভাবে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে, চলতে চেয়েছিল নারীত্বের মর্যাদা নিয়ে। সে আজ উপেক্ষিত। তথাকথিত যুগধরা সমাজের বিরুদ্ধে এই নারীরা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারীদের দুঃখকে জয় করবার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা এবং সাফল্যের চূড়ায় উত্তরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার ছবি বসু। তাঁর আরও একাধিক গল্পে এধরনের প্রতিবাদ রয়েছে। সমাজসচেতন এই শিল্পী সমাজের আরও নানা অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন।

মধ্যবিত্তের জীবন সংকট অবলম্বনে স্বাধীনতা উত্তরকালে যেসব মহিলা গল্পকার গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রতিভা বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর গল্পে ছিল বৈচিত্র্য, ছিল বিভিন্ন সম্ভাবনাময় দিক। প্রতিভা বসুর একাধিক গল্পে দেশবিভাগজনিত মানবিক সংকটের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। উদ্বাস্ত সমস্যা, বেদনাময় অনুভূতি, লেখিকা তুলে ধরেছেন বিভিন্নভাবে। সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি কোমল মার্জিত ভাষায় স্বদেশভূমি ছেড়ে আসা উদ্বাস্ত নারীদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা ছিল বিপন্নতা বোধের শিকার। নারীরা আতঙ্কিত হয়েছিল তৎকালীন যুগযন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে মানবিক মর্যাদার প্রশ্নে। অনেক গল্পে প্রতিভা বসুর নারীরা আলোর জগৎ থেকে হারিয়ে গেছে নিরস্ত্র অন্ধকারের মধ্যে। কারও জীবনে নেমে এসেছে অকাল মৃত্যু। নিরপরাধী এই নারীদের মৃত্যু যদিও কাম্য ছিল না। অনেক নারী অব্যবহার চাপে পড়ে নিজ আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য যৌনকর্মী হিসেবে নিজেকে যুক্ত রেখেছিল। অন্তরের গ্লানি তাদের হৃদয়কে কুঁড়ে কুঁড়ে খেলেও মৃত্যুকে বেছে না নিয়ে তারা এই পথে পা বাড়িয়েছিল। অনেক নারীরা ভিখারিণী হয়ে দ্বারে-দ্বারে ভিক্ষা করে তাঁদের জীবনদীপ কোনোভাবে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছে। কোনো কোনো গল্পে দেশবিভাগের পটভূমিকায় হিন্দু প্রেমিকা ও মুসলমান প্রেমিকের প্রেমকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজ তাদের এই প্রেমকে আন্তরিকভাবে মেনে নিতে পারেনি।

প্রতিভা বসু এমনি একজন গল্পকার যার গল্পে ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের একাধিক প্রসঙ্গ রয়েছে। এই আন্দোলন-এ অংশ নিয়েছিল নায়ক ও নায়িকারা। কেউ গান্ধীবাদী

আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, কেউবা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে বেছে নিয়েছে। নারীদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতকে প্রতিভা বসু শিল্পী সুলভ মনোভাব নিয়ে গল্পের নৈবেদ্য সাজিয়েছেন নূতনভাবে নূতন টেকনিকে। তিনি যে গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা গল্পের জগতে অক্ষয় সম্পদ হয়ে বিরাজিত থাকবে।

প্রতিভা বসু বৈচিত্র্যময় গল্পের স্রষ্টা। তাঁর প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখের দাবী রাখে স্বনির্বাচিত গল্প গ্রন্থের ‘সুমিত্রার অপমৃত্যু’ গল্পটি। এই গল্পে তিনি মিথ্যে সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ফুলের মতো নিষ্পাপ সুমিত্রা হিন্দু কন্যা হয়ে ভালোবেসেছিল এক পবিত্র হৃদয় মুসলমান যুবক ইউসুফকে।

লেখিকা বক্ষ্যমান গল্পে একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন রেখেছেন তথাকথিত রক্ষণশীল সমাজের প্রতিভূদের উদ্দেশ্যে —

“মানুষের মিথ্যে সংস্কারের জন্য কি আমরা দায়ী?

ওরকম অবোধ যারা, মানুষকে জাতি দিয়ে যারা বিচার করে

তাদের সঙ্গে ছলনা করলে কোনো পাপ হয়না।”

এই গল্পের নায়িকা সুমিত্রা। হিন্দু পরিবারের সুমিত্রা ছিল সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারিণী। হিন্দু সংস্কারকে উপেক্ষা করে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। এই দুই নায়ক-নায়িকার গভীর প্রেম তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা নিন্দিত হয়েছিল। এই রোমান্টিক নায়ক-নায়িকা ইউসুফ ও সুমিত্রাকে ভোগ করতে হয়েছিল কঠিন শাস্তি। সুমিত্রার মৃত্যু আসলে অন্যায়কে মেনে নেওয়া নয়, সে মৃত্যুবরণ করে তৎকালীন সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইউসুফও জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়। তার বিদ্রোহের বহিঃশিখা জ্বলে ওঠে সামাজিক বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে। তার প্রতিবাদী কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল জ্বালাময়ী ভাষার মাধ্যমে।

প্রতিভা বসুর ‘মাধবীর জন্য’ গল্পে মাধবী ও অশোকের দাম্পত্য জীবন মধুর হয়নি। যেকোন স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর ভালোবাসাই একমাত্র কাম্য। স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর কোথাও নেই। ইতিমধ্যে মাধবী একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে নিযুক্ত হয়ে সহজ সরল জীবন কাটায়। অন্যদিকে অশোক বকুলকে নিয়ে সংসার করে কিন্তু একাদিখ সন্তানের পিতা অশোক স্ত্রীর প্রতি মর্যাদা দিতে শেখেনি। বিভিন্ন পথ পরিক্রমার পর মাধবীর সঙ্গে আবার অশোকের দেখা হয়। অভিমানিনী মাধবী অশোকের কথা রাখেনি। অশোক যখন মাধবীর সেবা পাবার জন্য আকুল হয় মাধবী তার বিরুদ্ধে জানায় প্রতিবাদ। প্রতিভা বসুর বক্ষ্যমান গল্পটিতে বঞ্চিতা নারীর আত্মমর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেছেন।

‘অন্ধকারে’ গল্পে স্বদেশ চেতনার পরিচয় রয়েছে। বীরেশ্বর এই গল্পের নায়ক।

সে ভালোবেসেছিল সাহিত্য নিয়ে এম. এ. পড়া এক ছাত্রীকে। উভয়ের মধ্যে সাহিত্য রাজনীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক হত। রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বীরেশ্বর একাধিক খুনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছিল। দেশোদ্ধারের নামে হিংস্র কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকতে তার বাঁধেনি। বীরেশ্বরের দৃষ্টিতে

—
“আমার দেশের কাছে কেউ কিছু না। বাপ, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়, পরিজন, সব, সব কুয়াশা, শুধু তুমি, একটি বিন্দু সিদ্ধ হয়ে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হতে দিচ্ছ না।”

তার নাম পুলিশের খাতায় রয়েছে এক নম্বরে। রাধা তাকে এই সন্ত্রাসের পথ থেকে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। বীরেশ্বর গভীর জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকত তার পকেটে বোমা ও পিস্তল। পরিশেষে একদিন পুলিশের গুলিতে বীরেশ্বরের মৃত্যু ঘটে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাধা গভীর যন্ত্রণা নিয়ে বলেছিল —

“জীবন আমার কাছেও কম বোঝা নয় বীরেশ্বর, আমাকে তুমি ডেকে নাও। আমি আর পারছি না, পারছি না। তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করার শক্তি আমার আর অবশিষ্ট নেই। যদি আত্মহত্যা মহাপাপ হয় সে পাপও আমি করতে রাজী আছি তোমার জন্য। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। আর তোমাকে ক্ষমা করুন ঈশ্বর।”

দেশমাতার সন্তান বীরেশ্বর কখনো নিজের কথা ভাবেনি। প্রতিবাদী এই চরিত্র পারিবারিক ঐতিহ্য অনুশাসনের বিরুদ্ধে এবং তৎকালীন রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে শহীদ হয়েছিল।

প্রতিভা বসুর ‘সকাল বেলা’ গল্পটি সমাজ সমস্যামূলক গল্প। এই গল্পের নায়ক পূর্ণেন্দু এবং নায়িকা অনুরাধা। অকালে মাতৃবিয়োগ ঘটেছিল অনুরাধার। বিমাতার নির্যাতন তাকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। বিমাতা অনুরাধার প্রতি প্রতিহিংসা বশতঃ নারী বেচাকেনার দালালের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধা করেনি। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে তার পিতৃগৃহে ক্রীতদাসীর মত দিন যাপন করেছে। তার বাবাও তার প্রতি সদয় ব্যবহার করেনি। কোন এক সন্ধ্যায় এক আত্মীয় বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা বলে পূর্ণেন্দুর বাগান বাড়িতে রেখে এসেছিল। ছ’মাস মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে ফিরে আসবার পর এক দালাল চাকরির ইন্টারভিউয়ের নাম করে অনুরাধাকে নিয়ে গিয়ে নিষিদ্ধ পল্লীর একগৃহে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সেখান থেকেও অনুরাধা তিনমাস বাদে ফিরে এসেছিল। তাকে জীবনভর এভাবে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যে তৃতীয় খন্দেরকে অনুরাধা জানিয়েছে —

“আমি অন্তঃসত্তা আমাকে দিয়ে আর উপর্জনের আশা নেই।”

প্রতিভা বসুর একটি সফল প্রতিবাদী গল্প “স্বপ্ন ভেঙে যায়।” দু’জন সাংবাদিকের

জবানীতে গল্পটির শুরু। সাংবাদিকরা এলালতা রায়ের জীবনী সংগ্রহ করতে এসেছিল। এলালতা ছিলেন বিদ্রোহী নারী। একবাক্যে এলালতার নাম সারা বাংলা জুড়ে জানত। তিনি সারাভারতের সব বিপ্লবী দলের মক্ষীরাগী ছিলেন। তিনি থাকতেন কলকাতা শহরে এক দরিদ্র বস্তিতে। পঞ্চাশ বছর ধরে অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই বাড়িতেই থেকে মারা যান।

ভারত তখন স্বাধীন হয়নি। তার মৃত্যু হলেও সংরক্ষিত ডায়েরিখানা ছিল রাজনৈতিক তথ্য সমৃদ্ধ। দাদা কৃষ্ণরায় সাংবাদিকদের সেই ডায়েরি খুলে একাধিক তথ্য পরিবেশন করেছিল। বঙ্গদেশ তখন ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে উত্তাল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজ সরকার। এজন্য তারা নিষ্ঠুরতার চরমশীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। গুলি লাঠি ব্যাটারী বেয়নেট দিয়ে অত্যাচার চালিয়েছে সর্বত্র। শুধু আন্দোলনকারীদেরই নয় যাকে পাচ্ছে ধরছে, লাঠির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে। এমনকি মেরেও ফেলছে। চারদিকে পুলিশ এবং গোয়েন্দারা ঘুরছে। সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই তাদের উপর শুরু হচ্ছে আক্রমণ। এই অবস্থায় এলালতা কত গুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ করার জন্য জরুরি কাগজপত্র নিয়ে সন্ধ্যার ঝাপসা আলোয় গঙ্গার নিরালা পথে এগিয়ে চলছে। সঙ্গে ছিল তার পিস্তল। কোমড়ের বটুয়ায় রাখা ছিল কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয় ছিল। এলালতা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল তার পরনে ছিল হিন্দুস্থানী গয়লানীর মত পোষাক। কপাল আর সিঁথিতে সিঁদুর মাখানো। মাথায় সোনার মত করে মাজা দুধের কলসী। কলসিটি ছিল শূন্য। এলার পথ ছিল দুর্গম। আর দুরন্ত সাহসী অপরিমিত মনোবলের অধিকারী এলাকে রাতের অন্ধকারে পূর্ব সাংকেতিত একটি বাংলা বাড়িতে সেখানে পৌঁছে দিতে হবে চিঠিপত্র। সেই ঘরটি ছিল সাদা রঙ, চওড়া বারান্দা, টালির চাল রাস্তার পশ্চিমে। সে ভুলবশতঃ এসে পৌঁছেছিল হাওড়া রেলস্টেশনের একটি ঘরে সেই ঘরে বাস করত পুলিশের এক সেপাই। সেই স্পাইটি যখন এলাকে ধরতে এল বাধ্য হয়ে এলা পিস্তল বের করেছিল তাকে হত্যার জন্য। কিন্তু সে হত্যা করতে পারেনি। অচেতন্য অবস্থায় এলা যখন পড়ে রইল তখন সেই স্পাইটি পাঁজাকোলে করে তুলে এনে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। এই ছদ্মবেশিনী যে সন্ত্রাসবাদী এটা বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি। এলা চিঠিখানা পৌঁছাতে চেয়েছিল ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার আসামী নিরঞ্জন দাসের কাছে। নিরঞ্জন দাসকে ধরিয়ে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ৩০ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল। একে একে ইংরেজ স্পাইটি এলাকে প্রশ্ন করছিল তার অন্ধকারে ঘুরে বেড়ানোর মূল কারণ হল কাগজপত্র চালান করা তার বটুয়াতে কি আছে তার অনুসন্ধান করা। পিস্তলটি হস্তগত করা। পরিশেষে জানা গেল সেই লোকটির নাম সুব্রত সেন। তিনি ছিলেন ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের ছেলে, এলা ছিল ঢাকার ওয়ারীর মেয়ে। উভয়েরই দেশ ধ্যান দেশ জ্ঞান দেশই জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করেছিল। সেই সুব্রত এলালতাকে দৌলপূর্ণিমার দিনে মুঠো মুঠো আবির দিয়ে ভালোবাসার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু

এলালতার অনুশীলন সংঘের কর্মী হিসেবে কোন যুবকের প্রেম প্রণয়ের ফাঁদে পা দেবার ইচ্ছে ছিলনা। সুব্রত জেনারেল সেক্রেটারী পদেও উন্নীত হয়েছিল। তবুও সে যে আগুন নিয়ে খেলছে এই চেতনা তার জাগেনি। সুব্রতর অনুরোধে এলা তার প্রেমকে স্বাগত জানিয়েছে। পরে উভয়ের মধ্যে আইনসম্মতভাবে বিয়েও হয়। কিন্তু একজন বিপ্লবীর পক্ষে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল নিষিদ্ধ। রাজনৈতিক নির্দেশ অমান্য করার অভিযোগে রাজনৈতিক নেতা সুকান্ত বক্সীর আদেশে ঠিক বিয়ের দশদিনের মাথায় সুব্রতকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল তার দলের লোকেরা।

সুব্রতর মৃত্যু ঘটনা এলার কাছে ছিল গভীর দুঃখের কারণ। সেই সুকান্ত বক্সী পরে এলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সে অকপটে এলাকে জানিয়েছিল এলাকে সে দেশের চেয়েও বেশী ভালবাসে। কিন্তু যে এলার স্বত্বপিণ্ড খসিয়ে নিয়েছে সেই সুকান্ত বক্সীর সঙ্গে তার কখনো হৃদয় বিনিময় ঘটতে পারেনা। এমনকি এলা সেই হত্যার প্রতিশোধও নেয়নি। অলোক সামান্য সুন্দরী এলা বৈধব্য জীবন যজ্ঞা নিয়ে কাটিয়েছে। জেল থেকে তার দাদা কৃষ্ণরায় ফিরে আসার পর বিপ্লবের পথ ছেড়ে দিয়ে বোনকে নিয়ে অহিংসার পথকেই বেছে নিয়েছে বাকি জীবনটা। তারা কাটিয়েছিল একটি স্কুল খুলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালোবেসে।

সাংবাদিকরা এলালতার জীবনের সংগ্রামী ইতিহাস সংগ্রহ করে বেশফলাও করে পত্রিকাতে প্রকাশ করেছিল। এভাবেই প্রতিভা বসু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং নারী মনের দৃঢ়তাকে সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে।

প্রতিভা বসুর 'ঘাস মাটি' হিন্দু ও মুসলমান পারস্পরিক সম্প্রীতিযুক্ত একটি সফল গল্প। এই গল্পের নায়িকা মাধবী মিত্র একসময় ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তার অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। ঢাকা নিবাসি এই দুঃসাহসিক নেত্রীটি লাঠি খেলায়, ছোড়া খেলায় ও বন্দুকচালনায় পারদর্শী ছিলেন। ব্রিটিশদের দলিলে মাধবী মিত্র ছিলেন একজন রাজদ্রোহী। ঢাকাতে অধ্যয়নকালে মাধবী মিত্রের সঙ্গে প্রেমমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ইউসুফ নামে এক যুবকের। ভারত বিভাজনের পর মাধবীকে আসতে হয়েছিল কলকাতায় কিন্তু ইউসুফ থেকে গেছে ঢাকাতেই। ভৌগোলিক বিভাজন ঘটলেও দুই বাংলার মানুষ ছিল মাধবী ও ইউসুফের মত একপ্রাণ এক আত্মা। বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলে উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী হয়নি। মাধবীর কাছে ইউসুফের একপ্রাণ একআত্মা। বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলে উভয়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী হয়নি। মাধবীর কাছে ইউসুফ ছিল উঁচু দরের ছেলে। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ মাধবী ও ইউসুফের প্রেমকে ভালোচোখে দেখেনি। প্রভাস মাধবীকে সাংঘাতিক কমিউনেল হিসেবে চিহ্নিত করলেও মাধবীর দৃষ্টিতে শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা লাভই নয় ধর্ম ও ধর্মাক্ষের উচ্ছেদ করাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। প্রভাস তাকে বুঝিয়েছে সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যুর

চেয়ে আরও বেশি বেদনাদায়ক। কিন্তু ইউসুফ ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলংকৃত করে ভুলে যেতে পারেনি মাধবীকে। মাধবী যদিও জানিয়েছিল স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে ইউসুফকে বিয়ে করতে। কিন্তু ইউসুফ জানিয়েছে মাধবীর জন্য সে প্রাণ দেতে পারে। এরপর ইউসুফকে মরতে হল গুলির আঘাতে। তার রক্তাক্ত শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মাধবী। প্রভাস ও জিতেশ মাধবীকে তুলে এনেছিল কিন্তু মাধবীর মন থেকে ইউসুফ কোনদিনও মুছে যেতে পারেনি। ইউসুফকে উদ্দেশ্য করে মাধবী তার নিজের অনুভূতিটি প্রকাশ করেছে তার নিজের লেখায় -

“ইউসুফ ভালোবাসা, সত্যিই ঘাসের মতো, সে থাকে চিরদিন থাকে, মরে গিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার তেমনি সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে। এই মুহুর্তে আমি এই সত্যিই উপলব্ধি করে সানন্দ বিস্ময়ে তোমাকে জানাই, আত্মা আমাদের কল্পনার অনুভব, কিন্তু যা আমাদের অনুভূতির অন্দর্গত, তা হচ্ছে আমাদের প্রেম, যে প্রেম কখনো কোন সময়ের সীমায় গড়িবদ্ধভাবে থাকেনা, সব বয়সেই যা সমান রোমাঞ্চ এনে দেয় জীবনে। আমি অনেক দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু বেঁচে থাকার অর্থটাও খুঁজে পেলাম এতদিনে। বলো, এখন আমি কী করবো?”

প্রভাস ও জিতেশ ইউসুফকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করলেও আসল সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা পেল তারা। ইউসুফ ও মাধবী ছিল সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে।

প্রতিভা বসু আলোচ্য ‘ঘাসমাটি’ গল্পে সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যথার্থ মানবিকতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদী চেতনার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে।

‘স্বর্গের শেষ ধাপ’ প্রতিভা বসুর অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠগল্প। গল্পের নায়িকা মণিমালা এবং নায়ক সন্দীপ। মণিমালার বাবা, মা, ভাই প্রত্যেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। মণিমালার ভাইরা প্রত্যেকে অধ্যয়নরত। তার মা-বাবা অত্যন্ত কষ্টেই সংসার চালাত। বাবার রোজগারেই সংসার খরচ ও লেখাপড়ার খরচ চলত। তাদের তেমন কোনো সঞ্চিত অর্থ ছিল না। আকস্মিকভাবে তার পিতা ও মাতার মৃত্যু ঘটে। মণিমালা তখন বিবাহযোগ্য। মণিমালা তখন জানতে পেরেছে তার বিয়ের জন্য ২০ হাজার টাকা ইনস্যুরেন্স করেছিল এটুকুই তাদের শেষ সম্বল। মায়ের গয়না-গাটির কোনো সন্ধান নেই। যতটুকু গয়না-গাটি ছিল তা দিয়ে মণিমালাকে বিয়ে দেবে। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর কলেজ স্ট্রীটের একটি ফ্ল্যাটে মণিমালারা উঠেছিল। সে ফ্ল্যাটের মালিক হলেন প্রবাল। প্রবাল মণিমালাকে বিয়ে করতে আগ্রহী হলে, তার ভাইরা বিয়ে দিয়ে দেয় রেজিস্ট্রেশন করে। প্রবাল তাকে বিয়ে করেছিল। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল ক্ষণিকের। এক জরুরী কাজে মণিমালাকে রেখে প্রবাল চলে গিয়েছিল বাইরে, পুলিশে ভয়ে। পুলিশরা খুঁজছিল আই.পি.এস. অফিসার এ.কে. মৈত্রকে গুলি করার অপরাধী প্রবালকে। এমনকি মণিমালা পুলিশের কাছ থেকে এও শুনেছে, তার ছোড়া অমল রিভলবার দিয়ে তাদের পিতাকে হত্যা করেছে। প্রবাল একাধিক খুনের আসামী। স্ত্রী মণিমালার কাছে প্রবাল ছিল

প্রতিহিংসার পাত্র, ঘৃণার পাত্র। সে তার স্বামীকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিতেও চেয়েছিল। পুলিশ প্রবালকে গ্রেপ্তার করতে এলে, পুলিশের সংকেত পেয়েই পালিয়ে গিয়ে একটি পুকুরের জলে ডুবে থাকত। এরপর একদিন পুলিশ তার সন্ধান পেয়েছে। পুলিশের জেরাতে সে তার সঠিক নাম যে সন্দীপ মুখার্জী একথা জানিয়েছে। সন্দীপ যে মণিমালার পিতৃহত্যাচক্রবর্তীর মধ্যে একজন, একথা জানালে পুলিশকে মিথ্যাবাদী বলতে তার বাধেনি।

“মিথ্যাই আপনাদের জীবন, মিথ্যের বেসাতি করেই আপনারা জন্ম-জানোয়ারের মতো একে ওকে খুন করে বেড়ান। আপনাদের মতো কতকগুলো কৃমিকীটকে সরকার এখনো কেন ধরে ধরে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারছে না! ধরতে পারলে পুড়িয়েই মারবে। তুমি কেন সেদিন ধরিয়ে দিলে না। দিলে তোমারও শান্তি হতো, আমারও প্রায়শ্চিত্ত হতো। দেবো দেবো, নিশ্চয়ই দেব, সেদিন না পারলেও একদিন আমি পারবো। মৃদু হেসে সন্দীপ বললো, না পারবে না কোনদিনই পারবে না, যতোই ঘৃণা করো না কেন, যতক্ষণ জানবে আমি তোমার স্বামী ততক্ষণ সেই সংস্কারটাই তোমাকে বাধা দেবে। সুতরাং, জানিয়ে দেওয়া ভালো আমাদের বিবাহের অনুষ্ঠান সবই সাজানো, সবটাই ফাঁকি। তোমার পিতার টাকাটা আত্মসাৎ করবার জন্যই সেই আয়োজন।”

আসলে মণিমালাকে ও তার কাকাকে ধোকা দেবার জন্য ফন্দি এটেছিল সন্দীপ। সন্দীপকে যোগ্য পাত্র সাজিয়ে টাকা হাত করবার বুদ্ধিটা ছিল অমল-এর। এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতে উদ্যোগী হয়েছিল নীহার মজুমদার। তার পক্ষে টাকার জন্য চুরি-ডাকাতি-খুন অতি সাধারণ ব্যাপার। আর বিয়ের ভড়ংটা আরো অতি সাধারণ।

মণিমলা সন্দীপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, সে তাকে ঘৃণা করে। এভাবে সন্দীপ, অমল মণিমালাকে প্রতারণা করেছে। মণিমালাকে ছেড়ে তারা প্রত্যেকেই চলে যায়। পরিশেষে আশ্রয় গ্রহণ করে কাকাবাবুর কাছে। মণিমালার কাকাবাবু দার্জিলিং-এ একটি নার্সিংহোম খুলেছেন। সেখানে মণিমলার আশ্রয় হল। কাকাবাবুর বিশ্বস্ত মণিমলা রোগীদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলো।

আলোচ্য গল্পে মণিমলা বিদ্রোহ করেছে অন্যান্যসেয় বিরুদ্ধে। তৎকালীন সমাজে ঠক, প্রবঞ্চক পুরুষরা মণিমালার মতো শত শত নারীদের জীবনকে ছারখার করে দিয়েছে। এই সমস্ত শয়তানবেশী পুরুষদের বিরুদ্ধে প্রতিভাবসু জানিয়েছে প্রতিবাদ।

‘আয়না’ প্রতিভা বসুর একটি বিখ্যাত গল্প। এই গল্পে দিদিমা পরমা ও তার তেরো বছরের নাতনী উজ্জয়িনী দু’জনের কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে গল্পের কাহিনী এগিয়ে চলেছে। পরমা তার নাতনীকে নিজের জীবন কাহিনী ব্যক্ত করেছে। উজ্জয়িনী সুমনকে খুব ভালোবেসেছিল। সুমন ভালো ছবি আঁকতে জানে, সে রুচিশীল, ঘরে তার অসংখ্য ছবি, রেকর্ড ও বই-এর সমাহার। সুমন

তাকে তার বাড়ীতে বেশ আদর-আপ্যায়ণ করত। ধীরে ধীরে একদিন উজ্জয়িনী দিদিমাকে জানালো

—
“তুমি যখন আমার মতো, তোমারও এরকম বেশি বয়সের কোনো বন্ধু ছিল ?

তা বোধহয় ছিল — তোমাকে তারা খুব পাত্তা দিতেন ?

একটু-আধটু দিতেন বইকি,

ধর তোমার থেকে যে প্রায় কুড়ি বছরের বড়ো অথচ তোমাকে সঙ্গী পেলে আর কারোকে চায়না, কিছু চায় না। তুমি যা বল তাই শোনে, তাই করে তোমার জন্য —”

একথা শুনে পরমার মনে পড়ে গেল অতীতের স্মৃতি। ইউসুফ নামে সঙ্গীতপ্রিয় এক মুসলমান যুবকের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। সে খুব ভালো গাইতো। পরমা পিসতুতো ভাইয়ের কাছে জেনেছিল বত্রিশ বছরের এই যুবকটি পাঁচবার জেল খেটেছে, তিনবার সেলে থেকেছে, বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার সে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে। এই যুবকটি সাতদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকেছিল পরমা গৃহে। তেরো বছরের পরমা বত্রিশ বছর বয়সের সারা বাংলা বিখ্যাত মানুষটির মধুর কথায় আকর্ষণ বোধ করত। ইউসুফের কাছে পরমাই ছিল আসরের কেন্দ্রবিন্দু। সে তার খ্যাতি-অখ্যাতি, ভালো-মন্দ এবং উদ্যামতা সংহত করে তার আর্ধেকের কম বয়সি পরমা পায়ে ঢেলে দিয়েছিল হৃদয়ের গভীর প্রেম। তারপর একদিন কাউকে না জানিয়ে সে চলে গেল। অনেক ভেবেছিল তাকে হয়ত পুলিশে ধরেছে। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের জন্য শহরে তখন বহু ব্যক্তিকে পুলিশরা ধর-পাকড় করছে। ইউসুফের পিছনে পুলিশরাও সারা বছর লেগে থাকত। একথা শুনে পরমা বিষণ্ণ মনে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে। এর কিছুদিন পর এলো একটি চিঠি —

“পরমেশ্বরী শোনো, বিদায় নিয়ে না আসার জন্য রাগ করো না। ওই বিদায়-টিদায় নিতে গেলে জীবনে ফিরে আসতে পারতাম না। কয়েকটা দিন তোমার সংস্পর্শে ভারি সুন্দর এক পবিত্র সংবেদে সময় কেটেছে। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞ কিন্তু কার প্রতি ? তোমার না ঈশ্বরের ? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আশা করছি, হারানো সম্পদ ঠিকই আবার হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবো। ভালো থাকো। মা বাবা কেমন আছেন ?

তুমি —

দিদান —”

অতঃপর উজ্জয়িনীকে পরমা জানালো তার কুড়ি বছরের বড়ো একজন বন্ধু সুমনকে ভালোবাসলেও সে প্রকৃতই অব্যর্থ তীরন্দাজ কিনা তা যাচাই করতে হবে। পরিশেষে উজ্জয়িনী দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কান্নায় প্রশ্ন করেছিল “কোথায় চলে গেল সেই অব্যর্থ তীরন্দাজ! কোথায় ? মানুষ কোথায় যায় ? কেন যায় ? কেন ? কেন ?”

আলোচ্য গল্পে প্রতিভা বসু অসমবয়স্ক প্রেমের দিকটি উপস্থাপন করে সূক্ষ্ম প্রতিবাদের সুর উচ্চারণ করেছেন।

‘ইন্টিশনের মিষ্টি ফুল’ গল্পে প্রতিভা বসু পারিবারিক প্রতিবাদের দিকটি তুলে ধরেছেন। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই অজিত নামে একটি ছেলে পিতা-মাতার দুর্ব্যবহারে বাড়ী ছেড়েছিল। সে একটি রেলস্টেশনের পাশে একটি কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই কুঁড়ে ঘরে থাকত একটি দুঃখিনী মেয়ে, যে মেয়েটি পুরুষের পোকাশ পরে ইন্টিশনের বাবুদের মালবহন করে অতিকষ্টে দিন অতিবাহিত করত। পিতৃ-মাতৃহারা এ মেয়েটির আদর-আপ্যায়ণে অসুস্থ ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ছেলেটি পরে তার করুণ কাহিনী পরিবেশন করে সেই মেয়েটিকে। তার সৎমা তাকে শুধু খাটায়, মারে, ইস্কুলে পাঠায়না। রেশনে তাকে দীর্ঘ লাইন দিতে হয়। এছাড়া উনুন ধরানো, বাসন মাজা, ভাই-বোনদের ইস্কুলে দিয়ে আসা ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। ছেলেটি আরো জানায় তাকে ভয়ানকভাবে মেরেছে তার পাল্টা প্রতিশোধ হিসেবে সে তার সৎ মাকে একটি লাঠির আঘাত করে পালিয়ে এসেছে। একথা শুনে দুঃখিনী মেয়েটি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাকে আপাত আশ্রয় দিলেও পরে চলে যেতে বলে। কিন্তু বহু কষ্ট স্বীকার করে সে যায়নি। সেদিন গভীর অনুরাগবশত মেয়েটি তার জন্য খাবার এনেছিল। সে ছেলেটিকে ভুলে যে পারেনি। আজও কিন্তু তারা সারাদিন কুলিগিরি করে রোজগারের কড়কড়ে চারটি টাকা শিস দিতে দিতে এসে মেয়েটির হাতে তুলে দিয়ে জানায় —

“আমি তোকে বিয়ে করব

বিয়ে !

আমার খুব পছন্দ হয়েছে তোকে, আমাকে তোর ভালোলাগে না ? তুই আমার বউ হবি, আমি তোর বর হব। দু’জনে মিলে খেটে-খুটে যা আনব আমাদের ঠিক কুলিয়ে যাবে।”

অনেক গরীব দুঃখীরা কালিঘাটে গিয়ে কমপয়সায় বিয়ে করে। তারাও বিয়ে করতে চেয়েছে। মেয়েটিকে আশ্বাস দিয়ে সে বলল, একদিন সে ঠিক চাকরি পাবে। সেদিন হয়তো ছেলে সেজে কুলিগিরি তাকে করতে হবে না। তাকে শাড়ি, কাচের চুরি কিনে দেবে। সে দুঃখীকে খুব ভালোবাসবে। দুঃখী বুকে স্পন্দন অনুভূত হল।

আলোচ্য গল্পে প্রতিভা বসু সৎমায়ের ও অসৎপিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূত্র ধরে গল্পের রোমান্টিক পরিণতি যেভাবে এঁকেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প হল একটি জনপ্রিয় শাখা। ছোটগল্প ঊনবিংশ শতকে উদ্ভূত এক বিশিষ্ট সাহিত্য শাখা। এর আবির্ভাবের পেছনে ছিল যুগযুদ্ধা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এর সূচনা ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে সার্থক গল্পের ভগীরথ হিসেবে সুপরিচিত হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে ছোটগল্পের বীজ রোপিত হলেও সেই বীজ ফলে - ফুলে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর হাতেই। ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের ‘বর্ষাযাপন’ কবিতার লাইনগুলি —

“ছোটপ্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাজ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।” ১

রবীন্দ্র-প্রদত্ত এই সংজ্ঞার মধ্যে নিহিত রয়েছে ছোটগল্পের আঙ্গিক প্রকরণের কথা। ছোটগল্পে থাকবে জীবনের খণ্ডাংশ মুহূর্ত, তা হবে আয়তনে ছোট, ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ একমুখীন গতি, এক রুদ্ধশ্বাস মহামুহূর্ত, পরিণামী ব্যঞ্জন, ভাষার পরিমিতিবোধ, সংযত-সংহত রূপ, নাটকীয়তা ও কাব্যধর্মিতা ছোটগল্পকে শিল্প সফল করে তোলে।

ডঃ রবীন্দ্রনাথ রায় ‘ছোটগল্পের কথা’ গ্রন্থে বলেছেন —

“ছোটগল্প লঘুপক্ষ প্রজাপতি, তার পাখায় পাখায় দ্রুতলয়ের ছন্দ - যে ভারমুক্ত, লঘুছন্দ, অনাবশ্যকের বোঝা তার নেই। ছোটগল্পের একটি ঘটনায়, একটি চরিত্রের বিশেষ অংশে, একটি মানসিকতায় বিদ্যুদ্দীপ্তির যে চকিত উদ্ভাস ঘটে, তারই আলোয় জীবনেরই একটি গভীর সত্য ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে।” ২

ছোটগল্পের আঙ্গিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আরও একাধিক বিষয় বিচার্য। তাহল আরম্ভ ও উপসংহারে নাটকীয়তা, সার্থক নামকরণ। যেহেতু এটি গদ্য সাহিত্য এর দু’টি রূপ থাকবে - একটি হল বর্ণনা অংশ। অপরটি হল সংলাপ অংশ। কি বর্ণনা অংশ, কি সংলাপ অংশ সবক্ষেত্রেই থাকবে

বাহ্য্য বর্জিত কথা। এর উপস্থাপন কৌশল ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এইসব বৈশিষ্ট্যের নিরিখে একশ বছরের লেখিকাদের গল্পের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক আমরা বিচার করব। আমাদের আলোচনায় যে মহিলা ছোটগল্পকারদের শিল্পরূপ ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ করা হবে, তাঁরা হলেন প্রাক্ স্বাধীনতাপর্বের স্বর্ণকুমারী দেবী ও সরসীবালা দেবী এবং স্বাধীনতা উত্তর পর্বের পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাধারাণী দেবী, সাবিত্রী দেবী, ছবি বসু, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন প্রমুখ।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয় ‘স্বর্ণকুমারী দেবীর রচনা সংকলন’ গ্রন্থে একুশটি সার্থক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এরমধ্যে ‘ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী’, ‘অশ্ব ও তরবারি’ দুটি চার পৃষ্ঠার, ‘কেন’ গল্পটি সাড়ে তিন পৃষ্ঠার, ‘প্রকৃত প্রতিশোধ’ গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার, ‘টালিস্ম্যান’ গল্পটি চার পৃষ্ঠার, ‘অমর গুচ্ছ’ গল্পটি ছয় পৃষ্ঠার, ‘পেনে প্রীতি’, ও ‘সন্ন্যাসিনী’ গল্প দুটি আট পৃষ্ঠার। ‘কুমার ভীমসিংহ’ গল্পটি সাতপৃষ্ঠার। ‘ক্ষত্রিয়রমণী’ গল্পটিও সাতপৃষ্ঠার। ‘নবাডাকাতের ডায়েরী’ ও ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্প দু’টি চোদ্দ পৃষ্ঠা করে, ‘কান্তিবাবুর খোসনাম’ গল্পটি ন’পৃষ্ঠার।

তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলির প্লট বিশৃঙ্খল, শেষের দিকের রচনাগুলি এই ত্রুটি থেকে অনেকটা মুক্ত হয়েছে। আঙ্গিকের অভিনবত্ব তাঁর গল্পগুলির একটি প্রধান গুণ।

‘আমার জীবন’ গল্পটি আরম্ভ হয়েছে উত্তমপুরুষে —

“একবার ভালবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায়না
তবে যে আমার মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে ভালো লাগে ইহার
সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালোবাসি।”

পাশাপাশি ‘যমুনা’ গল্পটির সমাপ্তি অংশটিও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ,—

“কুটির দ্বারে আসিতেই কতকগুলো শৃগাল কুক্কুর আমার দিকে
চাহিয়া একবার চিৎকার করিয়া উঠিয়া কিছুদূরে সরিয়া গেল, ইঠাৎ কেমন
একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল, রুদ্ধদ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম,
দেখিলাম - অভাগিনীর মৃতদেহ ভূমিতে লুটাইতেছে, শিহরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।”

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পগুলির বাক্যগুলি বিভিন্ন মাপের বড়, মাঝারি ও ছোট।
‘ছোটখাটো মিউটিনি’ গল্প থেকে একটি বড় বাক্য প্রদত্ত হল —

“সম্মুখে জোয়ারে স্ফীত উচ্ছসিত চন্দ্রকিরণ খচিত-বিখচিত নীলাম্রু নিজের প্রাণের
আবেগ নিজের মধ্যে বদ্ধ রাখিতে অক্ষম হইয়া বিশৃঙ্খল ইচ্ছায় যেন মাতিয়া উঠিয়াছে : অদূরে
কোলাবার দুর্গজলে ভাসাইয়া, দূর দূরান্তর ব্যাপী শুভ্র বালুচর আচ্ছন্ন করিয়া ঠিক বাঙ্গলো প্রান্তের কৃষ্ণ
প্রস্তর-স্তূপের সন্নিকটে যেখানে দুইটি সতী স্তম্ভ দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পাদদেশে পর্যন্ত পৌছিয়া

সহসা সাগরের সফেন-তরঙ্গ-ভীম গর্জনে মুহূর্তের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িতেছে : তৎস্পর্শে সাহসহীন সিঁধুরব যেন সেখান হইতেই সবিষ্ময়ে শত নমস্কার শত স্তুতিগানে তাহাদিগের চরণ বন্দনা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আবার পিছাইয়া পড়িতেছে।”

এই দীর্ঘ বাক্যটিতে দু’টি সেমিকোলন, দু’টি কমা পর বাক্যের শেষে এসেছে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ।
নিম্নে একটি মাঝারি ধরনের বাক্য প্রদত্ত হল —

“ঐ দেখা যাইতেছে, স্বাধীনতার উন্মুক্ত অমৃত-ভাণ্ডারদ্বার, দুই পদ অগ্রসর হইবামাত্র ব্যাকুল প্রাণের তৃষ্ণা দূর হইবে, অমৃতপানে জীবন অমর হইয়া উঠিবে, পরিব না, আমি মরিতে পারিব না, আমার কাজ এখনও ফুরায় নাই, আমার দেশ মাতৃকা এখনও অধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধা!”

— এই মাঝারি বাক্যটিতে ছ’টি একটি হাইফেনের পর বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসেছে।
নিম্নোক্ত সংলাপ অংশে ছোটবাক্যের সংখ্যা প্রচুর —

“মগরা। ওটা ভূতের পাহাড়, মশাই।

আমি। দিনের বেলা ভূতের ভয় কি ?

মগরা। সাজ ত এল।

আমি। ঠিক যেন একটা কাটা গম্বুজের মত দেখতে। উপরে কি পথ আছে ?

মগরা। নীচের দিক থেকে-ও-একটা সুড়ঙ্গ আছে

আমি। চলনা, একবার দেখে আসি।”

উপরিউক্ত সংলাপ অংশে সাতটি বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিটি বাক্যই ছোট, দু’টি কমা, পূর্ণচ্ছেদ ও প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। বাক্যগুলি ছোট হলেও ভাবপ্রকাশক সন্দেহ নেই।

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পগুলির নামকরণ কোনটি বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক, কোনটি চরিত্র প্রধান, কোনটি ব্যঞ্জনধর্মী, - ‘মালতী’, ‘যমুনা’, ও ‘কান্তিবাবুর খোসনাম’, ‘কুমার ভীমসিংহ’, প্রভৃতি নামকরণ শিল্পসম্মত হয়েছে। ‘ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী’, ‘অশ্ব ও তরবারি’, ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’, ‘গহনা’, ‘প্রকৃত প্রতিশোধ’, ‘পূজার তত্ত্ব’, ‘পেনেশ্রীতি’, ‘স্বপ্ন নাকি ?’ ও ‘তিনটি দৃশ্য’, ‘কেন?’ গল্পগুলির নামকরণ যেমনি সার্থক, তেমনি এগুলির দ্রুতগতি ব্যঞ্জন লেখিকার রুচি ও সংযম গুণে সমৃদ্ধ।

ব্যঞ্জনধর্মী এই গল্পগুলি স্বর্ণকুমারী দেবীর কলমে সার্থক হতে পেরেছে। তাঁর বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে ‘নবডাকাতির ডায়েরী’, ‘ছোটখাটো’, ‘মিউটিনি’, ‘সন্ধ্যাসিনি’, ‘লজ্জাবতী’ ও ‘ক্ষত্রিয়রমণী’ গল্পগুলি সফল সৃষ্টি।

লেখিকা তাঁর গল্পে যে উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি প্রধানত প্রকৃতি কেন্দ্রিক। প্রাণী বাচক ও বস্তুবাচক উপমা, চরিত্র বর্ণনা, পরিস্থিতি বর্ণনা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লোকজীবনাশ্রয়ী ও পুরাণাশ্রয়ী যে উপমাগুলি ব্যবহার করেছেন তা ছোটগল্পের চমৎকারিত্ব সৃষ্টি

করতে পেরেছে। যেমন - ‘সে লজ্জাবতী লতাটির মত সংকুচিত জড়সড় হইয়া পড়িত।’ এখানে নিসর্গাশ্রিত বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ‘বায়ু যেন কেবল আনন্দের হিল্লোল’ - ‘গহনা’ গল্পের পরিস্থিতি বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত এই উপমাটি অনবদ্য। আবার ‘রুম্ম জটা’ যুক্ত কেশপাশ প্রচ্ছন্ন মলিন গম্ভীর অপরিচিত মুখ কাহাকে মনে করাইয়া দিতেছে’ - আলোচ্য স্মরণোপমা অলংকারটি লেখিকার কলমে জীবন্তভাবে ধরা দিয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর অসংখ্য গল্পে ছড়া, সঙ্গীত, চিঠিপত্র ব্যবহার করে গল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

‘মালতী’ গল্পে শোভনা ও রমেশের সঙ্গে কথোপকথনের সময় সংস্কৃত ‘রত্নাবলী’ নাটকের অংশ ব্যবহৃত হয়েছে —

“দুল্ল হজন অণুরাও
লজ্জা গুরুই পরব্বসো অগ্না।
পিঅসহি বিসমং পেন্নু
মরণং সরণং ণবরিঅমেব্বং ॥”

এই গল্পেই স্থান পেয়েছে একটি সঙ্গীত। গল্পটির আবহ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং রমেশ, শোভনা ও মালতীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে আলোচ্য গানটি তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধকারের নিস্তন্ধ প্রশান্ত পরিবেশে যে গানটি ধ্বনিত হয়েছিল —

“মুখেরি জনম যার, এই এ দুখিনী আর
দিবে না সে সুখে বাধা - কাঁদাবে না পলে পলে,
সাক্ষী থেকে রবি শশী, জ্বলন্ত তারকারাশি,
সাক্ষী থেকে গিরি নদী তোমরা সকলে
যতই যাতনা সই, যেখানেই মোরে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে দেখিও হৃদয় খুলে ॥”

‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্পটিতে বারুণীর কণ্ঠে যে গানটি সংযোজিত হয়েছে তা হল, —

“ললিত রাগে ঐ বাঁশরী বাজে !
থেকো না বঁধু হে শুধী আর
আমার গোপন মনের মাঝে ॥”

- নহবৎ-এর সুরের মাঝে মাঝে বাঁশীর সঙ্গে আসন্ন বিবাহের আবহসৃষ্টির জন্য স্বর্ণকুমারী যে গানটির সংযোজন করেছেন তা গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছে। এই গল্পে বীণা বাজিয়ে ভৈরবীর কণ্ঠে গাওয়া গানটির দু’টি ছত্র হল, —

“ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি সাধন

ফাঁকি জুঁকি আর সবই?”

- এই গানটির মধ্যে বৈরাগ্যের সুর নিহিত রয়েছে।

‘স্বপ্ন নাকি’ গল্পে বর্ণারধারে যে গানটি গাওয়া হয়েছে এর মধ্যে মিলন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে —

“ওগো মানস পুর প্রবাসী

আঁখি তব দরশন-পিয়াসী -

আশায় স্বপনে মিলায়ে,

থেকো না গো দূরে ভুলায়ে -

এস এ-বক্ষ আলয়ে দুঃখ কুয়াসা নাশি।।”

-গল্পের আবহে এই সঙ্গীতিক প্রবাহ অনন্যতা দান করেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী যে সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন তা পাঠ করলে পাঠকমাত্র উপলব্ধি করতে পারে।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর গল্পের ঘটনা বর্ণনার ফাঁকে-ফাঁকে কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও বুদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগ করে গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। এগুলির আবেদন চিরন্তন। এরূপ কিছু বাক্য নিম্নে প্রদত্ত হল, —

“প্রেম যখন অলপে অলপে হৃদয়কে অধিকার করে, নিজেই তখন বোঝা যায় না।”

- একটি যুবককে উদ্দেশ্য করে শোভনার এই উক্তিটি সর্বজন স্বীকৃত।

“মানুষ আত্ম-বিরোধী অস্তির যেথা।”

“কখনো কখনো অনেকে তার স্থির সংকল্প রাখতে পারে না।” শোভনার এই আশু বাক্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

“পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ।”

- ব্যথিত ব্যক্তির ব্যথা উপলব্ধি করবার সংখ্যা খুব কম।

“মনুষ্যজীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টিমাত্র।

শত শত বৎসরের বিপ্লবে যাহা না করিতে পারে একটি

মুহূর্তের ক্ষুদ্র ঘটনাতেও সম্পন্ন হয়।”

- শোভনা ও রমেশের জীবনে যে ঘটনাপ্রবাহ দেখা দিয়েছিল সেই সূত্রে আলোচ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সঙ্গতিপূর্ণ।

“রাজা হইয়া যে নিয়ম ভঙ্গ করে, সে অবিচার করে - সে রাজা

নহে -সে স্বৈচ্ছাচারী -সে অধর্মচারী।”

-রাজমহিষী, রাণা ভীম সিংহের উদ্দেশ্যে যে আশু বাক্যটি প্রয়োগ করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

“কঠোর কর্তব্যের নিকট পিতা-মাতা, ভাই-ভগিনী, পত্নী-পুত্র, স্নেহ-মমতা কাহার স্থান নাই।”

-ভীম সিংহকে উদ্দেশ্য করে রাজসিংহের এই মূল্যবান উক্তিটির আবেদন চিরন্তন।

“সংসার ভোজবাজি, অদৃষ্ট বাজিকর কি কৌশলে যে এই বাজি খেলিতেছেন তাহা বুঝা দেবতার অসাধ্য, মানুষের কি কথা।”

— নিয়তির অঙ্গুলি নির্দেশ বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

“ক্ষত্রিয়ের জীবন নির্দেশ অপেক্ষা তাহার নাম, বীরত্ব, যশ অতি মূল্যবান।”

-অজয় সিংহের সাথে সৈনিকের ক্ষাত্র তেজ সম্পর্কিত উপলব্ধির পরিচয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

“সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ।”

— স্বামী প্রেমবন্ধিতা নারীর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যায় আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

“তপস্যা বিফল হইবার নহে, ভগবৎপ্রসাদ মিথ্যা নহে,

কিন্তু সকল সফলতার মূল্যেই ধৈর্য, আত্মদমন ও কালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন।”

- মানুষের বাসনা তখন-ই সফল হয় যদি সে ধৈর্য ও নিষ্ঠা সহকারে সাধনা করে থাকে।

সহ্য করে কর্তব্য পালনে মনুষ্যত্ব।”

— কর্তব্যপালন মনুষ্য ধর্ম। এই লক্ষ্যে পৌছতে গেলে সহ্য গুণ থাকা দরকার।

“হায়! ক্ষণ কাহার জন্য অপেক্ষা করেনা- যে তাহাকে

ধরিতে পারে সেই ভাগ্যবান - যে পারেনা সে হতভাগ্য।

সকলেরই অবজ্ঞাজান।”

শুভ মুহূর্ত যে হেলায় নষ্ট করে ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি সুপ্রসন্ন হন না এই অর্থে আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

“দেশানুরাগ শিক্ষা দিতে হলে ন্যায়ানুরাগ স্বার্থত্যাগ, একতা

এসব আগে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক।”

- স্বদেশপ্রেমিককে ন্যায়ের পূজারী ও পরার্থে নিবেদিত প্রাণ হওয়াটাই সঙ্গত, এই সূত্রে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রবাদ-প্রবচনের ভাষা যেমন গল্পগুলিতে ভিন্নমাত্রা এনে দিতে পেরেছে, ঠিক তেমনি বর্ণনা অংশের মধ্যে বিশেষত রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় মেলে।

মালতীর রূপের বর্ণনা —

“মালতী মৃদু হাস্যময়ী কুসুম কলিকা।”

- জ্যোৎস্নালোকিত রাতে গল্পের নায়িকা মালতীর রূপ বর্ণনাটি স্বর্ণকুমারী দেবীর কলমে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

‘কান্তিবাবুর খোসনাম’ গল্পের সুমিত্রা একটি অন্যতম নারী চরিত্র। সুমিত্রার রূপ ও সজ্জার প্রসঙ্গে লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গী —

“সুমিত্রা উড়েনী, আধা বয়সী; তাহার খাটো চুলের বাঁটিটি শাড়ির ছেঁড়া পার দিয়া অতি মনোমোহন রূপে বাঁধা। তাহার সীথির দুই পাশ হইতে সমুখের কপালের উপর তেল জব-জবে, পেটে পাড়ান, চুলের বাহার খুলিয়াছে। সুমিত্রার বাকি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উল্কি ভূষণে ভূষিত।”

‘পেনে প্রীতি’ গল্পে এক মারাঠী কন্যার রূপের বর্ণনা লেখিকা নিম্নরূপভাবে দিয়েছেন-

“পুষ্পগুচ্ছ হস্তা, পীতবসন একটি মহারাষ্ট্রী কন্যা সে বালা কিশোরী, শ্যামা সুবদনি, ললিতা। প্রফুল্ল হরিণীর ন্যায় চঞ্চল। তাহার সুকোমল সহাস্য, আনন, তাহার সুহাব-ভাব।”

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের চিত্রকল্প গুলিও আমাদের মুগ্ধ করে। যেমন -

“কাননের এক প্রান্তে সুনির্মিত গ্রাম্যপথ, অন্য প্রান্তে অবধি জলপূর্ণ নদী; নদীর তীরে একদিকে কজ্জরের গ্রাম্য সহর, অন্যদিকে স্থানে স্থানে কুটীরাবলী; দূরে চতুর্দিকে ছবির মত পাহাড় চিত্র।”

নারী মনস্তত্ত্ব বর্ণনার পাশাপাশি মৃত্যুকামী শোভনা চরিত্রের সঙ্গে প্রগতির অনুসঙ্গ স্বর্ণকুমারী শিল্প সম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন -

“আমি কে? আমি কার? আমি যখন আমার স্বামীরই নই, তখন আমি কার? আমার স্বামীই যখন আমায় চান না, তখন আমাকে আর কে চায়? সংসার আমাকে চায় না, অন্য সব দূরে থাক - আমি নিজেই আমাকে চাইনে, তবে বাঁচিয়া আর নরক ভোগ কেন? আমি আজ মরিলে সে পূর্বের মত পৃথিবী মেরুদণ্ডে ঘরিবে, সংসার সেই পুরাতনভাবে সমান চলিবে। আবার হেমন্তের পর বসন্ত আসিবে, অমাবস্যার পর চাঁদের উদয় হইবে, আত্মীয়েরা সেই আগেকার মত খাইবে, শুইবে, বন্ধুরা একবার মাত্র অশ্রুজল ফেলিয়া আবার নূতন আমোদে মত্ত থাকিবে, আর আমার সর্বস্বধন-যারপরনাই সেই স্বামী? তিনি? তিনি কি করিবেন? এক ফোঁটা অশ্রুজল ফেলা দূরে থাক, হয়তো নিষ্কণ্টক হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি সুখীই হইবেন, তবে-তবে? আর একবার শোভনা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, মাথা ঘুরিতেছিল, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলনা - অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার নদীর অন্ধকার জল, তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। শোভনা সেই ঘূর্ণ-নদীর আবর্ত মধ্যে বিঘূর্ণিত হৃদয়ে বাঁপাইয়া পড়িল।”

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে কাব্যগুলির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। যেমন -

“তখনও সূর্যের আলো কনক ঝরণায় দিগদিগন্ত স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। রাস্তার অভ্রগুলো দিবা-খদ্যোতের ন্যায় ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছিল; পাশের মাঠে কাশগুচ্ছের উপরে সূর্যের কনকপ্রভা খেলিয়া যাইতেছিল। শিউলি ফুলের সুগন্ধ শরৎকালে বসন্ত জাগাইয়া তুলিয়া ছিল। বর্ণের শোভায়, গন্ধের হিল্লোলে চারিদিকে যেন সুখের তরঙ্গ বহিয়া যাইতেছিল।”

আলোচ্য গল্পটিতে শরৎকালের শিউলি ফুলের গন্ধ ও কাশগুচ্ছের ওপর সূর্যের কিরণের নিখুঁত বর্ণনাটি প্রকৃতি চেতনার সার্থক দৃষ্টান্ত।

প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মহিলা গল্পকার সরসীবালা বসুর গল্প সংকলন গ্রন্থের গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ। ‘গ্রন্থের ফাঁদ’ গল্পটি আয়তনে বড় এর পরিচ্ছেদ সংখ্যা উনিশটি। ‘অসহযোগ’ গল্পের পরিচ্ছেদ সংখ্যা পাঁচটি, ‘আঁতর’ গল্পে ছয়টি, ‘পাশ না ফেল’ গল্পের পরিচ্ছেদ সংখ্যা সাতটি। ‘চুরি’ গল্পের চারটি, ‘আগাছা’ গল্পটি ছটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হয়েছে। ‘গোপীভাব’ গল্পটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা ছয়টি। ‘মার্শাল্ল’ গল্পটি চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত ‘প্রেম’ গল্পের পাঁচটি পরিচ্ছেদ ‘প্রণয় পরিণাম’ গল্পে চারটি পরিচ্ছেদ। ‘সাধন পথে’ গল্পটির পরিচ্ছেদ ছ’টি। ‘মধুরেণ সমাপয়েত’ গল্পটি আদ্য-মধ্য ও অন্ত্য এই তিনটি পর্বে লেখা হয়েছে। প্রতিটি গল্পের পরিচ্ছেদ সম মাপের নয়। গল্পগুলির আয়তন কোনটি ছোট, কোনটি মাঝারি, কোনটি বড়। বড় গল্পগুলি রচনার সময় সরসীবালা বসু গল্পের ভাব ও সংহতিকে অক্ষুণ্ন রেখে শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম দিককার গল্পগুলির প্লট সুসূক্ষ্ম। শেষের দিকের গল্পগুলির প্লট কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ। আঙ্গিকের অভিনবত্ব তাঁর গল্পগুলিকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে।

‘চুরি’ গল্পের শুরুতেই রয়েছে নাটকীয়তা -

‘মা, মা চেয়ে দেখ, ছেনী কি পরে এসেছে’ -

গল্পটির সমাপ্তি অংশটিও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে -

“চুরি ! চুরি !

স্ত্রীলোকের অদ্ভুত জুয়াচুরি

সরলা গৃহস্থ বধু ও কন্যাগণ, সাবধান, নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার জন্য কেহ গহনা চাহিতে যাইলে কদাচ দিবেন না।”

‘প্রকাশকের বিড়ম্বনা’ সরসীবালায় এক অনবদ্য গল্প। এই গল্পটি ব্যঙ্গধর্মী। গল্পটির প্রারম্ভাংশ রসোত্তীর্ণ।

‘নেলী আট-বছর-বয়সে পিঠের উপর বেণী ঝুলাইয়া খাতা, পেন্সিল, শ্রেটবই বগলে

লইয়া যখন মিশনারী স্কুলে পড়িতে যাইত, তখন হইতেই সে পদ্য লিখিতে বা পয়ার বাঁধিতে শিখিয়াছিল।’

একদিন সে ‘কথামালা’র গল্প পড়িয়া নিজের বাদামী রঙের খাতায় বড় বড় অক্ষরে পদ্য লিখিয়াছিল :-

“কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলে দিল মাংসখণ্ড যা ছিল তার মুখে।”

গল্পটির সমাপ্তি অংশটিও ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ —

“আম্না সে কথায় কান না দিয়া অদূরে প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজেও অকারণে রাগ্তা হইয়া উঠিতে লাগিল।”

‘আগাছা’ গল্পটি শুরু হয়েছে নিম্নোক্তভাবে —

‘নলিনাক্ষ যখন আরায় ডাক্তার, সেইসময়, একদিন বর্ষণমুখর শ্রাবণের অপরাহ্নে এক দরিদ্রা ছিন্ন মলিন বাস পরিহিতা হিন্দুস্থানী নারী ছয়মাস আন্দাজের একটি শিশুপুত্রকে বক্ষে লইয়া তাঁহার বাড়ীর আঙিনায় আসিয়া দাড়াইল।’

‘আগাছা’ গল্পের সমাপ্তি অংশেও লেখিকার মুন্সীমানার পরিচয় দেখা যায় —

“ঐ ধীরে ধীরে অন্ধকারের কাল যবনিকা সরিয়া গিয়া উষার রক্তরাগ নীল আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছে। ঐ দলে দলে বিহঙ্গকুল কলকাকলিতে প্রভাত বন্দনা গাহিতে শুরু করিল, ভজু আর ফিরিল কই?”

সরসীবালা বসু তাঁর গল্পের বর্ণনা অংশে রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ‘সাধনপথে’ গল্পে শৈলেশ্বরের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন - ‘সুচারু সুশিক্ষিত, গুপ্তী, সুস্থকায় যুবক শৈলেশ্বর।’

আলোচ্য বর্ণনাংশে সার্থকভাবে অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘটনার পরিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখিকার বর্ণনাটিও অনবদ্য —

“ভোর হয় - ধারা-স্নাত পবন দ্বিগুণ শীতল হইয়া লেবুফুলের সৌরভ লইয়া দাতার আসন গ্রহণ করিয়াছে। সম্রাটের অন্তঃপুরের নহবৎখানায় অতি মধুর স্বর বাঁশীতে সুর বাজিতে শুরু হইয়াছে। অদূরে মসজিদে গম্ভীর আজানধ্বনির পবিত্র রণন সবেমাত্র থামিয়া গিয়াছে। এই সময় কারাগারের প্রহরী আসিয়া মশুরকে চুপি চুপি সংবাদ দিল - রাজবন্দী হিন্দু যুবা এবং তিনজন সহচর পলাতক - বাদশাহের অঙ্গুরীয় নিদর্শন দেখাইয়া বোরখা ঢাকা এক স্ত্রী মূর্তি তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে। মশুর আভাসে ইতঃপূর্বেই কতক কতক অনুমান করিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক, নিয়মানুযায়ী সেই সংবাদ তখনই সে বাদশাহকে জ্ঞাপন করিতে গেল। সম্রাট বিনিদ্র অবস্থাতেই শয্যার শয়ান

ছিলেন ; সংবাদ শুনিয়া বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইলেননা - ধীরভাবে কহিলেন,

‘রাজধানীতে এ সংবাদ রটনা না হইলেই মঙ্গল।’

চরিত্র চিত্রণের ক্ষেত্রে সরসীবালা বসু শিল্পসিদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। নারী চরিত্র হিসেবে ‘চুরি’ গল্পের বিজলী ও চপলা চরিত্র দুটির মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা তুলে ধরেছেন পাশাপাশি পুরুষ চরিত্র হিসেবে চন্দ্রনাথ চরিত্রটি জীবন্ত।

‘আগাছা’ গল্পের নলিনাক্ষ ও দুলাল চরিত্রদ্বয় রক্তমাংসে গড়া। সুশীলা, স্বর্ণলতা, নিরুপমা এই ত্রয়ী চরিত্র বর্ণনায় সরসীবালা অসাধারণ শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন।

‘গোপীভাব’ গল্পের ঠাকুন্দা চরিত্রটিতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে।

‘সহযোগ’ গল্পে শ্যামা ও সুধীরের কথপোকথনে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। এছাড়া নিলীমা গণেশ ও শরৎ চরিত্র তিনটি সার্থক।

‘মার্শাল ল’ ছোটগল্পের শ্যামাচরণ ও প্রসাদ চরিত্রদ্বয় স্বল্প পরিসরে পূর্ণরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

‘প্রেম’ গল্পের সিরাজী ও বেগম চরিত্রদ্বয় প্রাণবন্ত। এছাড়াও বাদশাহ ও সুখিনা চরিত্রে সজীবতার পরিচয় মেলে। ‘প্রণয়-পরিণাম’ ছোটগল্পের উর্মিলা ও মলিনা চরিত্রদ্বয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা আলোকপাত করেছেন।

দুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে লেখিকা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

গল্পের নামকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরসীবালা বসু শিল্পগুণের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর ‘যমুনা’ ও ‘মিলন’ গল্পদ্বয় চরিত্রকেন্দ্রিক। ‘খুকীরকিত্তী’, ‘ভাড়াটে’, ‘ব্যর্থ প্রণয়’, ‘কিত্তীরডাকাতি’ ‘পাশ না ফেল’ - গল্পগুলি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক। ‘এপ্রিলফুল’ ‘হতাশপ্রেমিক’, ‘আতর’, ‘গ্রহের ফাঁদ’ ‘দাগা’ ‘মধুরেণ সমাপয়েৎ’ ‘আগাছা’ ‘সাধন পথে’ ‘প্রকাশকের বিড়ম্বনা’ ছোটগল্পগুলির নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী।

সরসীবালা বসু তাঁর ছোটগল্পে অন্যান্য বিদেশি ভাষার পাশাপাশি সংলাপ অংশে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার করেছেন।

“নিজেদের Duty neglect করা তা বলে উচিত হয় না,

duty is duty ”. (পাশ না ফেল)

“আপিসে যে Message receive করেছে হয়তো সেই ভুল করে ভুল খবর রটিয়েছে।”

‘মার্শাল ল’ গল্পে কাণ্ডেনের মুখে ইংরেজী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে -

My boo, you have come in the field, but I see still you are

ignorant of the martial Law- Beg your Pardon Sir.”

‘পাশ না ফেল’ গল্পে সুখলালের মুখে হিন্দী সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে - সুখলাল কহিল, “হুজুর আপলোগোঁ তো জল্দী বিশাওয়াস নেহী করতে হো, বাকী হামারা বাত মান্ লিজিয়ে, খোকাবাবু নে জরুর পাশ ছ্যা হোগা, পীর বাবাকো মানৎ করনে সে, উনকা নামসে জরুর কাম হাসীল হোতা হ্যায়, আপ ই বাতমে ধোকা মৎ কিজিয়ে।”

নিম্নে একটি সংলাপ অংশ প্রদত্ত হলো - (সহযোগ গল্প থেকে)

“বিমলেন্দু কহিল - “সেখানে কিন্তু বউদিদির মতন ওস্তাদী হাতের সোয়াদ মিল্ত না।

শরৎ কহিল - “ততক্ষণ একটু গানটান গাই এস হে, নেহাৎ চুপচাপ -”

বাধা দিয়া সুধীর কহিল - “না হে, গানটান গেলো না। সেদিন সামনের ডাক্তার ভারী বকাবকি করেছিল। লোকটা বড় সুবিধের না।”

গণেশ কহিল - ‘বাঃ, এত ভারী মজার কথা। হরিনাথ ডাক্তার ভারী কড়া লোক ত ! তোমার বাড়ীতে তুমি গান করবে, নাচবে, তা ওর তাতে চোখ টাটায় কেন ? টাটায় তো চোখে ঠুলি দিয়ে থাকুক না।’

সুধীর কহিল - “তোমরা সেদিন নেশার ঝোঁকে যা তা গান গাইতে শুরু করেছিলে, তা বকবে না? ভদ্রলোকের বাড়ী - ওসব ঠিক নয় ভাই।”

গণেশ কহিল - ‘আরে তোমার ভদ্রলোক! ফুর্তি বুঝি ছোটলোকেরই একচেটে? একে তো দেশে কোথাকার কে এক গান্ধীর হুজুগ উঠেছে ‘মদ খেয়োনা, হেন কোরো না তেন কোরো না’- তারপর হুকুম জারী হবে এখন, ‘খীতু ফেলো না, চোখ চেয়ে দেখো না, নাকে গুঁকো না।’

বিমলেন্দু কহিল - “পেটে না পড়তেই যে তোমার বোলচাল ফুটতে শুরু হলো হে, গতিক তো ভাল নয়।”

গণেশ সুধীরকে ঠেলা দিয়া কহিল - “যাও দাদা, দয়া করে শ্রীহস্তের প্রসাদ নিয়ে এসো গিয়ে।”

— আলোচ্য সংলাপ অংশটির ভাষা চলিত। সরসীবালায় গল্পের বিশেষত্ব এই বর্ণনা অংশগুলি সাধী ভাষায় লেখা।

নারীর মুখের ভাষার বিশেষত্ব লেখিকার কলমে যথাযথভাবে দেখানো হয়েছে —

“পাড়ার একটি নববিবাহিতা কিশোরী অমনি ফরমাস করিল, ‘ওগো বোষ্টুমী, এইবার একটা মানভঞ্জন গাওনা গো।’ ঠাকুরমা কহিলেন, “ক্যান লো মাধু, মানভঞ্জনের খোঁজ ক্যান লো ? নাজ্জামাই কি চন্দ্রবলীর কুঞ্জে, যে মানময়ী সেজে বসেছি।” (‘গোপীভাব’)

সরসীবালা বসুর ছোট, মাঝারি ও বড় তিন ধরনের বাক্য ব্যবহার করেছেন। ‘সাধন পথে’ গল্প থেকে একটি বড় বাক্য নিয়ে প্রদত্ত হল, —

“মায়ের কথা অনেকদিন যাবৎ তেমন করিয়া ভাবে নাই, সে মায়ের কোলের ছেলে, বহুদিন যাবৎ বহু অত্যাচার আবদার করিয়া সে মায়ের কোলে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, দাদারা এজন্য অনেক সময় মাকে অনুযোগ করিত, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই কিছু কিছু বলিত, যা নীরবে গুনিয়া যাইতেন, দুরন্ত অশান্ত ছেলের আবদার সহিতে তবী কোনদিন তাঁহার শ্রান্তি বা বিরক্তি ছিল না, চিরটাকাল সে মায়ের কোল ছাড়া রাজিতে ঘুমায় নাই, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও মায়ের গলা ধরিয়া না গুলিলে তাহার ঘুম হয় নাই, অথচ সে যখন মাকে ছাড়িয়া দেশমাতার সেবার জন্য বাহিরে আসিতে চাহিল, মা নিষেধ করেন নাই, চোখের জল ফেলেন নাই।”

- এই দীর্ঘবাক্যটিতে দশটি কমার পর, পূর্ণচ্ছেদও পড়েছে।

এবার নিয়ে মাঝারি শ্রেণির বাক্য প্রদত্ত হল,

“মলিনা গত বৎসরে-ও এই স্কুলের ছাত্রী ছিল, এ বৎসর তার হঠাৎ পদ পরিবর্তন হইলে-ও বয়স্কা ছাত্রীগণ তাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনী হিসাবেই দেখিয়া থাকে, শিক্ষয়িত্রীর প্রাপ্য সম্মান তাকে মোটেই দেয় না।”

- এই মাঝারি বাক্যটিতে দু’টো কমার পর পূর্ণচ্ছেদ-ও পড়েছে।

ছোটবাক্যের দৃষ্টান্ত -

হিরন্ময় কহিল - “খদ্দর আমাদের সর্ব্বস্ব খদ্দরই গতি, খদ্দরই মুক্তি।”

- এখানে ছোট ছোট দু’টো বাক্যই ভাবপ্রবাহ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

সরসীবালা বসুর ছোটগল্পের মাঝে মাঝে সঙ্গীত ছড়া ও সুভাষণ ব্যবহার করে গল্পের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছেন। গোপীভাব গল্পে নগেনের কণ্ঠে আমরা একটি গান শুনি -

“দরশন বিনে মম প্রাণ যে যায়,

কোথা গেলে পাব তারে বলে দে আমায় !”

কিংবা, এই গল্পের অপর একটি গান, যে গানটি এক বৈষ্ণবী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে গিয়ে খঞ্জণী বাজিয়ে মধুর স্বরে গেয়েছিল,

“মেঘ দেখে যে পড়ে মনে সে মেঘবরণে

পদ্ম দেখে মনে পড়ে কমল চরণে।

সেই শিখীপুচ্ছ, চূড়া,

সে মোহন পীতধড়া,

আঁখি পানটিতে সদা জাগে নয়নে

দে সখি দে কৃষ্ণ এনে বাঁচি কেমনে,
বাঁচি কেমনে প্রাণগোবিন্দবিনে।”

— গানটির মধ্যে কৃষ্ণভক্তির যথার্থ পরিচয় মেলে। বৈষ্ণবীয় মধুর রস পাঠকের মনে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

অপর একটি বৈষ্ণবপদ ভাবের সঙ্গে মধুর বাংকার সৃষ্টি করেছে প্রেম গল্পে —

“কাহা পিয়া - কাহা - হৃদয়কা সাখী -

‘প্রকাশকের বিড়ম্বনা’ গল্পে দু’টি ছড়া রয়েছে, যে ছড়া দু’টি শিশুদের কাছে পরম উপভোগ্য,

ক) “কুকুর সে জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে,
ফেলেছিল মাংস খণ্ড যা ছিল তার মুখে।”

খ) “এক ছিল এক শেয়াল তার ছিল তিনটি ছেলে,
একদিন সে গাছে কাঁঠাল পেকেছে দেখতে পেলো-”

সরসীবালা বসু তাঁর গল্পে গল্প বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু পাণ্ডিত্য পূর্ণ বাক্য বা সুভাষণ ব্যবহার করেছেন। এই আগুপূর্ণ বাক্য গুলির আবেদন চিরন্তন। নিয়ে কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও সুভাষণের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো -

“শতমারী ভবেৎবোদ্য” (চুরি)

- এই প্রবাদ-প্রবচনটি পাঠকের মুখে মুখে ফেরে। যে বৈদ্যরা কঠিন রোগ দেখলেই যে কোন অজুহাতে রোগীর চিকিৎসা না করেই পালিয়ে যেত নিজের অনভিজ্ঞতার জন্য।

“যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা” (ঐ)

- এই প্রবাদ বাক্যটি আমাদের কাছে অতি পরিচিত। লেখিকা এই প্রচলিত প্রবাদটি চন্দ্রনাথ স্ত্রী চপলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল যা গল্পটির ভাব ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সুপ্রযুক্ত।

“এ যে দুধ দিয়ে কাল সাপ পোষাগো।”

- ‘আগাছা’ গল্পের নিরুপমার মুখ দিয়ে যে প্রবাদবাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে তার আবেদন চিরন্তন।

“বসন্তকালে মনটা আপনা হতেই হাল্কা হয়ে মধুর উদ্দেশ্যে প্রজাপতির মতো উড়ে যেতে চায়।”(চুরি)

- নগেনের মুখে এই আগুপূর্ণ বাক্যটি মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের উপযোগী।

“সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।” (ঐ)

- ভুজঙ্গ তার বন্ধু নগেনকে এই প্রবাদবাক্যটি শুনিয়েছে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লেখিকা সার্থকভাবে এই প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন।

“আত্ম বিস্মৃতিতে পুরুষত্ব জ্ঞান লীপ্ত হয়ে গোপীভাবে মন পূর্ণ হয়।” (ঐ)

- ভাগবতের এই মন্তব্যটি ঠাকুরদা নগেনকে শুনিয়েছেন। যে স্ত্রীলোক বেশী পুরুষটি বৈষ্ণব আখড়ায় এসেছিল সে আসলে গোপীভাবে কৃষ্ণের আরাধক। নারীবেশে গোপীভাব নিয়ে সে হয়ত সাধনা শুরু করেছে।

এছাড়া আরো একাধিক প্রবাদ বাক্য আছে -

১. ‘ন্যাড়া ক’বার বেল তলায় যায়’ ?
২. ‘পূর্বের সূর্য্য বুঝি পশ্চিমে উদয়’।
৩. ‘স্লেচ্ছের ভুবনে স্লেচ্ছলীলা’- প্রভৃতি।

লেখিকা ‘মার্শাল ল’ গল্পে বাঙালদের বিদ্বৎ করে একটি ছড়াগান সংযোজন করেছেন।

ছড়াটি হল,

“বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু,

লক্ষ্য দিয়া গাছে ওঠে, ল্যাজ নাই কিন্তু।” অথবা -

“মানুষ কার দাস-আইনের না বিবেকের ?”

‘প্রেম’ গল্পের নিম্নোক্ত আশুপূর্ণ বাক্যটি ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে,

“যে বীর, যে মহত্ত্বের উপাসক - যে ভগবানে যথার্থ বিশ্বাস করে, ধর্মের বাহিরের আবরণ লইয়া যে নাড়াচাড়া করে না, সকল গুণ হৃদয়ের মধ্যেই সে খোদা তালার পাদপীঠ দেখিতে পায় ; সুতরাং প্রেমকে সে কখন-ও ঘৃণা করে না।”

লেখিকা গল্পের স্থানে স্থানে একাধিক চিঠিপত্র সংযোজন করে গল্পকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলেছেন। ‘প্রকাশকের বিড়ম্বনা’ গল্পে ৩টি চিঠি স্থান পেয়েছে তন্মধ্যে একটি চিঠি - সুধেন্দু নেলীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছে। চিঠিটি নিম্নরূপ,

চিরায়ুস্মৃতিষু -

তোমার সাহিত্যসাধনা সফল হোক। প্রথম রচনাই বেশ আশাপ্রদ। আশা করি বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবায় তুমি দিন দিন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। বই’র নাম “কালির আঁচড়”ই রেখেছি ; এ আঁচড় কিন্তু সহজেই বুকে পড়ে।”

- সুধেন্দুদা

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সরসীবালা বসু একটি-ও চিঠির আকারে গল্প রচনা করেন নি। তাঁর গল্পে উত্তম পুরুষের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তিনি মূলত বর্ণনার মাধ্যমে ও সংলাপের মাধ্যমে গল্প বলার রীতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। এই উপস্থাপন কৌশল গল্পগুলিকে শিল্পসফল করে তুলেছে।

বাংলা মহিলা গল্পকারদের মধ্যে পূর্ণশশীদেবী একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর প্রতিটি লেখা সাবলীল, প্রতিটি গল্প যেন ছবির মতো। অত্যন্ত মমতা দিয়ে তিনি এঁকেছেন বাঙালি পরিবারের সুখ-দুঃখময় জীবন। তাঁর প্রতিটি গল্প যেন পাঠকের মনে দাগ কেটে যায়। কবিত্বের ঝর্ণাধারা পাঠকের হৃদয়কে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। তাঁর প্রতিটি গল্প বর্ণনা-গুণে সংলাপ-নৈপুণ্যে, চিত্রকল্পের যথাযথ ব্যবহারে, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে, কাব্যগুণ ও উপস্থাপন-কৌশলের অভিনবত্বে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। আজও তাঁর গল্পগুলির আবেদন হ্রাস পায়নি। উপমার মনোহারিত্বে, চরিত্র-উপযোগী যথাযথ ভাষার ব্যবহারে, সর্বোপরি অভিনব আঙ্গিকের রূপায়নে পূর্ণশশীদেবী যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে পূর্ণশশী দেবীর গল্পগুলির নামকরণ বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনধর্মী। তাঁর লেখা গল্পগুলি হ'ল - 'মায়ার বন্ধন', 'ববুয়া', 'ছেঁড়া ডায়েরী', 'নিরুদ্দেশের যাত্রী', 'সোহনি-মিহওয়াল', 'সহমরণ', 'স্পর্শের মায়', 'শরণাগত', 'সর্বহার', 'অভিসার', 'রিত্তা', 'পাঞ্জাবের একটি রোমান্স', 'ক্ষণিকা' 'দুইদিক', 'মেঘ-মুক্তি', 'আলো ও ছায়া', 'দুশমন'। প্রতিটি গল্পেরই নামকরণ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাঁর 'মায়ার বন্ধন' গল্পটি চারটি পর্বে লেখা হয়েছে ; 'ববুয়া' গল্পটির পর্ব সংখ্যা পাঁচ, 'ছেঁড়া ডায়েরী' পর্বহীন গল্প। এটি ছ'পৃষ্ঠায় লেখা। 'নিরুদ্দেশের যাত্রী' গল্পটি ন'পৃষ্ঠার পর্বহীন গল্প, 'সহমরণ' গল্পটি আঠারো পৃষ্ঠার। এতে কোনো পর্ব নেই। 'স্পর্শের মায়' গল্পটি তিনটি পর্বে বিভক্ত। এটি এগারো পৃষ্ঠার গল্প। 'শরণাগত' একটি বড় গল্প। এটি তিরিশ পৃষ্ঠায় লেখা। এতে কোন পর্ব নেই। 'অভিসার' গল্পটি বারো পৃষ্ঠার। 'রিত্তা' গল্পটি আয়তনে ছোট। এটি চার পৃষ্ঠার গল্প। 'ক্ষণিকা' গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার। 'দুই দিক' এটি ছয়টি পর্বে বিভাজিত হয়েছে। 'মেঘমুক্তি' গল্পটি আট পৃষ্ঠার। 'আলো ও ছায়া' গল্পটি ন'পৃষ্ঠার ; 'দুশমন' গল্পটি ছয় পৃষ্ঠায় লেখা। গল্পগুলির আয়তন বড় হলেও গল্পের একমুখীনতা, ক্লাইম্যাক্স, ভাষার সংহতরূপ ও দ্রুতগতি গল্পগুলিকে রসোত্তীর্ণ করেছে। আবেগ ও উচ্ছ্বাসবশত গল্পের সংহত রূপের ব্যত্যয় ঘটেনি।

গল্পের শুরু এবং সমাপ্তি অংশ শিল্পসম্মত হওয়া সঙ্গত। 'মেঘ মুক্তি' গল্পটি শুরু হয়েছে প্রকৃতির পটভূমিকায় - "শীতের সন্ধ্যা। অবিরাম বৃষ্টি। ভালো লাগেনা আর! বড়ই বিষন্ন, অলস ও ক্লান্তিকর ঠেকছে আজকের দিনটা বিশেষ করে এই সন্ধ্যা।"

গল্পের সমাপ্তি অংশটিও ব্যঞ্জনধর্মী -

“তখন নির্মেষ নির্মল পূর্বাকাশে বলমলিয়ে উঠেছিল জ্যোতির্ময়

স্বর্ণশতদল হাজার - হাজার সোনার পাপড়ি মেলে।”

‘দুশমন’ গল্পটি শুরু হয়েছে একটি গ্রাম্যজীবনের পটভূমিকায়।

“পাঞ্জাব অঞ্চলে জলন্ধর জেলায় একখানি গ্রাম। গ্রামখানি নিতান্ত ছোট নয়, কিন্তু গ্রামের বাসিন্দা অধিকাংশই কৃষিজীবী, গোয়াল, কামার, ছুতোর, মিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রমিক শ্রেণীর লোক।

বাড়ীঘর প্রায় মেটে এবং কাছাকাছি - গাঁয়ে গেলো করিম মিঞা লোহারের ছোট্ট বাড়িখানা এতটুকু তফাতে ফাঁকা জায়গায়, তার আশেপাশে কোনো বসতি ছিলনা - শুধু গাছপালা। সন্ধ্যা না হতেই সেখানে ঘনিয়ে আসে রাতের অন্ধকার - নিশীথের নিস্তব্ধতা।”

সমাপ্তি অংশে অরণ্য বেষ্টিত গ্রাম্যপ্রকৃতি বিশেষ করে সাক্ষ্যকালীন নিস্তব্ধ পরিবেশ গল্পটির আবহসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। গল্পের শেষে আমরা দেখি নিস্তব্ধ নিঝুম পরিবেশ -

“নিবিড় অন্ধকার, গাছপালা ঝোপে-ঝোপে শুধু জোনাকিদের ঝিকমিকি-আর কিছুই দেখা যায় না। কোনোখানে কারও সাড়া শব্দ নেই, চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম, সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন জোহরার কানে গেল রোশনের সেই গান -

“লাজিম না থা ইয়ে তুমকো

দিল লেকে দগা কর না.....

আঃ দু’হাতে বুক চেপে ধরে অভাগিনী জোহরা, ঘরে এসে লুটিয়ে পড়ে - ছিন্ন কণ্ঠ বিহগীর মত।”

‘সহমরণ’ গল্পটিতে আমরা দেখি পিতা কন্যার প্রতি অবিচার করেছেন। এরপর অনুতপ্ত পিতা কন্যার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। রক্ষণশীল ও ধর্মভীরু পিতার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ছিল অবিচল। গল্পটির শুরুতে কন্যার জবানীতে পিতার উপাসনার প্রসঙ্গ লেখিকা অনবদ্য ভাষায় তুলে ধরেছেন, -

“শুধু আজ বলেই নয়, আ-শৈশব দেখে আসছি, বাবা তাঁর নিরিবিলি পূজার ঘরটিতে বসে, চোখ বুজে যখন উপাসনা করেন তখন তাঁর মুদিত আঁখি পল্লব ভেদ করে অশ্রুজলের বড় বড় ফোঁটা গাল বেয়ে বুকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানিতে গড়িয়ে পড়ে ঝরঝর করে, এক-আধ দিন নয়, নিত্য দুটি বেলা।”

সমাপ্তি অংশটি ঘটনা ধারার সঙ্গে সম্মতি রেখে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে,

“তাঁর ব্যথা পান্ডুর সৌম্যবদনে পবিত্রতার দিব্য জ্যোতিঃ, প্রশান্ত করুণ নয়নে মমতার বিগলিত অমৃত উৎস, - একে ? এতো রক্ত পিপাসু কাপালিক নয় - আমার চির স্নেহময় করুণাময় বাবা।”

পূর্ণশশী দেবীর গল্পের বর্ণনা অংশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন গল্পেই তিনি বর্ণনা অংশে কিংবা সংলাপ অংশে সাধুভাষার প্রয়োগ করেন নি। তাঁর রূপের বর্ণনাগুলি যেন জীবন্ত। সহজ, সরলভাষায় তিনি সহজেই পাঠকের কাছে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন -

“কাশীধামে ভাগীরথী তীরে একটি দ্বিতল বাটীর ছাদের উপর একজন বিধবা প্রৌঢ়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিল। তখন সবেমাত্র সূর্যাস্ত হইয়াছে তপনের পরিত্যক্ত স্বর্ণাভ কিরণ নীলাকাশ-পরিশোধিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলদখণ্ডগুলিকে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতেছিল। আর নিম্নে জাহবীর

আচঞ্চল প্রশান্ত বক্ষে, সেই সুরঞ্জিত চিত্রিত নীরদখণ্ডগুলি রামধনুবৎ বিচিত্র সুন্দর স্ব স্ব প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিল। ভাগীরথীর স্থির, শান্ত, সলিলরাশি আলোড়িত করিয়া আরোহীগণকে বক্ষে লইয়া মধ্যে মধ্যে দুই একখানি তরনী ধীর মন্থর গমনে ভাসিয়া আসিতেছিল।”

- অন্যদিকে উজরিয়ার রূপের বর্ণনাটি লেখিকার কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ‘ববুয়া’ গল্পে -

“ছেদিরাম ঘরামীর স্ত্রীর, ‘উজরিয়া’ বাস্তবিক উজ্জ্বল গৌরাঙ্গী না হইলেও তাহার রূপখানি নেহাত মন্দ ছিলনা। বর্ষায় ধোয়া কচি কিশলয়ের মত স্নিগ্ধ শ্যামল, বর্ণ, ধারাল নাক-চোখ, ঢলঢলে সুন্দর মুখশ্রী, সর্বোপরি তাহার সেই নিটোল স্বাস্থ্যে ভরা কমনীয় দেহখানর লতানো গড়নটুকু দেখলে সে যে সুন্দরী তাহা দর্শক মাত্রেকেই স্বীকার করিতে হইত।”

লেখিকার কলমে প্রকৃতির বর্ণনাটিও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ -

“তখন কৃষ্ণ পক্ষের নিস্প্রভ পাণ্ডব জ্যোৎস্নাটুকু খোলা দরজা দিয়া আসিয়া অন্ধকার ঘরখানির কিয়দংশ আলোকিত করিয়াছে।”

মানবজীবনের সঙ্গে নিসর্গ বর্ণনার যোগসূত্র স্থাপনের বিষয়টি লেখিকা নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেছেন ‘ছেঁড়া ডায়েরী’ গল্পে -

“বর্ষার সূর্য্য সারাদিন প্রচ্ছন্ন থেকেও যেমন বিদায় বেলায়, সজল কাজল মেঘের বুকে রামধনুর বিচিত্র রং ছড়িয়ে যায়, তেমনি-ঠিক তেমনি করেই এ আশাহতের তিমিরঘন প্রাণে সোনার রং ফলিয়ে সে চলে গেছে।”

বিরহিনীর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি প্রাকৃতিক পটভূমিকায় লেখিকা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন ‘অভিসারে’ গল্পে-

“সুন্দর মুখখানি তার ব্যথায় স্রিয়মান, কনে দেখা বেলার ঝিকমিক আলো, সে মুখের করুণ-মধুর সৌন্দর্য্য আরো বিকশিত করে তুলেছে যেন। ঝিরঝিরে বাতাসে ঘন-পল্লবিত বকুল শাখা হতে শিখিল বৃন্ত বকুল ফুলগুলি তার মাথার এলোমেলো চুলে, পুষ্করিণীর জলে খসে পড়ছে, টুপটুপ করে - অশ্রুজলের বড়বড় ফোটার মত।” প্রকৃতি বর্ণনায় লেখিকা ব্যক্তিরিত্রের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপন করেছেন। নিম্নে এই বর্ণনা অংশটি প্রদত্ত হল -

“ভোরের গুহ্র স্নিগ্ধ আলো জানলার ফাঁকে এসে পড়েছে রোগীর মলিন শয্যায় একরাশ সাদা জুঁইফুলের মত।”

‘ক্ষণিক’ গল্পের অপরিচিতা তরুণীর রূপের বর্ণনা :-

“বয়স চব্বিশ পঁচিশের মধ্যে। শ্যামলবর্ণ, পরনে একখানি ফিকে সবুজ রং-এর শাড়ী, ছিপছিপে গড়ন, মুখে চোখে একটা স্নিগ্ধ লালিত্য, বেশ দেখতে!”

পূর্ণশশীদেবীর গল্পের বাক্যবিন্যাস শিল্পগুণ সম্পন্ন। তিনি বাক্যগুলিকে সমমাপে

ব্যবহার করেন নি। বিষয়বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য তাঁর কোন বাক্য দীর্ঘ, কোনটি মাঝারি আবার কোনটি ছোট। নিয়ে একটি বড় বাক্য ‘ববুয়া’ গল্প থেকে তুলে দেওয়া হল।

“আবার ঘরামী বধু উজরিয়ার চালচলন, হাবভাব ও বেশভূষাতেও এমন একটা সৌষ্ঠব ও বিশেষত্ব দেখা যাইত, যাহা তাহাদের সমশ্রেণী ও স্বজাতীয়দের মধ্যে একটা আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং উজরিয়ার চরিত্রগত কোনও দোষ দেখিতে না পাইলেও তাহার রঙ্গ চঞ্চল চপল স্বভাব এবং বিলাস-প্রিয়তার জন্য প্রতিবেশী মহলে বেশ একটু কানাঘুসা শুনা যাইত।”
তাঁর মাঝারি বাক্যগুলিও ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিখিত হয়েছে -

“স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য-যন্ত্রণা-ক্লিষ্টা, শোক-দুঃখে মুহ্যমান কাত্যায়ণীকে তাঁহার দেবর রমেশচন্দ্র ও ছোটজা কমলার একান্ত আগ্রহ ও নির্ব্বন্ধাতি-শয্যেই হৃদয়ের অগ্নি হৃদয়ে চাপিয়া পুনর্বার সংসারে লিপ্ত হইতে হইল।” (‘মায়ার বন্ধন’)

বর্ণনা অংশে ও সংলাপ অংশেও ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে গল্পকে গতিময় করে তুলেছেন।

“তুমি বড় দুষ্ট, আমাকে ফেলে পালাচ্ছ।”

লেখিকা ছোটগল্পে প্রশ্নবোধক বাক্যগুলিও যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন।

১) ‘না রে সোনামণি?’

২) ‘মনের বিশ্রাম কোথায়?’

৩) ‘মেম সাব ঘরমে হ্যায়?’

৪) ‘কেন গো? এত অবিশ্বাস? তাহলে আমাকে ভালবাসবে কেমন করে বলতো?’

নঞর্থক বাক্যগুলিও তিনি ব্যবহার করেছেন যথাযথভাবে। যেমন - কলি, তোর বাবাকে এবার আর বাঁচাতে পারবিনা - ধর্ম পথে বাঁচবার উপায় নেই - যত চেষ্টা করো।

“না আমি তোমাকে বাঁচাবো বাবা, তোমাকে অমনি নিষ্ঠুরভাবে মরতে দিতে আমি পারব না।”

পূর্ণশশী তাঁর গল্পে গজল গান থেকে শুরু করে রবীন্দ্র সঙ্গীত, ছড়া, ভক্তীগীতি, ভজনগান, ঠুংরী, ফার্সীগান, প্রেমগীতি ব্যবহার করে গল্পগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। যখন সংলাপ বা বর্ণনার মাধ্যমে মনের ভাবপ্রকাশ করা যায়না তখন তিনি চরিত্র পরিণতি ও ঘটনাধারার দিকে লক্ষ্য রেখে সঙ্গীতগুলি ব্যবহার করেছেন।

নিয়ে একটি সুমধুর গজল গান প্রদত্ত হলো -

“উমড়ি ঘুমড়ি আই কারিরে বদরিয়া,

যায় রহে সইয়া কওন নগারিয়া।” (‘ববুয়া’)

সেতারের মিষ্ট আলাপে মধুর কণ্ঠ মিলিয়ে একটি ফার্সী গান পরিবেশিত হয়েছে ‘সহমরণ’ গল্পে -

“পসে মরগ মেরে মজার পর
জো দীয়া কিসিনে জ্বলা দিয়া
উসে হাম দামনে বাদনে
সবে শামহি সে বুঝা দিয়া।”

- গানটি বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় -

“মরণের পর মোর সমাধি তলে যে দীপখানি জ্বালিয়া ছিলে,
নিষ্ঠুর বাতাস তার চঞ্চল আঁচলে সাঁঝ না হতে নিভিয়ে দিলে।”

‘স্পর্শের মায়া’ গল্পে একটি ঠুংরীগান গল্পটিতে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে -

“জীয়া চাহে করুতো কা পেয়ার
শ্যামলী সলনী ও প্যারী নার !”

‘সর্বহারা’ গল্পে মীরার একটি ভজন গান গল্পরসকে ব্যহত করেনি -

“মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরো না কোই।
যাকে শিরো লৌর মুকুট, মেরো পতি সোই,
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদা, কণ্ঠমাল হোই।”

পূর্ণশশী দেবীর কিছু কিছু বাক্যে সমাজ সম্পর্কে সুনিশ্চিত অভিমতগুলো ব্যক্ত হয়েছে।
তঁার এই নিজস্ব বক্তব্যগুলি চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি করেছে। আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সরস বুদ্ধিদীপ্ত
গদ্যভাষার সার্থক সংযোজন ঘটেছে। তঁার এই সুভাষণগুলি গল্পে অনন্যতা দান করেছে। ব্যঞ্জনার
গভীরতায় ও গৌরবে গল্পগুলি অসামান্য। নিম্নে লেখিকার আগুপূর্ণ বাক্যগুলি প্রদত্ত হলো :-

“রূপবতী ভার্য্যা শত্রু।”

- ছেদিরাম তার রূপবতী স্ত্রী উজরিয়া প্রসঙ্গে এই নীতিবচনটি যথার্থভাবে উপলব্ধি
করেছিল। রূপবতী স্ত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূপের জন্য অহংকারী হয়ে ওঠে।

এমনকি হারিয়ে ফেলে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। পরে তার স্বামীর কাছে শত্রুতে পরিণত হয়।

“শান্তি হারার পক্ষে সুনিদ্রা চিরদিনই দুর্লভ।”

— এখানে গল্পকথকের উপলব্ধি ব্যক্ত হয়েছে। গল্পকথক পিতৃ বিয়োগের জন্য
ব্যথিত। তার জীবনের সুখ ও শান্তি হারিয়ে গেছে, এমনকি সুখের নিদ্রা পর্যন্ত তার কপালে জোটেনি।
এই প্রসঙ্গে আলোচ্য সমাজ অভিজ্ঞতা প্রসূত বাক্যটি শিল্পসম্মত সন্দেহ নেই।

“রুটিনে বাঁধা একঘেয়ে দিনগুলোর মধ্যে মাঝে মাঝে একটুকু
পরিবর্তন যদি না আসে, তাৎক্ষণিক জীবনটা নেহাৎ মরুভূমি
হয়ে যায় যে!”

॥ ३६ ॥

- ୧୫୬

[illegible]

সংখ্যার দিক থেকে বেশি না হলেও তাঁর বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে ‘ননিখানসামার ছুটি যাপন’, ‘আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন’, ‘আদেশ পালন’, ‘করুণা দেবীর আশ্রম’, ‘পাঠশালার স্মৃতি’, ‘বোকার টুপি’, ও ‘ভূমিকম্প’ গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল ‘গোলাপ সিংহ’, ‘নিরঞ্জন সর্দার’, ‘মণীষা’, ‘লাফো’, ‘বিজয়ার নমস্কার’, ‘সূক্ষ্ম ধর্মজ্ঞান’, ‘কার্য্যাকারণ’, ‘দীপ্তি’ ‘বুনো ওল ও বাঘা তেঁতুল’, ‘ক্ষমতার জয়’, এবং ‘তোকে মেলে মেলে ইয়া-ইয়া খাঁ কলব’, - গল্পগুলির নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মী। শৈলবালার গল্পগুলির নামকরণ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ।

‘কপূরের মালা’ গল্পের ছবি চরিত্রটি লেখিকার কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গল্পের নায়ক রঞ্জন চরিত্রটি নির্মাণে তিনি বেশ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ‘ননিখানসামার ছুটিযাপন’ গল্পের বলিষ্ঠ যুবক ননী হাজরা চরিত্রটি বাস্তবধর্মী। তাঁর ছোটভাই চারুচন্দ্র চরিত্র নির্মাণে লেখিকার সাফল্য প্রশংসনীয়।

সত্যঘটনা অবলম্বনে ‘আশ্চর্য্য সফল স্বপ্ন’ গল্পের রাখালদাস মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে লেখিকার সত্য জিজ্ঞাসার পরিচয় মেলে।

‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পের ব্যথা চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গল্পের শেষ পর্যায়ে আমরা দেখি —

“অশ্রু-ছল-ছল নয়নে ক্ষণেক নির্ঝাঁক থাকিয়া ভদ্রমহিলা ধীরে বলিলেন, ‘আজ বিজয়া’। ব্যথা, তোমায় আশীর্বাদ করছি। কণ্ঠে চোখ খুলিয়া অন্ধকার গাড়ীর মধ্যে দু’হাত কপালে ঠেকাইয়া অতি কণ্ঠে রুদ্ধ ক্ষীণ স্বরে ব্যথা বলিল, ‘বিজয়ার নমস্কার’ দিদি।”

- ব্যথার করুণ জীবনের প্রতি জনৈক ভদ্রমহিলার স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘সূক্ষ্ম-ধর্মজ্ঞান’ গল্পের গৌর গোপাল চরিত্রটি বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব আমাদের কাছে আকর্ষণীয়। পাশাপাশি অপর এক বিপরীতধর্মী চরিত্র মহাদেব চট্টোপাধ্যায় লেখিকার কলমে সার্থক হয়ে উঠেছে। মহাদেববাবু ও পীর মহম্মদ চরিত্রদ্বয় লেখিকা অতি কুটিল চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করেছেন।

‘মণীষা’ গল্পের মণীষা ও মহেন্দ্রনাথের দাম্পত্য জীবনের মধুর রূপ পাঠক মাত্রেরই শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। ‘নিরঞ্জন সর্দার’- এর গল্পের নিরঞ্জনের কর্তব্যবোধ ও তার ব্যক্তিত্ববোধ শিল্পগুণের পরিচায়ক।

‘ভূমিকম্প’ গল্পের লছমন চরিত্রের প্রভু ভক্তি আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করে।

‘লাফো’ গল্পের লাফোর উপস্থিত বুদ্ধি এবং ‘বুনোওল ও বাঘা তেঁতুল’ গল্পের দেবী প্রসাদের বিপর্যয় অনেকটা গল্পের পরিণতির দিক থেকে সঙ্গতিপূর্ণ।

শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পের আঙ্গিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গল্পের শুরু এবং শেষের মন্তব্যগুলি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

‘দুইরূপ’ ছোটগল্পের শুরু হয়েছে সময়ের নিরীক্ষণ বিন্দু অনুসরণে। যেমন -

“সকাল বেলা।

আর্টিস্ট অজয়কুমার তাঁহার স্টুডিওতে বসিয়া ইজলে একটা ছবি আঁকিতে ছিলেন।”

গল্পের শুরুতেই একজন চিত্রশিল্পীর পরিচয় রয়েছে। গল্পটির সমাপ্তির মন্তব্যটিও স্মরণ করা যেতে পারে —

“পারুল বলিল, ‘কাল সকালেই আসবেন মোহনবাবু-’

“মোহন শূন্য পকেটে হাত দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।”

- মোহনের অর্থ সংকটকালে অমিতব্যয়িতার কারণে অনুশোচনা জেগেছিল।

মিসেস মিত্র, পারুল দেবী ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে সঙ্গে নিয়ে আম, সিগারেট, চা, চপ, কাটলেট, সিনেমা ও ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে তার পকেট যখন গড়ের মাঠ তখন তার মনে পড়েছিল আজ রাতের খাবার চালাবার অর্থ এবং কাল তার বিধবা মায়ের একাদশী পালনের খরচ বহন করবে কি করে? গল্পের সমাপ্তি অংশটিতে লেখিকা মোহন চরিত্রের একটি দিক তুলে ধরেছেন।

‘ক্ষমতার জয়’ গল্পের শুরুতে রয়েছে প্রকৃতির রূপের বর্ণনা -

“মাঘ মাস। কয়দিন আকাশ মেঘলা হইয়া আছে। দুই-এক পশলা বৃষ্টিও হইয়াছে মানভূমের প্রচণ্ড পাহাড়ে শীত অধিকতর তীক্ষ্ণ হইয়া হাড়ের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে।”

- গল্প শেষে আমরা দেখি গল্পটির নামকরণের সঙ্গে সার্থকতা রয়েছে কার্পেটে বোনা কবিতার শেষ ছন্দে -

“অপকারী জানে, যে পারে ক্ষমিতে

তারই ক্ষমতার জয়।”

লেখিকা বহু গল্পে উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্প রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। গোলাপ সিংহ গল্পে ‘উত্তমপুরুষ’ বচনের যথাযোগ্যতা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গল্প কথক গারো পাহাড় অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছেন, কয়েকজন সঙ্গীর কাছে। গল্পের প্রধান আলোচ্য বিষয় গোলাপ সিংহের দুঃসাহসিক ব্যাঘ্রশিকারের কাহিনী।

“আমাদের টেবিলে তখন ইংরেজী কেতায় পাকস্থলীর কল্যাণে বোতল গ্লাস উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং সেই বিরুদ্ধবাদী অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকটার গৌড়ামির বিরুদ্ধে উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিয়া এমন বেপরোয়া সমালোচনা আমরা জুড়িলাম, যা জনসমাজে প্রকাশ করিবার মত নয়! কিন্তু ভিতরে ভিতরে সবাই বোধহয় - বিবেকের কশাঘাত অল্পবিস্তর পরিমাণে পরিপাক করিলাম। কারণ সে রসিকতার দম বেশিক্ষণ রহিল না এবং সঙ্গে সঙ্গেই সকলেই কিছু অন্যমনা হইয়া পড়িলাম।”

গল্পে ব্যবহৃত গদ্যের ক্ষেত্রে শৈলবালা ঘোষজায়া সাধু বাংলা গদ্যের ব্যবহার করেছেন। সংলাপের ভাষা চলিত বাংলা গদ্য। আবার কোন কোন গল্পে বর্ণনা অংশেও চলিত গদ্যের

রীতি প্রযুক্ত হয়েছে। নিয়ে সাধুগদ্য রীতির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :-

“ব্রজদাস বাবাজী লোক মারফৎ আবেদন, নিবেদনের ফল যখন একান্তই নিষ্ফল বুঝিলেন, তখন সে সব ছাড়িয়া ছাড়িয়া স্বয়ং রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। কারণে-অকারণে শ্রীমতীর জন্য এমন ঘনিষ্ঠ গুণভাষিকতা দেখাইতে লাগিলেন, যাহা দেখা অপরের পক্ষে নিরঙ্কুশ কৌতুকের বিষয় হইলেও শ্রীমতীর পক্ষে একান্তই অসহ্য।” (কার্য্যকারণ)

পাশাপাশি বর্ণনাংশে চলিত গদ্যরীতির নিদর্শন -

“জোজো ভাত খেতে গেল। অদর্শনের শোকে কান্নার ঝোঁকটা খুব বেড়ে উঠল। শুধু মা নয়, আম্মা নয়, স্বয়ং দাদু এসে বুকে করে ভোলাবার জন্য কত চেষ্টা করলেন, কিছুতে থামল না। সাইকেল রিক্সায় চড়িয়ে সেই রাতে পথে পথে তাকে নিয়ে দাদু ঘুরলেন। তবু কান্না থামে না। দাদু হিমসিম খেয়ে গেলেন।” (তাকে মেলে.....)

-আলোচ্য বর্ণনা অংশটিতে ব্যবহারী কথ্যচালের ধরণটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সংলাপ অংশের চলিত গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হলো :-

“জিজ্ঞাসা করলুম, ‘মোহিনী বলছিল আপনি ভৈরবী. আপনারা তান্ত্রিক?’

‘তিনি সাগ্রহে ঘাড় নেড়ে জানালেন হ্যাঁ।’

“পুনশ্চ প্রশ্ন করলুম, ‘কিভাবে আপনি সাধন করেন? দিব্যভাব না বীর ভাব, না পশুভাব।’

“তঁার মুখে প্রচ্ছন্ন কাতর ভাবই ফুটে উঠল - স্পষ্ট বুঝলাম, এ প্রশ্নের সামনে তিনি নিজেকে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত বোধ করেছেন।” (‘কোন রোগ’)

- এই ভাষার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা নেই শৈলবালা ঘোষজায়া সংলাপ রচনায় এইভাবেই নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন।

- লেখিকা কোন কোন গল্পে সংলাপ অংশে হিন্দী ভাষার ব্যবহার করেছেন।

নিয়ে ‘ভণ্ডের সার্থকতা’ গল্পের পুর মহম্মদের মুখে হিন্দী ভাষা সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১। “বিকট হাস্যে পীর মহম্মদ বলিল, ‘হাঁ হাঁ, সে হামি শুনেছে। সেই বাহানায় ওর মায়ের দশ হাজার রুপেয়া মেরে লিয়েছে না? তুমি পাক্কা খেলওয়াড়, বাবুসাহেব! আচ্ছা, ভাল হোক। হামার আবি তিনচারশো রুপেয়া হাওলাৎ দেও তো।’”

২। “বাবু সাহেব, তোমার গুণ্ডামি বুটা বাত্তে, গুর আংরেজকা আইন আদলতে! লেকিন্ পীর মহম্মদের গুণ্ডামি সাচ্চা ছোরার কাচ্চা ঘাও যে! বুট বাৎ মাৎ বোলো। মোহিত মিত্তির আজ সামকো বখৎ পাঁচশো পাঁচশ রুপেয়া তোমার বাড়ীতে দিয়েছে, হামি খবর রাখে। চারশো রুপেয়া নিকালো বাবু, বহুৎ সুবিস্তা করে বলেছি। একরোজ হামার চার হাজার খা’কে হামায় জেলমে

৩। “চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া রুঢ় গজ্জনে পীর মহম্মদ বলিল ‘জাস্তি ষড়্‌বড়াও মৎ! পীর মহম্মদকো পছন্তা নেহি? দোস্তি মাঙ্গো তো, চারশো রুপেয়া দেদেও বাবুসাৰ। হাম সাচ্চা বাৎ বোলা, আব তোমরা যো খুশী - বোল দেও।”

লেখিকা জানে জানে ইংরেজি সংলাপ ব্যবহার করে গল্পকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছেন।

২। মোহন বলিল 'I beg your pardon!' তা হলে - আত্মবিস্মৃত!" (কোনো

শৈলবালা ঘোষজায়ার ছিল কবিত্বপ্রতিভা। কবিতার প্রতি গভীর অনুরাগ বশত তিনি তাঁর বহু গল্পে সার্থক কবিতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পে ব্যাথার গভীরে বেদনাকে তিনি কবিতার মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। নিম্নোক্ত কবিতাংশে ব্যাথার জীবন জিজ্ঞাসা লেখিকা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন :-

“অভাগার এই হাসি ছদবেশী অশ্রুরাশি
কি জানিবে, হয় বন্ধু, তার ইতিহাস ?
লাঞ্ছিত অদৃষ্ট সনে, যুঝিতে জীবন পণে
ক্লান্তি জুড়াবারে সৃজি, -ব্যঙ্গজ পরিহাস!
বেদনাশ্রু রোধিবারে, উদগ্র বিগ্রহ তরে -
মৃত্যু অবসাদে করি তীব্র প্রতিবাদ!
সৃজি এ তরল হাসি, লয়ে অশ্রু বাষ্পরাশি
লয়ে বঞ্চিতের মর্ম্মভেদী আর্তনাদ!
হতভাগ্য এই হাসি! - এরে বলে ভালবাসি ?
ধন্য ভালোবাসা! - মোর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!
থাক্ কথা ! কাজ নাই, - ভাল লাগে ? ভাল ত
লহ অশ্রু বেদনার, শ্রদ্ধা নমস্কার।”

‘থিয়েটার-দেখা’ গল্পে বিপিনবাবুর মুখে বৈষ্ণব পদাবলীর দু’টি লাইন আমরা শুনতে পাই। এই পদে ব্রজবুলি ভাষাকে লেখিকা স্থান দিয়ে গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করেছেন -

“বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরনে নয়নে জল,
দুখ সাগরে ধনি ভাসে - ”

‘কার্য্যকারণ’ গল্পে ব্রজদাস বাবাজীর প্রেমাবেশের গানটির রচনাকার ছিলেন বনমালি দাস। তিনি শ্রীমতীকে উদ্দেশ্য করে এগানটি গেয়েছিলেন। গানটিতে যদি-ও জীবাত্মার সঙ্গে পরাত্মার মিলনকাজক্ষা প্রকাশ পেয়েছে।

“সাধ করে সাজায়ে বাসর, বসেছে রাই রাজবালা,
ভাবছে বসে উন্মাদিনী কুঞ্জে কখন আসবে কালা- ”

- পূর্বোক্ত গানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিম্নোক্ত গানটিতে ভিন্ন মাত্রা এনে দিতে পেরেছে -

“পবনে শিহরে কায়, পথপানে দান চায়,
কাকলী লহরী ভাবে-”

আলোচ্য অংশে ব্রজদাস বাবাজীর নিভৃত হৃদয়ে যে বৈষ্ণব সঙ্গীতটি ধ্বনিত হয়েছে, সে সঙ্গীতটি যে শ্রীমতীকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া এটি আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না -

“ধনি ভাবে শুনি, বংশী রাধার গুণ গায়।”

- ‘গোলাপ সিংহ’ গল্পে ছোকরা কম্পাউন্ডারের গাওয়া গুণগুণ করে গানের সুর গোলাপ সিংহকে প্রভাবিত করেছিল।

লেখিকা গানটির মধ্যদিয়ে গোলাপ সিংহের মনস্তত্ত্বকে উদ্ঘাটন করেছেন -

“আমার মাথা ন্যাড়া করে দাও হে তোমার
ধারালো ত্রুপের ক্ষুরে
কালো কোঁকড়ানো চুল হে আমার
চোঁচে ফেলে দাও দূরে।”

লেখিকার ‘কোন রাগ’? গল্পে আলোচ্য দেশাত্মবোধক রবীন্দ্রসঙ্গীতটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে -

“বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
ধন্য হোক, ধন্য হোক,
ধন্য হোক, হে ভগবান!”

‘মনীষা’ গল্পের শেষে মন্দিরের সিঁড়িতে উপবিষ্ট একজন জ্ঞানী সাধকের কণ্ঠে

শ্রীগীতার নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বদ্ধজীবন থেকে মুক্তির বাসনা ব্যঞ্জিত হয়েছে।

“ন জাতো হহং মৃতোবাপি -

নামে কৰ্ম শুভা শুভম,

বিশুদ্ধং নিগুণং ব্রহ্ম

বন্ধো মুক্তি কথং মম।”

‘দীপ্তি’ গল্পে মনুসংহিতার নিম্নোক্ত শ্লোকটি দীপ্তির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। এই শ্লোকে শ্রী জাতির ধর্মশাস্ত্রে অনধিকারের প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে -

“নাস্তি শ্রীণাং ক্রিয়ামত্বেরিতি ধর্ম ব্যবস্থিতিঃ।

নিরিন্দ্রিয়াহ্য মজ্জণাশ্চ শ্রী যোহনৃত মিতিস্থিতিঃ।।”

এই মনুসংহিতার শ্লোকটিও দীপ্তি তার বড়দিকে গুনিয়েছে। এই শ্লোকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই -

“অপত্যং ধর্মকার্য্যাই শুশ্রূষা রতি রক্তমা

দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্নশ্চ হ।।”

‘সুস্ম-ধর্মজ্ঞান’ গল্পে নিম্নোক্ত কীর্তনটি সংযোজন করে শ্রী চৈতন্যদেবের অমর মহিমাকে সার্থকভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

“গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।

ও তার, হিল্লোলে পাষন্ড দলন, ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।”

এটি একটি দ্রুত তালের ছড়া। চানাচুর বিক্রেতা ফেঁকু এছড়াটি গেয়ে সে খদ্দেরের কাছে চানাচুর বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করেছিল। নিম্নের এই ছড়াটি গল্পের সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ।

“চানাচুর বানাওয়ে ধীর

খাতে রাম লছমণ বীর

মারে মেঘনাদকে তীর.....” (‘ভূমিকম্প’)

শৈলবালা ঘোষ জায়ার বর্ণনা অংশে কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ‘কপূরের মালা’ গল্পে ছবির মুখের বর্ণনার সঙ্গে মধুর প্রভাতের রবিরশ্মির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই তুলনাটি অসাধারণ -

“সেই রবিকরোজ্জ্বল মধুর প্রভাতে সেই স্নিগ্ধ লালিত্যময় সুন্দর মুখখানির

প্রতি চাহিয়া মুগ্ধ হৃদয় যুবা ভাবিল, ‘ছবি বটে’।”

নিম্নোক্ত রূপের বর্ণনাটি ‘কপূরের মালা’ গল্পের কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র ছবির। ছবির দৈহিক বর্ণনা থেকে শুরু করে তার সাজ-সজ্জা সবই বাস্তবধর্মী।

“- হাজার কপালে চন্দনের ফোঁটা, গলায় মালা, কোমরে গামছা জড়ান, ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি একটি তরুণ কোমল মূর্তি,”

মোটবাহী ননী হাজার পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকাকে কোন কল্পনার দ্বারস্থ হতে হয়নি। বাস্তবধর্মী এই বর্ণনাটি জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে -

“মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিয়া, বাম হাতে জুতা ও ছাতা লইয়া এবং ঘাড়ের রঙীন টিনের ট্রাঙ্ক সহ বিবিধ দ্রব্যসামগ্রী পূর্ণ প্রকাণ্ড মোটবহিয়া বলিষ্ঠ যুবক ননী হাজার বর্ধমান স্টেশন হইতে সদরঘাটে আসিয়া, নৌকাযোগে নদী পার হইয়া, চারি ক্রোশ পাকা রাস্তা হাঁটিয়া যখন তাহার নিজ গ্রামে যাইবার মেঠো পথে, ‘আলের’ মাথায় নামিল, তখন বেলা প্রায় পড়িয়া গিয়াছে।”

‘সূক্ষ্ম-ধর্মজ্ঞান’ গল্পে লেখিকা গৌরগোপালের দৈহিক বর্ণনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের যে উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে লেখিকার প্রতিভার পরিচয় মেলে -

“চেহারা লম্বায় বেশ দীর্ঘ, চওড়াতে বোধ হয় এক সময় মানানসই ভালরকম ছিল, কিন্তু এখন আর নেই। মুখের গঠন সুশ্রী, কিন্তু ভাব বড় বিশ্রী-কর্কশ, দস্তময়-সোজা কথায় ‘ধরাখানসরা’ জ্ঞানের তুল্য মূল্য উৎকট মুরব্বিয়ানা জ্ঞাপক - যা হোক একটা কিছু বটে! পরনে কালপেড়ে কাপড় ও ত্রি-কোয়ার্টার হাতাওয়ালা লংক্রুথের পাঞ্জাবী। পায়ে খড়ম, গলায় তিনকাঠি মালা, বিষ্ণুভক্তির অব্যর্থ প্রমাণ-স্বরূপ নীরব সাক্ষ্যে শোভা পাইতেছে।”

এই বর্ণনাংশে রূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে তার স্বভাবকে এক সূত্রে মিলিয়ে দিয়ে লেখিকা আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন -

“যমুনার বয়স পঁচিশ ও ত্রিশের বেশী নয়। মুখশ্রী চমৎকার, রং ধবধবে ফর্সা, দেহগঠন লম্বা চওড়া - সাধারণ ধনীগৃহের ভোগবিলাসী অলস মেয়েদের মত। খানিকটা বোকামি, খানিকটা ভালোমানুষী, খানিকটা একগুঁয়েমি মিশিয়া স্বভাবটি তৈরী। কিন্তু সরল মোটে নয়। সব বিষয়ে লুকোচুরি খেলিতে ভালোবাসে। কোনও কথার স্পষ্ট উত্তর দেয়না। সর্বদা যেন প্রচ্ছন্ন অভিমানে বিরজি গম্ভীর।”

“যমুনার নবজাত শিশুটি ধীরে ধীরে যখন বড় হয়ে উঠেছে, তখন তার চেহারা, বুদ্ধি সম্পর্কে লেখিকা যা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বাস্তবতার ছোঁয়া রয়েছে।

“মেয়েটি দিনে দিনে বড় হইয়া উঠিল। মেয়েটি খুব সুন্দরী, বেশ হুঁষ্ট পুষ্ট। কিন্তু কেমন যেন হাবাগোবা গোছের। জড় মস্তিষ্ক। যথা সময়ের অনেক পরে সে কথা বলিতে শিখিল। যা শিখিল তাও অতি অল্প, অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য।”

‘ননী খানসামা’ গল্পের বর্ষার যে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন - তার মধ্যে লেখিকার প্রকৃতি প্রেমের পরিচয় মেলে - “বর্ষাকাল, সমস্ত দিনই ঝুপ-ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। থাকিয়া

থাকিয়া এক একবার বৃষ্টি ধরিতেছিল বটে, কিন্তু তাহা পুনর্বর্ষনেরই নবোদ্যম সূচনা জন্য। সমস্ত আকাশটা বৃষ্টি সম্ভাবিত ‘আমানি’ মেঘে ধূসর - মলিনতায় লিপ্ত হইয়াছিল। মাঝে মাঝে হু হু রবে এক একটা দমকা বাতাস, শীতকম্পিত ওষ্ঠে আকুল হৃদয় ছাড়িয়া যাইতেছিল। সদ্যবিগত গ্রীষ্মের তপ্ত আলিঙ্গনমুক্তা বিশ্বপ্রকৃতি, এখন যেন নীরবে, নিশ্চিন্ত আরামে ঘাড় হেঁট করিয়া বাসিয়া বর্ষার জলে স্নান করিতেছিল।”

শ্রাবণের ঘোলা জলের সঙ্গে যমুনার মানসিক অবস্থার যে বর্ণনা নিয়োক্ত অংশে রয়েছে তার মধ্যে লেখিকার মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় মেলে -

“শ্রাবণ মাস ; অনিশ্চিত -সময়-উচ্ছ্বসিত যমুনা দেবী কয়েকদিন পূর্বে খুব বাড়িয়া এখন সহসা অত্যন্তই কমিয়া গিয়াছেন ;

তাহার সে দুই কূল হানা তরঙ্গ আশ্ফালনের শোভা এখন আর নাই; জল যেমনই দূরে সরিয়া গিয়াছে, তেমনই ঘোলা হইয়াছে।”

লেখিকা প্রকৃতির উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধরূপের যে অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন অনেকটাই কবির লেখা হয়ে উঠেছে —“সমস্ত আকাশ তখন মেঘশূন্য ও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। সেদিন শুক্লাদ্বাদশী, নির্মল আকাশে তখন চন্দ্রদেব জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিলেন। বাতীর পাশ্চবর্তী বন হইতে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত বনমল্লিকা ও রজনীগন্ধার মৃদু মধুর সৌরভ বর্ষার বাতাসে ধীরে ধীরে বহিয়া আসিতেছিল। চারিদিক একটা স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, সময়টা বড় মধুর বড় নিবিড় শান্তিপ্ৰদ মনে হইল।”

লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়া প্রতিটি গল্পেই কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। যেগুলিকে সুভাষণ না আগুপূর্ণ বাক্য বলা যায়। তার পাশাপাশি তিনি প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন, সংলাপ অংশে কিংবা বর্ণনা অংশে সুষ্ঠু প্রয়োগ গল্পগুলিতে সার্থক শিল্প রূপের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিটি বাক্যই যেন পাঠক মনে চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করে। প্রথম প্রবাদ বাক্যটি ‘ননী খানসামার ছুটি যাপন’ গল্পে ননীর মুখে আমরা শুনি -“ভূতের আবার জন্মবার!”

- ভূতেরা কোন নিয়ম নীতিকে মেলে চলে না। তারা স্বেচ্ছাচারী এই অর্থেই ননী তার বন্ধুদের এই কথা বলেছিল।

- “যমের বাবা বীরভদ্র!”

-বীরভদ্র একটি পৌরাণিক চরিত্র। শিবের ঘাম থেকেই তাঁর জন্ম। এই বীরভদ্রর ক্ষমতা অসীম। সে যমের অনুশাসন থেকেও অনেকটা মুক্ত। এই অর্থে এই প্রবাদ বাক্যটি গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

“নতুন বিয়ের পর থেকে মুখে সবই মিষ্টি লাগে, - কিছুই মন্দ লাগে না,”

- গৃহবধু চারুকে এই ব্যঙ্গ পূর্ণ কটাক্ষ পাতটি করেছে। নববিবাহিতের কাছে যেন সব কিছুই মধুময় মনে হয়। এই অর্থে এই প্রবাদ বাক্যটি সার্থক।

“উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।”

- পরাণ সিংহ গ্রামের অত্যাচারী জমিদার তালুকদার থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রজাই তার ভয়ে ভীত। মিথ্যে মামলা সাজানো, খুন-জখম, জালিয়াতিতে সে সিদ্ধ হস্ত। তারই চক্রান্তে নির্দোষও সাজা পায়, দোষীও মুক্ত হয় এই অর্থে প্রবাদ বাক্যটি যথাযথ।

“এদেশের প্রত্যেক মেয়ের জাতি - শুধু পরের রসনার

অনুগ্রহ ও নিগ্রহের উপর নির্ভর করে বইত নয়?”

‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পে নারী জাতির যন্ত্রণার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে আলোচ্য প্রবাদ বাক্যটি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

“ভিক্ষা এবং অনুগ্রহের দান ভিন্ন, যাহার বাঁচিবার উপায় নাই - ধর্ম হউক, লোকাচার হউক, বা স্বয়ং অদৃষ্টই হউক, যাহাদের নিজ শক্তিতে অন্য সংগ্রহের পথগুলো বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে - লাথি ঝাঁটা খাইয়া চুপটি করিয়া ঘৃণিত জীবনযাপনই পরম নিরাপদ।”

- যারা পরমুখাপেক্ষী তাদের জীবন যে কতটা দুর্বিষহ - একথা বোঝাতে লেখিকার এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি উপেক্ষিত নারী সমাজের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

“পৃথিবীর আড্ডাটা আমাদের সকলকারই অস্থায়ী।”

-জৈনিক মহিলা একথাটি ব্যথাকে গুনিয়েছিল। প্রত্যেকটি মানুষই কর্মব্যস্ত। সেক্ষেত্রে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করবার অবকাশ খুবই কম। তবুও এই অস্থায়ী আড্ডা নূতন নূতন চিন্তা ও সৃষ্টির একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সেই সূত্রে প্রবাদটি সার্থক।

“বড়লোকত্ব রক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থাই না কি মিথ্যাবাদিতা।

অর্থের অসদ্ব্যয় এবং প্রবঞ্চনা।”

- প্রত্যেকটি মানুষকে তার সামর্থের মধ্যে চলতে হয়। গরীব হয়ে বড়লোকের মত চাল চলন মূলত বাহুল্য ছাড়া কিছুই নয়।

“শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে ধাতের মিল থাকিলে, আসর জমে ভাল।”

- কোন প্রসঙ্গ নিয়ে যখন আলোচনা হয় তখন শ্রোতা ও বক্তা উভয়ই সমধর্মী না হলে সে আলোচনা রস যুক্ত হয় না। এ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবাদটি অনবদ্য।

“নিঃস্বার্থ পরোপকারী, গরীবের বন্ধু।”

— যারা উদার হৃদয় অপরের জন্য নিয়োজিত প্রাণ তারা বন্ধিতের একান্ত প্রিয়সার্থী। এই আগুপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

“এ দুনিয়ার একদল লোক আসে ঠকাতে, আর একদল লোক আসে ঠকতো।”

“এ পৃথিবীতে সার্থক শুধু ভন্ডের ভণ্ডামি, এবং দৈত্যের গুণ্ডামি।”

— প্রতাপশীল ভন্ডের প্রতাপে যখন শান্তি বিঘ্নিত হয় এবং অশুভ শক্তির উদয় ঘটে, তখন বুঝতে হবে দেশের সংকটকাল সমুপস্থিত।

“দেশের জঞ্জাল, মানুষের মনুষ্যত্বনাশী পাপ।”

— সমাজে যারা ক্ষতিকারক যাদের মধ্যে কল্যাণবোধ নেই, তারা সমাজের শত্রু এই অর্থে এই প্রবাদটি অর্থবহ।

“আঁতুরঘর থেকে গুরু করে মৃত্যুশয্যা পর্যন্ত যাদের চলার পথ, তাদের চোখ এড়ায় না কিছুই।”

— বাস্তবধর্মী মানুষেরা থাকে সচেতন। তাদের যাত্রাপথে ভালো মন্দ সবকিছুই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়।

“ভালো লোকের কাজ, মন্দলোকের কাজ বলে সবাই যদি সব
কাজ ছেড়ে হুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসি, তাহলে মানুষ গুলোকে

— বেশী নয়, আপনার এই আঙুল হারটাই ধরুন, সারবে কিসে?”

— জগতের কোন কাজই ক্ষুদ্র নয়। কাজের কোন শ্রেণী বিভাগ থাকতে পারে না। সুতরাং ছোটবড় সব কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলে সভ্যতার বিজয় রথ চলবে এগিয়ে এই অর্থে প্রবাদ বাক্যটি অর্থপূর্ণ।

“কর্তার ইচ্ছায় কর্ম।”

— সব কিছুই সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল এই প্রবাদটি বহু প্রচলিত।

“আজ মহেশের যদি ত্রিশূল হতাম আমি
তবে ইতর না মেরে, মারতুম ইৎরামি।”

— আলোচ্য ছড়াটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের ক্ষমতা সীমিত হলেও মানুষ যদি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাহলে ক্ষমতা বলে, অশুভ শক্তিকে বিনাশ করতে পারে।

“পৃথিবীর আবহাওয়ার গুণে মানুষের মনের উচ্চতা টিকতে পারে কই?”

— পৃথিবীতে উচ্চ ভাবনাকে অনেক সময় স্বার্থান্ধ মানীষরা মূল্য দেয় না। এই অর্থে এই সুভাষণটি ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

“নিয়তি বলতে একটা অদম্য শক্তি আছেই, সন্দেহ নাই।”

— সবার অলক্ষ্যে এক অদৃশ্য শক্তি প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এই অদৃশ্য শক্তিকে নিয়তি বলে সকলে মেনে নেয়, এই অর্থে এই প্রবাদ বাক্যটির আবেদন চিরন্তন।

“কপাল পোড়া ঈশ্বরোধীন কাজ বটে, কিন্তু বুদ্ধি ধর্ম পুড়িয়ে
যাওয়া ত ঈশ্বরোধীন কাজ নয় ; সে মানুষের কাজ।”

- শ্রীমতীর নিসৃত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্রান্ত মানুষ যখন আদর্শ থেকে বিচলিত হয়, তখনি তার জীবনে নামে বিপর্যয়।

“তৃণাদপি সুনীচেন.....।”

-বৈষ্ণব ধর্মের মহৎ গুণ প্রকাশের একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধনা হল নিজেকে ছোট ভেবে অপরকে বড় মনে করা।

“হিংস্রকের হিংস্র দোষ আছে কি?”

- এক শ্রেণির নীচ প্রকৃতির মানুষ প্রতিনিয়ত অপরের ঐশ্বর্যে জ্বলে পুড়ে মরে। এই ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের ঈর্ষা করাই কাজ।

“সদয় ব্যবহারে ওর স্বভাব সংশোধন কর।”

- এই উপদেশাত্মক বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। যে মানুষেরা নিষ্ঠুর, সহানুভূতিহীন তাদের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার তাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

“চন্দ্র ঘুরপাক খায় পৃথিবীর চারিদিকে, পৃথিবী ঘুরপাক খায় সূর্যের চারিদিকে!”

- ক্ষুদ্র বৃহৎশক্তির চারদিকে আবর্তিত হয়। এই অর্থে এই আশুপূর্ণ বাক্যটি মূল্যবান।

“পরকীর্তি অসহিষ্ণু!”

- অপরের গুণগান, যশাখ্যাতি অনেকে সহ্য করতে পারে না। এই অর্থে এই বাক্যটি সফল সৃষ্টি।

“মানুষমাত্রই অনেক ভুল করে থাকে নির্বোধের ভুলের জন্য

ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য।”

-মানুষ ভুল করে যদি সে ভুলের জন্য অনুশোচনা করে তখন তার ভুলকে বড় করে দেখা সঙ্গত। এই অর্থে এই বাক্যটি সার্থক।

“মানুষ হওয়ার পক্ষে, বেঁচে থাকার পক্ষে সৎ এবং ভদ্র হওয়ার পক্ষে, জ্ঞানচর্চাটা অত্যন্ত আবশ্যিক।”

- বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে চরিত্রবান হতে হবে। এই অর্থে এই বাক্যটি সার্থক।

“সৎকার্য্যে যত্নশীল, উৎসাহ-উদ্যম-তৎপর না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ।”

- প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল সৎভাবে কর্ম সম্পাদন। এই অর্থে এই বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

মনস্বিনী বিদূষী গল্পকার জ্যোতির্ময়ী দেবী মহিলা গল্পকারদের মধ্যে একটি পরিচিত নাম। তাঁর নিপুণ লেখনীর স্পর্শে বাংলা গল্প ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। বলিষ্ঠ ও সংযত ভাষায় রাজস্থান, বারাণসী তথা উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নাগরিক জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের ছবিকে বাংলা গল্পে তুলে ধরে ভৌগোলিক পটভূমির বিস্তার ঘটিয়েছেন। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞতার শিল্পী ভারতের

বিভিন্ন প্রদেশে জীবন জীবিকার তাগিদে, রাজনীতির প্রতি গভীর অনুরাগ বশত উপেক্ষিত নর - নারীর জীবন কথাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

নানা আঙ্গিকে একাধিক ভাষায় নারী জিজ্ঞাসাকে তিনি জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে। সমাজ জীবনের ছবিকে তাঁর মতো যথাযথভাবে তুলে ধরার দক্ষতা খুব কম লেখিকার মধ্যেই রয়েছে। মূলত নারী জাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সহজ সরল ভাষায় তিনি তুলে ধরেছেন। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর ভাষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন সেই ধারাপথেই তাঁর ছোটগল্পে প্রাধান্য পেয়েছে নারীবাদী চেতনা।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পসম্পর্কে ডঃ সুদক্ষিণা ঘোষ ‘মৃণালের কলম’ - গ্রন্থে লিখেছেন,

“অনেক গুলি ছোটগল্প আর বেশ - কয়েকটি বড়গল্পে সমকালীন, হয়তো বা চিরকালীন, এই সমাজের ছবি এইভাবে আঁকছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী, দেখছিলেন - এ কোন্ অদ্ভুত এক সমাজের বিধিলিপি নির্দিষ্ট হয়েছে, মেয়েদের জন্য, যেখানে শুধু মেয়েদের জন্যই অধিকারের অদৃষ্ট নির্দেশ ; এ কেমন বিধান, যেখানে জীবন জোড়া যত বঞ্চনা, যত প্রতারণা, যত নিষ্করণতা, যত অনুদারতা সমস্ত বহন করার দায় নারীর আর বিনা বিচারে অথবা অন্যায় বিচারে যে -কোনো মুহূর্তে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার অধিকার যে -কোনো পুরুষের, বিশেষত সেই-সব পুরুষের, মনুর বিধানে যারা তার আজীবন রক্ষক - সেই পিতা, পতি বা পুত্রের।”

জ্যোতির্ময়ী দেবী বহু গল্প প্রণেতা। তাঁর চারটি রচনা সংকলন গ্রন্থে, বড়গল্প, মাঝারি গল্প ও ছোট আয়তনের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বড় গল্প গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘অহল্যা’, ‘দ্রৌপদী’, ‘তারা’ এটি চব্বিশ পৃষ্ঠার বৃহৎ গল্প, বৃহৎ-যশ? গল্পটি তেত্রিশ পৃষ্ঠার, ‘বাঈজীলাল’ গল্পটি সতের পৃষ্ঠার, ‘সেই ছেলেটা’ চোদ্দ পৃষ্ঠার একটি গল্প, ‘আল্মাকালী’ গল্পটি ত্রিশ পৃষ্ঠার, ‘পিঁজরা পোল’ আটত্রিশ পৃষ্ঠার একটি গল্প।

তাঁর মাঝারি আয়তনের গল্প ‘নর ও নারী’ এগারো পৃষ্ঠার, ‘আগাছা’ বার পৃষ্ঠার, ‘লোকসান’ চারপৃষ্ঠার, ‘একটা বেণী’ একপৃষ্ঠার ছোটগল্প।

লেখিকার বড়গল্পগুলি ভাব ও সংহতির দিক থেকে ত্রুটিহীন। ছোট গল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশটি-ও সাধর্ম রক্ষা করেছে।

‘রক্তের ফোঁটা’ গল্পটি শুরু হয়েছে নিম্নলিখিতভাবে —

“স্থানস্বর্গ। স্বর্গে এখনো যেতে পারিনি সুতরাং সে যে কিরকম জায়গা বলতে পারা শক্ত।”

গল্পটির সমাপ্তি অংশটিও শিল্প সম্মত,

“অপ্রজ্ঞত মুখে তারপর বললে - ‘আগে তো ভালোবাসতো আমাকে খুবই।’ বলেই

মুখ নামিয়ে চোখ মুছলো। আমি চুপ হয়ে গেলাম।”

‘গিঁজরাপোল’ নামে বড় গল্পটি শুরু হয়েছে,

“কাশীর গলি। বাঙালি টোলা। চোদ্দ-পনেরোদিন বর্ষার স্নাতধারায় মেরামত এখানে ওখানে ভাঙা ইট, অপ্রিয় দর্শন তিনতলা একখানি বাড়ির সামনে এসে পিয়ন ডাকলে, ‘মানি অর্ডার আছে।’ বেলা তখন ১১টা। বাড়ির দরজা খোলা।”

গল্পের শেষ অংশটিতে গল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে,

“পিতৃগৃহ বা পতি গৃহহীন, স্নেহ-মমতাহীন, প্রেমহীন অবমাননার ইঙ্গিতময় নিষ্ঠুর দীর্ঘপথ তাদের এইভাবে যেতে হবে।”

‘সেই ছেলেটা’ গল্পের প্রারম্ভে পরিবেশ সৃষ্টির পরিচয় রয়েছে।

“দিল্লীর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র। কুইন্স পার্কের মাঝে জায়গাটা। চারদিকে লোক যাওয়া-আসা করছে, বসে-ও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা ভালই লাগছিল।”

গল্পটির সমাপ্তি অংশে একদিকে যেমন রয়েছে নাটকীয়তা, অন্যদিকে তেমনি চমক বিদ্যমান,

“যে তার মা। আর সে ছেলেটা তার ভাই নয়।”

তঁার গল্পের নামকরণগুলিও সার্থক। প্রকৃতিকেন্দ্রিক নামকরণ তিনি করেছেন, যেমন - ‘সরষে ফুল’, ‘আগাছা’, ‘এপার গঙ্গা’, ‘একটা রেণু’, ‘মেঘ -কজ্জল দিবসে’, ‘তেপান্তরের মাঠ’, ‘বনের পাখি বলে খাঁচার পাখিটির’, ‘ফণীমনসার বন’ প্রভৃতি। গল্পের পটভূমি ও মর্মবাণীর সঙ্গে এই নামকরণ গুলি সম্পর্কযুক্ত।

তঁার চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ব্যান্ডমাস্টারের মা’, ‘অহল্যা-দ্রৌপদী-তারা’, ‘লালজী সাহেব’, ‘মাজী সাহেব’, ‘বাঈজী লাল’, ‘রাখমণির ছেলে’, ‘পরী’, ‘মধুমালতী’, ‘মনির্কণিকা’, প্রভৃতি। এই গল্পগুলির মধ্যে পুরুষ ও নারী চরিত্রের মনস্তত্ত্ব নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

লেখিকার ব্যঞ্জনধর্মী নামকরণযুক্ত গল্পগুলি হল ‘প্রেমের অধিকার’, ‘সাক্ষী’, ‘গজলক্ষ্মী’, ‘রক্তের ফোঁটা’, ‘সতী’, ‘ঐতরেয়া’, ‘তিমির সম্ভবা’, ‘পদধ্বনি’, ‘উৎসর্গীত’, ‘কল্পবাস’, ‘রূপ’ প্রভৃতি।

বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক গল্পের নামকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘লোকসান’, ‘সন্তান’, ‘একজাত’, ‘টিনের মাংস’, ‘মর্ত্যের অঙ্গুরা’, ‘ময়ূর সিংহাসন’, ‘লেডিস ক্লাব’ প্রভৃতি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর প্রথম দিককার গল্পগুলির প্লট বিন্যাস কিছুটা দুর্বল হলেও ধীরে ধীরে প্লটের দুর্বলতাকে তিনি কাটিয়ে উঠেছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন শ্রেণি চরিত্র। রাজা, জমিদার, পুলিশ, শিক্ষক, আইনজীবী, শ্রমিক, কৃষক, পরিচারিকা, গৃহস্থ, বধূ, পতিতা, রাইজী, ঘাতক, মুটে, মাঝি, মুচি, মেথর ও বিভিন্ন অন্তর্জ্য শ্রেণি।

‘দিয়ে নিয়ে’ গল্পের শ্যাম ও গৌরীর প্রেম মনস্তত্ত্বকে লেখিকা নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিবাহিত জীবনের পর গৌরী সংসার পরিজন নিয়ে সুখে কাটিয়েছে। ছোটবেলাকার গৌরীর সাথী শ্যামকে সে ভুলতে পারেনি। শ্যাম জীবন যুদ্ধে বিদ্রস্ত হয়ে তার দিন অতিবাহিত করেছে।

‘সন্ন্যাসী’ গল্পের সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগী জীবন গল্পটিকে অনন্যতা দিয়েছে।

‘জবালা’ গল্পের গ্রামের মেয়ে রামপাতিয়া চরিত্রটি বাস্তবধর্মী।

‘একটি সেকেলে লেখক’ গল্পের শাদুল সিং ও হরবংশের প্রেম কাহিনি গল্পটির একটি আকর্ষণীয় অংশ।

‘সেই ছেলেটা’ গল্পের সুজাতা ও বরুণা চরিত্রদ্বয় যেমন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি রাজনামক ছেলেটির আচার-আচরণ-ও পাঠককে মুগ্ধ করে।

‘আমি এম. পি.’ গল্পের রেণু চরিত্রটি সার্থক। তার জীবনের স্বপ্ন ছিল মন্ত্রীর স্ত্রী হয়ে স্বামীর সঙ্গে দারোদঘাটন, ভিত্তিস্থাপন ও বিভিন্ন সভাতে অংশ গ্রহণ করে অনেক মালা, অনেক সম্মান পাবে। অনেক ক্ষমতার অধিকারী হবে। কিন্তু তার সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেছে বাস্তবে রূপ পায়নি।

‘সেই মেয়েটি’ গল্পের থাকমণির জীবনে বিভিন্ন পথপরিক্রমার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেলে-ও ঈশ্বর ভক্তি থেকে বিচলিত থাকে নি।

‘ডাইনী’ গল্পের প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে তার কুনজর রক্তশোষণ প্রভৃতি বিভিন্ন আজগুবি ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে। লছমী ডাইনী আখ্যা পেয়েছিল। কিন্তু গল্প শেষে হাবিলদারের স্ত্রী লছমীকে আর কেউ ডাইনী বলে নি।

‘তারা রূপবতী’ গল্পের তিনটি রূপবতী কন্যা- চিত্রকূটবাঈ, অহল্যাবাঈ, ও পম্পাবতীবাঈ। নাচে, গানে তারা দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। অথচ গল্প শেষে আমরা দেখি তাদের চেয়ে-ও রূপবতী নারী আনার কলি, নূরজাহান ও ফৈজী বেগম, তাদের রূপকে নিস্প্রভ করেদিয়েছিল।

‘এপার গঙ্গা অপার গঙ্গা’ গল্পে সুদামের স্ত্রী দুর্গা ছিল মুচির মেয়ে। দুর্গার হারিয়ে যাওয়ার পর সুদাম শুধু খুঁজে ফিরেছে দুর্গাকে। অল্প কথায় লেখিকার কলমে দুর্গা চরিত্রটি জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে।

‘উৎসর্গীত’ গল্পের দেবী এক অনবদ্য চরিত্র। অলৌকিক শক্তিদারিণী দেবীর ভূমিকায়

ভক্তরা পেয়েছিল সঠিক পথের সন্ধান।

‘পরী’ গল্পের বেণু ও মাসীমা চরিত্রটির পাশাপাশি খুকু নামে শিশুটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘পদধ্বনি’ গল্পে ভৌতিক পরিমন্ডল গড়ে উঠলেও সুধীর, বিমল ও সরিৎ চরিত্রগুলি পাঠকের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে।

লেখিকার বাক্য বিন্যাস কৌশল প্রশংসনীয়। তিনি বিভিন্ন মাপের বাক্য ব্যবহার করেছেন ছোট, বড় ও মাঝারি। বাক্য বিন্যাস করে ভাব প্রকাশ করেছেন। নিম্নে একটি বড় বাক্য প্রদত্ত হল —

“কিন্তু অতিশয় প্রিয়, বহু সাধনার ধন একমাত্র পুত্র যাকে কেন্দ্র করেই তাঁর গৃহস্থালী, ঘরকন্না, সঞ্চয়, পরিচয় আজও পুরাতন ধারায় প্রবহমান ; যে প্রদীপ জন্মানোর আগে উমা, রমা, অতসীকে নিয়েও তাঁর মাতৃত্বের গৌরব চরিতার্থ হয়নি, বরং লজ্জিত লাঞ্ছিত ছিল যেন - আজ তারই সম্পর্কে ক্ষোভ, অভিমান, অথবা অন্য যা অনুভূতিই হোক, নিজের ও কন্যাদের দীন, নিরর্থক অবাস্তিত অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার দায় ও পরম দুঃখের কথা কার কাছে বলবেন আন্বা ? মেয়েদের কাছে মা বলতে পারেন না।”

উপরোক্ত দীর্ঘ বাক্যটিতে দশটি কমা, একটি সেমিকোলন, একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন ও একটি পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে।

নিম্নে একটি মাঝারি বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

“সোনার প্রদীপ তেমনি আছে, তেমনি রূপোর খাট, তেমনি কণ্যের বীণাখানি, - তেমনি ঘরের দেওয়ালে রাজকন্যের আঁকা ছবি, শুধু দোরের আম্রপল্লবের পাতা ঝরে গেছে, সুতো আছে ; রাজার মেয়ের গলার মালার ফুলগুলি গেছে, ভোরটি আছে, মঙ্গলা ঘাটের জল শুকিয়ে গেছে, ঘটটি আছে এমনি তর,”

- উদ্ধৃত মাঝারি বাক্যটিতে নয়টি কমা, একটি সেমিকোলন ও একটি পূর্ণচ্ছেদ আছে।

নিম্নে ছোট বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল। বর্ণনা অংশেও যেমন ছোট বাক্য রয়েছে, তেমনি লেখিকার কলমে সংলাপ অংশেরও ছোট ছোট বাক্যগুলি সার্থকভাবে গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে।
দৃষ্টান্ত : “ধর্মতলার মোড় এসে পড়ল।

মণিকা বললে, ‘শীকর বাবু আমি এবার নাবি ?

শীকর কি ভাবছিল, চকিত হয়ে উঠল, ‘ও, তা আপনার ঠিকানাটাও তো দিলেন না।

কিছু পরিচয় ও তো দিলেন না।’

মণিকা বললে, ‘আমি লুধিয়ানায় একটি কাজ পাচ্ছি। সেখানে গিয়ে চিঠি দেবো,

ঠিকানাও পাবেন। এখানে তো ঠিক কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। বি.টি. -র ফলের জন্য এখানে ওখানে অপেক্ষা করছিলাম।’

সহসা শীকর তার হাত ধরল। ‘আপনি আমার মনের কথা কি বুঝতে পারছেন না ? আর এম. এ. পড়বেন না? একেবারে দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন?’

মণিকা তার শান্ত, গম্ভীর চোখ দুটি তুলে বললে, ‘না না, আর পড়ব না। চাকরিতেই যাবো।’

বাস প্রায় খালি। শীকর বললে, ‘আসুন ময়দানে নাবি। একটু কোথাও বসি ছায়ায়।’

মণিকার হাত ধরে শীকর বললে, ‘আমার আপনাকে ভালো লেগেছে এই থাক, এই-ই বলতে চাই।’

মণিকার হাত দুখানি তার হাতের মধ্যে ঘেমে উঠল। কিছু বলতে পারল না। দুজনে নামল।

একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে শীকর বললে, ‘একটু বসবেন, কোথাও? তাড়া আছে? আজ একটু আপনার নিজের কথা বলুন না?’ মণিকা বললে, ‘তাড়া নেই বটে। কিন্তু আর বসব না। আমার পরিচয় ঠিকানা কাল সব চিঠিতে জানাব।’

শীকর বললে, ‘পরিচয় চাইছি বটে। কিন্তু জাত গোত্র কুল পরিচয়ের চেয়ে কি মানুষ পরিচয়ই আরো বড় পরিচয় নয়?’

মণিকা শান্তভাবে হাসে একটু। শুধু বললে, ‘আমি জানি না। বলা শক্ত। মানুষকে কি মানুষ চিনে নিতে জানে? নেয়?’

— উপরোক্ত সংলাপ অংশে মণিকা ও শীকরের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি, লেখিকা ছোট ছোট সংলাপের মধ্যে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে সংলাপ এর ভাষায় কোন আড়ষ্টতা নেই। সহজ, সরল ভাষায় মনের ভাবকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে লেখিকার শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে।

বাংলা সংলাপের পাশাপাশি জ্যোতির্ময়ীদেবী হিন্দী ও ইংরেজী সংলাপ ব্যবহার করে ও গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। নিম্নে ‘লেডিস ক্লাব’ ছোটগল্প থেকে হিন্দী সংলাপের একটি অংশ প্রদত্ত হল —

“দিদি বললেন, ‘জি হাঁ, আমাদের এই সি রীত হ্যাঁ।’

জনান্তিকে পার্শ্ববর্তিনী একজনকে পেশোয়ারি বললেন, ‘ইয়ে ক্যা গজব !’

মুসলমানি বললেন, ‘বাঃ, ইয়ে হিন্দুওঁকী রীত এইসি ভাই।

মেরে ঘরকে পাশ এক থি, পাটনামে সব থে।’

মিস মিনি লাল প্রকাশ্যেই বললেন, ‘আরে, এই সি রেওয়াজ এঁ হ্যাঁ।’”

‘ব্যাভ মাস্টারের মা’ ছোটগল্পে মেম সাহেবকে বসতে বলা হলে তিনি প্রতিবাদ করে বলেছেন-

“হাম নেহি বইঠে গা, ‘আভি যায়েগা, এগারা বাত্‌ হয়।’

-এরপর যমুনা লাল যা মেম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিল -

“তোমাদের বিয়ে কারা দেয়? কি করে হয়? আমাদের মত হয় কি?”

মেম সাহেব বললেন, -

“পাদরী সাব হামকো সাদী কিয়া।”

গল্পের প্রয়োজনে লেখিকা কখনো বাংলা — ইংরেজী মিশ্রিত ভাষা বলেছেন, কখনো বা ইংরেজী ভাষার ব্যবহার রয়েছে -

“হ্যালো তুমি আসিয়াছ।”

ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও নানাবিধ শিষ্টাচার সূচক ভাষাও রয়েছে-

“হ্যালো মিসেস মুখার্জি; ‘গুড ইভনিং মিসেস রামদয়াল; ‘ইয়েস কোয়াইট ওয়েল।”

লেখিকা গল্প রচনা করতে গিয়ে স্থানে স্থানে গজল, বৈষ্ণব পদাবলীর ছত্র, শাক্ত পদাবলীর লাইন ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন ব্যবহার করে গল্পকে উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন।

‘ছবি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথের ‘সোনারতরী’ কবিতার দু’টি লাইন সংযোজন লেখিকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাই প্রমাণ করে —

“ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট এ তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।”

‘সেই মেয়েটি’ ছোটগল্পে মৃদঙ্গ বাজিয়ে একটি কীর্তন গাইতে শুনি —

“শ্যাম কুন্ড রাধাকুন্ড গিরি গোবর্ধন।

মধুর মধুর বংশী বাজে ঐ বৃন্দাবন।”

‘একা নড়ে’ ছোটগল্পে ভিথিরির কণ্ঠে বাউল গান শুনতে পাই -

“হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল

পার কর আমারে।

তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা

তাই ডাকি তোমারে।”

শ্যামা সঙ্গীতও স্থান পেয়েছে এই গল্পটিতে -

“মন তুমি কৃষি কাজ জান না

এমন মানব জমিন রইল পতিত

আবাদ করলে ফলত সোনা।”

শিশু মনের উপযোগী একটি ছড়া গানও পরিবেশিত হয়েছে এই গল্পে -

“এক যে ছিল একানড়ে

গায়ে তার বোড়ে বোড়ে

মাথায় তার নুনের বুড়ি

হাতে তার চাকু ছুরি.....

যে ছেলেটি কাঁদে তার কানটি ধরে কাটে.....”

‘তারারূপবতী’ ছোটগল্পে মেথর পাড়াতে এক মেথর যুবকের কণ্ঠে হিন্দুস্থানী গীত পরিবেশিত হয়েছে —

“গোরী গোরী ছোরীয়াঁ রে।

অরে গোরী গোরী বাঈয়াঁ রে -

কালি বনি কৈয়াঁরে।”

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পগুলি বর্ণনাগুণে সমৃদ্ধ। তিনি প্রকৃতি বর্ণনা ও রূপের বর্ণনাকে শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বর্ণনা অংশ যেন এক একটি ছবি কথার মধ্যে দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। ‘পুত্রোষ্টি’ গল্পে সন্ন্যাসী ঠাকুরের যজ্ঞসমেত পূজোর আয়োজনটি কত জীবন্তভাবেই না লেখিকা তুলে ধরেছেন। নিম্নলিখিত বর্ণনা অংশটি তার এক সার্থক দৃষ্টান্ত —

‘সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশে নতুন নতুন বুড়ি ভরা নানারকম ফল, নৈবেদ্য একখানা পপ্পপাত্র ভরা ফুল বেলপাতা, নতুন কাপড়, আরতীর পঞ্চপ্রদীপ পানিশঙ্খ থেকে কাসর ঘণ্টা, একটি পিলসুজ, একটি মঙ্গল প্রদীপ, অর্থাৎ পূজার সবরকম জোগাড়ই ছিল। তারপর পূজা আরম্ভ হল।’

তাঁর লেখনী গুণ প্রশংসনীয়। ‘ছবি’ গল্পে তিনি যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, স্বজন বন্ধুদের নিয়ে গ্রুপ ছবিটি যেন কথার মধ্যে দিয়ে এক চিত্রকল্পের রূপ পেয়েছে —

‘ততক্ষণে যে ছবিগুলোর সামনে আমরা এসেছি, তাতে জপের মালা হাতে করে নিয়ে একটি বৃদ্ধা মহিলা, কোশাকুশি ফুল বেলপাতা নিয়ে নামাবলী গায়ে আর এক বৃদ্ধা মহিলা, গরদের ধুতি পরা চাদর গায়ে গীতা হাতে এক প্রৌঢ় পুরুষ, আর নানা সাইজের নানা মানুষের ছবি। গ্রুপও। ঘোমটা দেওয়া বৌ, মেয়ে, ছেলেমেয়ে কোলে নিয়ে, নাতিনাতনী কোলে বৃদ্ধবৃদ্ধা ঠাকুর্দা ঠাকুমা, সরকার, চাকর, আশ্রিত, আহত, অনাহত লোকে ভরা গ্রুপ ছবি। বাড়িতে কোনো উৎসবের বিবাহ বা ব্রত প্রতিষ্ঠা অথবা কোনো বড় ক্রিয়াকাণ্ডের পর একত্র জড়ো হওয়া স্বজন বন্ধুদের সে ‘গ্রুপ’ ছবি’।

লেখিকা বাঙালিদের প্রচলিত সংস্কার সম্পর্কে ছিলেন সচেতন। নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ষষ্ঠী পূজো বাঙালিদের এক চিরাচরিত রীতি। এই পূজোর প্রস্তুতি বিষয়ে লেখিকা যে তথ্য চিত্র তুলে ধরেছেন তা যেন বাঙালি ঘরের অতি পরিচিত বিষয়।

‘একুশ দিন গেল। ষষ্ঠী পূজো। একুশটি খই-চুবড়ি, কলা নৈবেদ্য, একুশটি ক্ষীরের পুতুল, কাজললতা, মা-ষষ্ঠীর সিঁদুর-আলতা, চিরজীবী মার্কণ্ডেয় মূনির ধুতি, ষষ্ঠী দেবীর লালপাড় শাড়ি, পূজার সন্তারের পাশে বৈধব্যের রিক্তবেশ নরনপাড় ধুতি পরা লক্ষ্মী নবজাতককে কোলে নিয়ে নীরবে বিহ্বলভাবে বসে। আনন্দ কোথায় অথবা দুঃখ কোথায় তার জানা নেই।’

লেখিকা যে প্রকৃতি প্রেমিক তাঁর বাগানের বর্ণনার মধ্য দিয়েই তা প্রমাণিত হয়। নিম্নে বৃক্ষরাজির বর্ণনা প্রদত্ত হল — ‘মস্ত বাগান। তামালতালী নারিকেল সার নেই, আছে শিমূল, পলাশ, নিম, বট, অশ্বথ, দেবদারু, শিঙা, জাম, আম এমনই কতকি বনস্পতি-অবনস্পতির স্নিগ্ধ ছায়া, মাটিতে ঘাস, টবে মরশুমি ফুল।’

দশাশ্বমেধঘাটে কালীপূজার সন্ধ্যায় দীপাবলীর আলো ঝলমল মুহূর্তটিকে লেখিকা সর্বাঙ্গ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন —

‘দেওয়ালির আলো চারিদিকে ঝলমল করছে। ভিড়েরও সীমা নেই। গঙ্গা-আরতি দেখবার ভিড়। দেওয়ালির প্রদীপ ভাসানোর ভিড়। ফুলের নৌকা সাজানো প্রদীপ, শুধু ঘিয়ের প্রদীপ; শুধু পাতার ঘৃতাসিক্ত সলতের প্রদীপ যতরকমের সম্ভব সজ্জিত, প্রদীপ বেচাকেনা আর ভাসানের শেষ নেই। অনেকে ভাসাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। অনেকে ভাসানোর পরও দেখছে। প্রদীপটি ভাসছে কিনা; জ্বলে রয়েছে বা নিবে গেল? নিবে গেলে দুঃখিত হচ্ছে। আবার ভাসাচ্ছে কেউবা। সুখের প্রদীপ, ভাগ্যের প্রদীপ। জীবনের ইঙ্গিতসূচক দীপাবলীর তারা। আবার জ্বালে লোকে।’

‘সতী’গল্পে সতীসজ্জার বিবরণটিতে লেখিকা শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সহমরণ বিষয়টি কতটা মর্মান্তিক অন্ধ কু-সংস্কার বশত সতীকে নানাভাবে সাজিয়ে স্বামীর চিতায় তুলে দেবার মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে এরূপ একটি করুণ ছবি প্রদত্ত হল :-

‘পায়ে জড়ানো রাঙা চেলিখানি, মাদুরের ওপর রাঙা আলতাপাতারস্তূপ, চন্দন সিঁদুরকোঁটা, সিঁদুরের থান, গহনার বাক্স, কাজললতা, মঙ্গলঘট ও ফুলের মালার মানে বুঝতে পারলেন. তারা আস্তে আস্তে গহনার বাক্স খুলল। গহনা পরাতে লাগল। নীচের হাতে গুজরিপঞ্চম, বাউটি, তাগাবাজু পরাল বাহুতে। আঙুলে আংটি, গলায় কণ্ঠমালা, মুড়কি মাদুলির হার। কানে সারি মাকড়ি ছিলই, আবার চৌদানি পরাল। কোমরে রূপার চন্দ্রহার গেটে। পায়ে চরণপদ্ম, মল, চুটকি। পায়ে আলতা দিয়ে পদ্যের মতো গুড় পা দুখানি লাল করে দিল সবাই মিলে।’

গল্পকারের পোশাক পরিচ্ছদ বর্ণনার বৈচিত্র্য আমরা ‘লেডিস ক্লাব’ গল্পে বর্ণনা অংশে খুঁজে পাই।

‘সুভূষিতা দিশি, স্বল্পভূষিতা বিলিতি, চুরিদার, পেশোয়াজ, কাবলিওয়ালার পাজামা-পাজাবি, ঘাঘরা-ওড়না, শাড়ি ইত্যাদি পরিবৃত্ত সালঙ্কারা সর্বজাতিক নারীমণ্ডল, উদ্দেশ্য মহৎ। কেউ বলেন আত্মোন্নতি, কেউ স্ত্রী শিক্ষা-প্রচারিণী সভা, কেউ সম্মিলনী বলে থাকেন।’

জ্যোতির্ময়ী দেবী মেমসাহেবের দৈহিক রূপটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিম্নোক্ত বর্ণনা অংশে।

‘সেদিনের তন্বী মেম সাহেবকে ধবধবে সাদারঙ, নীলাভ ধূসরনয়নী, সোনালী চুলের উপর চমৎকার ফুলদেওয়া হ্যাট মাথায়, সুন্দর রঙের গাউন পরা দীর্ঘাঙ্গী তন্বী মেমসাহেবকে সাহেব হাত ধরে গাড়ি থেকে নামাল।’

‘অহল্যা-দ্রৌপদী-তারা’ গল্পে কিশোরী রূপবতী দুর্গার হরিণ চোখ, চুল, দাঁত ও হাসিভরা ঠোঁটের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে —

‘অনাথা কিশোরী রূপবতী দুর্গার ভাসাভাসা দুটি নির্বোধ হরিণ চোখ। যে দৃষ্টির বুদ্ধিহীনতা সরলতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। পিঠভরা কালো চুল। ঝকঝকে সমান দন্তশ্রেণী। সহজ সরল হাসি ভরা ঠোঁট। রূপ ছিল বই কি?’

‘তিমির সম্ভবা’ গল্পে বি. টি. কলেজের এক ছাত্রীর যে দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকার কলমে তা সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে -

‘চেহারা ভালো। বেশ একটু লম্বা। চোখ দুটি খুব কালো। মুখটা কলকাতার কলেজের মেয়েদের মতো চটপটে হাসিখুশি ভাবের নয়। যেন একটু অন্য রকমের গভীর ধরণের। মাথার চুলগুলিও আঁটোসাঁটো করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাধা নয় এখনকার মতো।’

‘ডাইনী’ গল্পের ডাইনী বলে পরিচিতা লছমীর দেহের অলংকারের বর্ণনাটি লেখিকা অত্যন্ত বাস্তবভাবে তুলে ধরেছেন —

‘ওমরাও পঙ্করের মা ঐ চোখে কাজল, মাথায় চোচী (বেণী), পায়ে কাঁসার মল, নাকে মাকড়ী, নাকে নথ, পুতুলের মতো দেখতে মেয়েটিকে ঘরে নিয়ে যাবার আগেই গানের দলের একটা মেয়ে এসে হাত ধরে নিলে।’

জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর ছোটগল্পে কিছু আশুপূর্ণ বাক্য সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। যে বাক্যগুলি পাঠ করে পাঠক গভীর জ্ঞানের সন্ধান খুঁজে পায়, নিম্নে এমনি কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্য বা সুভাষণ প্রদত্ত হল —

‘হিন্দুদের আধ্যাত্মিক ভাবের সহায়ক প্রেম ও বিবাহ।’

- বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার ঘটে। ধীরে ধীরে এটি পরিত্র প্রেমে রূপান্তরিত হয়, যা আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষের সহায়ক। এই অর্থে এই সুভাষণটি সার্থক।

‘বলবানের ইতিহাস দুরাশয় অনাচারীর ইতিহাস! আবার মহৎ মানুষের মহামানবের ইতিহাস।’

- বলদপী ও দুর্জন কখন-ও দেশের হিতাকাজক্ষী নয়। এই কুখ্যাতদের কলঙ্কিত ইতিহাস আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে। পক্ষান্তরে যারা মহান, তারা সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হয় তাদের আবির্ভাবে জগৎ ধন্য হয়। এই অর্থে এই আশুবাণ্যটি যথার্থ।

‘জীবন অল্পদিনের সমষ্টি।’

— মানবজীবন চিরস্থায়ী নয়, যেকোন সময় বিধাতার অমোঘ নির্দেশে জীবন যবনিকা নেমে আসতে পারে। এই অর্থে এই বাক্যটি লেখিকার অনবদ্য সৃষ্টি।

‘মরণকালের গঙ্গাজল।’

— তীর্থসলিলা পুণ্যতোয়া গঙ্গার পবিত্র জলধারা মরণ কালের একমাত্র সান্ত্বনা।

‘বাঙালী নিজের জীকে পরমাসুন্দরী দেখে।’

- বাঙালীরা পত্নীপ্রেমে হয় মুগ্ধ। পত্নীর গভীর ভালোবাসায় তাদের জীবন হয় ছন্দময়। এই ছন্দময় জীবনে স্বামীরা পত্নীর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠে। এই প্রবাদ বাক্যটির আবেদন চিরন্তন।

রাধারাণী দেবীর গল্পের বিষয় বিচিত্র। তবে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুগুলি যেমন অভিনব, তেমনি গল্পের আঙ্গিক বিচারের দিক থেকে সেগুলো সমৃদ্ধ। তাঁর প্রতিটি গল্পই সহজবোধ্য ও সরল। গল্পগুলির ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংখ্যার দিক থেকে খুব বেশি না হলেও তিনি যে গল্পগুলি রচনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ছোট, বড় ও মাঝারি সব মাপেরই গল্প। তাঁর ‘বিমাতা’ গল্পটি একত্রিশ পৃষ্ঠার, ‘যমের অরুচি’ গল্পটি ষোলো পৃষ্ঠার, ‘সাগর স্বপ্ন’ গল্পটি ঊনত্রিশ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ‘পরমভৃক্ষা’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ, ‘তোমার সঞ্চয়’ ‘দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, ‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদবুদ’ গল্পটি চোদ্দ পৃষ্ঠার, ‘শূন্যমনা কালিনী মেয়ে’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, ‘গতানুগতিক’ গল্পটি বারো পৃষ্ঠার, ‘দাবী হারা’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা চোদ্দ, ‘মাসী’ গল্পটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা একুশ। ‘নিশীথ রাতের বাদল ধারা’, গল্পটি তেরো পৃষ্ঠার, ‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’ চারটি পরিচ্ছেদে লেখা সতেরো পৃষ্ঠার গল্প, ‘মা’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা এগারো, ‘স্বাবার বেলায় পিছু’ডাকে গল্পটি মাঝারি আয়তনের। পৃষ্ঠা সংখ্যা নয়। ‘যে নদী মরু পথে হারাল ধারা’ গল্পটি বারো পৃষ্ঠার, ‘পাতানো মা’ গল্পটি আয়তনে বড়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছাব্বিশ। ‘একটি গল্প’ নামে গল্পটির আয়তন অপেক্ষাকৃত ছোট। পৃষ্ঠা সংখ্যা দশ।

‘বিমাতা’ গল্পটি শুরু হয়েছে নিম্নরূপভাবে —

“দশম বর্ষীয়া বালিকা মাধুরী যখন মাতৃহারা হইল, তখন তাহার
মর্ম্মভুদ বেদনা-মথিত আকুল শোকাশ্রু-ধারা রুদ্ধ করিতে হইয়াছিল দুই
বৎসরের শিশু ভাই তপনকুমারের মুখপানে চাহিয়া।”

গল্পটির সমাপ্তিটিও শিল্পসম্মত —

“তোমার মা স্বর্গে গেছে।”

‘যমের অরুচি’ গল্পটি শুরু হয়েছে ‘ক্ষেপ্তি’কে সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে “ক্ষেপ্তি, অ-
ক্ষেপ্তি, ওলো শতেক-যোয়ারি হারামজাদি! কানের মাথা খেয়েছিস কি?”

গল্পটির শেষ অংশ ব্যঞ্জনাধর্মী,

“আরে ছ্যাঃ, দেখলেন তো, অমন ছুঁড়িতে যমেরও অরুচি।”

‘সাগর স্বপ্ন’ গল্পটির প্রারম্ভ রয়েছে প্রকৃতির অপরূপ শোভা —

“স্বর্গদ্বারের শেষ সীমানায় যেখানে শুধু কাঁটা বন আর জঙ্গল
ভিন্ন লোকালয় দেখা যায় না, সমুদ্রতীরের উঁচু পাড়ে মস্তবড় একটা
বালির ঢিবির উপরে পা ঝুলিয়ে বসে নিবিষ্ট চিন্তে নীল রংয়ের
তুলিটা কাগজের উপর ঝুলিয়ে ছবি আঁকছিল মুকুর।”

গল্পের শেষ অংশটিতেও গল্পের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় —

“মুকুরের নিম্পলক দৃষ্টির উপরে বড় বড় হরফে হেডিং
লেখা ‘সাগর স্বপ্নটি’ একবার জেগে উঠতেই, মুহূর্ত মধ্যে আরও
অনেকগুলি পাতা ফর্ ফর্ করে তার উপর উল্টে পড়ে কোথায়
তাকে মিলিয়ে দিল।”

‘হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!’ গল্পটি শুরু হয়েছে
এইভাবে —

“নাম সার্থক হয়ে উঠেছিল কিনা জানা নেই।”

গল্পটির শেষাংশ নাটকীয় —

“.....তারপর কি ভেবে ধীরে ধীরে তার দুর্বল দেহখানিকে টেনে
নিয়ে শিথিলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে নির্বাক অবস্থায় অবস্থায় এসে বিপিনের
গাড়ীতে উঠে বসল।”

রাধারাণী দেবীর গল্পের নামকরণ ভাবধর্মী ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তাঁর বিষয়ভিত্তিক
নামকরণের সংখ্যা খুব কম। ‘পাতানো মা’, ‘মুক সাথী’, ‘শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে’, ‘পরম তৃষ্ণা’,
‘যমের অরুচি’, ‘দাবিহারা’, প্রভৃতি গল্পের নামকরণে শিল্পবোধের পরিচয় রয়েছে। গল্পের কাব্যধর্মী

নামকরণ গুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘নিশীথ রাতের বাদল ধারা’, ‘অন্তরেতে অশ্রুঝরে’, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’, ‘যে নদী মরুপথে হারাল ধারা’, ‘আলো কোথায় ওরে আলো’ ও ‘হায়রে হৃদয় ; ‘তোমার সঞ্চয় দিনান্ত নিশান্তে’ ‘শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়’ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোন কোন কবিতার ছত্র রাধারাণী দেবী নামকরণ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এরূপ নামকরণ না হলে কাব্যগুণের প্রকাশ ঘটত না। ‘মা’, ‘মাসি’, ‘বিমাতা’ প্রভৃতি গল্পে নারী হৃদয়ের সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। তার একটি গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ হল ‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদবুদ’ গল্প, ‘সাগর-স্বপ্ন’ গল্পটি ও এই ধারারই ফলশ্রুতি।

তাঁর গল্পের প্লট ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ ফলে গল্পগুলিতে কোন অসঙ্গতি দেখা দেয়নি। প্লট সেখানে শিথিল নয়।

চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যে রাধারাণীর গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ‘দাবীহারা’ গল্পের নন্দ, স্নেহ চরিত্রদ্বয় তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি। ‘মাসি’ গল্পের মীনু, অজিত চরিত্রদ্বয় জীবন্ত। গুল্লা চরিত্রটিও লেখিকার সার্থক সৃষ্টি। আমিনা চরিত্রটি ‘নিশীথ রাতের বাদল ধারা’ গল্পের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র। ‘অন্তরেতে অশ্রু বাদল ঝরে’ গল্পের প্রভাত, সুধা, বৌদি ও কমলা চরিত্র গুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকার কলমে জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ‘মা’ গল্পের সরোজিনী, অমল চরিত্রদ্বয় লেখকের স্বকপোল কল্পিত। সরোজিনী ও ললিতা চরিত্রদ্বয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। মালতী, কমলা ও নির্মল প্রভৃতি চরিত্র নির্মাণে লেখিকা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

গল্পের আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে বাক্য বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তিনি ছোট, বড়, মাঝারি সবধরনের বাক্যই ব্যবহার করেছেন। নিম্নে একটি মাঝারি ধরনের বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

“গভীর মন্ড্রে সাগর-গর্জন আর তার সঙ্গে উদ্দাম সমুদ্র -হাওয়ার ঢেউয়ের সাথে মাতামাতির বিচিত্র ধ্বনি, গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ হু হু নানা সুরে নানা শব্দে, কখনও-উন্মাদের অর্থহীন হাসির মতো, কখনও শত্রু- কারারুদ্ধ বীরের নিষ্ফল রুদ্ধ গর্জনের মতো, কখনও- সদ্যঃ পুত্রহারা জননীর বুকফাটা আর্ত কান্নার মতো শ্রবণ-পথে এসে ঠেকতে লাগল তার।”

— আলোচ্য বাক্যে চারটি কমা, ছয়টি হাই-পেন, তিনটি সাদৃশ্য বাচক শব্দ মতো এবং তিনটি উপমান যথাক্রমে হাসির, গর্জনের ও কান্নার ব্যবহৃত হয়েছে, এরপরে পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। নিম্নে একটি বড় বাক্য প্রদত্ত হল —

“সমস্ত দিনে এবং রাত্রিতে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে সে আপনাকে ঘড়ীর কাঁটারই মত নিয়মিত করিয়া আজিতির মুখ ধোয়ান, ঔষধ খাওয়ান, পথ্য প্রস্তুত করা, পথ্য খাওয়ান, বুক পিঠে

সেক দেওয়া, পুলটি লাগান, মালিস করা, জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা, বমি-মলমূত্রাদি পরিষ্কার করা, বিছানা বদলান, সর্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখা, রোগীর সদাসর্বদার শারীরিক অবস্থা এবং ঔষধ পথ্য সেবনের ভিন্ন ভিন্ন চার্ট লিখিয়া রাখা, রাত্রি জাগা, বাতাস করা, নানাপ্রকার প্রক্রিয়ায় রোগীর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করা, ঘুম পাড়ান, গল্প করা, সান্ত্বনা দেওয়া, বই পড়িয়া গুনান প্রভৃতি কৰ্ম অত্যন্ত ধীরে অথচ ক্ষিপ্ততা সহকারে শিক্ষিতা, সেবাকারিণী ও স্নেহময়ী জননীর মতই সুনিপুণভাবে করিয়া যাইত।”

— আলোচ্য বাক্যে দুটি ‘এবং’ উনিশটি ‘কমা’ একটি ‘ও’-র পর পূর্ণচ্ছেদ বসেছে। এখানে দু’টি উপমান-সেবাকারিণী ও সেবাময়ী জননী একটি সাদৃশ্য বাচক শব্দ ‘মতো’ ব্যবহৃত হয়েছে।

সংলাপ অংশে ছোট ছোট বাক্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

“সুধা বলিল — ‘এখনি আবার নীচে নামতে হবে তো ? আছাড় খাওয়া পা দুটোকে একটু তাজা করে না নিলে ওরা আজ আর তোমাকে নীচে পৌঁছে দিতে রাজি হবে না, মনে থাকে যেন।’

সুধীর একটা কেরোসিন কাঠের বাস্ত্রের উপরে বসিয়া দেয়ালে পিঠ দিয়া আরাম করিয়া সিগারেট টানিতে ছিল। বলিল - ‘সুধা, আমারও পায়ে একটু তেল দিয়ে দিবি তো?’

‘ঈস! বয়ে গেছে। ছোট বৌদিরই তো পায়ে তুই তেল দিচ্ছিস।

সে কি আর আমার পায়ে মালিশ করবে? বরং আমাকেই হয়তো হুকুম করে বলবে’

—
কমলা তর্জন করিয়া উঠিল - ‘মিছি মিছি আমার সঙ্গে লেগো না বলে দিচ্ছি।’

— আলোচ্য সংলাপ অংশে সুধা ও কমলাও সুধীরের এই সংলাপ অংশে রয়েছে নাটকীয়তা।

রাধারাণী দেবী তাঁর গল্পে বেশ কিছু সমাস বদ্ধ পদও ব্যবহার করেছেন। নিম্নে সমাস বদ্ধ পদ গুলি প্রদত্ত হল :-

আলোকোদ্ভাসিত, বিশৃঙ্খলামোচন, চিন্তাধ্যানমগ্ন, নবনীত-গুহ্র, অরুণালোকে, জ্ঞানোভ কৰ্ম, হীরকাসুরী, পূর্ণাধিকারে, অনুগ্রহজীবনীরূপে, স্নানসমাপনান্তে প্রভৃতি।

তিনি গল্পে ধন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন - বুপবুপ, রিমরিম, রিমরিম, চুপ-চুপ, খুঁত খুঁত, মচমচ প্রভৃতি।

গল্পকার রাধারাণী দেবী তাঁর গল্পের বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছড়া, গান, রবীন্দ্র কবিতার ও সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেছেন। চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে তথা মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে

ধরবার প্রয়োজনে গানগুলির উপযোগীতা কোন অংশে কম নয়। নিম্নলিখিত গানটি ‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’ গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গানটি গেয়েছে গল্পের নায়িকা সুধা। সঙ্গীত প্রিয় সুধার কাছে গানই হোল প্রাণ। এই গানটি শ্রোতা প্রভাত বাবু। এসরাজ বাজিয়ে সুমিষ্ট স্বরে এই গানটি সুধা তাকে শুনিয়ে ছিল। গানটির মধ্যে রবীন্দ্র ভাবনার সার্থকপ্রকাশ ঘটেছে।

“কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি

যাব -অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,

ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী

কোথায় - যেতেছি কোন দেশে সে কোন্ দেশে!”

নিম্নোক্ত অংশটি পূর্বোক্ত গানেরই অংশ বিশেষ। সুধার এই গানের সুর ও কথার মাধ্যমে প্রাণের নিরুদ্ধ গোপন বেদনা রাশি প্রকাশিত হয়েছে। নারী মনস্তত্ত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে এই গানটির বিশেষ প্রয়োজন ছিল —

‘আজও সময় হয়নি কি তার কাজ কি আছে বাকী ?

ওগো, - ঐ যে সন্ধ্যা নামে সাগর-তীরে -

মলিন আলোয় পাখা মেলে সিঁকুপারের পাখি

আপন, - কুলায় মাঝে সবাই এল ফিরে।

কখন তুমি আসবে ঘাটের পরে

বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে

অস্ত -রবির শেষ আলোটির মতো

তরী -নিশীথ মাঝে যাবে নিরুদ্ধদেশে!’

প্রকৃতির পটভূমিকায় সুধার কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই গুজরাতি গরবার সুরে গাওয়া গান। এই গানটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত। গানটির মধ্যে চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুল প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতি চেতনার পরিচয় বহন করে —

‘.....পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রতে।

চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে।

নিরালার কোল ভরা ফুল জাগে আলো- করা

যেচে কার খুনসুড়ি সইতে !

অথই পাথার পারা জ্যোৎস্নায় মাতোয়ারা

দিশেহারা হল হাওয়া চৈতে!’

রাধারাণীদেবী ছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি তাঁর গল্পে স্থান

দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এই গল্পটিতে প্রকৃতির অনুষঙ্গে মানব চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে —

“আমি, জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমার, এ দেহ-মন মিলায়ে যাক নিশীথ রাতে,
আমার, লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্প -পাতে
ওগো থাক না ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি।”

‘দেবতার গ্রাস’ কবিতাটি কথা ও কাহিনী কাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত। লেখিকা আলোচ্য কবিতার প্রথম দু’টি ছত্র ‘মাসি’ গল্পে স্থান দিয়ে মীনুর মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন —

“গ্রামে -গ্রামে সেই বার্তা রটি’ গেল ক্রমে,
মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সংগমে।”

‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’ গল্পের বেণু সমীরকে এই গানটি শুনিয়েছে। বলা বাহুল্য এটি প্রেমেরই গান। এই প্রেম এক কুমারী মেয়ের ভীষণ প্রেমের নিদর্শন। এই গানটির মধ্যে নায়িকার আবেগ ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে —

‘তুমি যে এসেছো মোর ভবনে -
তাই, রব উঠেছে ভুবনে !
নইলে, ফুলে কিসের রং লেগেছে
গগণে কোন গান জেগেছে
কোন পরিমাল পবনে -’

নিম্নোক্ত অংশটি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি গ্রাম্য ছড়া।

‘বিমাতা’ গল্পের নায়িকা মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে সৎমা অন্নতারা এই প্রবচনটি শুনিয়েছে। ঘটনার সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ এই ছড়াটির আবেদন চিরন্তন —

‘যে মেয়ে সতীনে পড়ে,
ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।’

লেখিকা ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার মন্ত্রটিকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ‘ভাই-ফোঁটা’ ছোট গল্পে সংযোজন করেছেন। দিদি তার প্রিয় ভাইকে ফোঁটা দিতে এসে শিউলি ফুলের মালা, শঙ্খ, ঘন্টা, প্রদীপ, ধূপের সুগন্ধ ছড়িয়ে স্নেহের ভাইটিকে ফোঁটা দিয়েছে :

“ভায়ের কপালে দিলুম ফোঁটা
যমের দ্বারে পড়লো কাঁটা -

যমরাজ যেমন অমর - (আমার) ভাই তেমনি হোন অমর !”

এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ। অনসূয়া নিতুকে গুনিয়েছে এই প্রবাদটি। জীবিতাবস্থায় যাকে ন্যূনতম খাদ্য বস্ত্র যারাদিতে পারে না, মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধানীষ্ঠানের আড়ম্বর করাটা অর্থহীন। এই অর্থে আলোচ্য প্রবাদটি অর্থবহ —

‘জ্যাস্তে পায়না ভাত- কাপড়

মলে হবে দান সাগর।’

রাধারাণীদেবী সংস্কৃত শ্লোকটি সংযোজন করে আলোচ্য ছোট গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রায় পৌছে দিয়েছেন —

‘ভ্রাতৃস্তবানীজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং

প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ।’’

গল্পের সংলাপের পাশাপাশি বর্ণনা অংশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বর্ণনা অংশে চরিত্রের রূপ ও বৈচিত্র্য তুলে ধরেন গল্পকারগণ। রাধারাণীর ক্ষেত্রে-ও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। মালতীর রূপ, তার স্বভাব সর্বগুণে ও মাধুর্যে যেন চরিত্রটির পূর্ণতা বহন করে এনছে নিম্নোক্ত বর্ণনা অংশে —

‘মালতিকে ভাবতে বেশ ভালো লাগে। ভারী সুন্দর মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটি। যেমনি শান্ত ও নম্র, তেমনি সলজ্জ প্রকৃতি। দেখতে পরমাসুন্দরী না হলেও মুখখানি কিছু নিখুঁত, টানা ভুরু নীচে স্নিগ্ধ শান্ত কলো চোখদুটি -টিকালো নাকটি, চিবুকে টেপা গড়নটি, কেমনতর যেন মাধুর্যে পরিপূর্ণ।’

‘পাতানো-মা’ গল্পে তরুণী বধূর দৈহিক বর্ণনার পাশাপাশি কম ব্যক্ততার সার্থক পরিচয় রয়েছে নিম্নোক্ত অংশটিতে —

‘নাতি-খর্ব নাতি দীর্ঘ দুটি তরুণী বৌ ভাড়ার ঘরের ভিতর হইতে বেরিয়ে আসে - একজনের ডান হাতের আঙুলগুলি চুন খয়েরের দাগে রাঙা- জলে ভেজা ; আর একজনের দু’হাতের আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে তালুদ্বয়ে ভিজেময়দা জড়ানো। দী’হাত রগড়ে আঙুলে জড়ানো ময়দা গুলি তুলে ফেলতে ফেলতে বেড়িয়ে আসে।’

পূর্বোক্ত গল্পেরই একটি চরিত্র, তার নাম উকিল সে বেহারী চক্রবর্তী দৌহিত্র। পিতৃ মাতৃহীন উকিলের বয়স, তার পোশাক-পরিচ্ছদ, তার স্বভাব আলোচ্য বর্ণনা অংশটিতে জীবন্তভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে - বয়স তের-চৌদ্দ। মুখে ক্লান্ত অবসাদ যেন নিবিড় করে মাখানো। সর্বদা দিয়ে চর্ম্মান্তরালবর্তী হাড়গুলির দৈর্ঘ্য- প্রস্থ সুস্পষ্ট দেখা যায়। আধময়লা মিলের ধুতি, - বোতামহীন খাকী শার্টের হাতদুটো এলিয়ে ঝলমল করে -বুকের মাঝখানটা খোলা জামার ভিতর দিয়ে সর্বদা সুস্পষ্ট।

চোখদুটি যেন কাঁচা - ঘুমভরা, নিদ্রালস জড়ানো। তাতে অতৃপ্তি বিরক্তি, অবসাদ ও

ঔদাসীনা যুগপৎ বিরাজমান। এত অল্পবয়স্ক বালকের মুখে চোখে ললাটের রেখায় জীবন যুদ্ধের ক্লান্তি যেন অপরিষ্কৃতভাবেই ফুটে উঠেছে। তার দৃষ্টির কর্ণ- ক্লান্তি, স্বভাবের মৃদুতা সহজেই মানুষের মমতা আকর্ষণ করে।”

পূর্বক্ত গল্পে অল্প বয়স্ক সমবয়সী দু’টি বউয়ের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

‘বৌ দুটি প্রায় সমবয়সী। বছর পনেরো - ষোল বয়স। শাণ্ডী শোকে -তাপে- মমতা-দ্রব-স্বভাব, -মাটির মানুষ।’

স্বপ্নদর্শন বিষয়ে লেখিকার এ বর্ণনাটি অসাধারণ সন্দেহ নেই —

“গায়ের রং ফর্সা, খালি গায়ে মোটা ধবধবে পৈতার গোছা। পরণে ধবধবে সাদা থানা।”

রাধারাণী দেবী ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক। তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায় রয়েছে কবিত্বের ছোঁয়া। গোধূলির আবীরমাখা সন্ধ্যার অন্তরাগ, নিশীথের আঁধার, পূর্ণিমার উল্লসিত জ্যোৎস্না, প্রভাত, সন্ধ্যা উষা ও দ্বিপ্রহরের বর্ণনাটি অনবদ্য।

“নিশি শেষে স্বর্ণরঞ্জিতা উষার প্রথম পদক্ষেপ, হ’তে গোধূলির আবীর মাখা সন্ধ্যার অন্তরাগ, নিশীথের আঁধার আকাশে নিস্তন্ধ নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ণিমার উল্লসিত জ্যোৎস্না হাসি, সবই যেন কত বিচিত্র অভিনব বেশে এসে দাঁড়াচ্ছে! - এই একই আকাশ প্রভাতে ঘন নীল অরুণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে -সন্ধ্যায় সিঁদুর -মাখা রক্তরাঙা হয়ে উঠেছে, উষার শুভ্র স্ফটিক, দ্বিপ্রহরে, দক্ষ তাম্রবর্ণ হয়ে উঠেছে। কখনও পুঞ্জপুঞ্জ মেয়ের আড়ালে সাড়া আকাশ লুকিয়ে পড়ছে - কখনও অশ্রান্ত ধারা বর্ষণে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে - কখনওবা জ্যোৎস্নারাতে হালকা মেঘশিশুদের সাথে লুকোচুরি খেলেচে!”

ছোটখাটো বর্ণনার মধ্যে লেখিকা চিত্ররূপের সম্ভার সাজিয়েছেন। একটি গ্রামের মেলার বর্ণনা আমাদের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত বলেই মনে হয় —

“দূরে পাহাড়তলীর গ্রাম - সীমানায় মেলা বসেচে। দলে দলে সকল বয়সের পুরুষ ও নারী বিচিত্র বেশে সেজে চলেছে। সামনের সররাঙা রাস্তাখানি পার হয়ে তারা ঐ পোড়া কালোরংয়ের ছোট পাহাড়টার কোল ঘেঁষে ধবধবে সাদা কাঁচা মাটির রাস্তাটি ধুলোয় ঘোলাটে করে চলে যাচ্ছে। পরণে তাদের হলুদ -ছাপানো শাড়ী, কুসমী রংয়ের ধুতি-শাদা রাঙা হলদে রঙের ফুল তাদের খোঁপায় কিম্বা কানে, তৈল -নিষিক্ত কালো চুন সযত্নে আঁচড়ানো।”

‘একটি গল্প’ গল্পের বাংলা প্যাটার্নের বাড়ীর নিখুঁত বর্ণনা আমাদের নিয়ে যায় স্বপ্ন সুরভিমাখা এক স্বর্গীয় জগতে। লেখিকা আলোচ্য অংশে ফুল ও নাটমন্দিরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেন কবির কলমে শরতের সন্ধ্যা। বালিগঞ্জে একখানি ছোট বাংলা প্যাটার্নের বাড়ী। রাস্তার ধারে বৈঠকখানা ঘরের সামনে দক্ষিণ- “পুব খোলা নাটমন্দিরের মত একটুখানি চত্বর, দক্ষিণে চত্বর

সংলগ্ন ছোট্ট একটুকরো জমিতে গোটাকতক ফুলের গাছ,- শিউলি, হাস্সাহানা, গোলাপ, রজনীগন্ধা, সকালবেলার হাওয়া শিউলির স্নিগ্ধ গন্ধে সুরভিত হয়ে ওঠে, টুকরো জমিটুকু শিশির সিক্ত শাদা ফুলের ঝারায় আলপনাচিত্রিত হয়। সন্ধ্যাবেলা হাস্সাহানার তীব্র সৌরভে বাতাস হয়ে ওঠে চঞ্চল।’

স্মৃতি সতত সুখের এমনকি দুঃখেরও। ‘বিমাতা’ গল্পে মাধুরীর বাল্যের বেদনা মথিত শোক ভোলেনি। শোকন্তপ্ত মাধুরী যখন বড় হয়েছে, তখনও অতীতের কথা স্মরণ প্রসঙ্গে লেখিকার এই দার্শনিক চেতনা যুক্ত আশু বাক্যটি সার্থক —

“সময়ই শোকের একমাত্র ঔষধ।”

প্রচলিত এই প্রবাদটির আবেদন চিরন্তন —

“সতীনপোর উপর সৎমায়ের টান।”

আলোচ্য প্রবাদটি-ও গল্পের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত —

“মাছের মায়ের পুত্রশোক।”

আলোচ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটিতে লেখিকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কুৎসিত রূপটি তুলে ধরা হয়েছে —

“দরিদ্র ও দুর্বলকে অস্পৃশ্য জাতি করে রাখা আর মেয়েমানুষকে মানুষের সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, একটা জড় পুতুল, ভোগের সামগ্রী করে রাখা, এই-ই আমাদের জাতের সবচেয়ে বড় মহাপাপ।”

অধার্মিক ব্যক্তির শান্তি পায় ও ধার্মিক ব্যক্তির শান্তি পায়। অর্থে এই প্রবাদটি সার্থক —

“ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।”

“গগন আর সাগর যেন এক মায়ের পেটের দুটি ভাই-বোন। এদের রূপ-বৈচিত্র্যের সীমা নেই, অন্ত নেই।”

দুঃখ বেদনা যুক্ত ব্যক্তির কর্মের মধ্যে মনোনিবেশ করলে তাদের দুঃখের ভার লাঘব ঘটে —

“সময় সকল দুঃখই ভুলিয়ে দেয়।”

- নিতান্ত আপনজনের সঙ্গে যদি কোন কারণে সু-সম্পর্কের ব্যাঘাত ঘটায়, তখন তারা কাছের না হয়ে দূরের হয়ে যায়। এই অর্থে লেখিকার অভিজ্ঞতা প্রসূত এই বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ —

“আপনজন যদি ‘পর’ হয়ে যায়, তার চেয়ে ‘পর’ আর কেউ হতে পারে না! নিকটতম ছিল যে-সে যদি দূরে সরে যায়, -তার চেয়ে সুদূর আর কিছু থাকে না।”

নিম্নোক্ত প্রবাদ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ —

“দুঃখই যে সব চেয়ে বড় সুখ।”

দুঃখ ও সুখের তাৎপর্য বোঝাতে এই প্রবাদটি লেখিকার সফল সৃষ্টি —

“দুঃখের ভিতরে নিবিড়তম সুখ!”

প্রকৃত ভালোবাসার মধ্যে কোন কপটতার স্থান নেই। এই অর্থে এই প্রবাদটি-ও লেখিকার সার্থক সৃষ্টি —

“ভালোবাসা দিনের আলোর মত সত্য, হাওয়ার মত সহজ, সাবলীল।”

প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। প্রবৃত্তি মানুষকে অধঃপতিত করে। এই প্রবৃত্তি হল আমাদের শত্রু। প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী হওয়ার মধ্যেই মনুষ্য মহিমার পূর্ণপ্রকাশ ঘটে। এই অর্থে আলোচ্য সুভাষণটি অভিনব সন্দেহ নেই।

“বয়স বা প্রবৃত্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর বৃত্তি মানুষের মধ্যেই আছে বলে এবং একমাত্র মানুষই এই বয়োধর্মকে জয় করে প্রবৃত্তির দাস না হয়ে তার প্রভুত্ব করতে পারে বলেই না সে জীবজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ?”

- ‘পাতানো মা’ গল্পে অনুসূয়ার জীবজগতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে ব্যবহৃত এই আশু বাক্যটি সার্থক।

লেখিকার গল্পে আত্মকথন রীতি যেরূপ আছে, তেমনি বর্ণনার মাধ্যমে কিংবা গল্পের মধ্যে গল্প বলার রীতি-ও যথাযথভাবে স্থান পেয়েছে। উপস্থাপন কৌশল নৈপুণ্যে রাধারানী দেবীর গুলি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সাবিত্রী রায়ের খ্যাতি উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে হলেও তাঁর রচিত গল্পগুলি ও বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন। তাঁর গল্পের সংখ্যা বেশি না হলেও বিষয় বস্তুর অভিনবত্বে ও আঙ্গিক রচনার ক্ষেত্রে পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছে। সমালোচক সুদক্ষিণা ঘোষ সাবিত্রী রায়ের গল্প সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন-

“নিছক মনোহারী গল্প বলার টানে কোনদিনই কলম ধরেননি সাবিত্রী, বিশেষ এক সময় আর সেই সময়ের স্রোতে বাহিত স্বল্পবিত্ত আর বীতবিত্ত মানুষের জীবনস্পন্দনকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে তাঁর গল্প, মানুষের ইতিকথার সঙ্গে পড়তে পড়তে জড়িয়ে গেছে অন্ধ আর্ত বিপন্ন এক সময়েরও উপকথা। আজকের মনোযোগী পাঠক হয়তো সাবিত্রী রায়ের গল্পে খুঁজে পাবেন সময়ের সেই জলছবি।”^৪

সাবিত্রী রায়ের গল্পের শৈলী অভিনব। তনিকা সরকার সাবিত্রী রায়ের রচনা - সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা অংশে মূল্যবাণ মন্তব্য করেছেন - “যে শৈলীকে সাহিত্য, রাজনীতি ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সাবিত্রী রায় বেছে নিয়েছেন তার পথ থেকে তিনি বারবার সরে আসেন কেন ?

তবে কি এই সাম্যবাদের, রাজনীতির শৈলী তাঁর যথার্থ আবাস নয়? বরঞ্চ কোন এক নিভৃত, নির্জন, অনুরণনময়, লিরিক ব্যক্তিমানসের অতল, অপার গভীরতা- এই কি তাঁর প্রকৃত ঘরাণা হতে পারত? তাই যদি হয়, তাহলে কেন তিনি বারবার নিজেকে এক বিশাল, জটিল, নিষ্ঠুর এপিকের ঘূর্ণাবর্তে ছুঁড়ে দেন, দুয়ের সংঘাতে এত কঠিন প্রশ্নের অবতারণা করেন? মতাদর্শের দিক দিয়ে তাঁকে কি বলব? আধা-সাম্যবাদী, আধা-নারীবাদী, আধা-সনাতনী?”

আমার বিশ্বাস যে, সাবিত্রী রায়ের এই স্ববিরোধী স্ববিত্ত ভাষা, বাচন ও প্রত্যয়, বিভিন্ন জীবন দর্শনের মোকাবিলায় এই যজ্ঞা, এই নিরন্তর, নিরবসান জিজ্ঞাসা - জার সহজ সমাধান তিনি দেবার চেষ্টা করেননি - এই হল তাঁর সাম্যবাদের স্বকীয় প্রকাশ। তাঁর লেখার শেষে প্রশ্ন সমাধানকে ছাপিয়ে ওঠে, চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অথবা উত্তরের নিশ্চিহ্ন নিরাপত্তার চেয়ে তর্ক, চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত জারী থাকে। স্ববিত্ত ইতিহাস নিজস্ব অন্তর্দ্বন্দ্ব পরস্পর বিরোধিতার চাপে এগিয়ে চলে, স্বর্ণ যুগের কল্পনা এসে ইতিহাসের অজস্রতা, বিলুপতাকে থামিয়ে দেয় না। ‘সাম্যবাদিনী’ বলে কি আমরা নতুন কোন শব্দের অবতারণা করতে পারি? - যা সাম্যবাদীর পরিচিত সংজ্ঞার থেকে কিছুটা আলাদা?”

ফর্মের দিক থেকে ভিন্ন হলেও সাবিত্রী রায় তাঁর গল্পে ব্যক্তিগত অনুভূতি ভাব ও ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে পেরেছেন। সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা-সংকলন গ্রন্থে গার্গী চক্রবর্তী লিখেছেন

“প্রতিদিনের চেনা জগৎ, তার গাছ পাতা - আকাশ-বাতাস-চারপাশের দেখেও না - দেখা মানুষ, তাদের সুখ দুঃখের চলমান জীবন-সবকিছুই লেখিকা দেখেছেন তাঁর আনন্দ বেদনাঘন চোখের বিস্ময়ভরা নীবিড়তায়।”

সাবিত্রী রায়ের গল্পের নামকরণ গুলিও শিল্পসম্মত। তাঁর চরিত্র প্রধান গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘রাধারাণী’ ও ‘হাসিনা’। ব্যঞ্জনধর্মী গল্পগুলি যথাক্রমে — ‘মাটির মানুষ’, ‘নূতন কিছু নয়’, ‘সাময়িকী’, ‘ধারাবাহিক’, ‘ওরা সব পারে’, ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’, ‘সমঝদার’, ‘প্যারামবুলেটার’, ‘অন্তঃসলিলা’। তিনি প্রত্যেকটি গল্পের নামকরণ আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রতিটি গল্পের নামকরণে গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ফুটে উঠেছে।

চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যে সাবিত্রী রায় সচেতন ছিলেন। ‘অন্তঃসলিলা’ গল্পের শকুন্তলা চরিত্র নির্মাণে রয়েছে বাস্তবতা। ‘মাটির মানুষ’ গল্পের যমুনা ও নিকুঞ্জ চরিত্র দুটি জীবন্ত। উভয় চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ তিনি আলোচ্য গল্পে ব্যক্ত করেছেন। শোভনার পাশাপাশি তার ডাক্তার স্বামী চরিত্রের বৈপরীত্য আলোচ্য গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়। শোভনার বিবেকবোধ ও সহানুভূতিবোধ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘রাধারানী’ লেখিকার এক রসোত্তীর্ণ গল্প। রাধারানীর চরিত্রিক বিবর্তনটি লেখিকা অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তারপর প্রলুব্ধ পুরুষ সমাজের যে অশুভ দৃষ্টি পতিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশপেল তিক্ত আত্মগ্লানি তাকে বহন করতে হয়েছিল।

‘সাময়িকী’ গল্পের যামিনী, উল্লাসিনী, রমা ও উর্মি চরিত্রগুলো আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

‘ধারাবাহিক’ গল্পের পটলা, বিশ্বনাথ চরিত্র নির্মাণে লেখিকা মুন্সীমানার পরিচয় দেখিয়েছেন। বিশ্বনাথ চরিত্রের পূর্ণরূপ তিনি আলোচ্য ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন।

‘ওরা সব পারে’ গল্পের গোলাপী চরিত্রটির সম্পর্কে লেখিকা ছিলেন সহানুভূতিশীল। বাবু ও বাবুপত্নী গোলাপীর উপর যে নির্দয় ব্যবহার করেছে তারমধ্য দিয়ে ধনীতন্ত্রের প্রতি লেখিকার ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে।

‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ গল্পের তাপস ও দীনু চরিত্রদ্বয় লেখিকার অসাধারণ সৃষ্টি।

‘প্যারামবুলেটার’ গল্পের শিশু চরিত্রটি অত্যন্ত সার্থক। সুশান্ত, মালা চরিত্র দুটি ঘিরে দুই দম্পতির মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা উদ্ঘাটন করেছেন। চরিত্র প্রধান হাসিনা গল্পটিতে লেখিকার দক্ষতা শীর্ষবিন্দুতে স্পর্শ করেছে।

লেখিকা তাঁর গল্পের প্লটবিন্যাসে বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেছেন। ভাবগত ঐক্য তিনি রক্ষা করেছেন। গল্পের উপকাহিনী তিনি পরিহার করেছেন। জীবনের সহজ সরলরূপকে তিনি কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করেছেন। ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক তিনি বজায় রেখেছেন।

ছোট আয়তন বিশিষ্ট গল্পই দেখা যায় সাবিত্রী রায়ের গল্প সংকলন ‘নতুন কিছু নয়’ তে।

তাঁর ‘মাটির মানুষ’ ও ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পদুটি পাঁচ পৃষ্ঠার। সাত পৃষ্ঠার গল্প ‘রাধারানী’। সাময়িকী গল্পটি ছয় পৃষ্ঠার। ‘ধারাবাহিক’ গল্পটি চার পৃষ্ঠার। ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ আট পৃষ্ঠার গল্প। ‘সমঝদার’ চার পৃষ্ঠার গল্প। ‘হাসিনাও’ চার পৃষ্ঠার গল্প। ‘প্যারামবুলেটার’ পাঁচ পৃষ্ঠার ছোটগল্প ও ‘অন্তঃসলিলা’ গল্পটি আটপৃষ্ঠার।

গল্পের আঙ্গিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাক্য বিন্যাসে মনোযোগী ছিলেন না। জীবনের ছোট খাটো সুখ দুঃখ কথা ছোট ও মাঝারি বাক্যের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। সংলাপ অংশে তিনি ব্যবহার করেছেন ছোট ছোট বাক্য। সে গুলোর মধ্যে তিনি অদ্ভুত নাটকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। বর্ণনা অংশের পাশাপাশি তিনি যে সংলাপ গুলি ব্যবহার করেছেন তারমধ্যে রয়েছে লেখিকার বাস্তবতার পরিচয়। যে চরিত্রের মুখে যে সংলাপ উপযোগী সেরূপ সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে লেখিকার অবদান অসীম। নিম্নে তার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

‘অবাক হয়ে হাসে পরিচারিকাটি।

‘ছেলেপুলে নেই?’

‘আছে একটি দোলনায় শুয়ে।’

‘ছেলে না মেয়ে?’

‘মেয়ে।’

তাঁর মাঝারি ধরনের বাক্যগুলোর মধ্যেও শিল্পগুণের পরিচয় মেলে। বর্ণনা অংশে তিনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঝারি বাক্য ব্যবহার করেছেন। নিম্নে তার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

‘ঘন অন্ধকারের ভিতর হইতে বিশ্বনাথের চোখের সামনে আরেক জোড়া চোখ ভাসিয়া উঠে- পটলার বৌ-এর জলভরা চোখ দুইটি - গ্লানিমাখা করুণ দৃষ্টিভরা।’

সাবিত্রী রায় গল্প রচনার সময় তৎসম শব্দকে পরিহার করেছেন। সংস্কৃত শব্দবহুল শব্দের পরিবর্তে কি বর্ণনা অংশে, কি সংলাপ অংশে তিনি সচেতনভাবে কথ্য রীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে কথ্যরীতি ব্যবহারের ফলে লেখিকার ছোটগল্পের ভাষা হয়েছে চিত্তকর্ষক এবং সহজবোধ্য।

তিনি কখনো কখনো আরবি, ফার্সী ও ইংরেজী বাংলা মিশ্রিত শব্দের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হল —

‘কটা গলায় ফরমাস জানায় মেয়েটি, ‘আরেকখান গাও বুড়া।’

নিম্নে বর্ণনা অংশে তিনি ইংরেজী ও বাংলা ভাষার সহবহুল ঘটিয়েছেন। এরমধ্যে দিয়ে গল্পের বিশেষ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

বিশ্বনাথ সবেমাত্র ঘরে ফিরিয়াছে ‘লান্টশো’-তে বায়স্কোপ দেখিয়া।

ইংরেজী ও বাংলা ভাষা মিশ্রিত শব্দের ব্যবহারে বৈচিত্র্যে দেখিয়েছেন। নিম্নে প্রদত্ত হল —

‘ক্রিকেট সীজন পড়িয়াছে।’

বিদেশী রান্নার কথা বলতে গিয়ে তিনি বিদেশী শব্দেরও বহুল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

‘ভারতীয় বাবুর্চিরা বিদেশী রান্নায় ব্যস্ত -ডিমের পুডিং, স্যাভুইচ, পটেটো ক্রীম - পটেটো স্ম্যাস, আরো কত কি।’

সাবিত্রী রায়ের গল্পের মধ্যে যত্রতত্র আরবি, ফার্সী শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নে ‘রাধারানী’ গল্প থেকে একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

‘ছোট ছোট চড়ুই গুলিরও মরসুম পড়িয়াছে।’

সাবিত্রী রায় আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের দক্ষ রূপকার। তাঁর লেখা বহু গল্পে চরিত্রে উপযোগী পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেখিয়েছেন। যেমন —

- ক. 'তোমরা চইলা যাইবা। মনটা ভাল ঠেকে না। মাইয়া, কান্দাইয়া থুইয়া যাইবা এ বুড়িরে।'
 খ. 'বৌঠারান, আমার শশাগাছে একটা মাচা করাইয়া দেওন লাগবো কামলাগে কইয়া।'
 গ. 'মাটির লগে কথা কইতাছে, তোমার শশাগাছ। এখনই মাচা বাঁধন লাগবো?'
 ঘ. 'এইবার লষ্টচন্দ্রায় বীড়ির গাছের ফল দিয়াই আরম্ভ করন লাগবো।'
 ঙ. 'অত সোজা না। বুড়িও সারা রাইত চেনন থাকতে জানে।'
 চ. 'মাইয়া জৈষ্ঠমাসেই শশা খাইতে চাইছিল। এইবার একবার আইলেই হয়।'
 ছ. 'বুঝছো পিসি, কইলকাতার রাস্তায় রক্তগঙ্গা বইয়া গেছে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায়।'
 জ. 'বৌঠারান, তাপসেরে পত্র লিখ্যা দেন, বোয়ারে লইয়া বাড়ি চইল্যা আসুক।'
 ঝ. 'বাড়ীই ছাড়ন লাগে নাকি দেখ্ আগে।'
 ঞ. 'ক্যান, বাড়ী ছাড়ন লাগবো ক্যান ?'

সাবিত্রী রায় গল্প রচনাকালে অলংকার বাতুল্য বর্জন করেছেন। নিতান্ত প্রয়োজনেই তিনি উপমা রূপক ব্যতিরেক ও অপহৃতি অলংকার ব্যবহার করেছেন। নিম্নে এরূপ কয়েকটি অলংকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো —

- ক. "সন্ধ্যাবেলা পচু হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া আবারও কি যেন বাহির করিল পুঁটনি হইতে।"
 খ. "তাহার শিরাগুলি যেন এক উপায়হীন ব্যথায় ভারী হইয়া আসিতেছে।"
 গ. "বিকালাটা যেন কাটিতেই চায়না কেয়ার আজ।"
 ঘ. "রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া অন্ধকারের মধ্যে কতকিছু যেন ভাসে তারার চোখের সামনে।"

লেখিকা কোন কোন গল্পে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য কিংবা ঘটনার প্রয়োজনে আবার চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য সংলাপের ব্যবহার না করে ছড়া, রবীন্দ্র সংগীত ও একাধিক কবিতার সংযোজন করেছেন। যেগুলি গল্পের শিল্পমূল্যকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নিম্নোক্ত পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর একটি অংশ বিশেষ। শ্রীরাধিকার প্রেমার্তি প্রকাশিত হয়েছে গল্পের নায়িকার প্রেমের অনুষঙ্গ ধরে। বিরহযন্ত্রণা কাতর নারীর আবেগঘন রূপ আলোচ্য পদটিতে বিধৃত হয়েছে —

'কালো তোর তরে কদম তলায় বসে থাকি.....।'

গায়ক এবং শ্রোতা উভয় মিলেই সংগীতের সুর মূর্ছনা প্রকাশিত হয়। এই অর্থে এই গানটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

'গাহিবে একজন খুলিয়া গলা।

আরেকজন গাবে মনে।'

চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আলোচ্য ছত্রটি ইঙ্গিতবাহী।

'ঝড়ে ভাঙ্গা ঘর যত বলিষ্ঠ বাহু উঠাবেই।'

এটি একটি ছড়ার গান। পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলোচ্য ছড়া গানটির উপযোগিতা কোন অংশে কম নয়।

‘কামারে ধইরা নেরে হাত ধরে কানা বলে তো ডাকলো মোরে.....’

লেখিকা শান্তগীতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছোটগল্পের বৈচিত্র্যটিকে বাড়িয়ে তুলেছেন।
মাতৃআরাধনার পরিচয়বাহী এই পদটির গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয় -

লেখিকা সাবিত্রী রায় গল্পে আপন অভিজ্ঞতা প্রসূত কিছু কিছু আশুপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করেছেন। যারা হত দরিদ্র যাদের আর্থিক সহায় সম্বল নেই, তারা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচ জোগাবে কি করে। একারণেই এই শ্রেণির লোকেরা অনেক সময় ঋণ গ্রহণ করে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পরিশোধ করতে পারেনা এই উপলক্ষে ব্যঙ্গাত্মক এই প্রবাদটিকে গুরুত্বহীন বলা যায়না।

“ছোটলোকের জাতই নিমক্ হারাম।”

এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ প্রত্যেকের জীবনের লক্ষস্থলে পৌছাতে হলে ধৈর্য গুণ একটি বড় গুণ এই অর্থেই আলোচ্য প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘সবুরে মেওয়া ফলে।’

সাবিত্রী রায়ের গল্পে বর্ণনা অংশে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি চরিত্রের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রকৃতি চিত্রের বর্ণনাতেও তাঁর মুনসিআনার পরিচয় মেলে। বিভিন্ন চরিত্রের শারীরিক রূপের বর্ণনায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপূর্ব শিল্পকুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। নিম্নে লেখিকার বর্ণনা অংশের কিছু চিত্র প্রদত্ত হল :-

‘শকুন্তলা ঘরে ঢোকে - কোলে কাঁথায় জড়ান রুগ্ন শিশুটির চোখে জ্বরের ঘুম। ভাল করে লক্ষ্য করে দেবব্রত শকুন্তলার মুখের দিকে। গভীর বেদনার ছায়া চোখের গভীরে।

মমতায় ভিজে উঠে মনটা - কি চিন্তা করে বলে সে, - ‘খাতাখানি নিয়ে যাই, টুকে নেবার ব্যবস্থা আমি করবো।’

এ ঐকান্তিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ দুটি - অসংখ্য ধন্যবাদ সে চোখে।

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে মফস্বলের এক ছোট শহরের শেষ প্রান্তে ওরা প্রথম সংসার পেতেছিল। শহরের শেষপ্রান্ত এসে যেখানে মিশেছে সর্বক্ষেত্রের আলোর সাথে তারই পাশে পা ছড়িয়ে বসত মালা, তার লম্বা বিনুনিটা কোমর ছাড়িয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়তো। সুশান্ত তার নতুন লেখা কবিতাগুলি পড়ে শোনাত লাজুক কণ্ঠে মালাকে।’

- এখানে খুবই অল্প কথায় মালার রূপটি ফুটে উঠেছে। দিনের মধুর আলোতে বসে লজ্জামাখা কণ্ঠে সুশান্ত মালাকে কবিতা শোনাত। এখানে দাম্পত্য জীবনের সুমধুর রূপটি অসামান্য হয়ে উঠেছে।

রাস্তার মোড়ে বাসগুলি আসিয়া যেখানে থামে সময়ের হিসাব লইতে, তারই ধারে এক ফালি জমির উপর কতকগুলি পিতলের থালা ঘটি উপড় করা রহিয়াছে। সবেমাত্র গাছতলার অস্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন হইয়াছে। বুটের ছাতু, নুন আর একটা লক্ষা। জল দিয়া মাখা ছাতুগুলি দলা পাকইয়া ওঠে।’

— উপরোক্ত বর্ণনাংশে অসুস্থ শিশুটির চোখে -মুখে একটি ছাপ রয়েছে। এই ছাপটি যেন লেখিকার কলমে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে।

— আলোচ্য বর্ণনাংশে রয়েছে দরিদ্র অস্থায়ী বাসিন্দাদের চিত্র। সমাজের এক শ্রেণির দরিদ্র মানুষের অবস্থা লেখিকা সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

‘সতের বছরের পূর্ণ নারী রক্তের মধ্যে প্রকাণ্ড সরীসৃপটা ঘুমাইয়া ছিল এতদিন। সামান্য আঘাতে গর্জিয়া উঠিয়াছে সে। শিরায় শিরায় ঝিলিক খাওয়া টান পড়ে। বৈদ্যুতিক শিহরণ একটু। তারপর নিস্তেজ হইয়া পড়ে দেহ অবশ শিরাগুলি।

বারান্দায় বসিয়া কাঁদে রাধারাণী - বোঝেনা কেন ? এ দুঃখ কিসের ? চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়ে উষ্ণ জল - অফুরন্ত কান্নার প্রস্রবণ ক্রন্দন।’

‘একটা হাড় বাহির করা কুকুর খচ্ খচ্ করিয়া উহার লোম পড়া গায়ের ঘা-গুলি কামড়াইতেছে। আর মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়া উঠায় একটা বিশী শব্দ হইতেছে - ফট্ ফট্ ফট্। তার পাশে একটি সতের-আঠার বছরের মেয়ে, কি আরও কিছু বেশী বয়স হইবে, দুই পা ছড়াইয়া বসিয়া কোলের উপরে হইতে কি যেন খাইতেছে। হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ছোটকাপড় একখানি তার পরনে। এক পায়ে একটা দগদগে ঘা, ঘা হইতে রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে। বড় বড় মাছিগুলি একবার সেই ঘায়ের উপর বসিতেছে, একবার মেয়েটির চোখে-মুখে বসিতেছে, মেয়েটি উত্থিত হইয়া বাঁ হাতে মাছিগুলি এক একবার তাড়াইয়া দিতেছে। তাহার মাথায় তেল না দেওয়া রন্ধ্র চুলগুলি দেখাইতেছে ঝড়ো কাকের পালকের মত। দেহটা কোনমতে একটু কাপড় দিয়া জড়ান - মাটির রং ধরিয়া গিয়াছে কাপড়ে বহু দিনের ময়লা জমিয়া।’

— এখানে একটি দুর্বল প্রকৃতির কুকুরের পাশাপাশি একটি সতের আঠার বছরের মেয়ের নিদারুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। রুগ্ন সমাজকে তুলে ধরতে বর্ণনাংশটি সার্থক।

মহিলা গল্পকারদের মধ্যে ছবি বসু একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি যে গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন সেগুলি যেন সমাজ জীবনের অন্যতম দলিল। তাঁর প্রতিটি গল্পের বিষয় ও আঙ্গিক অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে। জীবনবাদী এই গল্পকারের প্রতিটি গল্প বাস্তব জীবন থেকে সংকলিত। গল্প রচনাকালে তিনি শুধু বিষয়ের ওপরেই গুরুত্ব দেননি, বিষয়

আঙ্গিকের নৈপুণ্যের ওপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। প্লট, নামকরণ, ভাষা, চরিত্র, গুরু ও সমাপ্তি অংশ পুরুষালি গদ্যে লেখা। গল্পের ভাষা সংহত, সংযত। ভাব ও গল্পের ব্যঞ্জনা বাংলা গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ছোটবড় বিভিন্ন মাপের গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তিনি বড় মাপের যে গল্পগুলি লিখেছিলেন সেগুলি হল - ‘প্রবহমান’ বত্রিশ পৃষ্ঠার গল্প, ‘স্মৃতি বাতায়ন’ গল্পটি ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে।

তাঁর মাঝারি আকারের গল্পগুলি হল ‘হরমোহনের সমাজচেতনা’ ও ‘সেদিনের গল্পো’ আঠারো পৃষ্ঠায় সম্পন্ন তাঁর ‘হরমোহনের সমাজ চেতনা’ গল্পটি আর ‘সেদিনের গল্পো’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল কুড়ি।

লেখিকার ছোট মাপের গল্প সংখ্যাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। ‘বিভা বৌদি’ গল্পটি সাত পৃষ্ঠার, ‘দাহ’ গল্পটি সাত পৃষ্ঠার, ‘আস্তানা’ ও ‘চিঠি’ নামক গল্পদুটির পৃষ্ঠা সংখ্যাও সাত, ‘এক প্রজন্ম’ গল্পটি চারপৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে, ‘নীহারিকা’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়, ‘পথ চলতে’ গল্পে নয় পৃষ্ঠা আছে, ‘পিতৃঘাতিনী’ ও ‘ডাক্তার পিসীমা’ গল্পদুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়, ‘মেয়েমানুষ’ গল্পটি নয় পৃষ্ঠায় সম্পন্ন, ‘কাপুরুষ’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা পাঁচ, ‘নির্বাকযৌবন’ গল্পটি ছয় পৃষ্ঠার, ‘চোখে হাসি’ গল্পটিতে পাঁচ পৃষ্ঠা আছে আর ‘মরা স্রোত’ নামক গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার।

তাঁর গল্পের গুরু ও সমাপ্তি অংশটিতেও শিল্পরূপের পরিচয় মেলে। ‘বিভাবৌদি’ গল্পের শুরুতে ট্রামে করে বিভিন্ন অভিযাত্রির যাত্রার পরিচয় রয়েছে। গল্পের শেষে বিভাবৌদি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে।

‘প্রবহমান’ গল্পটি ছয়টি পর্বে বিভক্ত। এই গল্পের শুরুতে রয়েছে সূর্যাস্ত কালীন প্রকৃতিক পরিবেশ। গল্প শেষে একটি ছেলে নিঃসীম আঁধারের দিকে যাত্রা করেছে তার উল্লেখ রয়েছে।

‘দাহ’ গল্পের শুরুতে আছে রাতের চিত্র। গল্প শেষে একটি ছেলে সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার উল্লেখ রয়েছে।

‘আস্তানা’ গল্পের শুরুতে আছে পাগলের কথা। গল্প শেষে দুর্যোগপূর্ণ প্রকৃতির আবহ নববিবাহিতা মানসী ও তার বরের নাটকীয় উৎকণ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

‘চিঠি’ গল্পের শুরুতে রয়েছে একটি চিঠির প্রসঙ্গ। যে চিঠিটি লিখেছে সাগর মৈনু আপাকে। পত্র রচনা রীতির একটি সার্থক নিদর্শন হল আলোচ্য চিঠি গল্পটি। এই চিঠিতে সাগরের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা মূল উপজীব্য বিষয়। রাত এগারোটায় সাগর বাংলাদেশে বিমানে আগত মমতার জন্য অপেক্ষা করছে।

‘প্রথম প্রজন্ম’ গল্পে ভর দুপুরের চিত্রকল্প এবং গল্প শেষে অশান্ত বদ্বীপ সাগরের

নিরালায় সাদা শাড়ী জড়ানো দীর্ঘাঙ্গী নারী মূর্তির সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে রয়েছে নাটকীয়তার পরিচয়।

ছবি বসুর ‘হরমোহনের সমাজচেতনা’ গল্পের শুরুতে দেখি হলমোহনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি আলোচিত হয়েছে। গল্পশেষে বাণীর সঙ্গে তার দাদুর কথোপকথন রয়েছে।

‘কথা শেষ গল্পের শুরু প্রাকৃতিক আবহ দিয়ে হেমন্তের সকাল-এর অনবদ্য চিত্র রয়েছে। গল্পশেষে নির্মল চরিত্র নির্মলার কথা রয়েছে।

‘পিতৃঘাতিনী’ গল্পের শুরু হয়েছে বাতিকগ্রস্ত ছেলের বর্ণনা দিয়ে। আমি’র জবানীতে লেখা গল্প কথকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে।

‘কাপুরুষ’ গল্পটির শুরুতে মাধবের জীবন যন্ত্রণার কথা আছে এবং গল্পটি শেষ হয়েছে গুরুদেব সম্পর্কে একটি মনগড়া ভাবনা দিয়ে।

‘সুখ দেবার মালিক তো মানুষ নয় সবই ভাগ্য।’

— মানুষ ইচ্ছে করলেই সুখ পায় না। ভাগ্য বিধাতাই একমাত্র সুখ দিতে পারে। এই আগু পূর্ণবাক্যটি গল্পটিতে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

‘হাত বাড়িয়ে আনন্দকে জাপটে ধরতে হয় রে, নইলে ফসকে যায়।’

— সুমনার বাবা সুমনাকে রাজনীতির আলোচনা করতে করতে তার করা এই মূল্যবান মন্তব্যটি যথার্থ।

“বঞ্চিত সন্তানের দল, যুগ যুগ ধরে যারা সাদা মানুষদের বিস্ময়

আর ঘৃণা কুড়িয়েছে. তারাই আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আপন

গরিমায়, আপন শৌর্যে।”

— সমাজে বর্ণভেদ প্রথা প্রসঙ্গে ‘শিকড়’ গল্পের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

‘মেয়েরা নাকি হৃদয় তাপে তাপে ভরা ফানুস।’

— নারী চরিত্রের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

‘জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে এ তিন বিধাতা নিয়ে।’

— জীবনের সত্য সম্পর্কিত এই প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘অহিংসা হিংসার কাছে হার মানে না।’

— এটি একটি বহু প্রচলিত প্রবাদ। হিংসা অহিংসার কাছে কখনো জয়ী হতে পারে না। এটা বোঝাতে প্রবাদটি সার্থক।

‘ছায়া তো বাস্তবিক কায়া হতে পারে না।’

— সুলেখা তার বাস্তবধর্মী মনের ভুল করা প্রসঙ্গে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘বাতাসের-ও কান আছে।’

— কোন কথাই দীর্ঘকাল চাপা থাকে না, এক না এক সময় প্রকাশ পায়, এ-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত প্রবাদটি সার্থক।

‘বড় মানুষের ঘরে জন্মানো-ও পুণ্যের কপাল।’

— ধনীর ঘরে জন্মাণ্ড পুণ্যেরই ফল। এই সত্য কথাটি বোঝাতে উদ্ধৃতিটি অর্থবহ।

‘জীবনে আদর্শ অথবা লক্ষ্য না থাকলে মানুষ এমনই তলিয়ে যায়।’

— মানবজীবনের সফলতার চাবিকাঠি সম্পর্কিত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

‘যুগের সঙ্গে সঙ্গে তো অনেক কিছুই পাল্টায়।’

— যুগধর্ম সম্পর্কিত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘মানুষের স্মৃতিটা বড় ক্ষণিক, ঠিক জীবনের মতো। আজ আছে, কাল উধাও।’

— স্মৃতি ও জীবন উভয়ই ক্ষণিক এটা বোঝাতে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

‘সাধনা মানে নিষ্কাম সাধনা।’

— সাধনা হবে কামনাহীন এটা বোঝাতে আলোচ্য উদ্ধৃতিটি সার্থক।

‘পূর্বজন্মের পুণ্যফলই এজন্মের পাপের ভার লাঘব হল।’

— ‘স্মৃতিবাতায়ন’ গল্পে ব্যবহৃত এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘অনেক আশা নিয়েই তো জীবন।’

— মৃত্যু পর্যন্ত আশা জীবনের সঙ্গী এ প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ।

গল্পে বিভিন্ন চরিত্রের রূপ ও বৈচিত্র্য অঙ্কনের ক্ষেত্র রয়েছে, যে রূপ ও বৈচিত্র্য পাঠকের মনে ছবির মতো করে দেখা দেয়। ছবি বসু রূপ বর্ণনায় বৈচিত্র্য এনেছেন যার মধ্যে লৌকিক উপমার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নিয়ে ‘ডাক্তার পিসীমা’ গল্পের ডাক্তার পিসীমার গায়ের রঙ পাকা আমের মতো টুকটুকে। দীর্ঘ ঋজু মেদ বর্জিত বাঁশের মত গঠন, বয়সের ভারে চোখ দুটি নীলাভ তারা কিছুটা অস্তমিত। চোখে তার চশমা সম্ভবত চোখের ছানি অপারেশন হয়েছে, ‘তেমনি পাকানো বাঁশের মতো গঠন। তবে একটু কুঁজো হয়ে পড়েছেন। বয়েস কত হবে আশি ছুঁই ছুঁই করছে। চুল পুরুষের মতো ঘাড় চাঁছা তবে চোখের দৃষ্টি স্নান। সেই নীলাভ দৃষ্টি অস্তমিত। নাকের ডগায় ভারি পাওয়ারের চশমা। শুনলাস দুটো চোখেই নাকি ছানি অপারেশন হয়েছে।’

— উপরোক্ত বর্ণনাটির মধ্যে একটি জীবন্ত ছবি উঠে এসেছে।

‘পিতৃঘাতিনী’ গল্পের গল্পকথক হল ছেলে। ছেলের দৃষ্টিতে পিতার দৈহিক বর্ণনা লেখিকা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তার চেহারা, চুল ও তার স্বভাব সব কিছুই যেন কলমের আচরে ধরা পড়েছে।

‘অমনিতে বাবা আমাদের মাটির মানুষ। কালো মোষের মতো দামাল চেহারা। চুলে চিরুনি পড়ে মাঝে মাঝে। কোকড়ানো পাকানো রুখু চুল-দাড়ি।’

‘স্মৃতি-বাতায়ন’ গল্পে নির্মলার রূপের বর্ণনা যেন জীবন্ত। লেখিকা চরিত্রটি অন্ধনের সময় মুখের ছাপ, গায়ের রঙ, কালো চোখ, কালো তিল, এমনকি তার মুখখানা-ও পানপাতার মতো এবং ঠোঁটটি পাতলা এসব কিছুই বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার মধ্যে অপূর্ব শিল্প কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় —

‘বয়েস তিরিশ পেরিয়েছে কিন্তু চেহারায় ছেলেমানুষি ভাব লেগে রয়েছে। মনে হয় পারিপাট্য বা দৈন্য কোনো ছাপ নেই এই মানুষের মুখে। একটু মেদ লেগেছে শরীরে, তাই রক্তার চেয়ে বয়সে বড় লাগে। সকলের চেয়ে ফর্সা গায়ের রঙ আর ডাগর কালো চোখের নিচে একদিকে কালো তিল, যেন সযত্নে আঁকা, পানপাতার মতো মুখ, পাতলা ঠোঁট টিপে একটু হাসলে মনে হয় এইবার হেসে গড়িয়ে পড়বে।’

নিম্নোক্ত অংশে চরিত্রের রূপ বর্ণনার পাশাপাশি এক ভয় মিশ্রিত ভাব পরিলক্ষিত হয়।

নিম্নোক্ত বর্ণনাংশে গোয়ালন্দ রেল স্টেশনের নিকটবর্তী ধলেশ্বরী নদীতীরের স্টিমার ঘাটের যাত্রীদের বর্ণনাটি লেখিকার কলমে সার্থক রূপ পেয়েছে —

‘দার্জিলিং মেলে এসে পৌছলাম গোয়ালন্দ রেলস্টেশনে। সেখান থেকে স্টিমার ঘাটে। সামনে ধলেশ্বরীর বিশাল ঢেউ পার ঘাটে এসে আছাড় খাচ্ছে। পাটাতন ইস্টিমারের কোল বেয়ে ডাঙায় এসে ঠেকেছে। অনেক যাত্রীর আসা যাওয়ায় কাঁচা একফালি রাস্তা কাদায় জবজবে, পোটলা-পুটলি বাক্স প্যাটরা নিয়ে মেয়ে পুরুষ কচিকাচার ভিড় ঠ্যালাঠেলি আমরা এসে উঠলাম একেবারে দোতলায় ডেকে। দারুণ উত্তেজনা, খুশীতে ছটফটানি বেড়ে যায়, এতবড় নদী তো এর আগে দেখিনি। তার ওপর ইস্টিমার দর্শন তো জীবনে প্রথম।’

ছবি বসু ‘মেয়ে মানুষ’ গল্পে সল্টলেকের নমুর বাড়ির বর্ণনা করতে গিয়ে বাড়ির হলদে রঙের পাশাপাশি বড়কাকার রঙহীন গৃহ আর ছোটকাকার গৃহের নীল রঙের বর্ণনা দিয়ে গৃহ-রঙের বৈপরীত্য দেখিয়েছেন। এরূপ চিত্র অঙ্কণে লেখিকার নৈপুণ্যের অভাব ঘটেনি —

‘নমুদের বাড়িটা বেশ মজার দেখতে। নমুর বাবা করলেন কি ওঁর তরফের দুটো ঘরের বাইরেটা রঙ করলেন পানসে হলদে রঙে। পাশের ঘরদুটো বড় কাকার। উনি বললেন- ওসব রঙ করতে ওঁর পয়সা নেই। তাই বাইরেটা রইল ছাতারে পাখির গায়ের রঙে। শুধু বাড়ির গায়ে গায়ে অশুখ গাছ গজিয়ে রয়েছে। তার ঠিক পাশের ঘরদুটো ছোটকাকার হঠাৎ ছোটকা সে দুটোর গায়ে লাগালেন ঘন নীল রঙ।’

‘আস্তানা’ গল্পে এক অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোকের ঘরের বর্ণনা লেখিকা দিয়েছেন। ঘরের সামনে বারান্দা থেকে বড় রাস্তার ধারে বাড়িগুলো চোখে পড়ে। ঘরে মৃত্যুপথযাত্রী পেশেন্টের পাশাপাশি নীলচে আলো, গুহ্র বিছানা ঔষধের উগ্র গন্ধ বিষন্নতার ছায়া ফেলে —

‘ঘরের সামনে টানা বারান্দা আর খোলা ছাত। দৃষ্টি হাতড়ে একবালক বাতাস বাদামদাছটার ফাঁক-ফোকর দিয়ে বড় রাস্তার আকাশ ছোঁয়া বাড়িগুলোর কার্নিশে ধাক্কা খায়। ঘরে ফিকে নীলচে আলো, ধবধবে বিছানা, উগ্র ঔষধের গন্ধ, আর মৃত্যুপথযাত্রী পেশেন্ট।’

ছবি বসু তাঁর গল্পে একাধিক চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগ করে ভাষা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা গল্পে প্রয়োগের রীতি বহু গল্পকারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লেখিকা এই রীতিকে অনুসরণ করেছেন যে চরিত্রের মুখে যে ধরনের ভাষা উপযোগী সেই ভাষাই তিনি চরিত্রের মুখে স্থাপন করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নের দৃষ্টান্তটি মৈমনসিংহ জেলার উপভাষা।

‘স্মৃতিবাতায়ন’ গল্পে আধবুড়ো ভিথিরির মুখের ভাষাটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে —

‘ভাতের তরে গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে শউরে আসতেছিলাম, মেয়েটা সঙ্গ ছাড়লনি। মাথা খোঁড়া খুঁড়ি কইল — বাপগো, মোরে সঙ্গে লে চল, শউরে কত ধান চাল। বেবাক মানুষজন। ইন্সটিশন থিকে আসতেছি তো আসতেছি। কেডা জানত অমুন হবে তাইলে কী রাস্তায় পুলিশ কত অগো মাগো, তারপর নাঠি আর নাঠি। মেয়েডার হাত ধরি ছুটতি ছুটতি মাথায় বাড়ি নাগল। হুমড়ি খেইয়ে পড়লাম। দেশের কোন মানুষ টেইনে নিয়ে চলে। মুখপোড়া মেয়েডারে ছেইড়ে দিলি? কইলাম - অ সোনামুখী কুথা রেতুই! তারে আর পাইনি। এই শউরে কুথাও বসি কাঁদতিছে বাপের লেগে।’

‘পিতৃঘাতিনী’ গল্পে গল্পকথকের সঙ্গে ছোটকাকার কথোপকথোনের ছোটকাকার মুখে পাবনা জেলার আঞ্চলিক ভাষা শুনতে পাই। এই ভাষাটি ব্যবহার করে লেখিকা গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ করে তুলেছেন —

‘লক্ষ্মীকান্তপুর ইন্সটিশনে মেয়েলোকের প্রস্রাবঘরে বাপ মোর গলায় দড়ি দিছে।

কাকা কয়, ‘বকু জানিস। তর বাপ মেয়ের পাপ খণ্ডন কইরল, নিজেই আত্মঘাতী হইল। মেয়েডারে পিতৃঘাতিনী না সোয়ামিঘাতিনী হইতে হইল না।’

আমি কেমন ধন্দ হইয়া কাকার মুখের কথা শুনি। কিছু কইনা। ও-দুটো বড় কথার মানে আমার জানা নাই। তবু তার মানে শুধাবার আর ভরসা রাখি না।’

নিম্নলিখিত অংশে ‘পিতৃঘাতিনী’ গল্পে কাকীর মুখে আঞ্চলিক ভাষা আমরা শুনি। যে ভাষা ব্যবহারের ফলে ছোটগল্পটি একটি ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে —

“কাকী তার ধলা হাতের রাঙা চুড়ি খুলে দিদিরে পরায়। আমার দিদিরও একরাশ চুল। কোমর ছাপিয়ে চুলের ডগা মুখ উঁচিয়ে রয় কাল নাগিনীর মাথার মতো। দিদিরে একদিন কইতে হেসে গইড়ে পড়ে। বলে - ‘তুই যা রগড়ের কথা কস বকু।’”

ছবি বসুর ‘পথ চলতে’ গল্পে রতনবালার মুখে পাবনা জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের ফলে চরিত্রটি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে

‘এতবড় শউরে চিনা -জানা আপনজন থাকতি পারে।’

— উহঁ।

— ‘কাজকাম মিলতেও পারে।’

— লোকটা দূরে সড়কের দিকে চেয়ে বলে - ‘কামতো মিলছিল।’

— তো?

— ‘ঠিকাদার ব্যাটা চোর। রোজের পয়সা কম দেয়।’

— ‘তবে?’

— ‘মারপিট করেছি।’

— ‘এডা ঠিক না?’

— ‘কোনটা ঠিক কও, জুলুমবাজি সওন যায়।’

— ‘বুঝছি, বুঝছি।’

— ‘কি বুঝছ কি? লোকটা রামচন্দ্রের ওপর তেড়িয়া হয়ে উঠল।’

লেখিকা গল্পে বাংলা-ইংরেজী মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করে বহু গল্পে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। এধরমের ভাষা প্রয়োগের ফলে গল্পগুলির রসহানি ঘটেনি, প্রচলিত যে ধরনের ইংরেজী শব্দ আমরা ব্যবহার করি সেই শব্দই ব্যবহার করে লেখিকা ভাষাগত বৈচিত্র্যকে বাড়িয়ে তুলেছেন। তার একাধিক বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হল —

— ‘শুধু পার্ট-টাইম নয়, চাইল্ড-লেবার!’

— ‘কি বোরিং লাগছে?’

— ‘কাওয়ার্ড, আমি একটা জানোয়ার।’

— ‘আমার নার্সিং ট্রেনিংটা শেষ হয়েছে এই হপ্তা তিনেক।’

— ‘যাই বলুন ডেথটা মিস্টিরিয়াস।’

ছবি বসুর গল্পের বর্ণনা অংশে কি সংলাপ অংশে যে বাক্যগুলি ব্যবহার করেছেন তা সম মাপের নয়। কোনটি ছোট, কোনটি বড় ও কোনটি মাঝারি মাপের। তিনি বড় ধরনের বাক্য কম

ব্যবহার করেছেন। নিয়ে একটি বড় বাক্যের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :-

‘সুলেখার কথা স্বতন্ত্র, কারণ ওর ক্ষেত্রে নিচে নামার সাধনাই বড় - ওপরে ওঠার আকাঙ্ক্ষা ওর নয়, বাগচী -পরিবারের একটি কপর্দকও সে ছোঁবে না, মেয়ের জন্যও নয় এটাই বোধহয় ওর চরিত্রের একগুঁয়েমির প্রধান লক্ষণ বলা চলে।’

তাঁর মাঝারি ধরনের বাক্যগুলির ভাব ও সংহতি ক্ষুণ্ণ করেনি। ভাষা ব্যবহারের সাবলীলতা গল্পগুলির একটি মূল্যবান সম্পদ —

‘বড়বৌ কোমল গলায় বলে’ — ‘আপনি দুঃখ করবেন না, শ্রীকান্তকে দু’মাস মাইনে বাড়তি আর একজোড়া ধুতি দিয়েছি, পাটটাইম লোক এখন দুহাজারি- তিনহাজারি লোকেদের ঘরে ঘরে।’

সংলাপ অংশে তিনি বড় বাক্য সচেতনভাবে পরিহার করেছেন। গল্পের পতি যেখানে তীব্র ভাষাও সেখানে সংহত। বাড়তি কথা বলার অবকাশ উপন্যাসে থাকলেও গল্পে একদম নেই। নিম্নোক্ত সংলাপে চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি করেনি —

— ‘তুমি কি বলতে চাও?’

— ‘কিছুই না।’

— ‘একা মানুষ, চেটিয়ে কি করব?’

— ‘চেষ্টা চালাবে ঠিক একা নও।’

— ‘অত তড়পাচ্ছ যে ? জ্ঞানদাতা নিজেই করে দেখ না।’

— ‘তাই বলছি, আমিও ঠিক তোমারই মত কাপুরুষ।’

— ‘আমাকে কাপুরুষ বলার তোমার কোন অধিকার নেই।’

— ‘তবে তোমার টেবিলে, ফাইলের আনাচে-কানাচে কত টাকা ছড়ানো।

মুঠো মুঠো, একটু খুঁটে নিলেই হয়।

‘নিতে কি খুব কষ্ট ? সুট করে এই বুক পকেটে’.....

— ‘না’ আমি নেব না।’

— সাহস নয় বিবেক। এটা ভাঙিয়েই তো এত বছর টিকে রয়েছে।’

প্রতিভা বসু আজিক সচেতন শিল্পী, তাঁর গল্পের আজিক নৈপুণ্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্লট, চরিত্র, ভাষা, গল্পের নামকরণ, গুরু ও সমাপ্তি, নাটকীয়তা ও কাব্যগুণেভরা। গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ছোটগল্প রচনায় তিনি শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি মূলত ছিলেন আধুনিক যুগের সার্থক গল্পকার।

তিনি যে সকল গল্প রচনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে - ছোট বড় ও মাঝারি সব রকম গল্প। তাঁর প্রথমখণ্ডের গল্পগুলোর মধ্যে ‘প্রতিভা’, গল্পটি দশ পৃষ্ঠার, ‘ভালোবাসার জন্ম’ এগারো পৃষ্ঠার, ‘ঘাসমাটি’ গল্পটি নয় পৃষ্ঠার, ‘বিকেলবেলা’ গল্পটি নয় পৃষ্ঠার, ‘স্বর্গের শেষধাপ’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বারো। নয় পৃষ্ঠার গল্প ‘রূপান্তর’। ‘খণ্ডকাব্য’ গল্পটি আটপৃষ্ঠার। ‘বিচিত্র হৃদয়’ গল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোলো। ‘অন্তহীন’ গল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যা একুশ। ‘স্বামী-স্ত্রী’ গল্পটি বারো পৃষ্ঠার। ‘ইন্সটিশনের মিষ্টিফুল’ গল্পটির পৃষ্ঠাসংখ্যা আট। ‘সেইদিন সকালে’ গল্পটি আট পৃষ্ঠার। ‘গুণিজনোচিত’ গল্পটি পঁচিশ পৃষ্ঠার। ‘উৎস’ গল্পটির পৃষ্ঠাসংখ্যা পনের। এগারো পৃষ্ঠার গল্প ‘শব্দব্রহ্ম’। ‘নিখাতসোনা’ গল্পটি তেইশ পৃষ্ঠার। ‘আয়না’ গল্পটি পনের পৃষ্ঠার।

গল্পকারের দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলিও ছোট, বড় ও মাঝারি মিলিয়ে বিভিন্ন মাপের। তারমধ্যে ‘সকালবেলা’ গল্পটি আটপৃষ্ঠার। ‘ঈশ্বর ও নারী’ গল্পটি চোদ্দ পৃষ্ঠার। ‘মাৎসুমাতো’ তেরো পৃষ্ঠার। ‘মিসেস পলিতের গার্ডেনপার্টি’ এগারো পৃষ্ঠার গল্প। ‘সত্যমিথ্যা মিথ্যাসত্য’ গল্পটি সতের পৃষ্ঠার। ‘প্রথম সিঁড়ি’ চোদ্দ পৃষ্ঠার, ‘মাদমোয়াজেল গতিয়ে’ গল্পটি তের পৃষ্ঠার। ‘কাঁচা রোদ’ দশ পৃষ্ঠার গল্প। ‘সন্ধ্যাবেলা’ আট পৃষ্ঠার গল্প। চোদ্দ পৃষ্ঠার গল্প ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’। ‘ভেজানো দরজা’ এগারো পৃষ্ঠার। ‘সত্য সত্য’ গল্পটি ষোলো পৃষ্ঠার। ‘ন্যায় অন্যায়’ গল্পটিও ষোলো পৃষ্ঠার। পনেরো পৃষ্ঠার গল্প ‘মাধবীর জন্য’, ‘গর্ভধারিণী’ গল্পটি বারো পৃষ্ঠার এবং ‘অন্ধকারে’ গল্পটি সাত পৃষ্ঠার।

লেখিকার প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি খণ্ডের মধ্যে ‘অন্ধকারে’ গল্পটি আয়তনে ছোট। ‘প্রথম সিঁড়ি’ ও ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’ মাঝারি ধরনের ও ‘গুণিজনোচিত’ গল্পটি আয়তনের দিক থেকে বড়।

প্রতিভা বসুর গল্পগুলির শুরু ও সমাপ্তি অংশ শিল্প সফল।

কোনো গল্পের শুরুতে রয়েছে নাটকীয়তা, গল্প শেষে রয়েছে ব্যঞ্জনাময় ভাষা। তাঁর লেখা কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় গল্পের এই শিল্পকৌশল নিম্নে প্রদোত্ত হল —

‘নিখাতসোনা’ গল্পের শুরুতে রয়েছে নাটকীয়তা, স্থান পেয়েছে একটি বিধির প্রসঙ্গ। গল্পশেষে অরুন্ধতীর সঙ্গে গল্প কথকের আশা আকাঙ্ক্ষা আনন্দ স্বপ্ন এবং ভালোবাসার যথার্থ পরিচয় রয়েছে।

‘আয়না’ গল্পের শুরুতে তেরো বছরের নাতনী উজ্জয়নী তার দিদিমাকে এক চমকপ্রদ প্রশ্ন করেছে, যে প্রশ্নের মধ্যে নাট্য কৌতুহল রয়েছে। গল্প শেষে এক দার্শনিক জিজ্ঞাসা গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে।

‘গুণিজনোচিত’ গল্পটির প্রারম্ভে একটি সাধারণ যুবকের আত্মপলঙ্কির প্রসঙ্গ রয়েছে।

‘সেইদিন সকালে’ গল্পের শুরুতে রয়েছে এক অধ্যক্ষা অনুরাধা মিত্রের পরিচয়

দিয়ে গল্পটির শেষ হয়েছে অসম্ভব কথা দিয়ে।

‘অন্তহীন’ গল্পটি শুরু হয়েছে এক অজ্ঞাত রহস্য মানুষের হৃদয় কথা। গল্পশেষে এক ভদ্রমহিলার সক্রিয় ক্রন্দন ধ্বনি হয়েছে উচ্চারিত।

‘বিচিত্র রহস্য’ গল্পের শুরু হয়েছে মায়ের প্রশস্ত মূলক কথা দিয়ে এবং গল্পের শেষ হয়েছে হতভাগ্য অসিতের জীবন যন্ত্রণা দিয়ে।

‘ঘাস মাটি’ গল্পের শুরু কলকাতা শহরের এক শিক্ষয়িত্রীর পরিচয় দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে।

লেখিকা প্রতিভা বসুর গল্পের নামকরণগুলিও সার্থক। চরিত্রপ্রধান গল্প বিশেষ নেই। বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক ও ব্যঞ্জনধর্মী এই দুই ধরনের নামকরণ তিনি তাঁর গল্পে করেছেন। প্রকৃতির পটভূমিকায় ব্যঞ্জনধর্মী নামকরণগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল - ‘ঘাস মাটি’, ‘বিকেলবেলা’, ‘সকালবেলা’, ‘সেইদিন সকালে’, ‘কাঁচা রোদ’, ‘সন্ধ্যাবেলা’, ও ‘অন্ধকারে’, প্রভৃতি গল্প। বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক নামকরণগুলি হল - ‘ন্যায়-অন্যায়’, ‘গর্ভধারিণী’, ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’, ‘ভেজানো দরজা’, ‘সত্য মিথ্যা’, ‘মিথ্যাসত্য’, ‘মাৎসুমোতো’, ‘গুণীজনোচিত’, ‘আয়না’ ও ‘নিখাত সোনা’ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ‘ঈশ্বর ও নারী’, ‘স্বর্গের শেষ ধাপ’, ‘ভালোবাসার জন্ম’, ‘খন্ড কাব্য’, ‘বিচিত্র হৃদয়’, ‘ইষ্টিশনের মিষ্টি ফুল’, এই গল্পগুলি ব্যঞ্জনধর্মী।

তাঁর গল্পের প্লটে কোনো শিথিলতা নেই। একমুখীন গতি এবং সমাপ্তি অংশে ব্যঞ্জন রয়েছে।

আঙ্গিক বিশ্লেষণে উপস্থাপন কৌশল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উত্তমপুরুষে আমি’র জবানিতে লেখা সার্থক গল্প - ‘অন্ধকারে’, ‘মাধবীর জন্ম’, ‘ন্যায় অন্যায়’, ‘ভেজানো দরজা’, ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’, ‘প্রথম সিঁড়ি’ প্রভৃতি। যেমন —

- ক. ‘চুচুড়ায় আমরা পিসিমার বাড়িতে ছিলাম।’
- খ. ‘তাহলে তুমি আমাকে কিভাবে চেয়েছিলে’
- গ. ‘পরেরদিন প্রায় বেলা আটটার সময় ও আমাকে নিয়ে গেল।’
- ঘ. ‘আমিতো আপনাকে বিকাশরঞ্জন বলি।’
- ঙ. ‘আমরা নিঃশব্দে মাথা নাড়লুম।’

এধরনের উত্তমপুরুষের দৃষ্টিকোণ পাঠকের কাছে বিশেষ আবেদনের সৃষ্টি করে। চরিত্র-নির্মাণ কৌশল আঙ্গিক প্রকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ।

‘মাৎসুমোতো’ গল্পের জাপানি মেয়ে মাৎসুমোতো চরিত্রটি রক্তমাংসে গড়া। ‘ঈশ্বর ও নারী’ গল্পের মহাঋষি আনন্দযোগী চরিত্রটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘সকালবেলা’ গল্পের

পূর্ণেন্দু ও অনুরাধা এই দুই নায়ক নায়িকা চরিত্র নির্মাণে লেখিকা মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।
'ভেজানো দরজা' গল্পে রাধারানী ও টুকু চরিত্রদ্বয় নির্মাণ লেখিকার অসাধারণ সৃষ্টি।

'সত্যাসত্য' গল্পের বন্দনা, নন্দিতা ও রঞ্জনা চরিত্র তিনটি লেখিকার সার্থক সৃষ্টি।
'বিচিত্র হৃদয়' গল্পের সুশান্ত ও কণা চরিত্রদ্বয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ভুলে ধরার ক্ষেত্রে আঙ্গিক সচেতনতার পরিচয় মেলে।

বাক্য বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রতিভা বসুর সাফল্য প্রসংশ্যাতীত। তিনি বড়, মাঝারি ও ছোটো তিন ধরনের বাক্যের সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যে বাক্যগুলি গল্পের ভাব ও সংহতি রক্ষার সহায়ক হয়েছে। নিম্নে একটি মাঝারি বাক্য প্রয়োগ হল —

‘কতকাল পরে চোখে জল এলো তার, ভেসে গেল গাল, ভেসে গেল বুক, তিনি আলো জ্বলে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে কাগজের প্যাড টেনে লিখলেন ইয়ুসুফ ভালোবাসা, সত্যিই, ঘাসের মত, সে থাকে, চিরদিন থাকে, মরে গিয়েও সামান্য জলের ছোঁয়ায় আবার তেমনি সবুজ হয়ে বেঁচে ওঠে’ —

উপরোক্ত বাক্যটিতে ছয়টি কুমার পূর্ণচ্ছেদ বসেছে।

‘ছেলেটি অন্ধকারে কোনোরকমে টানতে টানতে একটা গাছের নীচে নিয়ে এলো তাকে, গলা থেকে আঁকড়ে থাকা হাতটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, এভাবে না, এভাবে না, এরকম করে জড়ালে আমি চলতে পারবো না, হাত ধরুন, নীচু হোন, গড়িয়ে আসুন, বড় ঝাপটা এলে গুঁড়ি মারুন, কোনো রকমে দেয়ালের আড়ালটায় চলুন —

হাওয়া কাটাবার কৌশলগুলো একের পর এক বলে যেতে লাগলো, কিন্তু মারিয়ার কানে বোধহয় কোনো কথাই পৌঁছুলো না।’

এই বড় বাক্যটিতে গল্পের সারল্য বজায় রয়েছে। কোনো দুর্বোধ্য ও তৎসম শব্দ প্রয়োগ না করে চলিত ভাষায় যে দীর্ঘ বাক্যটি সংযোজন করেছেন সেখানে নয়টি কমা ও একটি ড্যাস চিহ্নের পর পূর্ণচ্ছেদ বসেছে।

আগন্তকেরা জেরা করলো, তুমি এখানে কী করো?

এজ্ঞে আমি ও বাড়ির চাকর।

নাম কি?

এজ্ঞে গোবর্ধন।

কদিন কাজ করছো?

তা হবেন দু-চার মাস।

তার মানে নতুন লোক?

এজ্ঞে

যার কাছে, কাজ করো তার নাম কি?

এজ্ঞে পোবাল।

পোবাল, পোবাল কি?

ঐ পোবাল মল্লিক দাদাবাবু। সেই যে নতুন বিয়ে করে বউ নিয়ে এলো - কোথা থেকে বউ নিয়ে এলো?

এজ্ঞে কর্তা বারাসত থেকে। দাদাবাবু আগে পিসির বাড়ি ছেলো কিনা, এখন বউ নিয়ে ভেন্ন হয়ে এখানে এলো।

এ বাড়িতে আগে কে ছিলো জানো? সন্দীপ মুখার্জী বলে কেউ আসে এখানে? কিনা থাকে এখানে? তা তো কর্তা আমি জানি না।

লেখিকার ছোটো ছোটো বাক্যগুলি চরিত্রের মুখে যা বসিয়েছেন তার মধ্যে ভাবগত ঐক্য রয়েছে।

‘স্বর্গের শেষধাপ’ ছোটো গল্পের উপরিউক্ত সংলাপ অংশে গোবর্ধন ও আগন্তকের মধ্যে যে কথোপকথোন ঘটেছে তা সৎক্ষিপ্ত কোনো বাহ্যিক কথা নেই। ভাষা এখানে সংযত ও পরিমিত, ভাষা প্রকাশের কোনো ভ্রুটি নেই।

বাংলা সংলাপের পাশাপাশি হিন্দী সংলাপও তিনি একাধিক চরিত্রের মুখে জানিয়েছেন সে সংলাপগুলি না থাকলে গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠত না —

রামকিষণ তেওয়ারী ঘাড় বড় বড় চুল, বুক পর্যন্ত দাড়ি, সব ফলস - সে আসলে বাঙালি। বিহারে থাকবার সময় দিব্যি বিহারি নাম নিয়ে হিন্দী ভাষায় কথা বলেছে।

‘মুখ তুলে তাকিয়ে বললো, মেমসাব কিধার’? ‘পাত্তা নেই সার, গিরধার’ বলতো ‘কৌন এক আদমী খুন হো গিয়া, ঐ দেখনেকো গিয়া’।

বর্ণনা অংশে চরিত্ররূপ অঙ্কন অন্যান্য ছোটখাটো ডিটেলস্ অংশে লেখিকার কলম সাবলীলভাবে চলেছে। রূপ বর্ণনা প্রকৃতি বর্ণনা কোনো বাড়ি ও স্থানের বর্ণনার ক্ষেত্রে লেখিকা যে বিশেষভাবে অনুভূতিশীল ছিলেন তার পরিচয় মেলে বিভিন্ন চিত্রকল্পের দৃষ্টান্তে। নিম্নে একটি যুবতী মেয়ের পোষাক পরিচ্ছদ, অলংকারে, গায়ের রং, চোখ, মুখ, মাথার চুল থেকে শুরু করে সিঁথির সিঁদুর সবকিছুর বর্ণনা এতটা যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন যা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। মনে হয় যেন যুবতী মেয়েটা আমাদের মানস চক্ষে উপস্থিত হয়েছে।

একটি যুবতী মেয়ে, পরনে টিয়া রংয়ের সস্তা শাড়ি, গায়ে আঁটো ছিটের ব্লাউস, হাত ভর্তি কাচের লাল-সবুজ চুড়ি, বাঁহাতে চুড়ির পিছনে সাধব্যের চিহ্নস্বরূপ। সরু-মোটা-চার-পাঁচটা

লোহা, উপর হাতে সুতোয় বাঁধা বড় ছোটো তিনটে মাদুলি, গলায় চিকচিকে সোনার হার। গায়ের রং মাজামাজা, নরম কোমল শ্যামল। মুখশ্রী বেশ সুন্দর। বিশেষত চোখ, চোখ বড়, কালো গভীর। মাথার চুল ঈষৎ কটা, কিন্তু ডৌল সুন্দর, সিঁথির দুপাশে ঢেউ আছে। এই মুহূর্তে সেউ চুল পিঠে জড়ানো, ঘন এবং লম্বা। একটু একটু ভেজা। বোঝা যাচ্ছে স্নান করেছে খানিক আগে, কেননা কপালের সিঁদুর তাজা টকটকে। সাধব্যের চিহ্ন সেখানেও প্রকট। কপালের ফোটাটা যেমন বড়, সরু সিঁথিটাও তেমনি দগদগে লাল।

‘বিচিত্র হৃদয়’ গল্পে কন্যার জবানীতে মায়ের রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে লেখিকা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। মধুর বিষন্নতার আভা জড়ানো মাতৃ মুখশ্রী তার পোষাক গায়ের বর্ণ সবকিছুই যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি রূপে দেখা দিয়েছে। অসামান্য প্রতিভা না থাকলে এধরনের বর্ণনা করা যেত না।

‘আমার মা-র মুখশ্রী অতি সুন্দর, সমস্ত মুখ খানাতে তার এমন একটা মধুর বিষন্নতার আভা ছড়িয়ে থাকত যে কোনো কোনো সময় অপলকে সে মুখের দিকে তাকিয়েও আমার তৃষ্ণা মিটতো না। তিনি কালো পাড় শাড়ি পরতেন, হাতে সরু সরু দুগাছা বালা ছিলো- গলায় প্রায় অদৃশ্য একছড়া সোনার হার চিকচিক করতো। কী যে সুন্দর দেখাতো তাকে - মসূন শ্যামল রংয়ে একটা বর্ষার সজল আভা ছিলো - আমি ফর্সা ছিলাম, কিন্তু সকলে বলতো মার শ্রী আমি পাইনি। অত্যন্ত শান্ত। দৃঢ় ছিল তাঁর স্বভাব’।

লেখিকার কলমে অরুন্ধতী দেবীর দৈহিক রূপের যে বর্ণনা এবং তার চুলের বেণী, মৃণাল বাহু সবকিছু যেন পাঠকের কাছে সহজ সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়েছে —

‘ভদ্রমহিলার নাম অরুন্ধতী দেবী। রোগা নন, মোটা নন, ফর্সা নন, কালো নন, আশ্চর্য এক সমন্বিত কোথায়! দেখামাত্রই মনে হল এতো দিনে সত্যিকারের একটি বাঙালি মেয়ে দেখে চোখ সার্থক হল। ঘিয়ে রঙের শাড়ি পরেছেন, গায়ে সেই রঙের ব্লাউস। পিঠের উপর লম্বা একটি বেণী। যাকে বলে মৃণাল বাহু, সেই বাহু দুটি তুলে যুক্ত করে হয়ে বললেন, আসুন’।

লেখিকার ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’ গল্পের নায়ক সুব্রত সেন। অত্যন্ত মেধাবী এই ছাত্রটির রূপ এবং গুণের জন্য প্রশংসনীয়। তার দৈহিক বর্ণনা লেখিকা নিম্নোক্তভাবে দিয়েছেন-

‘সুব্রত সেনের নাম আরো অনেক কিছুর জন্য বিখ্যাত। এমনকি চেহারার জন্যও, ঘসা মাজা শ্যাম রং, সিংহ কোটি, বিশাল বক্ষ, অজানুলম্বিত বাহু - অর্থাৎ রূপে-গুণে সুব্রত সেন হীরের টুকরো।’

নিম্নে কলকাতার একটি ফুলে ফুলে ঘেরা একটি ছোট্ট গৃহের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা কতটা সংক্ষিপ্ত ভাষায় পাঠকের হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন তা নিম্নে প্রদত্ত হল -- ‘বাড়িটি

ছোটো, কিন্তু বড় সুন্দর। চারপাশে একটু একটু জমি-আগাছায় জঙ্গলে ভর্তি - তারমধ্যে ছড়ানো ছিটানো নানা রংয়ের বুনো ফুল। দেয়াল ঘেসে একটি লম্বা লিচু গাছ। মাত্র তিনখানা ঘর।’

নিম্নোক্ত অংশে একটি চলন্ত ট্রেন থেকে তার দু’পাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য কত জীবন্ত না ধরা পড়েছে। ট্রেনে বসে দূরের স্টেশনের, রাস্তার ধারে জোনাকির আলোও ঝাঁঝের ডাক সান্ধ্যকালীন পরিবেশকে রহস্যময় করে তুলেছে —

‘চলতে লাগলো ট্রেন -কলকাতার হাঁট কাঠ ছাড়িয়ে সবুজ সবুজ পানাজল ডোবা দেখা দিলো, - দেখা দিলো ঝোপঝাড়। ধানের ক্ষেতের আল বেয়ে হাঁটা, বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকা মানুষ - উলঙ্গ শিশু - ময়লা শাড়ি পরা ঘোমটা টানা বঁধু তারপর নামল অন্ধকার। আবছা সান্ধ্যরাত্রি কালোতে গভীর হয়ে এলো। দূরে রেললাইনের ওপরে জ্বলে উঠলো অগ্নিনিভ জোনাকি - ঝাঁঝের ডাকে রাত্রি যেন থমথমে হয়ে উঠলো তখুনি।

টিমটিম করে স্টেশনে দুটো আলো জ্বলছিলো।’

‘সত্য-মিথ্যা, মিথ্যা-সত্য’ গল্পে একটি নদীর ধারের প্রকৃতির ছায়া ঘেরা পরিবেশে চড়ুইভাতির উপযুক্ত স্থান। ফাল্গুন মাসের শেষের কোনো এক দিনে সতেরো জনকে নিয়ে আনন্দঘন বনভোজন আমাদের মনকে ভ্রমের প্রতি আকৃষ্ট করে —

ফাল্গুন মাসের শেষ, এই ধরনের বনভোজনের পক্ষে সময়টি চমৎকার। সুন্দর ছায়া ছায়া রোদ, মন কেমন কার হাওয়া, আকাশ গভীর নীল।’

নিম্নোক্ত বর্ণনার স্থানটি হল হুগলী নদীর তীরের ধারে এক বর্ষিষ্ণু শহরের কাছাকাছি। যে স্থানটি জনহীন। বিশাল বটবৃক্ষের ও অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ার নীচে যেখানে সুরমাবেদী, তার কিছু দূরে ভগ্নপ্রায় একটি জমিদার বাড়ি আগাছা, পানগাছ, ফোয়ারা, মার্বেলের নারী মূর্তি এবং গেট অবস্থান করছে। বট অশ্বথের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার পরিচয় রয়েছে - এখানে নদীতীরে বিশাল একটি বটবৃক্ষ অশ্বথের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের স্নিগ্ধ ছায়া বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার করেছে, তলায় চওড়া বাঁধানো বেদী তেলের মত চকচকে; অদূর বৃহৎ সুরমা অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ। বোধহয় কোনো জমিদার বাড়ি। দেয়াল ঘেষে এরিকা পামের সারি, ঘাসে ভরা জঙ্গলে বাগানে ইটালিয়ান মার্বেলের নারী মূর্তি, পাথরের পদ্মকাটা ফোয়ারা, মোরাম বিছানো পথ, লোহার মস্ত ফটক - জমিদার বাড়ি সুলভ সব বাহুল্যই সেখানে বিদ্যমান। বোধহয় এককালে তারাই এই বট অশ্বথের বিবাহ দিয়ে বেদী বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন এখানে।

প্রতিভা বসুর ‘মাদমোয়াজেল গৈতিয়ে’ গল্পে ফ্রান্সের সোন্ নদীর তীরে প্যারিস শহরের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অনবদ্য। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য রাতের বেলার কাকগুলোর ভিড়, লাল-নীল আলোর ফোয়ারা, নদীতীরের অসংখ্য মর্মর মূর্তি, একাধিক দোকান, বাগানবাড়ি, পথ-

ঘাট, জ্যোৎস্নাধোওয়া দুর্গ প্রাসাদের চূড়া সব কিছু মিলিয়ে নন্দনকাননের মত একদৃশ্য লেখিকা বর্ণনা করেছেন —

‘সময়টা গ্রীষ্মকাল। প্যারিস শহর ফুলে-পাতায় কুঞ্জবন হয়ে উঠেছে, লাল চেরিতে ঢেকে গেছে আকাশ। কাফেগুলো এত রাত্তিরেও গিসগিস করছিল লোকে, এখন আস্তে আস্তে জনবিরল হয়ে আসছে, এখানে ওখানে দু-চারজন প্রেমিক প্রেমিকা বিদায় বেলায় গাঢ় আলিঙ্গন চুম্বন ইত্যাদিতে নিমগ্ন, লাল-নীল আলোর বন্যার ফোয়ারাগুলো অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

সরু নদীর এপারে ওপারে অসংখ্য চত্বর, অসংখ্য মর্মরমূর্তি। অসংখ্য বই আর ছবির দোকান। পৃথিবীর অন্যান্য শহরের সঙ্গে এই শহরের চেহারা ও চরিত্রের তফাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট। এর এমন একটি খোলামেলা মাঠ-মাঠ ভঙ্গির গড়ন যে রাস্তাকে রাস্তা মনে হয়না, মনে হয় সারা শহরটাই যেন একটা বাগান বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে সেতু পার হয়ে এ পিঠে এসে সমস্ত দলটি থামলাম। এই বিশাল গোল বাঁধানো চত্বরটি থেকে বারো দিকের বারোটি রাস্তা চলে গেছে এদিক ওদিক, সাঁজেলিজে আলোতে ফুলেতে নতুন পাতার কলোরোল তত রাত্রেও সজীব। পৃথিবীর নন্দনকানন। এই নন্দনকাননই একদিন সারা পৃথিবীতে আলো ছড়িয়েছিল। আর ঠিক এই চত্বরেই একদিন ষোড়শ লুইয়ের অনিন্দ্য সুন্দরী পত্নী মারী আঁতোয়ানেৎকে দেশের ক্ষুধিত দ্বৈত জনগন তার সাতমহলা রাজপ্রাসাদ থেকে টেনে বার করে এনে সকলের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল, উৎকট উল্লাসে ছিন্নভিন্ন করেছিল সেই অপরূপ রূপলাবণ্যে ভরা চাঁদের কণা দিয়ে গড়া ফুলের মত পেলব দেহ সৌষ্টব। মনে হল পায়ের নীচে যেন সেই রক্তের উষ্ণতা অনুভব করলাম। অদূরে জ্যোৎস্না ধোয়া বুর্ভপ্রাসাদের চূড়ার দিকে তাকিয়ে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো’।

প্রতিভা বসু যে শক্তিমান ভাষা শিল্পী ছিলেন তাঁর লেখা গল্পগুলি সে সাক্ষ্য বহন করে। তিনি শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে অপূর্ব ভাষা শিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনাধর্মী বিবৃতিনির্ভর ও সংলাপের ভাষার পরিচয় আমরা পেয়েছি। তিনি ভাষার সাবলীলতা গল্প পাঠক মাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে তিনি স্থানে স্থানে যে সুভাষণ গুলির সার্থক প্রয়োগ করেছে সেগুলি প্রতিটি পাঠকেরই শিক্ষার বিষয়। নিম্নে এ ধরনের আশুপূর্ণ বাক্যগুলির বিশ্লেষণ করে দেখানো হচ্ছে —

উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্পকথক জনৈক ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথোপকথোন কালে ভদ্রমহিলাটি তার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা নিম্নোক্ত অংশে জানিয়েছেন। ভদ্রমহিলার ছেলে ও মেয়েরা প্রত্যেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই বিবাহিত। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখকর। ছোট্ট সংসারে বিশেষত নতুন সংসার জীবনে প্রবেশের সময় যারা বয়সে প্রবীণ-প্রবীণা পিতা-মাতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও এই মধুময় দিনগুলিতে তাদের স্থান গৌণ। এই প্রবাদটি সার্থক —

‘যাদের নতুন জীবনস, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়ই সেখানে অবাস্তব’।

‘সন্তান বড়ো উপকারী জিনিস, সংসারের সর্বময় কর্তা হতে গেলে একমাত্র জীব উপর নির্ভর করলেই চলে না, প্রভুত্বের জন্য পুরুষের আরো উপাদান চাই।’

‘ঘাস মাটি’ গল্পের ম্যাজিস্ট্রেট ইউসুফ আলি খাঁ সম্পর্কে প্রভাস বাবু আলোচ্য মন্তব্যটি করেছেন।

ইউসুফ গান্ধীবাদে বিশ্বাসী সেটা তার বাইরের রূপ, ভেতরে তার মধ্যে ছিল পশু বৃত্তি। বহু কুকীর্তির নায়ক সে। শুভ ব্যক্তির একটি ছদ্মবেশ থাকে, একমাত্র বিচক্ষণরাই তা উপলব্ধি করতে পারে। এই অর্থে নিম্নোক্ত প্রবাদ বাক্যটি অর্থবহ —

‘পাপীদের সর্বদাই ছদ্মবেশ থাকে, সেটাই তাদের ধর্ম’।

নিম্নোক্ত অংশটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। যার মানী ব্যক্তি তাদের মানহানি হলে তা যে মৃত্যুর সমতুল্য ও কথাই বোঝানো হয়েছে —

‘সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষা বেদনাময়’।

প্রেমের স্থান ‘সবার উর্দ্ধে’ যেখানে প্রেম নেই, আছে নির্মমতা, হিংসা তা কখনো কল্যাণকর হতে পারে না।

এই অর্থে নিম্নোক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ —

‘আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায়না। হিংসা দিয়ে হিংসার নিবৃত্তি হয় না, মেরে ফেলে সঞ্জীবনী খোঁজার নাম মূর্খতা।’

অদৃশ্য নিয়তির শক্তির কাছে মানুষ পরাজিত এই অর্থে প্রবাদটি অনবদ্য —

‘কিন্তু দৈবের কাছে মানুষের হার চিরকাল চলে এসেছে,’

নিম্নোক্ত বাক্যটিতে ভালোবাসার স্বরূপ ব্যখ্যা করা হয়েছে। ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই মানুষ পরকে আপন করে নিতে পারে। মানুষের জীবনের সার্থকতা, খ্যাতি, সম্মান কোনোটিই ভালোবাসা ব্যতীত সম্ভব নয়। এই সত্য কথাটি লেখিকা তুলে ধরেছেন —

‘ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই পরম আত্মীয় - ভালোবাসাই সম্মান - ভালোবাসাই জীবন - তার চাইতে বড় কিছু নেই।’

ভালোবাসা একটি চিরন্তন অনুভূতি। যার অভাবে মানুষের জীবন মরময় হয়ে ওঠে। এই অর্থে নিম্নের প্রবাদটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘ভালোবাসাই আমাদের মানুষ করে - তার অভাবে জীবন শুষ্ক ব্যর্থ’

প্রত্যেকেই সৌন্দর্য প্রিয়। এই অর্থে আলোচ্য আগুপূর্ণ বাক্যটি প্রতিভা বসুর সফল সৃষ্টি —

‘সৌন্দর্যই পুরুষের মনকে বিচলিত করে - সৌন্দর্যের তৃষ্ণাই পুরুষের চিরন্তন নেশা।’

যারা সংসার অভিজ্ঞ এবং সর্বকাজে পারঙ্গম তারা সবকিছুর সঙ্গে অভিযোজন করে চলতে পারে।

সর্বজনপরিচিত আলোচ্য সুভাষণটি ব্যবহারে লেখিকা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন -

‘যে রাধে সে কি চুল বাঁধেনা?’

প্রকৃত অর্থে যে ব্যক্তির ন্যায়ের পূজারী তারা কখনো অন্যায় পথকে মেনে নিতে পারেনা। আদর্শবাদী ব্যক্তির পরিচয় বোঝাতে আলোচ্য প্রবাদটি প্রতিভা বসুর সার্থক সৃষ্টি।

‘আদর্শ নামক পদার্থটি বড় কঠিন, বড় ভীষণ, একবার যদি তার ফাঁদে পা দেওয়া যায় তার বিরুদ্ধে উপায় থাকেনা।’

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের পূর্ণতা আসে। যে স্ত্রী স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিতা তার জীবন অসম্পূর্ণ। স্বামী প্রেম বঞ্চিতা নারীমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দিক থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ —

‘লোকের পক্ষে স্বামীর ভালোবাসা না পাওয়ার মত পরাজয় আর নেই।’

প্রতিভা বসু একাধিক গল্পে দু’একটি ছড়ার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গল্পে সঙ্গীতের ব্যবহার নেই বললেই চলে। এই ছোট্ট কবিতা ও ছড়াগুলি শিশুমনস্তত্ত্বের উপযোগী।

নিম্নোক্ত ছড়াটি ‘প্রথম সিঁড়ি’ গল্প থেকে সংকলিত। গল্পকথকের সঙ্গে অমলের সুসম্পর্ক বহুদিনের। অমলের মত একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু পেলে গল্পকথকের কবিতা রচনার প্রেরণা জাগে। ছোটবেলা থেকেই অজস্র ছড়া গল্পকথক রচনা করেছেন। সে অভ্যাসবশত পরিণত বয়সে কাঠপেন্সিল দিয়ে বড় বড় করে অমলকে উদ্দেশ্য করে এই ছড়া গানটি রচনা যা গল্পে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে —

‘শোনরে অমল নন্দী

তোর সকল ফন্দী

একদিন করে দিব ফাঁস

দিদিমাকে বলে দেব

তুই আচার চুরি করে খাস।’

‘মাধবীর জন্য গল্পে লেখিকা একটি ছড়া শান্তার মুখ দিয়ে পাঠককে শুনিয়েছেন। মেয়েদের হস্টেলে সুললিতা ব্যানার্জীর আধিপত্যই বেশী। তাঁর আচরণে হস্টেলের অন্যান্য মেয়েরা অনেকেই ক্ষুব্ধ। তাকে কেন্দ্র করে শান্তাদি একটি ছড়া তৈরী করেছে যে ছড়াটি একটি হাস্যরসের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় —

শোনো মিস্ ব্যানার্জী

মা-বাপের মরজি

তাই করি সহি

তোমার ও নাম।

হতো যদি হিড়িম্বা,

হস্তিনী, কিংবা

জগ জগ দম্বা,

মিলতো স্বনাম।

পরিশেষে বলা যায় প্রতিভা বসুর আঙ্গিক নির্ভর গল্পগুলি পাঠকের কাছে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গল্প বলার কৌশল তার ছিল করায়ত্ত। তিনি যে একজন দক্ষ গল্পকার তার প্রমাণ মেলে প্রতিটি গল্পের পাতায় পাতায়।

আশাপূর্ণাদেবী মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবনকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগুলি ছোট, বড়, মাঝারি বিভিন্ন মাপের। লেখিকার ‘তোমার মুখে আয়নার ছায়া’ গল্পটি ছয় পৃষ্ঠার, ‘কুয়াশা’ গল্পটিও ছয়পৃষ্ঠার, ‘আদর্শবাদ’ গল্পটি আট পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, ‘ধূলির প্রাপ্য ধূলিরে না দিলে’ গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার, ‘স্মৃতির অতলে’ গল্পটি তেরো পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়েছে, ‘নিয়মের চাকায়’ গল্পটি আট পৃষ্ঠার, ‘ভয়’ গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে বারো পৃষ্ঠায়, ‘ওরা কথা বলেনা’ গল্পের পৃষ্ঠা সংখ্যা সাত, ‘মাটির নীচে’ গল্পটিও সাত পৃষ্ঠায় শেষ হয়েছে, ‘ফাঁস’ গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার। এটিও ছোটমাপের গল্প। ‘ছুরির ধার’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা সাত, আট পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়েছে, ‘তুচ্ছ নয়’ গল্পটি ‘বাড়ি’ গল্পটি আট পৃষ্ঠার, ‘কমলি’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছয়, ‘রেহাই’ গল্পটি তিন পৃষ্ঠার, ‘যা ছিল সেখানে’ গল্পটি আট পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়েছে। ‘ইজ্জত’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট। এটি একটি মাঝারি আকারের গল্প। ‘নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য’ গল্পটি সাত পৃষ্ঠার, ‘নিজের জন্য শোক’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, ‘ঘৃষ’ গল্পটিও আট পৃষ্ঠার। গল্প দু’টোই মাঝারি আকারের। ‘বরফজল’ গল্পটি সাত পৃষ্ঠার, ‘মলাটের মুখ’ গল্পটি দশ পৃষ্ঠায় সম্পন্ন হয়েছে, ‘শোক’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, ‘নিঃশব্দ’ গল্পটি পাঁচ পৃষ্ঠার, ‘প্রাণাধিকার’ , গল্পটি শেষ হয়েছে নয় পৃষ্ঠায়, ‘ক্যাকটাস’ গল্পটি সতেরো পৃষ্ঠার, ‘আহতফণা’ গল্পটি ষোলো পৃষ্ঠার। এই গল্প দু’টি বড় মাপের। ‘চরিত্রহীন’ গল্পটির পৃষ্ঠা সংখ্যা আট, ‘দশায়শনি’ গল্পটি নয় পৃষ্ঠার।

গল্পের শিল্পরূপের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল শুরু ও সমাপ্তি। আশাপূর্ণাদেবী তাঁর প্রারম্ভ ও সমাপ্ত অংশ দু’টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন ‘আদর্শবাদ’ ছোটগল্পের শুরুতেই রয়েছে নাটকীয়তা। জয়দেব ও জয়দেবের বিধবা দিদি উমার নাটকীয় সংলাপ কয়লাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছিল। জ্বালানির একটি উপকরণ হল কয়লা। সংসার জীবনে এর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। গল্প শেষে সমগ্র বিশ্বের শোষিত, শাসিত, নিপীড়িত, অবমানিত, লাজিত, মানবাত্মার যুক্তির প্রশ্ন বর্তমান। গল্পের বৈশিষ্ট্য হল সমাপ্তি অংশে থাকবে একটি জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা পাঠক মনকে প্রভাবিত করে। গল্প রচনাশৈলীর এটি একটি সার্থক দৃষ্টান্ত।

‘তুচ্ছ নয়’ গল্পের শুরুতে রয়েছে একটি চিঠি। গল্প শেষে চিত্তরঞ্জনও অনুপমার সংলাপে একটি সময়ের নিরীক্ষণ বিন্দু প্রকাশ পেয়েছে।

বিয়ের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে ‘বাড়ি’ গল্পে। গল্পটির সমাপ্তি অংশে বাড়ি তৈরীতে ব্যস্ত

রমলা উপলব্ধি করেছে যে বাড়ির চেয়েও তার আরো বড় জিনিস তৈরি করা প্রয়োজন ছিল।

‘মাটির নীচে’ গল্পের শুরুতে রয়েছে নাটকীয় চমক। কোন একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা যে ঘটতে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত গল্প শুরুতে আছে। গল্পের শেষে অজানার উদ্দেশ্যে লমিত যাত্রা করেছে।

‘নিয়মের চাকায়’ গল্পের শুরুতে চাকদা স্টেশনে বড়াকার আগমন-এর অপেক্ষায় রয়েছে ব্রজ। গল্পটি শেষ হয়েছে গভীর ব্যঞ্জনাময় একটি সংলাপে,

“.....এ সমস্তই জাগতিক নিয়ম মোহিতমোহন যে

নিয়মে আমরা, যে সবুজ পাতারা কোন এক সময় হলদে হয়ে

ঝরে পড়ে যাই গাছের ডালে আটকে থাকবার ক্ষমতা হারিয়ে।”

গল্পকারকে নামকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হয়। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের নামকরণে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সহজ-সরল, নিরলঙ্কারযুক্ত তাঁর গল্প নামকরণ থাকলেও শিল্পগুণের দিক থেকে নামকরণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর উল্লেখযোগ্য বাছাই গল্প সংকলন গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই যেন এক মূর্ত প্রতিবাদ।

‘ইজ্জত’ গল্পে আমরা দেখি, যে গল্পটি রচিত হয়েছে একটি হতদরিদ্র বি-এর মেয়ের ইজ্জত রক্ষাকে কেন্দ্র করে। তথাকথিত পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় বিশেষভাবে বিত্তবান মানুষের কাছে গরীব মেয়ের কোন ইজ্জত নেই। নেই তাদের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব। এই বিষয় অবলম্বনে ‘ইজ্জত’ নামকরণটি সার্থক।

‘জালিয়াত’ গল্পেও আমরা দেখি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এক বোঝাপড়ার অভাব। দায়িত্ববোধহীন স্বামীকে জালিয়াত হিসেবে চিহ্নিত হতে হয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের এই দূরত্ব বোঝাতে গিয়ে আশাপূর্ণার ‘জালিয়াত’ - নামকরণটিও সার্থক।

‘ছিন্নমস্তা’ গল্পের নামকরণটি জয়াবতী চরিত্রের নামে লেখিকা করেননি। যে মা তার নিজের সন্তানের মৃত্যুকামনা করেন, বিমলের বিধবা পুত্রবধূকে দেখে আনন্দিত হন, সেই মা ছিন্নমস্তা হিসেবেই পরিচিত। ছিন্নমস্তা দেবী যেমন নিজের খড়্গে নিজমস্তক কেটে, কাটা মুণ্ড নিজ হাতে নিয়ে রক্ত পান করেন। এই গল্পের ক্ষেত্রে-ও সে নিমর্মতা প্রাধান্য পেয়েছে বলে নামকরণটি সার্থক।

এছাড়া ‘একটি সত্যি গল্প’ ‘শেষ’ ‘বৃত্ত’, ‘মাথাধরা’ ‘শোক’, ‘প্রাণাধিকার’, প্রভৃতি ছোটগল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাময়ী ‘মাটির নীচে’, ‘ছুরির ধার’, ‘পরিবর্তন’, ‘আদর্শবাদ’, ‘কুয়াশা’, ‘স্মৃতির অতলে’, ‘আহতফনা’, ‘সমারোহ’, ‘আগুন’, ‘বরফ জল’ ও ‘ভালোবাসার নাম প্রতারণা’ গল্পগুলির নামকরণেও রয়েছে ব্যঞ্জনাময়ীতা। ‘দেশলাই বাস্ক’, ‘অনাচার’, ‘ধারশোধ’, ‘বাড়ি’ প্রভৃতি গল্প বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক। তাঁর চরিত্রকেন্দ্রিক গল্পের নামকরণ -ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণাদেবীর গল্পের প্লট শিথিল নয়, আটোসাটো। প্রতিটি গল্পের শেষে উত্তরণের ইঙ্গিত রয়েছে। গল্পের ঘটনা, সময় ও সংস্থানকে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি সরাসরি গল্পের মাঝখানে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁর ‘হিন্মন্তা’ একটি চরিত্রপ্রধান গল্প।

বিমলেন্দুর স্ত্রী প্রতিভার প্রতি শাশুড়ীর অস্বাভাবিক ব্যবহার গল্পটি কেন্দ্রে অবস্থান করছে।

চরিত্র চিত্রণের দিক থেকেও আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলি কৃতিত্বের দাবী রাখে। তিনি অতিপরিচিত মধ্যবিত্ত পরিবারের পটভূমিতে গল্পগুলি রচনা করেছেন। ‘অভিনেত্রী’ গল্পের অনুপমা যেন উপমাহীন। বাবা, শ্বশুর, স্বামী, পুত্র সকলের সঙ্গে অনুপমা অভিনয় করে গেছেন সংসার জীবনের সুখ এবং শান্তির জন্য। এরূপ নারী না থাকলে সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হতো।

‘হিন্মন্তা’ গল্পের জয়াবতী বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্র। জয়াবতী হিন্মন্তার মতোই নিজরক্ত পান করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে। পাশাপাশি প্রতিভা চরিত্রের মধ্যে লেখিকা বাঙালি গৃহিণীর রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গল্পের বিমলেন্দু চরিত্রটি-ও বাস্তবলোক থেকে তুলে এনেছেন। তার আকস্মিক মৃত্যু করুণ রসের সঞ্চারণ করেছে।

এছাড়া ‘ইজ্জত’ গল্পের সুমিত্রা মধ্যবিত্ত ঘরের স্ত্রী। সে নারী হয়ে নারীকে সাহায্য করতে চেয়েছে। বাসন্তীর কন্যার ইজ্জত রক্ষা করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েও স্বামী মহীতোষের স্বার্থপরতা, দাস্তিকতা ও দরিদ্রের প্রতি তচ্ছিল্যের ভাব সুমিত্রাকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারেনি। বাসন্তী অকাল বিধবা এক নারী চরিত্র, সঙ্গে তার এক চোদ্দ-পনের বছরের সুন্দরী কন্যা। তার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিল সুমিত্রার কাছে। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে কন্যার ইজ্জত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

‘জালিয়াত’ গল্পের সুমিত্রা সান্ত্বনা তার স্বামীর কাছে জালিয়াত বলে গণ্য হলেও দুর্জয় সাহসে স্বামীকে পাঁচটা আক্রমণ করে জালিয়াত বলে অভিযুক্ত করেছে।

‘নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য’ গল্পে বিধবা, বৃদ্ধা হেমাসিণী চরিত্রটি জীবন্ত।

‘নিজের জন্য শোক’ গল্পে শৈলবালা ও অবিনাশ উভয়ের দ্বন্দ্ব সংঘাতের চিত্রটিকে লেখিকা অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন।

আশাপূর্ণাদেবীর ‘হিন্মন্তা’ গল্পের শিল্পরূপ প্রসঙ্গে ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন,

১) “তাঁর পরিষ্কৃত বোধ অসামান্য ; কলহের তীব্র অন্তর্ঘাত, তিক্ততা, প্রথমে জয়াবতীর, পরে প্রতিভার অন্তর্লীন ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা - সবই চিত্রিত করেছেন অথচ বিষয়কে লঘু বা ইতর হতে দেননি, টেনশানের টান টান সুতো মুহূর্তের জন্য টিলে হয়নি।”

২) “গল্পের প্রয়োজনে তিনি কখনও গল্প-কথক, কখন-ও চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে অনায়াস, কখন-ও বা পাঠকের সঙ্গে একাত্ম।”

৩) “লেখিকার পরিমিতিবোধ, টেনশান ধরে রাখার ক্ষমতা, কাহিনী বর্ণনদক্ষতা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করার সময় নৈব্যক্তিকতা পাঠক বা ভোক্তা হিসেবে সচেতন অথচ নৈব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী - এসবই অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন তিনি প্রবহমান, সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায়। এ-ভাষার কোথা-ও অতিসচেতন অলংকরণ নেই। একান্তই ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা, যে ভাষা মহিলা-মহলের পরচর্চায়, সন্তানকে আদরের সময়, রান্নাঘরে, হেঁসেলে, দাম্পত্যজীবনে বা শাওড়ীর সঙ্গে কলহের সময় ব্যবহার করেন বাঙালী মধ্যবিত্ত নারীরা। নারীদের মুখের এই ভাষা এদেশের নারীদের মতই বহু-ভার-বহনে সক্ষম, সক্ষম আধার অনুযায়ী জলের মত নিজের জীবন ও চরিত্রকে পাতে নিতে, এবং এদেশের নারীদের মতই এ-ভাষার প্রাণশক্তি অফুরন্ত। যে-কোন দুর্যোগ তথা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাই সাবলীল গতিতে বয়ে যেতে পারে সে।” ৭

আশাপূর্ণাদেবী তাঁর গল্পে ছোট, বড় ও মাঝারি - তিনরকম বাক্যই ব্যবহার করেছেন। সংক্ষিপ্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হল —

‘সন্ধ্যা ভয় পায়।’

— পাশাপাশি মাঝারি বাক্য তিনি যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। একটি মাঝারি বাক্যের উদাহরণ তুলে ধরছি —

‘জয়দীপের মা ছেলে বড়ো হয়ে ওঠা ইস্তক ছেলেকে ধমক দেবার কথা ভাবতে পারে না, জয়দীপের বাবা তো নিজ স্বভাববশেই কখনো ছেলেমেয়েকে উঁচু গলায় কথা বলতো না, পিঠোপিঠি দিদিই ওর বরাবরের শাসনকর্তা।’

দীর্ঘবাক্য ব্যবহারের অভাব নেই। ভাষার স্বচ্ছতা ও দৃশ্যমানতা তাঁর গল্পে উপস্থাপন করে তিনি পাঠককে অনেক কাছাকাছি এনেছেন। লেখকের বিশেষণ প্রয়োগ এর চিত্রধর্মীতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নোক্ত বাক্যে তার সার্থক ব্যবহার রয়েছে —

‘প্রতিদিন প্রতিরাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্ঠুর নিয়মের নিষ্করণ আকর্ষণে যে সব হতভাগ্যরা আশা আকঙ্কার ভরাপাত্র নামিয়ে রেখে এই শোভাসম্পদময়ী ধরণী থেকে অসময়ে স্থলিত হয়ে পড়ে যাচ্ছে - অন্তত শূন্যের ক্ষুধার্ত জঠরে, দলে দলে উঠে আসে তারা, অনুকারের অসাবধান অবসরে।’

লেখিকা একাধিক ছোটগল্পে চিঠিপত্রেরও উল্লেখ করেছেন। ‘একটি সত্যি গল্প’ গল্পেতে চিঠির উল্লেখ আছে —

“ছিলে জামাই, ভাগ্নে ভাইপো যার জন্যই হোক, কেউ একবার চাকরির কথা বললেই বৈকুণ্ঠ বল্লভ দরাজ নির্দেশ দিয়ে। চিঠি দেন, ‘পত্রপাঠ তাহাকে পাঠাইয়া দাও ব্যবস্থা করিতেছি।’”

নিম্নে আশাপূর্ণাদেবীর ছোটগল্প সংলাপ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদত্ত হল :-

‘সাহেব আপনি ঘুমোতে যান — ‘বিছানা থেকে এসে সাহেবের সন্নিহিত দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে অনুরোধ জানায় পাখি, ‘মেমসাহেব এখন একটু ঘুমিয়েছেন, আমি আছি —’

সাহেব নিদ্রাতুরা শয্যাশায়িনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে তেমনি আস্তে বলেন, ‘তা তোমার-তো ঘুম টুম —’

‘আমাদের আবার ঘুম! কী যে বলেন। এখন মেমসাহেব যাতে আরাম পান — আর আপনাদের হলো দামী শরীর, ঘুম না হলে -’

‘আচ্ছা -’ সাহেব আর একবার স্নেহকোমল দৃষ্টিতে নিদ্রিতাকে দেখে নিয়ে বলেন ‘যাচ্ছি। কিন্তু জেগে উঠে উনি যদি খোঁজেন, আমাকে ডেকে দিও। বাইরে থেকে দরজায় একটু শব্দ করলেই —’

‘ওস্তাদ!’ হেসে কুটি কুটি হয় অমূল্য। ‘তারপরে ? দিলি তো টাকা ?’ পাখি গম্ভীর মুখে বলে, ‘দিলাম বৈকি! গিনী যে জেগে উঠেই ‘সাহেব কই সাহেব কই করে আনচান করলেন!’

‘যাচ্চলে - জেগে উঠলো। তবে আর কী হলো ছাই!’

‘তুই থাম অমূল্য।’

‘তুই তো চিরকাল আমায় থামিয়েই রাখলি পাখি! কিন্তু বলি, এবার হেরে যাচ্ছিস যে?’

‘হারিনি। চেষ্টা করছি না।’

‘কেন বল তো ?’

‘কি জানি!’

‘না, বাবা, তুই যেন রহস্য হয়ে উঠছিস ! তা ডাকার পর কি হলো তাই বল ?’

ছোট ছোট কাটা-কাটা বাক্যে বর্ণনার মাধ্যমে সরাসরি ঘটনার মাঝখানে এনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন। লেখিকা অধিকাংশ বাক্যে অন্বয়গত বিপর্যয় ঘটলে-ও তা লেখিকার বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে বলে মনে হয়।’

আশাপূর্ণাদেবী গল্পের বর্ণনা অংশে-ও শিল্প সিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছেন। তিনি যে রূপের বর্ণনাগুলি করেছেন তা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিম্নোক্ত বর্ণনায় আমরা লক্ষ্য করি কৃশাদী কস্তুরির দৈহিক বর্ণনা ও পোশাক-পরিচ্ছদের জীবন্ত রূপ —

‘দুটো বেণী দিয়ে গড়া প্রকাণ্ড খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, হাতে ভারী ওজনের মোটা মোটা কঙ্কণ, মিহি ক্রেনের শাড়ির জমকালো টিসুর আঁচলটা অবহেলায় পিঠে ফেলা, পায়ের

জুতোয় আর হাতের ভ্যানিটি ব্যাগে শ্রীনিকেতনী শিল্প চাতুর্য -

অতি আধুনিকতার একখন্ড নিখুঁত নমুনা কৃশাঙ্গী কস্তুরী, গাড়ি থেকে নেমে যেন হালকা হাওয়ার মতো ভেসে বাড়িতে উঠে এল।”

আশাপূর্ণা দেবীর ‘ইজ্জত’ গল্পে বাসন্তীর মেয়ের দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা সুমিত্রার জবানীতে মেয়েটির মা অপরের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করে কোন মতে দিন চালায় চোদ-পনের বছরের মেয়েটিকে দেখতে সতের-আঠারোর কম মনে হয় না। নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মেয়েটির রূপফুটে ওঠে। মেয়েটির রূপের মধ্যে একধরনের কমনীয়তা ও ভদ্র মার্জিতশী ছিল। তাই সহজেই সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। লেখিকা তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তভাবে —

‘মেয়েটা ওদিকে বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে, পরনে সস্তামারকা একখানা জ্যালজেলে ডুরে-শাড়ি। আর বোধহয় ফুটপাথে কেনা একটা তেমনি জ্যালজেলে লাল ব্লাউজ। তাতেই এতো খাসা দেখাচ্ছে, একবার দেখলে আরও একবার দেখতে ইচ্ছে হয়।’

গল্পকার একজন বয়সে প্রবীণা দিদিমার রূপের বর্ণনাটি কত নিপুণভাবে অঙ্কণ করেছেন তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যার মধ্যে ভাষার স্বচ্ছতার পরিচয় পাওয়া যায়।

‘এই তো কিছুদিন আগেও দিদিমাকে দেখে গেছি, তখন তিরিশী বছর বয়স। রোগা একখাবলা মানুষ। তবী বড় সিঁদুরের টিপে চওড়াপাড় শাড়িতে, একগোছা চুড়িতে কি জ্বলজ্বলেই দেখিয়েছে। আর এখন দেখ - কে বলবে সেই মানুষ! রংটা সুদৃক কালিবুল হয়ে গেছে। বুড়োতেও তো পাকা আমটি ছিলেন।’

লেখিকা ‘গুধু একটি ঠিকানা’ গল্পে যে লোকটির বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্যে চেহারার সৌন্দর্য এতটুকু ফুটে ওঠেনি। নোংরা লুঙ্গি ও ছেঁড়া গেঞ্জি পরিহিত, চুল দাঁড়িতে ভরা একটি রুক্ষ চেহারা বর্ণনায় মুনসীমানার পরিচয় মেলে —

‘লোকটাকে কদিনই দেখছে অসিত। পরনে একটা ময়লা লুঙ্গি আর ফুটো গেঞ্জি, কাঁচাপাকা দাড়িতে মুখভর্তি চুলও তাই, আবার খোঁচা খোঁচা। মুখটা যেন কাঁচা আতার মতো এবড়ো খেবড়ো জামড়োপড়া।’

গল্পকার ‘নিজের জন্য শোক’ গল্পে অবিনাশ ও শৈলবালার বাসগৃহ -এর যে বর্ণনাটি তুলে ধরেছেন সেটি যেন একটি দরিদ্র পরিবারের গৃহের বর্ণনা যে বর্ণনার মধ্যে সমাজ বাস্তবতার সার্থক পরিচয় মেলে —

‘ঘরটা সরু, শোবার ঘর হিসেবে গণ্যও ছিল না, তাই সীলিং ফ্যান নেই, দরকারও হয়না, পাশের জানলাটা খোলা থাকলে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায় আজ জানালাটার একটি কপাট বন্ধ।

এ-সমস্তই ঠিকঠাক করে গেছেন শৈলবালা শুতে যাবার আগে। যান না অবশ্য বেশী দূরে, পাশের ঘরেই তাঁর অবস্থান। এ ঘরটা তো ছোট্ট একফালি, ব্যবধান সামান্যই, দু'ঘরের মাঝখানের দরজাটা খোলাই থাকে, শুধু একটা পর্দা ঝোলে তাতে। . . . তবু কত দূর দূরান্তের ব্যবধান।’

পূর্বের বর্ণনার পাশাপাশি একটি সৌখিন পরিবারের সুসজ্জিত গৃহের বর্ণনাটি রমণীয় সন্দেহ নেই। খাট, কাঠের পুতুল, কাঁচের পাখি, কার্পেটের নিসর্গ দৃশ্য ও নানরূপ সৌখিন দ্রব্য অত্যন্ত সযতনে সচীন ও লীলা এই দম্পতি সঞ্চয় করে রেখেছিল যার মধ্যে উন্নত রুচিবোধের পরিচয় মেলে।

‘এখনো শচীনাথের ঘর সেই আগের মতোই সাজানো পরিপাটি। তেমনি বাহারি সুজনি পাতা খাট, সেই তেমনি দেরাজের ওপর ছোটছোট কাঠের পুতুলের সারি, সেই টেবিলে টাইমপিসটার পাশে দুটি কাঁচের পাখি, দরজার সামনের দেয়ালে লীলার বাল্যকালের বোনা কার্পেটের নিসর্গ দৃশ্য, কাঁচের আলমারিতে বহুবিধ সৌখিন দ্রব্য সম্ভার যা না কি লীলার আজীবনের সঞ্চয়, সব ঠিকঠাক রয়েছে, কোথাও কিছু নড়চড় নেই।’

গল্পকার রোম্যান্টিক পরিবেশ বর্ণনায় যে কাব্যিক গদ্যভাষা বর্ণনা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পাশাপাশি তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিত্রকে সহজবদ্ধ ভাষায় রূপায়িত করেছেন। যার মধ্যে অলংকার নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। বাতাসের আশ্ফালন শব্দের সঙ্গে গাছেদের আর্তনাদ সমাসোক্তি অলংকারের দৃষ্টান্ত।

‘উঠেছে ঝোড়ো হাওয়া। বাইরের গাছপালাগুলো অন্ধকারে হাওয়ার মুখে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালাচ্ছে। বাতাসের আশ্ফালন শব্দের সঙ্গে গাছেদের আর্তনাদ মিশে গেছে।’

নিম্নোক্ত বর্ণনা অংশে রাতের অন্ধকারে অরণ্যের মর্মরধ্বনির পাশাপাশি দিনের অরণ্যের মর্মর ধনিকে লীলাচঞ্চল করে তুলেছে। এ যেন রহস্যহীন মৌন অরণ্যের আরেকরূপ। গল্পের নায়ক প্রদীপ কস্তুরীকে তার অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেছেন —

‘সে ধ্বনি শাখাপত্রে বাতাসের লীলা চাপল্যের। তখন কেউ ফিসফিস করে কথা কয়ে ওঠে না। কস্তুরী দিনের আলোয় তুমি যদি অরণ্যের জটিলতায় ঘুরে বেড়াতে চাও, তখন যে শব্দ তুমি শুনতে পাবে সে নিতান্তই তোমার নিজেরই পায়ের চাপে শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। তখন রহস্যহীন মৌন অরণ্য গম্ভীর মুখে চেয়ে থাকবে তোমার মুখের দিকে। সারা রাত্রির মাতামাতির ইতিহাস দেখতে পাবে না তার মুখের কোন রেখায়।’

আশাপূর্ণা দেবীর কোন কোন বর্ণনা অংশ যেন কবির কলমে লেখা। হৈমন্তী সদ্য বিবাহিতা শ্বশুর গৃহে আসবার পর সেতার হাতে নিয়ে সমুদ্রনারায়ণের পাশে বসে সঙ্গীতের চর্চা

করেছিল। এই সঙ্গীতের সুরের তালে তালে মিলিয়ে প্রকৃতি যেন অপূর্বরূপ বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে নিম্নোক্ত বর্ণনা অংশে — ‘সে দিন চাঁদ উঠিয়াছিলসদ্য ফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস ছিল উন্মাদা দীঘির ঘাটে বাঁধানো চাতালে হৈমন্তী বসিয়াছে সেতার হতে জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ, পরনে নীলাম্বরী পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ।’

আশাপূর্ণা দেবী সমাজ অভিজ্ঞতার শিল্পী। তিনি তাঁর গল্পে প্রবাদ-প্রবচন ও আশুপূর্ণ বাক্যের এমন সুসম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন যেগুলির আবেদন চিরন্তন। নিম্নে মণিমঞ্জুরার মতো কথাগুলি পাঠকের শিক্ষার বিষয়। তার কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত :-

‘বাবুদের কাছে ছোটলোকের মেয়ের ইজ্জতের কোন দাম নেই।’

— বাসন্তী সুমিত্রাকে আপন অভিজ্ঞতার কথা গিয়ে বাবুদের চরিত্র প্রসঙ্গে এই উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘যৌবনে গুরুজনদের কাছে লজ্জা বার্ষক্যে লঘুজনের কাছে।’

— বার্ষক্যের সময় নিজস্ব উপলব্ধি প্রসঙ্গে এই প্রবাদ বাক্যটি সার্থক।

‘সাহিত্যে সুন্দর নেই অসুন্দর নেই, রুচি অরুচি নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, আব্রু নেই বে-আব্রু নেই, সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্য।’

— সাহিত্যের তাৎপর্য বিষয়ে উক্তিটি রয়েছে আশাপূর্ণাদেবীর ‘বরফজল’ গল্পে।

‘সৌন্দর্য বস্তুটা তো কেবলমাত্র বাইরের ছাঁচের মধ্যেই আবদ্ধ নয়।’

— প্রভাংশু সৌন্দর্যের অসীমতার কথা বলতে গিয়ে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটিকে সার্থক করে তুলেছেন।

‘সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।’

— এখানেও প্রভাংশু সৌন্দর্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্তিটি ব্যবহার করেছে সার্থকভাবে।

‘চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?’

— কৃষ্ণামালার সুখী দাম্পত্য জীবন প্রসঙ্গে উক্ত আশুপূর্ণ বাক্যটি ব্যবহার করেছেন।

‘বড়বেশি প্রয়োজনের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সেই প্রয়োজনীয় বস্তুটি হাতে এসে পড়া মানুষের ভাগ্যে দৈব্যাত্মই ঘটে।’

— প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভাগ্যের সহায় থাকার প্রসঙ্গে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

‘সেই চিরন্তন পুরুষ জাতির অর্থহীন অহমিকা! কিছুতেই নিজেদেরকে জীবর থেকে উচ্চস্তরের না ভেবে ছাড়বে না। উচ্চস্তরের, উচ্চদের উচ্চমর্যাদার।’

— পুরুষজাতির অহংকার বোঝাতে গিয়ে আশুপূর্ণবাক্যটি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

‘মেয়েরা বিদ্যায়, কর্মে, পদমর্যাদায় বা পদে’র জটিলতায় যেখানেই পৌঁছক, তার একেবারে অন্তরের অন্তরলোকের একান্ত বাসনাটি থাকে মনের মতো একটি ‘ঘর’।

— মেয়েদের মনের স্বাভাবিক বাসনা প্রসঙ্গে আশুপূর্ণ বাক্যটি সার্থক হয়েছে।

“নিভৃত অশ্রুর দর্শক থাকেনা, নিভৃত চিন্তার সাক্ষী থাকে না।”

‘অসহায় একক পুরুষের উপর মমতা মেয়ে মনের চিরন্তন প্রকৃতি, তা যে বয়সেরই হোক।’

— চারুলতা মেয়েদের চিরন্তন প্রবৃত্তির কথা বলতে গিয়ে আগুপূর্ণ বাক্যটির সার্থক ব্যবহার করেছেন।

‘নিজেকে আশ্চর্যরকম ‘অ্যাডজাস্ট’ করে নিতে পারে মানুষ। ‘অ্যাডজাস্ট’ করতে করতেই তার জীবন পরিক্রমা।’

— মানুষের ক্ষমতা প্রসঙ্গে আলোচ্য প্রবাদটি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ‘ক্যাকটাস’ গল্পে।

‘বড়লোক জাতটাই এমনি ; মন নেই প্রাণ নেই!’

— সহানুভূতিহীন বড়লোক প্রসঙ্গে উক্তিটি তাৎপর্যপূর্ণ।

‘অরণ্য মর্মরের সত্যি ইতিহাস।’

— প্রকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্তিটি সার্থক।

‘মহৎ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ মানুষের কাছে থাকেন।’

— সাধারণ মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার প্রসঙ্গে প্রদীপ উক্তিটির সার্থক ব্যবহার করেছেন।

— ‘অধৈর্য হয়ো না মা, সোমেনের মুখ চাও, পৃথিবীর নিয়মই এই, অধৈর্য হলে চলবে কেন মা, কি করবে?’

— পার্থিব নিয়ম প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

ছোট ছোট আগুপূর্ণ বাক্যের পাশাপাশি আশাপূর্ণাদেবী তাঁর গল্পে একাধিক কবিতাংশ ও ছড়ার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর রবীন্দ্রানুরাগের পরিচয় মেলে গল্পে একাধিক রবীন্দ্র কবিতার সংযোজনে। ‘আর একদিন’ ছোটগল্পে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি তর্পণ করেছেন তাঁর সংগীতের সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে।

“তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি

শতরূপে শতবার

যুগে যুগে অনিবার

চিরকাল ধরে -”

— অশোক ও অলোকার প্রেমের উন্মেষ পর্বের অনুষঙ্গে আলোচ্য গানটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লেখিকা ‘একটি প্রেমিক পুরুষের ইতিবৃত্ত’ গল্পে যে পত্রটি লিখেছেন, তার মধ্যে হাস্যরস যেমন পরিবেশিত হয়েছে। ঠিক তেমনি প্রেমের নবানুরাগেরও পরিচয় মেলে যেমন —

“বাকা, রাকা, রাকা !

তোমায় ছেড়ে চলে যেতে প্রাণ হচ্ছে ফাঁকা।

তুমি এত সুন্দর তাই তো এত ভালবাসি,

তোমার সবই সুন্দর, কথা আর হাসি।

স্কুলে গিয়েও তোমার কথা মনে পড়বে,

লেখা পড়া সব কিছু মাথায় চড়বে।

— ইতি নতুন।”

শুধু বিষয়বস্তু নয়, প্রকরণ কৌশলে-ও আশাপূর্ণা দেবী যে কতদক্ষ শিল্পী ছিলেন তাঁর গল্পগুলি পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ মেলে। এখানে আশাপূর্ণা দেবীর স্বাতন্ত্র্যতাও অনন্যতা।

মহাশ্বেতা দেবী সত্তর দশকের মধ্যভাগ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত অজস্র গল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। অভিজ্ঞতার শিল্পী মহাশ্বেতার গল্পে অপেক্ষাকৃত অন্ত্যজ শ্রেণির পাশাপাশি ভাগচাষি, ক্ষেতমজুর বা কারখানার শ্রমিক তাদের সুখ-দুঃখ, বঞ্চনাময় জীবনকে গল্পের পাতায় তুলে ধরেছেন। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার দলিত সমাজের বিভিন্ন চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপ তিনি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি যথাক্রমে পীতাম্বর হেমব্রহ্ম, বারেন ভুঁইয়ালি, মাখন হাঁসদা, মাগন সাঁওতাল, কালীপদ, সরেন, কেতু শবর, গঙ্গা কাঁটাল, অন্নবালা, কোটাল, রঘীবর ঘারোয়ার, দিগাম্বর, নরেন মন্ডল, বিশাল ভুঁইয়া, চন্দ্রনাথ, বেশরা, বনপতি কোটাল, উচ্ছব নাইয়া, জুরন লধা, ভিখারি দীসাদ, সাধন কান্দরি, দীলন গঞ্জ, নিষাত মাঝি, ভুজংমাহাতো, প্রভৃতি পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি পদ্মমণি, বদনী গাঙ্গের, দ্রৌপদী, যশোদা ইত্যাদি নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকা শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এরূপ পিছিয়ে পড়া মানুষদের ওপর যারা অত্যাচার চালিয়েছে তাদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির, রাজনীতিবিদ, প্রশাসনিক স্তরের মানুষ, দারোগা, পুলিশ, বিচারক, পুঁজিবাদী, মধ্যবিত্তশ্রেণি, জোতদার, জমিদার, চিকিৎসক, রক্ষণশীল মানুষ ব্যবসায়ী মহাজন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গল্পের শিল্পরূপ বিচারের ক্ষেত্রে প্লট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর গল্পে প্লট সরল ও জটিল দু’রকমেরই। প্রথম দিককার গল্পের প্লট কিছুটা শিথিল হলেও প্লটের এই ত্রুটিকে তিনি অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন উত্তরপর্বের গল্পগুলিতে। তাঁর গল্পগুলি যৌক্তিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ঘটনাগুলি কার্যকারণ সূত্রে আবদ্ধ বর্ণনামূলক ও বিবৃতিমূলক দু’ধরনের রচনা রীতিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন।

ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী ‘স্তনদায়িনী’ ছোটগল্পের প্লট তথা শিল্পরূপ সম্পর্কে মূল্যবান মন্তব্য করেছেন

—

‘স্তনদায়িনী’ গল্পের পরিধি ও আঙ্গিক গল্পের নিয়ম মেনে চলেছে এমন কথা বলা যায় না। লেখিকা নিদারুণ ক্ষোভ সামাজ ও পরিবারের নানা ঘৃণ্য অসঙ্গতি ও ভাঙন উপলক্ষ্যে বলসে

উঠেছে - তাঁকে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে গেছে। তিনি নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। গল্পের একমুখীনতা থেকে ভ্রষ্ট হওয়ায় এ গল্পের আঙ্গিক বেশ ঢিলেঢালা, আয়তন ও খানিক বড়। তবে যশোদা তথা ভারতবর্ষ কত কুসন্তানকে নির্বিচারে স্তনদান করে ক্ষয়িত হচ্ছে তা বোঝাবার জন্যে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া প্রয়োজন ছিল।”৮

গল্পকার মহাশ্বেতাদেবীর গল্পগুলি সম-আয়তনযুক্ত নয়। ছোট, মাঝারি ও বড় বিভিন্ন মাপের গল্প তিনি রচনা করেছেন।

ছোটশ্রেণির গল্পের মধ্যে ‘ভয়’, পাঁচ পৃষ্ঠার, ‘ক্লাপ ৩৯৬ রং নাম্বার’ তিনপৃষ্ঠার, ‘অর্জুন’ তিন পৃষ্ঠা, ‘সোনালি মাছ’ পাঁচ পৃষ্ঠা, ‘একটি আষাঢ়ে গল্প’ তিনপৃষ্ঠা, ‘শান্তিকুঞ্জ’ তিনপৃষ্ঠা, ‘পূর্বাভাস’ চার পৃষ্ঠা, ‘পুতুলদিদি’ তিনপৃষ্ঠা, ‘ত্রিভুজ’ তিন পৃষ্ঠা, ‘যরা চিঠি’ তিনপৃষ্ঠা।

মাঝারি শ্রেণিরগল্প-এর অন্তর্ভুক্ত ‘মাছ’ ছয় পৃষ্ঠার, ‘নিশাত মাঝির ভুটান যাত্রা’ সাত পৃষ্ঠা, ‘মৌল অধিকার ও ভিখারি দুসাত’ তেরো পৃষ্ঠার, ‘ভাতুয়া’ পাঁচ পৃষ্ঠার, ‘ফার কাটি’ এগারো পৃষ্ঠার, ‘গরিবানা’ এগারো পৃষ্ঠার, ‘ভাত’ সাত পৃষ্ঠার, ‘জোচ্চোর’ নয় পৃষ্ঠার, ‘চরক’ আট পৃষ্ঠার, ‘কানু’ ছয় পৃষ্ঠার, ‘সমাজবাদ’ ববুয়া’ আটপৃষ্ঠা, ‘ভাষাভাষি’ নয় পৃষ্ঠা, ‘গন্ধ’ এগারো পৃষ্ঠা, ‘দাহ’আটপৃষ্ঠা, ‘বেড়াল’ সাত পৃষ্ঠা, ‘অনসূয়া’ সাতপৃষ্ঠা, ‘শান্তি’ নয় পৃষ্ঠা।

বড়শ্রেণির গল্প - ‘তরাস’ পনের পৃষ্ঠা, ‘উড়োনির বেটা’ চোদ্দপৃষ্ঠা, ‘গণপতি কোটাল’ পনের পৃষ্ঠা, ‘গতিগঙ্গা যুগিদাস নাইয়া’ চোদ্দপৃষ্ঠা, ‘ভূমিদাত্রী’ সাত পৃষ্ঠা, ‘তৃষ্ণা’ চোদ্দ পৃষ্ঠা, ‘জাতুধান’ বারো পৃষ্ঠার।

গল্পচর্চা গ্রন্থে ডঃ অনন্যা বড়ুয়া ‘সাঁঝ সকালের মা’ : স্বপ্নভঙ্গ ও সময়ের বিনির্মাণ প্রবন্ধে লিখেছেন - ‘মহাশ্বেতার গল্পের একটি পরিচিত রীতি তিনি গল্পের পরিসমাপ্তি থেকে শুরু করেন।’ ৯

‘বৈশাখের তাতে মাঠের ছাতি ফাটে, সাধন কান্দোরীর মা জটি ঠাকুরনি মরে গেল। মরে যাবার আগে জটি ঠাকুরনির পেটগলা ফুলে ঢাক হয়েছিল বাঁশের দোলা বেঁধে সাধন কান্দোরী মাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল।’

‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে সাধনের মা জটি ঠাকুরাণী পাখমারাদের মেয়ে হাসপাতালের বেডে গুয়ে ছিলেন। সংস্কারাচ্ছন্ন অশিক্ষিত জটি হাসপাতালে থাকতে চায়নি তার বিশ্বাস এখানে এলে কোনো রোগী বাঁচেনা তাইসে পুত্র সাধনকে বলেছিল বাড়ী নিয়ে যেতে। গল্পটির শেষে জটি ঠাকুরাণীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ রয়েছে। লেখিকার বর্ণনায় সমাপ্তি অংশে সাধনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও সার্থকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে -

মায়ের কথা মনে করতে গিয়ে পুরুতের ওপর দুর্ব্যবহারের অনুতাপে সাধনের চোখ

জলে ভেসে গেল। মা, তুমি যেমন - তেমন করে স্বর্গে যাও। সাধন এখন ভাত রন্ধে যাবে। তুমি দোষ নিও না।”

‘রোম্থা’ গল্পের শুরুতে লেখিকা গল্পের পটভূমি সৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য উল্লেখ করে রোম্থা শরণের পলায়নের দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে -

“হেমন্তের অপরাহ্ন। এমন অপরাহ্নে ভাগীরথীর দুইকূল পাকাধানের গন্ধে মত্ত, সুরভিত। চারিদিকে শুধু অব্যাহত ধানক্ষেত, মাচায় বসে চাষির ছেলে পাখি ও হরিণ তাড়ায়। গাছের পাতা স্বর্ণাভ, উজ্জ্বল। বিচিত্র বর্ণ প্রজাপতি ও পতঙ্গ পাখার শব্দে বাতাস মঞ্জুরিত করে। ধানকাটা এখনও শুরু হয়নি। শস্যক্ষেত্রে মনে হয় কোনো সুখশয্যা, সেখানে কোনো সুলক্ষণা গৃহস্থবধু, পূর্ণগর্ভা, আলস্যে, আবেশে, মত্ত প্রতীক্ষায় দেহ বিছিয়ে রেখেছে। এমন হেমন্তে মানুষের মন শান্ত থাকে, চাষিও ধানের গোলা ও অঙ্গন নিকোয়, অচিরে সেখানে নবান্নের আয়োজন হবে। সকলেই ঘরে ঘরে কাঁচা পাকা ধানের গুচ্ছ বেণীর মতো বিনিয়ে ধানের নৌতি বাঁধে। এমন নৌতি ছাড়া নবান্নের পূজা সম্পূর্ণ হবে না। এমন হেমন্তে প্রবাসী বেনের মন গ্রামের জন্য ব্যাকুল হয়, যারা কাজের জন্য রাজধানী গৌড়ে থাকে তারাও বেনে ব্যাপারীর কাছে গৃহে সংবাদ পাঠায়। পাকাধানের এ মৌসুমের মধ্যে কোথায় যেন একটি শান্ত ভাব আছে, যা মনকে শান্ত করে। কিন্তু এমনই এক হেমন্তের অপরাহ্নে মনানন্দী গ্রামের কবিরাজ চন্দ্রসেনের রোম্থা শরণ, তার রক্ষী গর্গের মাথায় লোহার শেকল মেরে গ্রাম ছেড়ে পালাল।”

হেমন্তের অপরাহ্নের পাকাধানের গুচ্ছ মৃদুমন্দ বাতাস স্বনির্ভর উজ্জ্বল গাছের পাতা প্রভৃতি বর্ণনার যে শান্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে এমনি সময়ে শরণ রক্ষী গর্গের মাথায় লোহার শেকল দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে গেল। বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে আটশ পৃষ্ঠাব্যাপি গল্পের কাহিনী বিস্তার লাভ করে গল্প সমাপ্তিতে শরণের মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনায় লেখিকা পাঠকের সহানুভূতি অর্জন করতে পেরেছেন। পরিসমাপ্তি অংশে লেখিকা শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে —

“হা ভগবান! দু-দুটো প্রাণ নিলাম, তবু পালাতে দিলেনা।’ রোম্থার আত্ননাদ সব কোলাহল ভেদ করে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। ‘তবু তোদের হাতে মরব না’ শরণ ঝপ করে জলে পড়ে। উন্মত্ত জনতা ঝপাঝপ করে তার মাথার ওপর দাঁড় ও লাঠি মারতে থাকে। জল ক্রমে লাল হয়ে ওঠে। তারপর লালটা ছড়িয়ে পড়ে ক্রমশ অনেকখানি জায়গা ভরে ফেলে। একে একে সব মানুষ জল ছেড়ে উঠে পড়ে ও গ্রামের দিকে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে আর কেউ থাকে না। নদীতীর নির্জন। জল নির্মল। নৌকাটা শুধু অল্প জলে গোল হয়ে ঘোরে। যেন যেখানে শরণ পড়েছে সেই জলটুকুতে কে নৌকাটিকে ধরে রেখেছে, তাই ঐ জায়গাটুকু ছেড়ে নৌকাটি সরতে পারেনা।”

বাংলা সাহিত্যের এক বিখ্যাত প্রতিবাদী গল্প ‘দ্রৌপদী’-র প্রারম্ভিক অংশটি কতটা শিল্প সম্মত তা তুলে ধরা যেতে পারে-

“নাম দোপদি মেঝেন, বয়স সাতাশ, স্বামী দুলন মাঝি (নিহত), নিবাস চেরাখান, থানা বাঁকড়াঝাড়, কাঁধে ক্ষতচিহ্ন (দোপদি গুলি খেয়েছিল), জীবিত বা মৃত সন্ধান দিতে পারলে এবং জীবিত হলে গ্রেপ্তারে সহায়তায় একশত টাকা.....”

ফেরার, দোপদিও দুলন মেঝেনকে পুলিশ ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার পরিচয়, দৈহিক বর্ণনা কতটা নৈপুণ্যের সঙ্গে লেখিকা তুলে ধরেছেন গল্পের শুরুতে আমরা তার পরিচয় পাই। গল্প শেষে আমরা দেখি দোপদি ধর্ষিতা হয়েছেন তার যোনিদ্বারে রক্তস্রাব, স্তনদুটি কামড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে, বৃন্ত ছিন্ন ভিন্ন, ছ’সাতজন সেনা-সেনানায়কের নির্দেশানুসারে ইজ্জত নষ্ট করেছে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে দোপদির লজ্জায় ঘৃণায় নিজের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দোপদি খুলে ফেলেছে তার শাড়ি। সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দোপদি সেনানায়কের সাদা বুশ ও শার্টে রক্তমাখা থুঁথু ফেলে তাকে অপমান করেছে এবং এরপর দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে সেনানায়কের মনে তখন ভয়ের সঞ্চার ঘটে। লেখিকার বর্ণনা :-

“চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুঁতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশশার্টটি বেছে নেয় এবং সেখানে থুঁতু ফেলে বলে, হেথা কেও পীরুষ নাই যে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিবা না। আর কী করবি ? লেঃ কাঁউটারট কর -?”

দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং এই প্রথম সেনানায়ক নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান। ভীষণ ভয়।”

গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখিকা বিভিন্ন রীতিকে বেছে নিয়েছেন। তাঁর চরিত্রপ্রধান গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘হীরামতি’, ‘রাবণ’, ‘পুতুলদিদি’, ‘মমতাময়’, ‘স্বাতীচৌধুরী’, ‘উর্বশী ও জনি’, ‘গিরিবালা’, ‘যশোমতী’, ‘যমুনাবতীর মা’, ‘অনন্ত খাটুয়া : এইচ. এম., ‘অনসূয়া’, ‘চিনু’, ‘যশবন্তী’, ‘পদ্মিনী’, ‘চম্পা’, ‘কানু’, ‘অর্জুন’, ‘সমাজবাদ ববুয়া’, ‘দ্রৌপদী’, ‘অপারেশান? বসাই টুডু’, ‘শনিচরী’, ‘হরিরাম মাহাতো’, ‘হারুণ সালেমের মাসি’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিষয়ভিত্তিক গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন - ‘এজাহার’, ‘মায়েরমূর্তি’, ‘দেওয়ান খইমালা ও ঠাকুরটির কাহিনী’, ‘সতীরাণীর ঘাট’, ‘পরমাআত্মীয়’, ‘প্রতারক’, ‘ঋণ’, ‘বন্ধু -বিচ্ছেদ’, ‘স্তনদায়িনী’, ‘সন্দেশ’ ‘বিশালাক্ষীর ঘর’, ‘নিষাত মাঝির ভুটান যাত্রা’, ‘পায়রা’, ‘খবর’, ‘হাতির পা’, ‘জ্যামিতিক’, ‘ভৌগোলিক’, ‘দাম্পত্য’, ‘আত্মজা’, ওভারব্রীজে রাত’, ‘কালবৈশাখী’, ‘নিখোঁজ’, ‘ছুরি’, ‘ছোঁয়াচে’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘দূরদর্শন’, ‘জন্মতিথি’ ‘রাফস’ প্রভৃতি।

ব্যঙ্গনাধর্মী গল্পের নামকরণগুলি যথাক্রমে ‘প্রেতোৎসব’, ‘ইটের পরে ইট’, ‘রোম্থা’, ‘চিন্তা’, শুধুপটে লিখা’, ‘জলে ঢেউ দিওনা’, ‘মরাচিঠি’, ‘অহিংস’, ‘ভরসা’, ‘জগন্নাথের রথ’, ‘ভাতুয়া’,

‘ফারকাটি’, ‘চক্রব্যূহ’, ‘জলসত্র’, ‘বাঘের থাবা’, ‘পিভদান’, ‘অগস্তি সাহেবের কুঠি’, ‘রাস’, ‘পর্বত’, ‘সমান্তরাল’, ‘পূর্বাভাস’, ‘ত্রিভুজ’, ‘দাহ’, ‘তৃষ্ণা’, ‘বিস্মরণী’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

‘জন্মতিথি’, ‘রাক্ষস’, ‘জাতুধান ও বাণ’, গল্পগুলিতে খিদের কথা বিচিত্রভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাক্ষস অর্থে ‘জাতুধান’, গল্পের নামকরণ করা হয়েছে। অপরিমিত খেত বলে ভবতারণ বাবুকে রাক্ষস নামে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ‘রুদালী’, ‘শনিচরী’ শনিবারে জন্মেছিল বলে ‘শনিচরী’ গল্পের নামকরণ করা হয়েছে। ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পের নামকরণটিও শিল্পসমৃদ্ধ। সাঁঝ ও সকালে সাধনের মা ডাক শুনে পরিতৃপ্ত হতো। জটির মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের জন্য পুরোহিতকে দেওয়া চালগুলি কেড়ে নিয়ে সাধন ভাত রন্ধে খেয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নকে খুঁজে পেয়েছিল।

‘রোম্থা’ গল্পের নামকরণটিও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাণদন্ডে দন্ডিত বন্দিকে জীবন্ত অবস্থায় কড়াইতে গরম তেলে সিদ্ধ করে তৈরী করা হতো হত পৌরুষ উদ্ধারের ঔষধ। এইভাবে মৃত্যু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে বলা হতো রোম্থা। সভ্য মানুষের সুপরিকল্পিত নিষ্ঠুরতার গল্প ‘রোম্থা’।

‘স্তনদায়িনী’ গল্পের নামকরণটিও সার্থক। এই গল্পের নামকরণ প্রসঙ্গে ডঃ ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী লিখেছেন - “স্তনদায়িনী একাধারে এক নারীর কাহিনী যে সমৃদ্ধে বহুল ব্যবহৃত রিক্ততায় নিগৃহীত এবং প্রতিকার্তে ভারতবর্ষের কাহিনী যে দেশের অমিত ঐশ্বর্য ব্যবহার করে, লোলুপ জিহ্বায় শুষে নিয়ে তাকে ধ্বংসের শেষপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে ঘৃণ্য রাজনীতিকেরা এবং নির্বোধ স্বার্থপর জনগণ।” ১০

‘কানাইবৈরাগীর মা’, ‘জলসত্র’, ‘জল’, ‘পিভদান’ প্রভৃতি গল্পের নামকরণ করা হয়েছে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার প্রতি খিঁকার জানিয়ে। শরীরের স্বাভাবিক সুস্থতা মানুষের খাদ্য রুচির প্রয়োজনে হাতির জন্য রেখে দেওয়া মাটি মেশানো নুন সংগ্রহ করতে গিয়ে দল ছাড়া এক হাতির পদদলিত হয়ে তিন আদিবাসীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ‘নুন’ গল্পের নামকরণ হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী অভিজ্ঞতার শিল্পী। বিভিন্ন চরিত্রের মুখে তিনি যে সংলাপ গুলি ব্যবহার করেছেন তা স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী। সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, শিক্ষার আলো থেকে যারা অনেকটা বঞ্চিত তাদের মুখের ভাষা লেখিকা স্বাভাবিক ভাবেই উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর গল্পে শবরের ভাষা স্থান পেয়েছে —

শবরের ভাষা - “জল দিছে বটেক আকাশ! এমন জল্যে যাবি যা কুথাকর লদীতে হড়পা ডাক্যে ? হাসাক্ বল্ হাসি জানায়ো দিভ্য।”

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মৌখিক বচন - “আমাদের কাজটি নক্কী কাজ। লেডি ডাগদার সে কারণেই হোক আমারে সে কী চক্কে দেখল। বাদিনে একবচর হলে, সে বলল, তুমি বাচা তোমার মত কটা মেয়ে নে এসো। এই রকুম গেরস্ত ভাব হবে, দয়ামায়া থাগবে। এ তো সরকারি হাসপাতাল নয় যে সগোবার নাম লিকে ঢুকে গেলে তো ইউনাইন কল্লে, আর সরায় কার সাদ্যি?”

হিন্দিভাষী জঙ্গল অফিসারের সংলাপ, ‘কুটকাটি ফরেস্ না হয়। এক সাগোয়ান খতম, এক আদমি খতম। কা শসী, শুনা হ?’

পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু মানুষের সংলাপ - “ঘরের বাসন তেজস তো দেখত্যাছি, ঠাইকরেনের ঘরেও চোর পড়ে না, আমার ঘরেও না। অহন তো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানায়ও কইতরের খাঁচা। আমি কাম পাইনা। ঘর আমি লৈতন কইরা দিমু। পাকা খুঁটা দিছিলাম। দুখান পালটাইতে হইব।”

পালামৌবাসী বানিয়ার উক্তি - “কংগ্রেস কো মদত দিয়েছি, যখন যে সরকার চালায় তাকে মদত না দিলে আমার মতো গরিব গৈয়ো বেনে বাঁচে না। আপনারা বললেন, আমি বেঠবেগারি বন্ধ করে দিলাম ফসলে হকও ছেড়ে দিলাম।তবে এখন যা বলছেন, তা করি কী করে ? যে চিজে নাফা নেই, তা বেচতে বললে জবরদস্তি হয়ে যায়।”

‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে জটির পুত্র সাধনের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে —

“মাথা আখব, মা বলে ডাকব, তা বাদে কত অঙ্গ করব মোরা। উয়ার দিনমানে ভক্তজন আছে। কিন্তু এতের বেলা আমি বিনা উয়ার ক্যান্ড নাই।”

‘জগন্নাথের রথ’ গল্পেও আঞ্চলিক ভাষা লক্ষণীয়, যেমন “ভগবানের অঙ্গুনেই, জানলি বউ ? গুরু ধত্তে ধত্তে ভগবান পাওয়া যায় আর সব কিছুতে ভগবান অঙ্গুদে’ছে কিনা ? ফুলে, ফলে, সংসারের সর্বত্ত, তাই নিজের তরে উনি আর অঙ্গ রাখেনি। সব ফুইরে ফেলে নিজে উনি একাকার।”

সাংবাদিকতার কাজ করতে গিয়ে সংক্ষেপে স্পষ্টভাবে, বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আকারে সাংবাদিকতার ভাষাকে লেখিকা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন।

“হরিয়া ঘাসের আঁশ অত্যন্ত শক্ত। ছাগলে চিবোতে পারে না। বৃদ্ধরা বলোয়া দিয়ে ফলাগুলিএর ধার চেষ্টে ফেলে পাতা চিরে চাটি বানায়। আগে কেউ কিনত না হাটে। গত বছর থেকে আদিবাসী কুটির শিল্প সহায়ক সংস্থা হাট থেকে এ চাটি কেনে চার-পাঁচ টাকায় এবং আটাইয়ের লোকরা জানেনা যে ব্যাপারটিকে উক্ত সংস্থার বার্ষিক তিন লক্ষ টাকার প্রকল্প হিসেবে দেখানো হচ্ছে, সংস্থার অফিসাররা মাসে পঁচিশ হাজার টাকার বাটোয়ার পাচ্ছেন।”

ডঃ সুমিত চক্রবর্তী গল্পের বিষয়-আশয় গ্রহে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে সাংবাদিকতার লক্ষণ সম্পর্কে লিখেছেন —

‘বেহুলা’ গল্পে কালাজ সাপ সম্পর্কিত তথ্য, ‘নুন’ গল্পে মানব শরীরে নুনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত গবেষণা সিদ্ধান্ত আপাত অমানুষি ধাতব শৈলীতে বলে গেছেন মহাশ্বেতা। সেই ধাতু শানিত তরয়াল হয়ে আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বিদ্ধ করে।” ১১

মহাশ্বেতার গল্পে বিদ্রূপ গর্ভ বুদ্ধি প্রদীপ্ত বাচন রীতিতে সিদ্ধ হস্ত। তিনি ‘স্তনদায়িনী’ গল্পে এদেশের দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন —

“যশোদার এই স্বামীর প্রতি বৎসল ভাবটির কথা জগনীমুনিরা লিখে যাননি। তাঁরা প্রকৃতি ও পুরুষ এইভাবে নারীপুরুষকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সে তাঁরা করেছেন আদি যুগে যখন অন্যদেশ থেকে তারা এই পেনিনসুলায় প্রবেশ করলেন। ভারতের মাটির গুণ এমনি, যে এখানে রমণীরা সবাই জননী হয়ে যায় এবং পুরুষরা সবাই গোপাল ভাবে আপ্ত থাকে। সকল পুরুষই গোপাল ও সকল রমণী নন্দরানী, এ ভাবটি যারা অস্বীকার করে নানারূপ ‘ইটার্নাল শী’ ‘মোনালিসা’ - ‘লা পাসিও বারিয়া’ - ‘সিমন দ্য ব্যোভোআর’ ইত্যাদি পছন্দমতো কারেন্ট পোস্টার পুরানো পোস্টারের ওপর সাঁটতে চান ও মেয়েদের সেভাবে দেখতে চান, তাঁরাও এভারতের ছানাপোনা। তাই দেখা যায়, শিক্ষিত বাবুদের এ সকল অভীপ্সা বাইরের মেয়েছেলেদের জন্যে।”

মহাশ্বেতা দেবী ভারতীয় নারীর সীতা - সাবিত্রী মার্কা সতীত্বকেও ব্যঙ্গ করেছেন। বলেছেন —

“যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে রমণীর যুক্তি, বুদ্ধি বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তান প্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা, সতী-সাবিত্রী-সীতা থেকে গুরু করে নিরুপা রায় ও চাঁদ ওসমানি পর্যন্ত সকল ভারতীয় নারী জনমানসে জাগিয়ে রেখেছেন। এহেন জীলোককে দেখেই সংসারের ন্যালা - মাকড়সা বোঝে, ভারতের সেই ঐতিহ্য প্রবহমান।”

শিক্ষিত লোকের পাশাপাশি অল্পশিক্ষিত ও নিরক্ষরেরাও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার করছে। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত - পুলিশ, ফ্যামিলি পাবলিক, পোটেকশান, ফাংসন, কালচার, লাইন, লিভার, কমিশন, পার্টি, হেভি, অর্ডার রেট, মর্গ, সাট্রিফিকেট, অপারেশন।

মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পে ছড়া, গান, প্রবাদ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি গল্পের প্রয়োজনেই এগুলি ব্যবহার করেছেন। ‘বেহুলা’ গল্পে সাপের বিষ নামাতে গিয়ে শ্রীপদ ওঝা বিষহরির মন্ত্র সুর করে উচ্চারণ করেছেন —

“মা মনসা দোহাই দিলেন শঙ্কর পিতার।

বিষ গিয়ে শঙ্করের হল কঠহার।

জয় জয় শুভঙ্কর শঙ্করের দোহাই।”

‘গুরু’ গল্পে আমরা খুঁজে পাই সর্পদেবী মা মনসার স্তুতি —

“কে বলে এটা ইন্দ্রের ঐরাবত।

কামরূপী বারণ হয় কত মত।।

ডাকিনী পাড়াতে ছিল তাদের বাহন।

তাদের বাহন আমার বাহন এখন।।

চল বলতে নল চলে কামিখ্যার বরে।

এক পল বিলম্ব না কর, চল শীগগির করে।

দোহাই মা কামিখ্যার বরে।।”

‘জল’ গল্পের দু’টি ছড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোকেদের মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। ছড়া দু’টি যথাক্রমে -

“হেই লক্ষা! যেই লক্ষা !

মারে ঢিবা, ভারে ঢিবা !”

“শঙ্কনী চিত্রানী লাগে মায়ের কাঁচলা

চিতিবোড়া লাগে রবচ মায়ের আঁচলা

কাজলিয়া লাগে মায়ের লয়ানে কাজল

পাতুড়িয়া লাগে মাতা পায়ে পরে মল - ”

‘কুড়োনির বেটা’ গল্পে আমরা লোখা মেয়েদের মুখে ছড়া শুনতে পাই —

“পাহাড়ে পর্বতে যামু আলু-তুঙ্গা খামু

সাহার দেখমী খত্তা - কোদাল তাহার সঙ্গে যামু।”

“কাগাবগা গীতিকা’ নামক ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত প্রৌঢ়া গৃহিণীর ভাষা -

‘কাগাবগারে কই’, ‘আশ কেলে বাস কথা’- ”

‘জগমোহনের মৃত্যু’ গল্পে পালামৌ জেলার অন্ত্যজদের মধ্যে (হয়তো ব্রাহ্মণদের মধ্যে -ও) প্রচলিত মর্যাস্তিক প্রবাদ - ‘ব্রাহ্মণ যব ভি দ্রষ্ট / তিনো ভুবনমে শ্রেষ্ঠ/ ব্রাহ্মণ যব ভি নষ্ট / তিনো ভুবনমে শ্রেষ্ঠ।’

নিম্নে আরোও কয়েকটি ছড়ার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :-

১) “ওরে আমার ময়না
ইদিক পানে আয়না
গড়িয়ে দেব গয়না !”

২) “মেয়ের নাম ফেলি
যমকে দিলে -ও গেলি
জামাইকে দিলেও গেলি।”

‘বন্ধুবিক্ষেদ’ গল্পের দু’টি প্রবাদ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে -

ক) “ক্যাকড়া আনিতেছ নিত্য।
দেখিলেই জ্বলে ওঠে পিত্ত।।”

খ) “কে আর খাবে বেগুন।
বাগানে লাগান সেগুন।।”

গ) “চুঁচুড়ার মণি ঘোষ

সদা করে ফোঁস ফোঁস
গছাইল দুহিতারে
বাগাল ডেপুটি
তারপর দাপাদাপি
ওরে ও কুচুটি?”

কীর্তন গানের -ও দৃষ্টান্ত মেলে তাঁর গল্পে। যেমন —

১) “গৌর প্রেম রসার্গবে
যে জন ডুবে ডুবে মরে
সে জানে অমৃত স্বাদয়ে কেমন।”

অপর একটি দৃষ্টান্ত —

“জলে ঢেউ দিওনা গো রাধা কিশোরী।’

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের প্রবাদ বাক্যগুলিও চিরকালীন আবেদন সৃষ্টি করেছে —

‘সুখের দিন পলকে যায়। দুঃখের দিন সত্ত্বর কাটতে চায়না।’
‘ভিথিরির ভালো করতে নেই।’
‘ছেলের মা সাবোধান।’
‘ইঁদুর খেগো ঢ্যামনা সাপের মতো রক্ত ঘুমায়া।’
‘একথার কোন উত্তর নাই। ভূতে তাড়ায় আমাকে।’
‘জাতিগত ঐক্য ভেঙোনা।’
‘বিচ্ছিন্নতাবাদ ঐক্যের অন্তরায়।’

‘রূপের বর্ণনা’ গল্পের একটি পরিচিত বিষয়। লেখিকা গল্পের ফাঁকে ফাঁকে রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। বিনুর বোনের বর্ণনাটি লেখিকার কলমে জীবন্তভাবে ধরা পড়েছে : —

“রানী খেতের মল-এ ফ্রক কুয়াশাঢাকা সকালে বিনু আবার বোনটিকে খুঁজে পেল।
ভীষণ দরদস্তুর করে পেঁপে কিনছিল বোনটি, হাতে একটা বেতের ব্যাগ। কালো কোটের কলার একটু
তোলা পায়ে জুতো, মেয়েটিকে ভীষণ চেনাচেনা মনে হচ্ছিল।”

চোখের বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা নিম্নলিখিত ভাবে : -

‘পটলের মতো চোখ যার তার নাম পটলাক্ষ হবে না তো কী হবে মশায় ?’

মৃত্যু চিত্র অঙ্কনে লেখিকা সফলতার পরিচয় দিয়েছেন : -

“অসম্ভব স্বাস্থ্য মণিলার লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফিট। আত্মহত্যা করব, আত্মহত্যা করব
বলে ও রীতিমতো দাপাচ্ছিল। এই চৌকো নিখুঁত পরিষ্কার জ্যামিতিক ঘরের ভেতর মণিলা পরে

আছে ! লম্বাটে পা হয়তো সবুজ টালিতে, খুঁকিভরা শ্যাম্পু-করা মাথা হয়তো লাল টালিতে, হয়তো হলুদ টালিতে মণিমালার বগলের গন্ধ।”

বিলাসবাবুর বাড়ির বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা নিম্নলিখিতভাবে :—

‘পাচখানা গ্রামের মধ্যে-বিলাসবাবুর বাড়ির ভিত উঁচু। বাড়িটা দোতলা বাড়ির উঠানে ধানের মরাই। বাইরে দু-খানা বাস দাঁড়বার জায়গা। বিলাসবাবুর বাস।’

সর্পদংশনে মৃত্যুর চিত্রকল্প বর্ণনায় লেখিকা শিল্পসিদ্ধির স্তরে পৌঁছেছেন। ‘বারো মিলিগ্রামের বেশি গোখরোর বিষ, পনেরো মিলিগ্রামের বেশি চন্দ্রবোড়ার বিষ, ছয় মিলিগ্রামের বেশি কালাজের বিষ শরীরে ছড়িয়ে পড়ল স্নেক ভেনম অ্যান্টিসিরাম বিফল হবে, চন্দ্রবোড়ার ক্ষেত্রে শরীরের রক্তে লালকণিকা ভেঙে যায়, নাক-মুখ-মূত্র ও গুহ্যদ্বারে রক্তস্রাব হয় তাৎক্ষণিক মৃত্যু। করুণাময়। নয় মাংস গলে-খসে-অসহমৃত্যু। গোখরো ও কালাজের বিষ নিউরোটকসিন। স্নায়ু অবশ-অবশ, পেশী সংকোচন, লালানিষ্ক্রমণ, ঘুম-ঘুম ভাব, শ্বাস কমে আসা, মৃত্যু।

চিত্রকল্প বর্ণনায় মহাশ্বেতাদেবী যে কতটা সিদ্ধ হস্ত তার দু-একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হল —
সাধনের দৈহিক গঠনের বর্ণনার মধ্যে রয়েছে চিত্রকল্প,

“মোষের মতো শরীরে ওর পাকস্থলী ছাড়া আর কিছু নেই। ফুসফুস রক্ত জবার পাপড়ির মতো হৃদযন্ত্র, সাপের মতো পিচ্ছিল নাড়ী, ভোরের দোপাটির মতো কুসুম কোমল জিভকোষ, কিছু নেই ওর শরীরে। শুধু একটা পাকস্থলী আছে আর আছে খিদে।”

বলরামের চরিত্র বর্ণনার ক্ষেত্রেও রয়েছে লেখিকার সচেতন দৃষ্টি। যেমন - এদু’টি উদাহরণে ক্ষ্যাপা মোষের মতো এবং ধলেশ্বরীর শীতলতা ও ধান ক্ষেতের শ্যামালিমা চিত্রকল্প গুলি ব্যবহারের সরলতা ও প্রয়োগ তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সবশেষে ‘সাঁঝ সকালের মা’ গল্পে মৃত্যু পথযাত্রী জটি ঠাকুরানীর বর্ণনা করতে গিয়ে মহাশ্বেতা লিখেছেন —

“তক্তপোষে টকটকে লালরঙের ময়লা চেলী পরে জটি ঠাকুরানী রূপকথার রাক্ষসীর মতো চিৎ হয়ে পড়েছিল, পেট ফুলে উঁচু, হাত-পা চিতিয়ে ফেলে রাখা। জটি ঠাকুরানীর চোখে শুধু আশ্চর্য অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি ছিল।”

লেখিকার গল্পে কাব্যগুণেরও অভাব নেই। প্রেম, সৌন্দর্য বা রূপময় প্রকৃতির বর্ণনা কাব্যধর্মী - ‘রোম্‌থা’, গল্প থেকে এরূপ একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে দেওয়া হল :-

“চন্দ্রাবলীকে রত্নদ্যুতিখচিত এক আশ্চর্য অংশুক শাড়িতে, বনযুথীর মতো স্নিগ্ধ দ্যুতি মুক্তার কর্ণাঙ্গুরি, কণ্ঠহার, বালা ও মেখলা, চন্দন, কুঙ্কুম ও অগুরুতে সাজাতে সাজাতেই শরণ তার গলা টিপে ধরেছিল।”

‘গণপতি কোটাল’ ও ‘ভারতবর্ষ’ ছোটগল্প থেকে-ও যথাক্রমে দু’টি কাব্যধর্মী দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

“দুজনেই বৃষ্টিপাত দেখে। তারা যেখানে বসে থাকে, তার সামনে অনতিদূরে মহাবরষার রাঙা জলে ফেনিল কোটাল।”

“পরিদর্শক এসে নীল জল, তাতে পাহাড়ের ছায়া, চলন্ত পাথরের মতো কিছু আদিম মানুষ এবং পাথুরে জমি দেখে অফসর লোগের মনে প্রথমত প্রকৃতির এই আদিম রূপ দেখে মনের অতলে কোথাও বিপন্ন বোধ হয়। এইজল, এই পাহাড়, দূর পশ্চিম পাড়ে সঞ্চরমান একটি হরিণ, যে মানুষ দেখে ছুটি পালায় না, এসব যেন অপার ঔদ্ধত্যে বলে দিচ্ছে, হাটবাহার হয়ে যাও। তোমরা কারা বহিরাগত ?”

নবনীতা দেবসেন বাংলা সাহিত্যের অতিপরিচিত গল্পকার। তিনি নানা আগ্নিকের ও নানাস্বাদের গল্প রচনা করেছেন। তাঁর গল্পগুলির আয়তন কোনটি বড়, কোনটি মাঝারি, কোনটি অণুগল্প। হাসি, কান্না, ব্যথা-বেদনার মিশ্রিত বহু ছোটগল্প রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন। অভিজ্ঞতার শিল্পী নবনীতা দেবসেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইংল্যান্ড, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রভৃতি স্থানে শিক্ষা সূত্রে অবস্থান করে পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে অত্যাধুনিক ছোটগল্প রচনায় তিনি ব্রতী হয়েছেন।

তাঁর ‘অজাচার’ গল্পটি পনের পৃষ্ঠার, ‘পত্রোত্তর’ গল্পের আয়তন পাঁচ পৃষ্ঠার। ‘খগেনবাবুর পৃথিবী’ একটি দীর্ঘগল্প। উনিশ পৃষ্ঠা ধরে এই গল্পটি লেখা। ‘বামন-মুচি-রাজা’ গল্পটি সাতপৃষ্ঠায় সমাপ্ত করেছেন, ‘চোরচোর’ গল্পটি আকারে ছোট। এর আয়তন পাঁচ পৃষ্ঠা। ‘দি নেস্ট’ গল্পটি সমাপ্ত করেছেন চার পৃষ্ঠায়, ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ’ চার পৃষ্ঠায় লেখা।

লেখিকার গল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ‘পত্রোত্তর’ গল্পটি নাটকীয়ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে। গল্পের প্রারম্ভিক অংশটি নিম্নে প্রদত্ত হল :-

“সোমদেব চক্রবর্তী লিখছিলেন। উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন। কবিতাটি অসমাপ্ত রইলো, এবং মনটা বিক্ষিপ্ত।

‘কবি সোমদেব চক্রবর্তী আছেন?’

‘কথা বলছি।’

‘আমি চন্দ্রশেখর সান্যাল। চিনতে পেরেছেন তো ?

‘সোমদেব একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন

নামটা কোথায় শুনেছেন। চন্দ্রশেখর... চন্দ্রশেখর... মনে করতে পারলেন না ?

‘চন্দ্রশেখর সান্যাল বলছি। চিনতে পারলেন না।’

‘ক্ষণপ্রভা’ গল্পের শুরুতেও রয়েছে নাট্য ব্যঞ্জনা। যেমন - “তিনশো ইউনিট-বাস। এক পা বেশি এগিয়েছে কি আর দেখতে হবে না। এক মাস অন্ধকার। পেনালটি। বুঝলে গিনি ? তিনশো ইউনিটের বেশি হলেই কেটেদেবে লাইন।’ বিনোদবারু কাগজখানা গিনির নাকের ডগায় নাড়তে নাড়তে বললেন। মালতী মন দিয়ে কুটনো কুটতেই থাকেন।

— ‘শুনচো ফ্যানঘুরিয়ে কুটনো কোটা চলবে না।’ বিনোদ সুইচ অফ করে দিলেন।”

‘মেজদির কেচ্ছা’ গল্পের সমাপ্তি অংশে বাক্য দু’টি তীব্র গতি সম্পন্ন। শেষের বাক্যটিতে ব্যঞ্জনায় পরিণতির ঘা দেয়, তখনি পাঠকের মনে একই সঙ্গে বিষন্ন অনুভূতির সঞ্চার ঘটিয়। যেমন —

“বলি, আনবেটা কে ? মিছিমিছি থান-কাপড়ের গুলগপ্পো শুনিয়ে গোপালঠাকুরকে ঠকানোর কেউ ছিল না যে!”

‘ভরতকথা’ গল্পের শেষে এক আনন্দঘন পরিবেশ দেখানো হয়েছে। এই পরিবেশ বর্ণনায় নবনীতা দেবসেন শিল্পরূপের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন —

“প্রদীপ গুইন। এই প্রত্যহের চাকরির রক্ষ পৃথিবী ওর জন্য নয়। ওর জন্য ফুল, কবিতা, ঝর্ণার অবসর। ঠিকই হয়েছে। ও এখন ফুল, কবিতা, ঝর্ণাধারার অনিশেষ ছুটির চাকরি পেয়ে গিয়েছে। আমরা কেউ ওকে বিরক্ত করতে পারব না। শিবু শত চেষ্টাতেও ওকে ঠকাতে পারবে না।

আজ সন্ধ্যায় সে ভরত। হাওড়া আজ অযোধ্যাপুরী।”

নবনীতা দেবসেন গল্পের নাম ব্যবহারে বেশিরভাগ ব্যঞ্জনধর্মী ও বিষয়কেন্দ্রিকতার আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁর বিষয়কেন্দ্রিক গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘ইয়াং সায়েবের গাড়ী’, ‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’, ‘চাঁদ গড়ার কারিগর’, ‘মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর’, ‘হারানো প্রাপ্তি’ - নিরুদ্দেশ’, ‘দেশে যাওয়া’, ‘ছোটবারুর জমিদারী পরিদর্শন’ প্রভৃতি।

ব্যঞ্জনধর্মী নামকরণ গুলি যথাক্রমে ‘দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ’, ‘ভরতকথা’, ‘পত্রোত্তর’, ‘স্বপ্নের মতো’, ‘ক্ষণপ্রভা’, ‘অজাচার’ নোরার বাড়ি’, প্রভৃতি।

চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ‘গুণিয়াভাই’, ‘গুণিয়াকাকিমার গল্প’, ‘মেজদির গল্প’, ‘বামুন-মুচি-রাজা’, ‘খগেন বাবুর পৃথিবী’ ও ‘বনলতার পুষিয়া’

গল্পের উপযোগী প্লট রচনায় লেখিকা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর গল্পের প্লট শিথিল নয় সুসংবদ্ধ। পাশাপাশি গল্পের চরিত্র সৃষ্টিতে সূক্ষ্ম নিবিড় শিল্পের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে। ‘মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর’ গল্পের রাণী, ছোটকন্যা, বড়কন্যা চরিত্রগুলি সার্থক। কানাই চরিত্রটি অত্যন্ত

সহানুভূতি নিয়ে লেখিকা রচনা করেছেন।

আলোচ্য গল্পের মধ্যে একটি বিশেষত্ব হল নিশ্চাণ মোপেটের মধ্যেও মানবিক চেতনা রোপিত হয়েছে।

‘অজাচার’ গল্পের দাদামণি, দুইনাতি টুলু-বুলু, বসন মামা চরিত্রগুলি জীবন্ত। ‘বনলতার পুষি’ গল্পের বনলতার প্রকৃতি ও পশুপ্রীতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইন্দ্রনীল বুদ্ধিমান ও সুসংস্কৃত চরিত্র। কবি মানবেন্দ্র চরিত্রের সংগীত প্রীতি এবং স্বর্ণলতার ভীরু, লাজুক প্রেমের উদভাস গল্পটিকে অনন্যতা দান করেছে। ‘চাঁদগড়ার কারিগর’ গল্পের নবনীতা একটি রুচিশীল নারী চরিত্র।

‘ক্ষণপ্রভা’ গল্পের বিনুর সৌজন্যবোধ এবং বিনোদবাবু শুচিবায়ুগ্রস্ততা এবং কিশোরী মালতীর সহজ সরল চিত্তবৃত্তি পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়।

‘প্রেমচাঁদিনী’ গল্পে সোম্য চরিত্রের সাহিত্যপ্রীতি এবং ডঃ কঙ্করের অতিরঞ্জন করে কথা বলার বিষয়টি একান্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’ গল্পে চিনু ও গণেশ চরিত্রদ্বয় যতটা আন্তরিক তুলনামূলকভাবে জ্যাঠামশাই অনেকটাই সঙ্কীর্ণচেতা।

গল্পের শিল্পরূপ বিচারের ক্ষেত্রে বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশে থাকে বাহুল্য বর্জিত কথা। নবনীতা দেবসেন গল্পের সংক্ষিপ্ততা ও একমুখীন গতি ছোটগল্পে সঞ্চার করেছেন।

‘দেশে যাওয়া’ গল্প থেকে বর্ণনা অংশের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো -

“ভাগ্নে বেচারার বয়েস হয়েছে, মামীর চেয়ে বড়ই হবে, বিয়ে-থা করেনি, শ্যামবাজারের এঁদো গলিতে তার মন টেকে না।

বিশাল বাড়ি-হোক না সাতপুরুষের ভিটে, ভাড়াটে গিজগিজ করছে। মামা-মামী এলে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায় প্রত্যেক বছর। আইসক্রীম খাইয়ে আনে কোয়ালিটিতে। অথচ একটা পয়সাও দিল না।”

ভাষার পরিমিতি বোধ যেমন বর্ণনা অংশে পরিলক্ষিত হয় নবনীতা দেবসেন ঠিক তেমনি সংলাপ অংশে-ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন। ‘বঁ ভোয়াইজ’ গল্পের সংলাপ অংশে মাঝেমাঝে ইংরেজী ভাষার-ও সার্থক ব্যবহার করেছেন লেখিকা যেমন - “ভোর ছ’টার সময়ে ও বাড়ি থেকে বড়কার ফোন এল।

- ‘খুকু, I am dying. I may die any minute.’

- ‘কেন বড়কা ? কী হয়েছে তোমার ?’

- I am ninety three. আমার কাছে কেউ নেই। Nobody home - কেউ বাড়িতে নেই - I am alone.’

- সেকি বড়কা ? মার্সা ছিল যে ? সে কই ?

- আছে। সে আছে। সে ঘুমোচ্ছে। এদিকে আমি মরে যাচ্ছি।

I am dying.

- কি কষ্ট হচ্ছে তোমার ? আমি এক্ষুণি ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি .

- কিন্তু নার্সকে ডাকো ? ও ঘুমোবে কেন ? ডাকো, ডাকো - আমিই চীৎকার করতে থাকি। যদি এতে নার্সটি শুনতে পায় !

- ‘চৈঁচিও না। You all hurting my ears. অনেক ডেকেছি।

বকা যাচ্ছে। বলছে - ‘ডোনট ডিস্টার্ব - আমি রেস্ট নিচ্ছি’।

- ‘সে কি কথা ? তোমার ঠিক কী কষ্ট হচ্ছে বললে না তো ?

ডাক্তারকে কী বলব ?

- I’ am dying.’

- ‘ডাক্তারকে খবর দিয়েই আমি আসছি বড়কা।’

বহু গল্পে তিনি অবলীলাক্রমে ইংরেজী বাক্য ব্যবহার করেছেন।

যেমন - ‘নাট্যারম্ভ’ গল্পে

ক) “ইট্‌স দেয়ার লাইক, দে শুড ডিসাইড হাউ টু লিভ ইট।”

খ) “ওয়েলকাম টু কেমব্রিজ ফ্রম ক্যালকাটা।”

গ) “হোয়েন ইন রোম বি আ রোমান। ‘ডোনট স্পিক্‌ ইন বেঙ্গলী চেঞ্জ দ্য হ্যাভিট।”

ইত্যাদি।

নবনীতা দেবসেন পত্রীতির গল্প রচনাতেও সিদ্ধ হস্ত। যেমন - ‘বামন-মুচি-রাজা’ গল্পে অভিষেক চিঠি লিখেছে প্রিয় তমসার উদ্দেশ্যে।

‘বঁ ভোয়াইয়াজ’ গল্পটি নবনীতা দেবসেন লিখেছেন মাননীয় সম্পাদক মশাইয়ের উদ্দেশ্যে।

লেখিকা প্রাদেশিক ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর একাধিক গল্পে উড়িয়া ভাষারও দৃষ্টান্ত মেলে। যেমন -

“মা করুঁ কহিছতু ? মু বুঝি পারলানি - পুরী পান্ডা

এইঠি হব কিমিতি ?”

“বাঃ করুঁ কহিছন্তি পরা। রামশ রামঅ। জগন্নাথঅ কভু খারাপ থাকে ? ভল্ল অছি।’

‘মু ভল, মা।’

সানু বাহনটাই কিছি গরবর করিলা।”

উড়িয়া ভাষার পাশাপাশি হিন্দি ভাষার সুষম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর গল্পে। ‘চাঁদগড়ার কারিগর’ গল্পে হিন্দি বাক্যের ব্যবহার ঘটেছে সংলাপ অংশে। যেমন -

“বাস্ বাস্। উসকো ছোড়্ দিজিয়ে মাঈজী! উও বুদুসে আপকা ক্যা কাম ? ম্যে আপকো মেরী মুন্নিকো দে দুংগা। মুন্নি, মুন্নি, মুন্নিবাদ্, সবসে আছি মুন্নিবাদ্ -”

‘মুলতানী কামধেনু’ গল্পের সংলাপ অংশে হিন্দির ব্যবহার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে -

“কাকে চাই ?”

“গায় কিধার ভইল বা ? সুঁই লগালে আয়া।”

“সুঁই ?”

“হাঁ হাঁ, সুঁই। ইনজিশান। দুধকা ওয়াস্তো।”

“আপনি কি ভেটেনারি সার্জন ?”

“কেয়া ভিটিনারি ? মোর পাস ছে-ঠো ভৈস ঔর চারঠো গায়ে ভইল - মুঝকো ভিটিনারিটিরিসে কেয়া কাম ? গায়কো সুঁই লগানা হ্যায় কি নেহী ?”

ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সংলাপ অংশের জীবন্তরূপ ফুটিয়ে তুলতে নবনীতা দেবসেন গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ‘সুতানী কামধেনু’ গল্পে কামধেনুর বর্ণনা আমরা শুনি বসনমামার মুখে —

“সাইক্ষাৎ ভগবতী। কামধেনু মেজদা, কামধেনু! এইয়ার গুণের তুলনা পাইবেন না - রূপ দেইয়া ভুলব তো ইডিয়টে। বাঁট থিক্যা দুধ অবোর ধারে ঝাইরা যায়। নম্র, মধুর স্বভাব, সাইক্ষাৎ সুরভি, কামধেনী’ দুধের গাভে দুধ ভাইস্যা যায়। যাতেন মেজদি, যাতেন, জলদি সিদ্দুরডা লইয়া আইসেন, ভগবতীরে বরণ কইরা গৃহে তুলতে হয় —”

আইসো মা লক্ষ্মী, আমাগো ঘরে আইসো। দ্যাখেন মেজদি- এই লইলাম সিদ্দুর। এই লাগাইলাম কপালে।!”

‘অজাচার’ গল্পেও উপভাষার ব্যবহার রয়েছে। আঞ্চলিক উপভাষার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল :

“আমাগোর জীবনই আমাগো বাণী। আমি হেইডাই স্মরণ করাইয়া দিতাসি। রেগুলাররি ঐ ছাগদুধ খাইতেন বইল্যাই গান্ধীজী ক্যাবল কৌপিন পইরা শীতে-গ্রীষ্মে ঝাড়া আশিডা বৎসর দিব্য বাইচ্যা আছিলেন। মাথাডা ঠান্ডা রাইখ্যা ইংরাজের বিরুদ্ধে ঠান্ডা লড়াই চালাইতে পারছিলেন। ছাগদুধের সাত্ত্বিক গুণ অসামাইন্যা। প্যাট, মাথা, শরীল শীতল রাখে। এই গরম দ্যাশে যেইডা কিনা অত্যাবশ্যিক। অর্থাৎ এসেইনসিয়াল। গান্ধীজী হইলেন গিয়া হেইয়ার বেইস্ট এগজামপুল।” এই উদাহরণে আমরা দেখি ঢাকার আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দেরও সার্থক ব্যবহার ঘটেছে।

‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’ গল্পে মেসোমশায়ের মুখে আঞ্চলিক ভাষা দিয়ে চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেখিকা :

“এই যে লম্বোদর শুইন্যা যাও।” তুমিও যাও। গিয়েআ মিঠাইটা গার্ড দাও গা। এই ডিউটি তোমারে ঠিক স্যুট করবো, ভাড়ারঘরের সামনাটায় খাড়াইয়া থাকবা, হাতে একটা ছড়ি লইয়া। কেও যান্ চুরি কইরা খায় না, কুকুর-বিড়াল, কি পোলাপান — বি কেয়ারফুল, বোঝলা?”

এখানে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে ডিউটি, গার্ড, স্যুট, বি কেয়ারফুল, প্রভৃতি ইংরেজী শব্দ যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

‘স্পটলেস স্পয়েট ডিয়ার’ গল্পেও বসনমামার সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে ‘কই, গেলা কই সব ? মৃগ শিশুগ্যা কই ? মৃগশিশু আইজ আছে কেমন ? খাইতাছে কি ? এভিরিথিং অলরাইট ?’

লেখিকা কথায় কথায় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে গল্পটি রসগ্রাহী করে তুলেছেন।

নবনীতা দেবসেন তাঁর গল্পে স্থানে স্থানে কাব্যিক স্পন্দনের বৃষ্টি করেছেন রূপের বর্ণনা করে।

চাঁদ গড়ার কারিগর’ গল্পে নবনীতা রূপের বর্ণনা করেছেন নিম্নলিখিতভাবে —

“ঘন নীল কর্ভুরয়ের প্যাণ্টের ওপরে ম্যাচ করা লঙ্কৌ কুর্তা, সব চুল টেনেটুনে পিছনে উঁচু করে ঘোড়ার ল্যাজ-স্টাইলে বাঁধা। দীর্ঘ, রুক্ষ, ঘন কালো চুল। বিশাল খোঁপা হতো, বাঁধলে। যেমন চুল তেমনি চেহারা। স্বাস্থ্যবতী একটা চকচকে বাদামী ঘোড়ার মতোই জোয়ান তরতেজী কালো শরীর ; বড় বড় চঞ্চল চোখ দু’টি কৌতুকে ঝকঝক করছে, বেশ একটা মিষ্টি মিষ্টি ভাব আছে মুখময়।”

‘ধর্মভাই’ গল্পে এক খুনির বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে -

“পরনে আধময়লা ধুতি গায়ে রঙীন মোটা চাদর, পায়ের গোড়ালি ফাটা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রুক্ষ চুল। চাদরের তলায় লুকোনো ছিল ইসুয়া। মাঝ বয়েসি পুরুষ মানুষ, নখে ময়লা।” — চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই বর্ণনাটি সঙ্গতিপূর্ণ।

‘কে.পি. ন্যান্ডি ফ্রম ক্রাইস্ট চার্চ, ছোটগল্পের ন্যান্ডির রূপের বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা নিম্নরূপভাবে — “গস্তীর, গোলগাল, সোনালি ফ্রেমের চশমা, কালো কালো আল্লাদে চেহারা, টিপটপ থ্রিপিস স্যুট পরনে, তার ওপর আভার গ্রাজুয়েটেট। কালো আলখাল্লা গাউন চড়ানো। পায়ের জুতো চক্-চক্ করছে মাথায় হ্যাটি। গলায় কলেজের মাফলার।”

নবনীতা দেবসেন বিভিন্ন গল্পে একাধিকবার সঙ্গীতের ছত্র ব্যবহার করেছেন —

‘সোনার হরিণ চাই?’

‘সন্ধ্যাবেলায় কে ডেকে নেয় তারে।’

‘ও আমার গোলাপ বালা।’

“কেন যে মন ভোলে, আমার মন জানে না। / তারে মানা করে কি আমার মন মানে না।”

‘প্রথম সিঁড়ি’ গল্পের একটি গান পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে -

“যতবার আলো জ্বলাইতে চাই,

নিবে যায় বারে বারে,

আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকার।”

— গানটিতে বিরহের সুর উচ্চারিত হয়েছে।

তাঁর একাধিক গল্পে হিন্দীগানের কলি-ও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন —

“ইস ধরতী পর ঘোর অন্ধেরা।

“মুনশি, যব জগমে আয়ে

জগহমে তুম বোয়ে।

এইসা করকে চলি হো মুনশি

তুম হসে জগ রোয়ে।।”

— ‘উত্তরাধিকার’ গল্পের এই গানটিকে একটি চিরন্তন সত্য ব্যক্ত হয়েছে। পৃথিবীতে যখন কোন মহৎ ব্যক্তির আগমন ঘটে, তখন তিনি কাঁদলেও জগৎ হেসে ওঠে। তাঁর বিদায় বড়ই বেদনাদায়ক জগৎ কেঁদে ওঠে কিন্তু তিনি হাসি মুখে চলে যান।

কোন কোন গল্পে সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করে গল্পের গুরুত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

‘টাংরী কাবাব’ গল্প থেকে পুরাণের একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

“ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা বৃষগজ তুরগা

দক্ষিণাবর্ত বহি দিব্য-স্ত্রী পূর্ণকুম্ভা।

দ্বিজ নৃপগণিকা পুষ্পমালা পতাকা

সদ্য মাংস ঘৃতং বা দধি মধুরজ তং

কাঞ্চনং শুল্ক ধান্যং দৃষ্টা শ্রুত্বা পঠিত্বা

ফলমিহ মানবে গন্তুকাম। পূজ্য পদে প্রণাম।”

— পুরাণের এই দৃষ্টান্ত থেকে একটি প্রচলিত প্রবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে - যাত্রাকালে যদি ধেনু, ঘাঁড়, হাতি, জলভরা কলসি কাঁখে দক্ষিণদিকে গমনকারী নারী, ব্রাহ্মণ, গণিকা, পুষ্পমালার

পতাকা, ঘি, কাটামাংস, দই, মধু, রূপা, সোনা, সাদা ধান দেখা যায় বা এদের নাম শোনা কিংবা পাঠ করা হয় তাছাড়া গুরুজনকে প্রণাম করলে যাত্রা শুভ হয়।

লেখিকা তাঁর গল্পে আগুপূর্ণ বাক্য গুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। যার আবেদন চিরকালীন। নিম্নে এরূপ প্রবাদ বা আগুপূর্ণবাক্য গুলির কিছুটা দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো :-

“আপনারা এই অবোলা প্রাণীর জন্যে যা করলেন, এর জন্যে

ঈশ্বর আপনাদের শতগুণ করে”.....

— উপরিউক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটিতে রয়েছে সর্বজীবে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। জীবসেবার মধ্যেই ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

“যার ডানা আছে কিন্তু পালক নেই, সে কখনো বিশ্বাসী হতে পারে ?”

— আলোচ্য বাক্যটি তাৎপর্যপূর্ণ একারণেই যে ডানার সঙ্গে পালকের সংযুক্তির মধ্যে থাকে পরিপূর্ণতা। তার অভাব ঘটলে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

“সুন্দরীর ভুরু জট পাকিয়ে যায়।

— কোন জিনিসই বেশি বেশি ভালো নয়। এই অর্থে প্রবাদ বাক্যটি অর্থবহ।

“কিন্তু যে যাই বলুন দুর্ঘটনায় বাস্তবের কাছে কল্পনা দাঁড়াতে পারে না।”

— দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন তা আকস্মিকভাবেই ঘটে। যা কল্পনা করা যায় না তা বাস্তবে ঘটতে দেখা যায়।

“ প্রেম যতদিন অপূর্ণতার মধ্যে, অতৃপ্তির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে ততদিনই বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেই প্রেমে প্রাপ্তি এল, তৃপ্তি এল, অমনি সুপ্তি-ও চলে আসে। তারপরে প্রেম শুকিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়। তখন জীবন খুব বোরিং।’

— প্রেম একটি স্বর্গীয় অনুভূতি পবিত্র প্রেমে কোন চাওয়া-পাওয়া কিংবা স্বার্থ গন্ধ থাকেনা। এখানে যখন চাওয়ার - পাওয়ার প্রশ্ন যুক্ত হয়, তখনই ঘটে প্রেমের মৃত্যু। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটির আরেদয় চিরন্তন, সন্দেহ নেই।

“মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার দের ভালো। তারা ভালোবাসতে জানে।”

— যখন অনেকে মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে, তখন তারা জন্তুর চেয়েও হীন হয়। কেননা বাঘ, বাঘকে খায় না কিন্তু বৃহৎমানুষ ক্ষুদ্র মানুষকে ভক্ষণ করেই চলে এই অর্থে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটি সার্থক।

“যাদের নতুন জীবন, নতুন সংসার, পুরোনো মানুষ সব সময়েই সেখানে অবান্তর।”

— নবজীবনের ধারাপাতে থাকে রাগ-অনুরাগ ও রোমাঞ্চের পরিপূর্ণতা। সেখানে অন্যকারোর স্থান নেই। এই অব্যর্থ উক্ত প্রবাদটি সার্থক।

“মানুষের সাধ্য আর ভগবানের সাধ্য তো এক নয় ?”

— আলোচ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাক্যটিতে দৈবশক্তির প্রাধান্য দেখানো হয়েছে। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী দৈবশক্তির কাছে মানুষের শক্তি অবান্তর।

“সন্তান বড়ো উপকারী জিনিস, সংসারের সর্বময় কর্তা হতে গেলে একমাত্র স্ত্রীর উপর নির্ভর করলেই চলে না, প্রভুত্বের জন্য পুরুষের আরো উপাদান চাই।”

— সংসার জীবনের অভিজ্ঞতা যুক্ত আলোচ্য প্রবাদটি সার্থক।

“পাপীদের সর্বদাই ছদ্মবেশ থাকে, সেটাই তাদের ধর্ম।”

— সমাজে যারা অপরাধী তারা অনেকের কাছে ছদ্মবেশ ধারণ করে অন্যায়মূলক কাজ চালায়।

“সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অখ্যাতি মৃত্যু অপেক্ষা বেদনাময়।”

— মানী ব্যক্তির নিকট মান-সম্মানটাই বড়। তার মান বিয়িত হলে, তা তার কাছে মৃত্যুর চেয়ে-ও বড় বলে মনে হয়।

আগুন দিয়ে আগুন নেবানো যায় না, হিংসা দিয়ে হিংসার নিবৃত্তি হয় না, মেরে ফেলে সঞ্জীবনী খোঁজার নাম মূর্খতা।”

— হিংসাকে জয় করতে হয় অহিংসা বা প্রেম দিয়ে। গর্হিত কাজ করে পরবর্তীতে অনুশোচনা জাগ্রত হলে কোন কিছু করার থাকে না।

“ভালোবাসাই আমাদের মানুষ করে - তার অভাবে জীবন শুষ্ক, ব্যর্থ।”

— মানবজীবনে ভালোবাসার জয় সর্বত্র। এর দ্বারা সমগ্র পৃথিবীকে বস করা সম্ভব। এই অর্থে এই প্রবাদ বাক্যটির আবেদন চিরকালীন।

“ভালো যিনি বাসতে জানেন তিনিই পরম আত্মীয়- ভালোবাসাই

সম্মান-ভালোবাসাই জীবন-তার চাইতে বড় কিছু নাই।”

ভালোবাসাই মানুষকে কাছে টেনে নেয়, মানুষকে মহীয়ান করে তোলে। যেখানে ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান নেই। এই অর্থে এই বাক্যটি সার্থক।

পরিশেষে বলা যায়, নবনীতা দেবসেনের ছোটগল্পে রয়েছে একটি আর্ট। তিনি বিষয় ও শিল্পরূপের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে বাংলা গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। এখানেই তাঁর গল্পের বিশেষত্ব।

এই দীর্ঘ অধ্যায়টিতে একশ বছরের প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের ছোটগল্পের শিল্পরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই শিল্পরূপ বিবর্তিত হলেও কালের অঙ্কে তাঁদের রসোত্তীর্ণ গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

উল্লেখপঞ্জী

চতুর্থ অধ্যায়

১. সোনার তরী - বর্ষাযাপন	—	পৃঃ ৮২
২. ছোটগল্পের কথা - রথীন্দ্রনাথ রায়	—	পৃঃ ১০৯
৩. মৃণালের কলম - সুদক্ষিণা ঘোষ	—	পৃঃ ৪৫
৪. মৃণালের কলম - সুদক্ষিণা ঘোষ	—	পৃঃ ১০২
৫. সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন - তনিকা সরকার	—	পৃঃ ১১
৬. সাবিত্রী রায়ের নির্বাচিত রচনা সংকলন - গার্গী চক্রবর্তী	—	পৃঃ ১৩৫
৭. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী - বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ	—	পৃঃ ২০০
৮. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী - বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ	—	পৃঃ ৭০
৯. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার - গল্পচর্চা	—	পৃঃ ১০৯৪
১০. ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী - বাংলা ছোটগল্প রীতি প্রকরণ ও নিবিড় পাঠ	—	পৃঃ ৭০
১১. সুমিতা চক্রবর্তী - ছোটগল্পের বিষয়-আশয়	—	পৃঃ ২৯২

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ

তুলনার আলোকে মহিলা গল্পকার

স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প থেকে শুরু করে মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন পর্যন্ত মহিলা গল্পকারদের গল্প রচনার সময়কাল একশ বছরের উর্ধ্বে। কেননা আশাপূর্ণা দেবী ও মহাশ্বেতা দেবীর গল্প আলোচনা না করলে বাংলা ছোটগল্পের প্রতিবাদী চেতনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। এই দীর্ঘ সময়কালে বাংলা ছোটগল্পের জগতে যারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে বাংলা ছোটগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, কল্লোল ত্রয়ীর অন্যতম পুরোধা প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, রাঢ়বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এছাড়া বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ও সুবোধ ঘোষ প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্প লিখেছেন। মহিলা গল্পকারদের গল্প রচনাকালেই তাঁরা গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের পাশাপাশি, পূর্বোক্ত গল্পের তুলনামূলক আলোচনা স্বাভাবিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। তুলনামূলক আলোচনা না করলে গল্পকারদের স্বাভাবিক সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। প্রত্যেকেই অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, বঞ্চনা, কুসংস্কার ও প্রশাসনিক ত্রুটি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এই অধ্যায়ে আমরা তারই তুলনামূলক আলোচনায় ব্রতী হয়েছি। একক ভাবে তুলনামূলক পর্যালোচনা করতে গেলে এই অধ্যায়ের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তাই আলোচনার সংক্ষিপ্ততার কারণে প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত মহিলা গল্পকারদের সঙ্গে পূর্ববর্তী গল্পকার, সমসাময়িক গল্পকার ও পরবর্তী গল্পকারদের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে তাঁদের গল্পের প্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য সচেষ্ট হয়েছি।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ‘রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্প রচনা করেছেন। ‘গহনা’, ‘লজ্জাবতী’, ‘যমুনা’, ‘প্রতিবাদী’, ‘নব ডাকাতির ডায়েরী’, ‘তিনটি দৃশ্য’, ‘কেন’, ‘পূজার তত্ত্ব’, ‘কান্তিবাবুর খোসনামা’, ‘মালতী’, ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ প্রভৃতি গল্পে কোথাও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তো কোথাও ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোথাও পণপ্রথার বিরুদ্ধে তো কোথাও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, কখনও বা রাজনৈতিক হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও পারিবারিক কোন মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ব্যক্ত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘দেনাপাওনা’ ছোটগল্পের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘লজ্জাবতী’ ছোটগল্পের তুলনা করা যায়। দু’টো গল্পেই পণপ্রথার বিষয় ও পরিণামের কথা উল্লেখ আছে।

‘দেনাপাওনা’ গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে অসহায় নারী চরিত্র নিরুপমা। গল্পশেষে পণের টাকা তার বাবা পরিশোধ করতে পারেনি বলে নিরুপমাকে অকালেই ঝরে যেতে হয়েছিল, ঠিক তেমনি ‘লজ্জাবতী’ গল্পে লজ্জাবতীর করুণ পরিণতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘তিনটি দৃশ্য’ গল্পে স্বামীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলেও রবীন্দ্রনাথের ‘হৈমন্তী’ গল্পে শৃঙ্গুর-শাশুড়ীর নীচতা ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে তিলে তিলে নীরবে সহ্য করে হৈমন্তী আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। এরূপ পণপ্রথার বিরুদ্ধে ‘পূজার তত্ত্ব’ গল্পে সুশীলার করুণ পরিণতি আমাদের ব্যথিত করে। রবীন্দ্রনাথ এর ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের মৃণালের মধ্যে যে বিদ্রোহী মনোভাব এবং ‘নষ্টনীড়’ গল্পে ভূপতির স্ত্রী চারুণ জীবনকথার সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘মালতী’ গল্পের তুলনা করা যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতিবাদী গল্পের নারীচরিত্রগুলি যথাক্রমে ভামিনী, লজ্জাবতী, যমুনা, মেঘমালা, ধনিষ্ঠা, সুশীলা, মালতী, ক্ষেমঙ্করী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর গল্পের নারী চরিত্রগুলির প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের মতো জোরালো ছিল না।

স্বর্ণকুমারী দেবী যেমন সামাজিক উৎপীড়ন, বৈষম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন শরৎচন্দ্রও তেমনি তাঁর গল্পে উৎপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন কিন্তু তা আরও বলিষ্ঠভাবে।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘গহনা’ গল্পের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ‘পরেশ’ গল্পের কিছুটা মিল রয়েছে। পরেশ যেমন পিতার বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে সামাজিক পরিবর্তনের একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন। নলিনও তদ্রূপ পিতা-মাতার মনোনীতা মেয়েকে বিয়ে না করে তারই নির্বাচিত একটি প্রবাসী মেয়েকে বিয়ে করে পিতার সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর গল্পে বিধবা নারীর প্রেমকে উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর ‘আলো ও ছায়া’ গল্পে যজ্ঞদত্তের সঙ্গে বিধবা সুরমার সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। যদিও শরৎচন্দ্র আলোচ্য গল্পে বিধবা বিবাহকে স্বীকৃতি দেননি।

শরৎচন্দ্রের ‘অনুপমার প্রেম’ গল্পে আমরা দেখি সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ললিত ও বিধবা অনুপমার প্রেমকে তিনি সার্থকরূপ দেননি।

শরৎচন্দ্র হিন্দু সমাজের জাত-পাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হল ‘অভাগীর স্বর্গ’। তবে স্বর্ণকুমারী দেবী জাত-পাতের বিষয়ে বিশেষ একটা গল্প লেখেন নি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্পে গঙ্গাবক্ষে প্রথম সন্তান বিসর্জন দেওয়ার নির্মম প্রথা নিয়ে গল্প লিখেছেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর ‘সতী’ গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তবে শুধু বিষয় বিন্যাসেই নয়, চরিত্র নির্মাণের দিক থেকেও শরৎচন্দ্র স্বর্ণকুমারী দেবীর চেয়ে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র অভাগী, সতী, অনুপমা, কাদম্বিনী, ইন্দু, বিলাসী, একাদশী, আমিনা প্রমুখ নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পমূল্য বিচারে স্বর্ণকুমারী দেবীর চেয়ে শরৎচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের তুলনা করা যেতে পারে। তবে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ছোটগল্পে কল্লোল যুগের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর ‘শুধু কেরানী’, ‘হয়তো’, ‘বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে’, ‘মহানগর’, ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’, ‘সংসার সীমান্তে’, ‘সাগর সঙ্কম’ প্রভৃতি ছোটগল্পে শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে বিকৃত জটিল জীবন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত দম্পতির জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্রটির বিরুদ্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র সরব হয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘পূজারতত্ত্ব’ গল্পে পারিবারিক নিষ্ঠুরতা, প্রেমে নৈরাশ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গ উদ্ঘাটিত হয়েছে। উভয়ের লেখনী যেন অনেকটা কবির কলমে লেখা। কাব্যগুণ ও নাট্যগুণ এই দুই গল্পকারদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তারশঙ্করের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব নবীনকে জয়যুক্ত করা। পাশাপাশি তিনি সামাজিক মূল্যবোধহীন, রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিরোধ, ধর্মান্ধতা, অর্থনৈতিক শোষণ, পারিবারিক অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গল্প লিখেছেন। পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধ আমরা দেখি ‘ময়দানব’ গল্পে। প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বমূলক গল্প স্বর্ণকুমারী দেবী লেখনি।

তারশঙ্করের ‘সন্তান’ গল্পে গোবিন্দ মঞ্জুরীকে বিয়ে করেছিল। সে প্রত্যাশা করেছিল তার পুত্র হবে অনিন্দ্য সুন্দর। কিন্তু পুত্রটি হয়েছিল তারই মত কুৎসিত। এজন্য সে রেগে গিয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থায় পুত্রকে হত্যা করে। এরূপ পুত্র হস্তারক ঘটনা স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পে না থাকলেও স্বামী, স্ত্রী, পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যার মতাদর্শগত বিরোধের চিত্র আমরা দেখতে পাই ‘গহনা’, ‘যমুনা’, ‘তিনটি দৃশ্য’ প্রভৃতি গল্পে।

তারশঙ্করের ‘বোকাকান্না’, ‘ডাইনী’ ও ‘ডাইনী বাঁশি’ গল্পে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ গল্পেও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে। তারশঙ্করের ‘শশীশেখর’ ছোটগল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিশেষভাবে জমিদার পুত্রের দম্ভ ও অহংকার পারিবারিক বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘গহনা’ গল্পেও বিলেত ফেরৎ নলিন তার মনোনীত পাত্রীকে বিয়ে করায় পিতামাতার সঙ্গে বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারশঙ্কর যেমন অন্ত্যজ শ্রেণিভুক্ত দুলে, বাগদী, সাপুড়ে শ্রেণিকে গল্পে এনেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী এরূপ অন্ত্যজ শ্রেণিকে গল্পের চরিত্র হিসেবে বেছে নেননি।

তারাশঙ্করের গল্পের শশীশেখর, গোবিন্দ, মিহির মুখুজ্যে, ট্যারা, গড়গড়ি, তারিণী, পূর্ণ চক্রবর্তী, মোহনদাস মহন্ত, কিশোর গোসাই, বিনয়কৃষ্ণ রায়, কালীনাথ, শিবনাথ, সত্যপ্রিয়, মুকুন্দ পাল ও রাবণেশ্বর রায় চরিত্রগুলি বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। তারা কেউ জমিদার, কেউ বাউল, কেউবা আদর্শ শিক্ষক, কেউ অপরাধী খুনি, কেউ মাঝি, কেউবা ডাক্তার, কেউবা বাজিকর। প্রত্যেকটি চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। কিছু কিছু চরিত্রের মুখে রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাও প্রয়োগ করে শিল্পসিদ্ধির চরমে পৌঁছতে পেরেছেন।

পাশাপাশি স্বর্ণকুমারী দেবীর পুরুষ চরিত্র গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নলিন, বিহারী, কালীপ্রসাদ, নবকুমার, প্রাণনাথ, কান্তিবাবু, রমেশ প্রভৃতি এই চরিত্রগুলিও রক্তে মাংসে গড়া, তারাশঙ্করের নারীচরিত্র গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘স্বর্ণ ডাইনী’, ‘সুরধনী’, ‘রাধিকা’, ‘কাত্যায়নী’, ‘সুখী’, ‘ব্রজরানী’ প্রভৃতি নারীচরিত্র নির্মাণে তারাশঙ্কর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

স্বর্ণকুমারী দেবী ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমকালের গল্পকার নন। স্বর্ণকুমারী দেবী যখন গল্প রচনা করেছিলেন তখনো গল্প বিশেষ প্রতিষ্ঠা পায়নি। গল্পের শিল্পরূপের যথার্থ পরিচয় তার মধ্যে ফুটে না উঠলেও আজও তার গল্পগুলির আবেদন নিষ্প্রভ হয়ে যায়নি। কিছু তারাশঙ্করের গল্পগুলি বিষয় ও আঙ্গিক বিচারে সফল সৃষ্টি বলা যেতে পারে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, প্রমথনাথ বিশী, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ ছোটগল্পকাররাও প্রতিবাদী ছোটগল্প লিখেছেন তাঁদের ছোটগল্পের সঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতির পরিচয় দেখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের গল্পকারদের মধ্যে সরসীবালা বসু একটি জনপ্রিয় নাম। বাংলা গল্পে যখন স্বর্ণযুগ, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যখন গল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তখন বাংলার বাইরের গিরিডিতে থেকে সরসীবালা গল্প লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। সে সময় যে সব প্রতিভাময়ী গল্পকারদের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বর্ণকুমারী শরৎ কুমারী, নিরুপমা, অনুরূপা, প্রভাবতী, শান্তা, সীতা, অনিন্দিতা, বেগম রোকেয়া, গিরিবালা, শৈলবালা, জ্যোতির্ময়ী, আশালতা ও রাধারাণীদেবী। সহজ, সুন্দর ও গল্প বলার অভিনব ভঙ্গীর জন্য তাঁদের গল্পগুলি শিল্প মূল্যের পরিচয় বহন করে।

সরসীবালা বসুর গল্পে সমস্যা, নারী সমস্যা এবং প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তার পরিচয় মেলে। তাঁর গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে। সরসীবালা ছিলেন একান্তভাবে রবীন্দ্রানুরাগী।

তিনি তাঁর একাধিক গল্পে রবীন্দ্রনাথের কথা, গান ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেরকম সমাজ রক্ষণের প্রশ্নে নারী-পুরুষের সমতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেরকম সরসীবালাও তাঁর ‘আতর’, ‘দাগা’, ‘উশুজ্বল’ প্রভৃতি গল্পে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ব্যাভিচার অসংঘম যেমন মেয়ে মানুষের পক্ষে কাম্য নয়, ঠিক তেমনি পুরুষের পক্ষেও তা দোষের। সামাজিক মূল্যবোধকে রবীন্দ্রনাথের মতো সরসীবালাও গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন ‘হৈমন্তী’, ‘দেনা-পাওনা’, ‘অপরিচিতা’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘পয়লা নম্বর’, ‘ত্যাগ’, ‘দুরাশা’, ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘বদনাম’ প্রভৃতি গল্পে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে, সরসীবালাও তেমনি তাঁর ‘দুর্দিনে’, ‘ব্যর্থ প্রণয়’, ‘পাশ না ফেল’, ‘প্রণয় পরিণাম’, ‘আগাছা’, ‘সাধন পথে’ প্রভৃতি গল্পে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে যেমন রোমান্টিক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি সরসীবালা বসুর ছোটগল্পেও তার নিদর্শন মেলে। ‘প্রেম’ গল্পে মল্লার রাগিনীতে মধুর স্বরলহরী উচ্চারিত হয়েছে। তার অর্থ হল “বহু আমার মেঘ - হে আমার প্রিয়তম হে আমার দ্বৈত - আমার চুম্বনের লালিমায় তোমার সারা অঙ্গ আবীর রাঙা করিয়া দেব তুমি এসো।” রবীন্দ্রনাথের ‘সমাপ্তি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’ প্রভৃতি গল্পেও এরূপ রোমান্টিক ভাবনার পরিচয় মেলে।

নারীজাতির অবমাননাকে রবীন্দ্রনাথ যে রূপ বিদ্রূপ করেছেন, সরসীবালার গল্পেও সেরূপ বিদ্রূপের পরিচয় মেলে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের যোগসূত্র রবীন্দ্রনাথ যে রূপ তাঁর বহু ছোটগল্পে উপস্থাপন করেছেন তন্মধ্যে ‘সুভা’, ‘পোস্টমাস্টার’, ‘পরীর পরিচয়’, ‘দিদি’ প্রভৃতি ছোটগল্পে তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ এরূপ লক্ষন সরসীবালা বসুর গল্পেও মেলে যেমন —

“রেশমের অবগুষ্ঠন বন্দিণীর সর্বাঙ্গ ঢাকা ছিল -

বাদশাহের আদেশ শুনিয়া নারী ধীরে ধীরে আপনার অবগুষ্ঠন খুলিয়া ফেলিল -

সূর্য্য তখন ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহার শেষ আলো তখন ধরনীর পৃষ্ঠ হইতে

শেষ বিদায় লইতেছে ; তাহারই কোমল করলন রশ্মিটুকু তখন সেই তনু

বন্দিণীর তরল মুখখানিতে যেন শেষ চুম্বন আঁকিয়া দিল।”

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি বিষয়ের অভিনবত্বে, আঙ্গিক সচেতনতায় পাঠকের মনে বিশেষ সাড়া জাগাতে পেরেছে। সরসীবালা বসু হয়তো গল্পকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি, তবুও তাঁর গল্পগুলি বিষয় ও আঙ্গিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্রের ‘ছবি’, ‘বিলাসী’, ‘অনুরাধা’, ‘আঁধার আলো’, ‘বাল্যস্মৃতি’ প্রভৃতি প্রেমের গল্পের সঙ্গে সরসীবালার ‘ব্যর্থ প্রণয়’, ‘হতাশ প্রেমিকা’, ‘গনৌরী’, ‘ঘাসওয়ালা’ প্রভৃতি গল্পের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সরসীবালা দেবীর গল্পে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সমাজ বাস্তবতার তুলনা করা যেতে পারে। ‘পাশ না ফেল’ থেকে তাঁর দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রদত্ত হল -

“আগা সাহেব মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিয়াছেন। মোটা মোটা রুটি, আর গোস্ত কাবাব। ক্ষুধার তাড়নায় খুব শীঘ্র শীঘ্র গলাধঃকরণ করিতে ব্যস্ত।

বেড়া ঘেরা আঙিনায় একপাল হাঁস ও মূর্গী চরিয়া বেড়াইতেছে। কয়েকটি শীর্ণকায় ও কয়েকটি পুষ্টদেহ ছাগবৎস সারি সারি খুঁটিতে বাঁধা। স্তূপাকার অশ্বখ ও বটপাতা তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে।”

শরৎচন্দ্রের ‘লালু’ গল্প থেকে সমাজ বাস্তবতার একটি নিদর্শন নিয়ে প্রদত্ত হল —

“কিন্তু গভীর রাতে অকস্মাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ছাদ চুইয়ে মশারি ফুঁড়ে তাঁর সুপরিপুষ্ট পেটের উপর জল পড়চে। - উঃ, কি ঠান্ডা সে জল’

শশব্যস্তে বিছানার বাইরে এসে পেটটা মুছে ফেললেন, বললেন নতুন বাড়ি করলে নন্দরানী, কিন্তু পশ্চিমের কড়া রোদে ছাতটা এর মধ্যেই ফেটেচে দেখচি। ফিতের খাট, ভারী নয়, মশারি সুন্ধ সেটা ঘরের আর একধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। কিন্তু আধ মিনিটের বেশী নয়, চোখ দুটি সবে বুজেছেন, অমনি দু-চার ফোঁটা তেমনি ঠান্ডা জল টপটপ টপটপ করে পেটের ঠিক সেই স্থানটির উপরেই ঝরে পড়ল।”

শরৎচন্দ্রের বহু ছোটগল্পে জিভ কাটিয়া বলিলেন এই শব্দটির বহুল প্রয়োগ রয়েছে। সরসীবালা বসুর গল্পেও এই শব্দটির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় - ‘প্রণয় পরিণাম’ গল্প থেকে তাঁর উদাহরণ দেওয়া হল —

“ঠাকুর জিভকাটিয়া কহিল - ‘জগবন্ধু জগবন্ধু ! দেবতার স্থানে কি মিছে কথা বলতে আছে মা ঠাকুরণ ?”

শরৎচন্দ্র ও সরসীবালার গল্পের সংক্ষিপ্ত ভাবে সংলাপ অংশের তুলনা নিয়ে প্রদত্ত হল - সরসীবালার ‘প্রেম’ গল্প থেকে একটি উদাহরণ দেওয়া হল —

“বাদশাহ । তোমার নাম কি সুন্দরী ?

বন্দিনী । সখিনা ।

বাদশাহ । তুমি হিন্দু না মুসলমান ?

সখিনা । জাঁহাপনা দেখিতেছেন, মুসলমানের পোষাকে আমার সর্বাঙ্গ ঢাকা -

খোদাতালার বাঁদী আমি -

যিনি এই দিনদুনিয়ার একমাত্র মালিক।”

শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প থেকে সংক্ষিপ্ত সংলাপ অংশ তুলে ধরা হল —

“কাকে মা ?

ওই যে রে - ও গাঁয়ে যে উঠে গেছে -

কাঙালী বুঝিয়া কহিল, বাবাকে ?

অভাগী চুম করিয়া রহিল।

কাঙালী বলিল, সে আসবে কেন মা ?

প্রকৃতি প্রেমিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাঢ় বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাস্তববাদী ছোটগল্পকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখ ছোটগল্পকার স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য স্বরাট। সরসীবালা বসু ও সতীনাথ ভাদুড়ী দুজনে দুজনের গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি হিসেবে মাটি ও মানুষের জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন। সতীনাথের ‘বন্যা’, ‘আল্টাবাংলা’, ‘পরকীয়া-সন-ইন-ল’ প্রভৃতি ছোটগল্পের সঙ্গে ‘মার্শাল ল’ ‘মধুরেন সমাপয়েৎ’, ‘দাগা’ ও ‘ভাড়াটে’ -র মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে সতীনাথের ছোটগল্পের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে রাজনীতি। কিন্তু সরসীবালা বসু রাজনৈতিক গল্প বিশেষ লেখেননি।

পূর্ণশশী দেবী একজন প্রবাসী বাঙালি। পাঞ্জাবের ভৌগোলিক পরিবেশে বসে তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেছিলেন। প্রবাসী জীবনের বহু অভিজ্ঞতা তাঁর গল্পের উপাদান। তাঁর গল্পগুলিতে রয়েছে সঙ্গীতের সুর আর আছে সার্থক চিত্রকল্প। চরিত্র নির্মানের ক্ষেত্রে তাঁর মুন্সীয়ানা রয়েছে। বলা যায় তাঁর প্রতিটি টগলে বিষন্ন করুন অসহায় মানুষের জীবনের ছবি লিপিবদ্ধ রয়েছে। পূর্ণশশী দেবী যখন গল্প লিখেছেন সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ গল্পকারগণ গল্প লিখে চলেছেন। তাঁদের গল্পের সঙ্গে লেখিকার গল্পের সংক্ষিপ্তভাবে তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কর্তৃক নারীদের শোষণ, লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও অবমাননার চিত্র রয়েছে। পূর্ণশশীর গলেও তার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘পয়লা নম্বর’, ‘ত্যাগ’, ‘মানভঞ্জন’, ‘দুরাশা’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘চিত্রকর’, ‘বদনাম’, ‘সমস্যাপূরণ’ প্রভৃতি ছোটগলে পারিবারিক সমস্যার চিত্র রয়েছে। তুলনামূলকভাবে ‘মায়ার বন্ধন’, ‘ববুয়া’, ‘নিরুদ্দেশযাত্রী’, ‘সহমরণ’, ‘স্পর্শের মায়া’, ‘স্মরণাগত’, ‘রিক্তা’, ‘দুইদিক’, প্রভৃতি গলেও প্রতিবাদী মনস্তার পরিচয় রয়েছে।

রবীন্দ্র ছোটগল্পের পরিবেশের প্রয়োগশিল্পে কবি কল্পনাশ্রয়ী মন্ডনশিল্পের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন —

“কান্না শেষ হইয়া গেলেও চোখের পল্লব ভিজা থাকিলে যেমন
ভাবটা হয়, সকাল বেলায় বৃষ্টি অবসানে সমস্ত লতাপাতা আকাশ ও বাতাস
এর মধ্যে সেই ভাবটা ছিল। একখানা শুভ্র কুয়াশার চাদর বিধবার
ঘোমটার মতো গ্রামের গাছগুলির উপর টানা রহিয়াছে।”

- পাশাপাশি পূর্ণশশী দেবীর ‘সহমরণ’ গল্প থেকে পরিবেশের প্রয়োগশিল্পের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার
করছি —

“সেই অবধি নরকের তীব্র জ্বালা বুকে নিয়ে নিজ অমানুষিক
নৃশংসতার দূরপন্থে কলঙ্কের কীর্তিচক্ষের সুমুখে রেখে পলে পলে
তিলে তিলে মরণাধিক যন্ত্রনায় জ্ঞানকৃত মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন
-- ‘পাপজীবনের শেষ হয়ে এসেছে এইবার কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের
শেষ হয়েছে কি ? যদি তা না হয়ে থাকে, যদি পর জন্মেও এমনি
মর্মান্বাহকারী’ - বলতে বলতে বাবার মাঝে মাঝে কণ্ঠরোধ হয়ে যাচ্ছিল।”

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তি অংশের সঙ্গে পূর্ণশশী দেবীর গল্পের
সূচনা ও সমাপ্তি অংশ তুলনামূলকভাবে প্রদত্ত হল। রবীন্দ্রনাথের ‘জীব পত্র’ গল্পের শুরুতে মৃণাল
তার স্বামীকে পত্রে জানিয়েছে সে এসেছে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে শ্রীক্ষেত্রে। গল্পটির পরিণতি অংশে
পৌঁছে মৃণাল লিখেছে,

“আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র।”

- গল্পটির সূচনাতে আছে শ্রীক্ষেত্র পুরীর প্রেক্ষাপট এবং শেষ অংশেও নেই
প্রেক্ষাপটটিই উল্লিখিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পের শেষ বাক্যটিও অর্থবহ -

“কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।”

পূর্ণশশী দেবীর ‘মেঘ মুক্তি’ গল্পের শুরুতে আছে,

“শীতের সন্ধ্যা। অবরাম বৃষ্টি। ভালোলাগে না আর ; বড়ই বিষন্ন, গল্পের শুরুতে
সাক্ষ্যকালীন পরিবেশ বিষন্নতার প্রতীকরূপে দেখা দিলেও গল্প শেষে আর সেই বিষন্নতা নেই।
প্রকৃতির জ্যোতির্ময়ী রূপের বর্ণনা রয়েছে। যেমন -

“তখন নির্মেঘ নির্মল পূর্বাকাশে ঝলমলিয়ে উঠছিল জ্যোতির্ময় স্বর্ণশতদল হাজার
হাজার সোনার পাপড়ি মেলে।”

পূর্ণশশী দেবীর গল্পের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের তুলনা করা যেতে পারে।
শরৎচন্দ্র সামাজিক উৎপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন ‘মহেশ’, ‘একাদশী’, ‘কাশীনাথ’, ‘বিলাসী’

প্রভৃতি ছোটগল্পে। পূর্ণশশী দেবীর ‘রিক্তা’, ‘সর্বহার’, ‘স্মরণাগত’, ‘আলো ও ছায়া’ প্রভৃতি গল্পে পুরুষ শাষিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ‘নিরুদ্দেশের যাত্রী’, ‘মায়ার বন্ধন’ প্রভৃতি ছোটগল্পে লেখিকার প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ‘সতী’ গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে। পূর্ণশশী দেবীর ‘সহমরণ’ গল্পেও রয়েছে সেই প্রতিবাদী কণ্ঠ। শরৎচন্দ্র নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন ‘একাদশী বৈরাগী’, ‘অভাগীর স্বর্গ’ প্রভৃতি গল্পে। পূর্ণশশী দেবীর ‘সর্বহার’ গল্পেও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের ভাষার সঙ্গে পূর্ণশশীদেবীর গল্পের ভাষার তুলনা করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের ‘বিলাসী’ গল্পের ভাষা —

“অন্ধকার রাত্রি - বাটীতে ছেলেপুলে চাকর-বাকর নাই, ঘরের মধ্যে শুধু তার সদ্য বিধবা স্ত্রী, আর আমি। তাঁর স্ত্রী তো শোকের আবেগে দাপাদাপি করিয়া এখন কাঙ করিয়া তুলিলেন যে ভয় হইল, তাহারও প্রাণটা বুঝি বাহির হইয়া যায় বা। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারবার আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন তিনি স্বেচ্ছায় যন সহমরণে যাইতেছেন তখন সরকারের কি ? তাঁর যে আর তিলার্ধ বাঁচিতে সাধ নাই, একি তাহারা বুঝিবে না ? তাহাদের ঘরে কি স্ত্রী নাই ? তাহারা কি পাষণ ?”

— এখানে সাধুভাষায় একাধিক প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করে সহমরণের কুফল বিষয়ে পাঠকের সামনে সহজ-সরল ভাষায় এক জিজ্ঞাসা চিহ্ন তুলে ধরেছেন।

পূর্ণশশী দেবীর ‘অভিসারে’ গল্পের ভাষা কি বর্ণনা অংশে, কি সংলাপ অংশে চলতি রীতিতে লেখা —

“বিভ্রান্ত চিত্তে ব্যাকুল কণ্ঠে হিরন্ময় ডাকে - কল্যাণী !
একি করলে কল্যাণী ! সাড়া পায় না। প্রতিধ্বনি ফিরে আসে শুধু।
অন্ধকারে সাঁ সাঁ করে গুমরে ওঠে কোন অদেহীর আকুল দীর্ঘশ্বাস।
মাথার ওপর বকুলের শাখায় শব্দ হয় ঝটপট করে ;
তারপরও কার তীব্র অটহাসি - ? হিরন্ময়ের রক্ত জমাট করে দেয় -
বরফের মত। ওঃ ! কল্যাণী

পূর্ণশশী যখন সাহিত্য রচনা করেছিলেন, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তারাক্ষর, মানিক, বিভূতিভূষণ, বনফুল, নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ গল্পকারদের ছোটগল্পগুলি রসোত্তীর্ণ সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্ণশশী দেবীর গল্পে তাদের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ বলা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যের মহিলা গল্পকারদের মধ্যে যারা প্রতিবাদী গল্প রচনা করেছেন, শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁদেরই একজন। ৯টি গল্প সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অজস্র ছোটগল্প। তাঁর গল্পের সঙ্গে একাধিক গল্পকারের গল্পের তুলনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেমন সমাজ সমস্যামূলক ছোটগল্প রচনা করেছেন, শৈলবালাও তেমনি সমাজ সমস্যামূলক গল্প লিখে প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। শৈলবালার ‘শিশুর স্মৃতি’, ‘ভন্ডের সার্থকতা’, ‘ক্ষমতার জয়’, ‘মণীষা’, ‘লাফো’, ‘বুনোওল ও বাঘাতেঁতুল’, ‘গোলাপ সিংহ’ প্রভৃতি গল্পে অর্থনৈতিক শোষণ, পারিবারিক অন্যায় অবিচার ও মূল্যবোধহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারিত হয়েছে। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘শান্তি’, ‘হেমন্তী’, ‘উলুখড়ের বিপদ’, ‘প্রতিহিংসা’, ‘ভুল স্বর্গ’, ‘বড় খবর’, ‘পণরক্ষা’ প্রভৃতি গল্পে রয়েছে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনিক ত্রুটির বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশ শিল্প চেতনার পরিচয় বহন করে। তাঁর ‘ত্যাগ’ গল্পের শুরুতে রয়েছে —

“ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধলইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে।”

- এমনি এক জ্যোৎস্না রাত্রিতে এক তরুন দম্পতির আনন্দমগ্ন মুহূর্তে নায়কে ত্রুদ পিতা, পুত্রকে আদেশ করলেন - স্ত্রীকে ত্যাগ করতে,

“হেমন্ত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।”

গল্প শেষেও আমরা দেখি,

“হরিহর মুখুজে বলিলেন, ‘অনেক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর

সময় দিতে পারি না মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।”

..... হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, ‘আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।’

হরিহর গর্জে উঠে কহিল, ‘জাত খোয়াইবি?’ হেমন্ত কহিল, ‘আমি জাত মানিনা।’

‘তবে তুই সুদূর হইয়া যা।’

পাশাপাশি শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘লাফো’ গল্পের শুরুতে আছে বিজয়া দশমীর প্রসঙ্গ। সমাপ্তিতে গল্পকথকের জবানীতে আছে —

“জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিলাম লাফোর চক্ষে অশ্রু চক্চক্ করিতেছে।”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে উত্তম পুরুষের জবানী যথাযথভাবে প্রয়োগ করেছেন। যেমন - ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পের দৃষ্টান্ত,

“একথা নিশ্চয় সত্য যে, বরীচের হাটে তুলার মাঙল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চারশ টাকা বেতন লইয়া থারি। তখন আবার আমার পূর্বজ্ঞের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসিন

প্রদীপ্ত ক্যাম্প টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুক হাসিতে লাগিলাম।”

শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণের প্রয়োগ রয়েছে। যেমন —

“বজ্রনিদানে সদর্পে গৌর বিলল, ‘গৌর সিংগীকে সে ছেলেই

পাওনি রায়গিন্দি ! আমি আবার উঠে তাকে জল দেব ? কি গরজ ? আমি

সব চুপ করে পড়ে পড়ে শুনেছি, আর মনে মনে হেসে কুটিকুটি হয়েছি।

সাড়া দিতে আমার বয়ে গেছে !”

ছোটগল্প মূলত বহুলাংশে সময়ের ওপর নির্ভরশীল। টাইম আট একটি সার্থক ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ ‘কঙ্কাল’ গল্পে সময়ের প্রয়োগ রীতি অনবদ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। গল্পে প্রণয় বঞ্চিত নায়িকা শশী লেখককে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। এই মর্মান্তিক মুহূর্তের প্রকৃতির প্রেক্ষাপটটি কত অনবদ্য -

“বড় সুন্দর রাত্রি ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে।”

‘ত্যাগ’ গল্পে সময়ের রিবেশে এইভাবে বর্ণনা করেছেন -

“কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী অন্ধকার রাত্রি সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে।”

- গোপিকানাথ রায় চৌধুরী নিয়োক্তভাবে বিষয়টির বর্ণনা করেছেন -

“কিন্তু সময়ের এই মসীকৃষ্ণ প্রেক্ষাপটে - কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে নায়কের পিতৃ আদেশ লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে নবদম্পতির মিলনের উজ্জ্বল আলোকিত আভাস ফুটে উঠেছে।” ১

শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পেও রয়েছে সার্থক সময়ের প্রয়োগ রীতি। তাঁর ‘গোলাপ সিংহ’ গল্পের শুরু হয়েছে সময়ের প্রয়োগে, ‘সন্ধ্যা হয় হয়’ কিংবা গল্পের তৃতীয় পরিচ্ছেদেও রয়েছে সময়ের বিন্যাস,

“শীতের বেলা দেখিতে দেখিতে ফুরাইল। সন্ধ্যারপর একটা গ্রামের প্রান্তে তাঁবু ফেলিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করা গেল। রাত্রের জন্য সকলের যথোপযুক্ত আহার ও বিশ্রামের বন্দ্যোবস্ত করিয়া পীড়িতদের আর এক দফা দেখিয়া শুনিয়া নিজের তাঁবুতে ঢুকিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম।”

— এইভাবে শীত, সন্ধ্যা ও রাত্রি শব্দগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে সময়ের বিন্যাস লক্ষ্য করা যায়।

শরৎচন্দ্র ও শৈলবালার ছোটগল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। দু’জনেই প্রতিবাদী ছোটগল্প লিখেছেন। শরৎচন্দ্রের ‘মহেশ’, ‘পরেশ’, ‘আলো ও ছায়া’, ‘দর্প চূর্ণ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘অনুপমার প্রেম’ প্রভৃতি গল্পে নিপীড়িত মানুষের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘বিজয়ার নমস্কার’, ‘লাফো’, ‘ননীখানসামার ছুটি যাপন’, ‘কাব্যকারণ’, ‘আদেশ পালন’, ‘মণীষা’, ‘সূক্ষ্ম-ধর্মজ্ঞান’ প্রভৃতি গল্পে প্রতিবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের প্লট যেরূপ সুবিন্যস্ত শৈলবালার গল্পের প্লটগুলিও শিথিল নয় কার্য-কারণ সূত্রে আবদ্ধ।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটগল্পগুলিকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছেন। যেমন - ‘মন্দির’ গল্পটি ১৩টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত। ‘বোঝা’ ছোটগল্পটি ৯টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছেন। এমনকি এক একটি পরিচ্ছেদের এক একটি নামকরণ করেছেন, যেমন - ‘বিবাহ’, ‘সুশীলার ছেলের অন্তপ্রাশন’, ‘আবার বিবাহ’, ‘নলিনী’, ‘দুই বৎসর পরে’, ‘কপাল ভাঙ্গিয়াছে কি?’, ‘ভাঙ্গিয়াছে’, ‘ফুলশয্যা’ ও ‘নরেন্দ্রনাথের পত্র’। ‘অনুপমার প্রেম’ গল্পটিও ৬টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের নামকরণগুলি যথাক্রমে - ‘বিরহ’, ‘ভলবাসার ফল’, ‘বিবাহ’, ‘বৈধব্য’, ‘চন্দ্রাবুর সংসার’ ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নাম ‘শেষদিন’। ‘বাল্যস্মৃতি’ ছোটগল্পটি মাত্র ২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত ‘হরিচরণ’ গল্পের কোনো পরিচ্ছেদ নেই। ‘ছবি’ গল্পটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১০টি। পরিচ্ছেদ গুলোর কোনো নামকরণ করা হয়নি।

পাশাপাশি শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘নিরঞ্জন সর্দার’ গল্পের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৩টি। ‘ভূমিকম্প’ গল্পের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৫টি। ‘দীপ্তি’ ছোটগল্পটি ৪টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। ‘ক্ষমতার জয়’ গল্পে পরিচ্ছেদ সংখ্যা ৪টি। ‘গোলাপসিংহ গল্পটি ৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। কিন্তু ‘করুণা দেবীর আশ্রম’, ‘কোনরোগ’, ‘দুইরূপ’, ‘পাঠশালার স্মৃতি’ ছোটগল্প কোনরূপ পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর একাধিক ছোটগল্পে প্রাচীন গল্প বলার রীতির আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের শুরুতে। শরৎচন্দ্রের ‘হরিচরণ’ গল্পের শুরুতে আমরা দেখি, -

“..... সে আজ অনেকদিনের কথা। প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা।

তখনদুর্গাদাসবাবু উকিল হন নাই। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমি

বোধ হয় ভালো চেনো না, আমি বেশ চিনি। এসো,

তাহাকে আজ পরিচিত করিয়া দিই।”

শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘নিরঞ্জন সর্দার’ গল্পের শুরুটিও হয়েছে শরৎরীতির অনুসরণে, যেমন -

“প্রায় একশত বৎসর আগের কথা। কখন বর্ধমান জেলা উৎকৃষ্ট

স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। বর্ধমানের বিখ্যাত দামোদর নদে তখনও বাঁধ’ হয় নাই।

দেশে ম্যালেরিয়া দেখা দেয় নাই। দেশের নর-নারীর স্বাস্থ্য ছিল সুদৃঢ় মজবুত।

তাহারা খাইতে পারিত, এবং সহজেই খাইতে পাইত - যথেষ্ট নির্ভেজাল খাদ্য।

হজম করিতে পারিত নির্বিঘ্নে হাঁটিতেও খাটিতে পারিতে প্রচুর।”

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোটগল্পের সংলাপ অংশের কোন কোন গল্পে সাধুরীতির প্রয়োগ

করেছেন। ‘বিলাসী’ গল্প থেকে তার দৃষ্টান্ত উদ্ধার করা যেতে পারে —

“চোখ মুছিয়া বলিলেন, ভাই, যা হবার সে ত হইয়াছে আর

বাহিরে গিয়ে কি হইবে ? রাতটা কাটুক না।

বলিলাম, অনেক কাজ, না গেলেই যে নয়।

তিনি বলিলেন, হোক কাজ, তুমি বসো।

বলিলাম, বসলে চলবে না, একবার খবর দিতেই হইবে,

বলিয়া পা বাড়াইবা মাঝেই তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে বাপরে !

আমি একলা থাকতে পারব না।”

- এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে শরৎচন্দ্র সাধু ও চলতি এই দুই -এর মিশ্রনো ঘটিয়েছেন। যেমন - গিয়ে, পারব ইত্যাদি শব্দ চলতি রীতি। হইয়াছে, বলিলাম, উঠিলেন ইত্যাদি শব্দগুলি সাধু।

“মন্দির’ ছোটগল্পের সংলাপ অংশে সম্পূর্ণ চলতি ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে,

‘অপর্ণা জেগেছিল, বলল না।

বাপের বাড়ি যাবে ?

যাব।

কাল যেতে চা’ও ?

চাই।”

শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প বর্ণনা অংশে সাধুরীতি কিন্তু সংলাপ অংশে চলতি রীতির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

“মহিলাটি পুনশ্চ অবজ্ঞাভরে বলিলেন, ‘যে যাই বলুক এই আর্টস্টি

একদম নৈঁইয়া ! লোকটা বিয়ে করেছে ?’

‘হ্যাঁ দু’টি ছেলেও হয়েছে।’

‘স্ত্রীটিও অগ্নি হেঁইয়া।”

রাদ্‌বঙ্গের রূপকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সঙ্গে শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্পের তুলনা করা যেতে পারে। তারাশঙ্কর অভিজ্ঞতার শিল্পী পল্লী বাংলার প্রত্যশারূপ উপলব্ধি করে। তিনি মাটির কাছাকাছি এসেছেন। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থে লিখেছেন —

“রাঢ়ের মাটি ও মানুষের সঙ্গে তারাশঙ্করের অন্তরঙ্গ পরিচয়ও

নিবিড় আত্মীয়তার ফলে বাংলার এই বিশেষ অঞ্চলের ভৌগোলিক

রূপ এক অভিনব রসমূর্তি নিয়ে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। তাঁর

ছোটগল্পে ডোম, বাউড়ী, বাগদী, কাহার, বেদে, সাঁওতালের

এই নতুন সাহিত্যের নায়ক হয়েছে।” ২

তারাশঙ্কর দরিদ্র-দীনতার পাশাপাশি ঐশ্বর্য মহিমাকে আবিষ্কার করেছেন। প্রবৃত্তির লীলাকে তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং নিয়তির প্রসঙ্গ এনেছেন। প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বকে দেখেছেন। তাঁরই স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পে।

শৈলবালা ঘোষজায়া তাঁর গল্পে আঞ্চলিকতার রূপ দিতে পারেন নি। তিনি বঞ্চিত, নির্যাতিত পুরুষ ও নারীর জীবনকথাকে গল্পে রূপ দিয়েছেন। তাঁর ‘বিজয়ার নমস্কার’, ‘লাফো’, ‘দিপ্তি’ প্রভৃতি গল্প পাঠ করলে তা বোঝা যায়।

তারাশঙ্করের গল্পে গ্রাম্য কুসংস্কারের পরিচয় আছে। তাঁর ‘ডাইনী’ গল্পটি সার্থক নিদর্শন।

শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘করুণাদেবীর আশ্রম ছোটগল্পে অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মন্তব্য রয়েছে, যেমন —

“নৈতিক চেতনা যাদের নিষ্ক্রিয় সে সব নারীর আবার বিধবা বিবাহ কেন ?

কৌমার্য্য খন্ডন ও পাপ, অপরাধ।”

জ্যোতির্ময়ী দেবী বাংলা কথা সাহিত্যের এক শক্তিমতী শিল্পী। তিনি রাজস্থানে অনেক বছর কাটিয়েছেন। সেখানকার সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গপরিচয় গড়ে উঠেছে। তবে তিনি বঙ্গদেশের জীবনকথা মথুরা ও বৃন্দাবনের বহু অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অনবদ্য গল্প রচনা করেছেন। জীবনের বহু কান্না-হাসিকে বিভিন্ন ভাবে ও রূপে তুলে ধরতে গিয়ে অবহেলিত নারীসমাজ এর কথাকে তিনি ভুলে যাননি। বাঙালি হয়েও প্রবাসী জীবনের কথা জ্যোতির্ময়ী দেবী অত্যন্ত নিপুনভাবে তুলে ধরেছেন তার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কথাশিল্পীরাও বাঙালি হয়ে বিহারের জীবন ছন্দকে সার্থকভাবে রূপ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক সীমাতে প্রসারিত করেছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে একাধিক ছোটগল্পকার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন জাতপাতের উর্ধ্বে ছোটগল্প রচনা করে তথাকথিত রক্ষণশীল পরিবারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তার সার্থক নিদর্শন আমরা খুঁজে পাই ‘ত্যাগ’ ছোটগল্পে। ঠিক তেমনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ গল্পেও রয়েছে সেই জাতপাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গল্পের নায়িকাকে এক মুসলমান স্পর্শ করেছিল বলেই তৎকালীন সমাজ তাকে কলঙ্কিনী অখ্যা দিয়েছিল, অথচ সেই মুসলমান ছেলেটি তাকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু সমাজ তার যথাযথ মূল্যায়ন করেনি।

‘বেটিকা বাপ’ জ্যোতির্ময়ী দেবীর এক অন্যতম প্রতিবাদী গল্প। যার রাজপুতানার মেয়েদের নিপীড়নের ছবি আছে। পণপ্রথা, বিধবানারীর প্রতি অবিচার রবীন্দ্রনাথের একাধিক ছোটগল্পে যেমন রয়েছে, তেমনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পেও তার সন্ধান মেলে।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে যেমন দরিদ্র, হতভাগ্য, নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে তেমনি জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘সেই মেয়েটি’, ‘সেই ছেলেটা’, ‘জবালা’ প্রভৃতি গল্পেও অসহায় মানুষের প্রতি করুণা ব্যক্ত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের মতো জ্যোতির্ময়ী দেবীও পতিতা নারীদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন ‘আরাবল্লীর আড়ালে’, ‘জরতী’, ‘দমন্তীর ঠিকানা’, ‘মধুমালতী’ প্রভৃতি গল্প তার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

‘সতী’ গল্পে সহমরণের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘সতী’ গল্পে উনিশ শতকের প্রথম দশকে সহমরণের নিখুঁত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। এই গল্পে সত্য অলক মনির সহমরণ প্রসঙ্গে লেখিকা জানিয়েছেন, অলকমণিকে বস্ত্র অলংকারে সজ্জিত করে পা দু’খানি আলতা দিয়ে রাঙিয়ে সতী শয্যার সমাপনান্তে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তৎকালীন সময়ে সতী হওয়াকে পুণ্য বলেই মনে করা হতো। আলোচ্য গল্পে এক সংলাপে সে কথা ব্যক্ত হয়েছে —

“আহা মাগো ! সতী হবে গো ! আহা সাবিত্রীয়ে

আহা কি রূপ রে মার।

‘কেউ বলল হে গা, ভয় লাগবে না মার ?’ ‘কেউ

বললে, ‘এই গেল বছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছ গো ! আহা

কিসের বয়স ! তা বিধবা হয়ে বেচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো।”

ফুল, মালা, চন্দন, সিঁদুর, আলতা, শাঁখ, হৃত, মধু এগুলো নিয়ে পুরোহিতের নির্দেশে চিতা সাতবার প্রদক্ষিণ করবার পর গুরুদেব বললেন,

“মা, আপনি পতির চরন দুটি কোলে করে বসুন।

তাকে ধ্যান করুন, স্মরণ করুন কোন ভয় নাই।

মহাসতী লোক আপনাদের জন্যই মা।”

এরপর বাদ্যভাঙ। শব্দ কোলাহল। কোলাহল। অলকমণির সংজ্ঞা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত, আচ্ছন্ন হয়ে গেল নিঃশব্দে। নীরবমুখে অলকমণি সতীলোকে যাত্রা করলেন। নিঃশব্দে দেহ পুড়তে লাগল।

‘প্রবাসী’ পত্রিকায় এই মৃত্যু প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল,

“১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের আসন্ন দ্বিশত জন্ম বার্ষিকী স্মরণে লেখা।

সতী অলকমণি রামমোহনের জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের দ্বিতীয়া পত্নী।
তঁার সহমৃত্যুতেই রাজা মর্মান্বিত ও বিচলিত হয়ে ঐ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে
আন্দোলন করেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, ঐ প্রথা সরকারী আইনে নিষিদ্ধ হল
লর্ড বেন্টিনের সময়ে।”

রাধারাণী দেবী বাংলা সাহিত্যের এক বিশিষ্ট গল্পকার। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ
চৌধুরী রাজশেখর বসু ও অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা তঁার জীবৎকালে সাহিত্য রচনা
করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাধারাণী দেবীর গল্পে সেই প্রভাব রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের
একান্ত স্নেহধন্য ছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা
যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন তঁার গল্পে নারী মুক্তির কথা বলেছেন রাধারাণী দেবীর গল্পেও নারী
মুক্তির প্রসঙ্গ আছে। পুরুষ ও নারীর সমান অধিকারের কথা রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রতিফলিত হয়েছে।
পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের উপর শোষণ, বঞ্চনা ও অবমাননার চিত্র রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন
‘দেনাপাওনা’, ‘অপরিচিতা’, ‘হৈমন্তী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘নষ্টনীড়’, ‘মহামায়া’, ‘পয়লা নম্বর’ প্রভৃতি
ছোটগল্পে।

রাধারাণী দেবীর ‘যমের অরুচি’, ‘হায়রে হৃদয়’, ‘তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে
শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়’, ‘আলো কোথায় ওরে আলো’, ‘পরমতৃষ্ণা’ ও ‘বিস্তীর্ণ বারিধির
একটি বৃন্দবন’ গল্পে নারীর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। সেইসঙ্গে সামাজিক
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে লেখিকার প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারিত হয়েছে।

রাধারাণী দেবীর সাহিত্য গুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি বহু গল্পের নামকরণ করেছেন
রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক ব্যঙ্গনার অনুসরণে। যেমন - ‘নিশিথ রাতের বাদল ধারা’, ‘অন্তরেতে অশ্রু
বাদল ঝরে’, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’, ‘যে নদী মরুপথে হারালো ধারা’ ও ‘হায়রে হৃদয়
; তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়’ প্রভৃতি গল্প তঁার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

রাধারাণী দেবী কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন তঁার গল্পে তুলে ধরেছেন
যেমন - ‘দাবীহারা’ গল্পে —

‘সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে’।

‘মাসি’ গল্পে ‘দেবতার গ্রাস’ কবিতার ছত্র তুলে ধরেছেন। যেমন -

‘রাখাল থাকিবে সুখে

মার চেয়ে আপনার মাসীমার বুকে।’ এবং

‘গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি’ গেল ক্রমে,

মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে।’

আঙ্গিকগত দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর গল্পের তুলনা করা যায়। রাধারাণী দেবীর ‘মা’ গল্পের শুরু হয়েছে। নিম্নলিখিতভাবে —

“শেষ চৈত্রের অগ্নিবর্ষা মধ্যাহ্ন। প্রখর রৌদ্রের রং চোখ-ঝলসানো সুতীত্র।

বাগানের ভিতরে ফুলগাছগুলো মোলার গাছের মত প্রাণহীন আড়ষ্টভাবে দাঁড়িয়ে অগ্নি পরীক্ষা দিচ্ছে। তাপসী পৃথিবী যেন পঞ্চগ্নি তপে কৃচ্ছনিগ্না।”

লেখিকার ‘নিশীথ রাতের বাদলধারা’ গল্পটির সমাপন ঘটেছে এইভাবে,

“তারপর ? তারপর আবার অন্ধকার দ্বিগুণতর হয়ে জমে যাক্

- আকাশের বুকফাটা কান্না আরও ফুঁপিয়ে ঝরতে থাকুক ভিজে হাওয়া

নিরুপায় সর্বনাশের বেদনায় আত্মহারা হয়ে, ঘরে ঘরে রুদ্ধ বাতায়নে

ব্যর্থ ক্ষোভে আছড়ে পড়ুক - হুঁ - হুঁ -”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মাল্যদান’ ছোটগল্পের সূচনা হয়েছে আবহাওয়া সংক্রান্ত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে —

“সকালবেলায় শীত-শীত ছিল। দুপুর বেলায় বাতাসটি অল্প একটু

তাতিয়া উঠিয়া দক্ষিণ দিক হইতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে।”

রবীন্দ্রনাথের ‘সমস্যাপূরণ’ গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে নিম্নলিখিতভাবে —

“এই সামান্য ঘটনায় লিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা

পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতিক্ষুদ্র

দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুদ্র হইয়া উঠিল।”

রাধারাণী দেবীর গল্পের বর্ণনা অংশ আমাদের রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘আলো - কোথায় ওরে আলো’ গল্পে উপমার আশ্রয় নিয়ে রাধারাণী দেবী মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। অমলা চরিত্রটি নির্মান করতে গিয়ে প্রকৃতির অঙ্গন থেকে বেছে নিয়েছেন অনবদ্য সৌন্দর্যকে। যেমন—

“অমলারা থাকে শহরের অল্প তফাতে কুশী নদীর ধারে একখানি সুন্দর সুন্দর সাহেবী বাংলোয়। সামনে ঘন-সবুজ টেনিস গ্রাউন্ড। আশেপাশে বিলাতী ও দেশী ফুলের গাছ এবং ফ্রেণ্টনের কেয়ারি। ‘পর্যাপ্ত পুষ্প স্তবকাবিনম্রা’ বিলাতী লতা, তার ঘনকুসুমিত সবুজ বল্লরী বিস্তারে বাংলোর সম্মুখস্থ প্রাচীর ও উপরে রক্তবর্ণ টালির ঢালু-ছাদটির অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়াছে।”

রবীন্দ্রনাথের ‘সুভা’ ছোটগল্পে আমরা দেখি সঙ্গীহীন বোবা বালিকা সুভার সঙ্গে প্রকৃতির আত্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যেমন —

“প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়।

নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর-সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ রাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তদ্ধ হৃদয় উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই শব্দ এবং বিচিত্রগতি ইহাও বোবার ভাষা বড়ো বড়ো চক্ষু পল্লবিশিষ্ট সুগভীর যে ভাষা তাহারই একটি বিশ্বব্যাপী বিস্তার ; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।.....রুদ্ধ মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিত একজন সুবিশীর্ণ রৌদ্রে, আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।”

আলোচ্য বর্ণনায় একটি স্নেহকাতর পিতৃহৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। অসহায় অমলার উপর তার সমস্ত পিতৃ স্নেহ বর্ষিত হয়েছে।

নাটকীয় সংলাপ প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। ‘রাসমণির ছেলে’ ছোটগল্প থেকে নাটকীয় সংলাপ অংশটি প্রদত্ত হল —

“রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ কী ত্রা’

ভবানীচরণ কহিলেন, ‘সেই অইল।’

রাসমণি কহিলেন, ‘কে দিল।’

ভবানীচরণ কহিলেন, ‘কালরাত্রে সে আসিয়াছিল - সে দিয়া গেছে।’

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ কী হইবো’

ভবানীচরণ কহিলেন, ‘আর আমার কোনো দরকার নাই।’

বলিয়া সেই দলিল চিন্ম ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।”

পাশাপাশি রাধারাণী দেবীর ‘অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝরে’ গল্পের সংক্ষিপ্ত সংলাপ

অংশটি ও পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

“প্রভাত চেয়ারে ভালো করিয়া উঠিয়া বসিয়া সহাস্যে

বলিল - ‘আজ কেন, আদেশ বলুন !’

সুধা হাসিয়া বলিল - ‘যা আপনার অভিরুচি ! কিন্তু

আমাদের কথা রাখবেন কিনা আগে বলুন ?’

‘অবশ্যই রাখব।’

‘বৌদিরা সীমা চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

আপনি নিয়ে যেতে পারবেন কি ?

‘হ্যাঁ। এতো অতি উত্তম প্রস্তাব।’

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রাধারাণী দেবীর গল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র ছিলেন রাধারাণী দেবীর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। রাধারাণী ‘শরৎচন্দ্রঃ মানুষ এবং শিল্প’ প্রবন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং শরৎ সাহিত্যের দ্বারা তিনি যে অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছেন তা অকপটে স্বীকার করেছেন। শরৎচন্দ্র যেমন নারীর ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাধারাণী দেবীও তেমনি নারী মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। রাধারাণী দেবী নারীর ভাবমূর্তির কথা নিজেই বলেছেন, তাঁর ‘নারী’ প্রবন্ধে,

“আমি নারী, আমি সেবিকা, আমি কন্যা, আমি ভগ্নী, আমি পত্নী, আমি মাতা।” ৩

শর্মিলা বসুদত্ত রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন দ্বিতীয় খন্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন, “দ্বিতীয় খন্ডের জন্য নির্বাচিত গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় বাংলা তথা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র কেন্দ্রিক যে ধারা ভাবীকালকে আপ্ত করে রেখেছিল, রাধারাণী দেবীর গল্পগুলো সেই ধারারই শরিক। এখানে যুক্তিবুদ্ধি বা নৈব্যক্তিকতা ততটা ক্রিয়াশীল নয়, যতটা কাজ করে সেন্টিমেন্ট। মানুষের কিছু যুক্তিহীন অনুভূতি আর আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা এই গল্পগুলোতে আজকের পাঠক যে ধরনের পরিণতি আকাঙ্ক্ষা করতো অনেক সময়ই অনুপস্থিত।”

শরৎচন্দ্রের ‘একাদশী বৈরাগী’, ‘অভাগীর স্বর্ণ’, ‘মহেশ’, ‘বিলাসী’ প্রভৃতি ছোটগল্প গ্রামীণ হিন্দু সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে।

রাধারাণী দেবীর ‘যমের অরুচি’, ‘পরম তৃষ্ণা’, ‘আলো-কোথায় ওরে আলো’ ‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদবুদ’ প্রভৃতি গল্পে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

‘মহেশ’ গল্পে গোফুরের জীবনযাত্রণা ব্যক্ত হয়েছে। সামাজিক অবিচারের জন্য একদিন গোফুর তার নিজের গ্রাম ত্যাগ করে যাবার সময় তাঁর গ্রামের দিকে তাকিয়ে আল্লার দরবারে নালিশ জানিয়েছে। শরৎচন্দ্রের প্রতিবাদী ভাষা নিম্নে প্রকাশিত হয়েছে এভাবে -

“আল্লা, আমাকে যত খুশী সাজা দাও। কিন্তু মহেশ
আমার তেষ্ঠা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু
জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস
তোমার দেওয়া তেষ্ঠার জল তাকে খেতে দেয়নি,
তার কসুর তুমি যেন কখনো মাফ করো না।”

‘একাদশী বৈরাগী’ ছোটগল্পে একাদশীর প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারিত হয়েছে নিম্নোক্ত

অংশে -

“তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা। সুদ তো হয়েছে
কুললে সাত টাকা দু’আনা। আর দু’আনাই যদি

ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা

দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন ?”

রাধারাণী দেবীর ‘বিস্তীর্ণ বারিধির বুদবুদ’ নামক একটি গল্পে বিন্দু চরিত্রের মধ্যে প্রতিবাদ রয়েছে। বিন্দু পিতার মনোনীত পাত্রকে বিয়ে করতে চায়নি। সে কেঁদে কেঁদে তার বাবাকে বলেছে,

“দু’টি পায়ে পড়ি বাবা এসব বন্ধ করে দাও। বিয়েতে আমার একটু ইচ্ছা নেই। বিশ্বাস কর। কেন তুমি কি আমায় তাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছ বাবা।

বাপ ম্লান হেসে বললেন, - বিক্রি নয়, তবে নিঃশর্ত হয়ে দান করছি যে মা ! আর তো তোমার ওপরে আমার কোনো দাবী-দাওয়া থাকবে না।

বিন্দু আকুল কণ্ঠে বলে উঠল - পায়ে পাড়ি বাবা, এমন করে আমাকে তুমি পরের হাতে বিলিয়ে দিয় না। আমি সেখানে যাব না।”

শরৎচন্দ্রের একটি ছোটগল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশ প্রদত্ত হলো :-

“সে অনেক দিনের ঘটনা সত্যেন্দ্র চৌধুরী জমিদারের ছেলে; বি.এ. পাস করিয়া বাড়ি গিয়াছিল, তার মা বলিলেন মেয়েটি বড় লক্ষ্মী বাবা, কথা শোন, একবার দেখে আয়।”

গল্পের শেষে রয়েছে —

“নমস্কার বোন। বয়সে ঢের বড় হলেও তোমাকে আশীর্বাদ

করবার অধিকার তো আমার নেই - আমি কায়মনে প্রার্থনা করি

বোন, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক। চললুম।”

শরৎচন্দ্রের গল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশটি যে শিল্পগুণ সম্পন্ন তাতে সংশয় নেই।

রাধারাণী দেবীর ‘গতানুগতিক’ গল্পের শুরু হয়েছে এভাবে —

“মামা বাড়ীতে মানুষ, মাতৃহীনা কালো মেয়ে মলিনা।

শুশুর বাড়িতে বধূ জীবন-যাবন করছে চৌদ্দ

বছর বয়স থেকে। এখন বয়স আটাশ।”

গল্পের সমাপ্তিতে আছে,

“বধূ অকস্মাৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে ওঠে - ভালো না ছাই !

তারপর অবজ্ঞা ও আচ্ছিল্যের সহিত ঠোট উল্টে সিঁড়ি বেয়ে

উপরে যেতে যেতে বলতে থাকে মেয়ে মানুষ গৃহস্থঘরে

গান নিয়ে যেন ধুয়ে থাকেন।”

শরৎচন্দ্রের দীর্ঘ আয়তনের ছোটগল্পের সংখ্যা কম নয়। তাঁর ‘রামের সুমতি’,

‘বিন্দুর ছেলে’, ‘পথনির্দেশ’, ‘মেজদিদি’, ‘দর্পচূর্ণ’, ‘আঁধারে আলো’, ‘সতী’ প্রভৃতি বড় মাপের ছোটগল্প।

রাধারাণী দেবীর ‘দাবীহারা’, ‘মাসি’, ‘নিশীথ রাতের বাদলধারা’, ‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’, ‘মা’, ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে’ প্রভৃতি ছোটগল্পের আয়তন দীর্ঘ।

গল্পকার সাবিত্রী রায় উপন্যাস রচনার পাশাপাশি যে গল্পগুলি রচনা করেছেন সেগুলির অনেকটাই সমকালীন সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও তাঁর অনেক গল্প কালোত্তীর্ণ সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতিটি গল্পে প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তর যুগের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, ভারত স্বাধীনতালাভ, দেশ বিভাগ জনিত সংকট সমস্যা বাস্তবহারাদের সমস্যা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় সাবিত্রী রায়ের গল্পে ধরা পড়েছে।

সাবিত্রী রায়ের গল্পে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তিনি নারীর প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। তাঁর ‘ওরা সবপারে’, ‘রাধারাণী’, ‘স্বর্ণ হইতে বিদায়’, ‘সমঝাদার’, ‘অন্তঃসলিলা’, ‘হাসিনা’, ‘ধারাবাহিক’, ‘সাময়িকী’, ‘মাটির মানুষ’ প্রভৃতি গল্পে নানা ঘটনা, চরিত্র বিন্যাস, যুগের প্রতিবিশ্ব সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে।

সাবিত্রী রায়ের গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তুলনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ পণ প্রথার বিরুদ্ধে ‘দেনাপাওনা’, ‘হৈমন্তী’, ‘অপরিচিতা’ প্রভৃতি গল্প লিখেছেন।

সাবিত্রী রায় ‘মাটির মানুষ’ গল্পে পণপ্রথার চিত্র তুলে ধরেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে বরপণের করুণতম চিত্র প্রতিবিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু সাবিত্রী রায়ের এই গল্পটিতে কন্যা পণের উল্লেখ রয়েছে। যমুনার বাবা ভূমালী শশী’কে কন্যার পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে, তিনি কুড়ি এক টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয়নি।

লেখিকার গল্পে পরিচারিকা চরিত্রের একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পরিচারিকা চরিত্র থাকলেও তারা মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি। রবীন্দ্রনাথ উদ্ভাস্ত সমস্যা বিষয়ে কোন গল্প লেখেননি। সাবিত্রী রায় ‘ধারাবাহিক’, ‘সাময়িকী’, ‘হাসিনা’, প্রভৃতি গল্পে দেশভাগের জন্য ঘরছাড়া মানুষদের নিয়ে অনেক গল্প লিখেছেন।

সাবিত্রী রায় ছিলেন রবীন্দ্রানুরাগী। তিনি একাধিক গল্পে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছত্র তুলে ধরেছেন। ‘সমঝাদার’ গল্পে রবীন্দ্রনাথের গানভঙ্গ কবিতার লাইন —

“গাহিবে একজন খুলিয়া গলা।

আর একজন গাবে মনো।”

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃতি ও মানবচরিত্র পরস্পর দোসররূপে উপস্থাপিত

হয়েছে। যেমন - ‘নিশীথে’ গল্পে মনোরমার মনস্তাত্ত্বিক দিকটি তুলে ধরেছেন অপূর্ব শিল্পকুশলতার সঙ্গে —

“সেই মুহূর্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নিচে দিয়া গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিমপার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতিদ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল। সেটা মর্মভেদী হাসি কি অভভেদী হাস্যকার বলিতে পারি না। আমি তদভেদেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মুচ্ছিত হইয়া নিচে পড়িয়া গেলাম।”

দক্ষিণাচরণ মৃতা প্রথমা স্ত্রীর কথা ভুলে যেতে পারেনি। দ্বিতীয়া স্ত্রী মনোরমাকে প্রণয় সম্ভাষণ মুহূর্তে যে নিসর্গচিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

সাবিত্রী রায়ের ‘প্যারামবুলেটার’ গল্পে প্রকৃতিচিত্র —

“মাথার উপরে দেবদারু গাছে নেমে আসছে সূর্যবিহীন আকাশের শুদ্ধ বিষন্নতা। মালা সন্ধানী দৃষ্টিতে রাস্তার চারদিকে দেখে। রাস্তার লোকজন সব ছুটে চলেছে, ‘গুলি, গুলি চলছে। পালাও।’”

সুশান্ত এবং মালার পুত্র সন্তান হারানোর পটভূমিরূপে লেখিকা প্রকৃতি ও মানুষের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

সাবিত্রী রায়ের গল্পের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সাদৃশ্য কিছুটা রয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছিনিয়ে খাইনি কেন’ ছোটগল্পটি খাদ্য সংকটের পটভূমিকায় লেখা। মজুতদাররা যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সময়কালে কৃত্রিমভাবে খাদ্যসংকট সৃষ্টি করছে তাঁর জীবন্ত দলিল হল আলোচ্য গল্পটি। লুকানো গুদামে চালের পাহাড় রয়েছে অথচ সাধারণ মানুষ খাদ্যসংকটে প্রাণ হারাচ্ছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

“বৈকুণ্ঠ সা’র গুদামে কম করে তিন হাজার মন চাল আছে জানতাম চালান দেবার ব্যাপারে কত্তাদের সাথে ভাগ বাঁটোয়ারার মীমাংসা না হওয়ায় ব্যাটার গুদামে মাল শুধু জনছিল মাসখানেক। গুদামটার হুদিশ-টুদিশ দিয়ে কালক্ষণ সুযোগ ঠাহর করতে দুটো দিন কেটে গেল। যখন বললাম কিভাবে কি মতলব করেছি সারা গুদামের জমানো অন্নছিনিয়ে নেবার, তেমন যেন সাড়া এল না সবার কাছ থেকে। শুধু তাদের নয়, চাদিক এর কম করে হাজার ভুখা মেয়ে পুরুষ বাচ্চা বাঁচানোর উপায় হবে বললাম, সায় এল কেমন মনমরা ঝিমোনো মতন।”

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন খাদ্য সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন ক্ষুধার্ত মানুষ কেন নিজের বাঁচার জন্য বৈকুণ্ঠ সা’র গুদাম থেকে চাল লুট করে নেয়নি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’ ছোটগল্পটির সঙ্গে সাবিত্রীরায়ের ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পটির সাদৃশ্য রয়েছে। সাবিত্রী রায় ১৯৪৫ সালের ভয়াবহ দিনগুলির কথা ভোলেননি। ক্ষুধার্ত মানুষ মিছিল করে রান্না ঘরের নর্দমার পাশে এতটুকু ফ্যানের জন্য ভিড় করে লেখিকা তার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপভাবে ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পে —

‘পাচিকা অসাবধানতায় ফ্যানের সঙ্গে বেশ খানিকটা ভাত-ও গড়াইয়া পড়ে। আর সেই জন্যই..... ভিড় লাগিয়া যায় ঐটুকু সংকীর্ণ নর্দমার পাশে। অনেকগুলি হাত একসঙ্গে ভিড় করে যেখানে ভাত মেশান থকথকে ফ্যান পড়িয়া আছে। ঠেলাঠেলির চোটে কেউ-বা পচা দুর্গন্ধ নর্দমাটায় হুমড়ি খাইয়া পরিয়া যায়।’

ক্ষুধার্ত মানুষেরা খাদ্যের সন্ধান পেয়ে নোংরা নর্দমার বাছ-বিচার না করে চরম ক্ষুধায় ফ্যানের ভাত পেয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু করেছে। খাদ্যসংকটজনিত কারণে সাধারণ মানুষগুলি মেনে এসেছে রাস্তায়, তারা আজ ভিখার। সদ্য প্রসূতা এক মৃতা জননীর অসহায় মৃত্যু শহরে নাগরিকদের হৃদয়ে করুণা জাগাতে পারেনি। লেখিকার প্রশ্ন কেমন করে মানুষ এতটা নিষ্ঠুর হতে পারল ? এই অমানবিক আচরণের জন্য কি অস্থির সময়ই দায়ী ?

মানিকের ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’ গল্পটির শুরু হয়েছে এইভাবে,

“দলে দলে মরছে তবু ছিনিয়ে খায়নি। কেন জানেন বাবু ?”

‘ছিনিয়ে খাইনি কেন’ ছোটগল্পটির সমাপ্তিতে রয়েছে,

“তার পরিবার খেতে না পেরে হারিয়ে গেছিল তো ?

যেভাবে পারে খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো ?

তারপর আর কোন কথা আছে ?”

সাবিত্রী রায়ের ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পটির প্রারম্ভে আছে,

“অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া প্রকাণ্ড এক বাড়ী - দক্ষিণের বারান্দায়

পোষা বিলিত কুকুর, সামনেই টেনিস লন। পেছনের দিকে রান্নাঘর।

সেখানে ঠাকুর-চাকরের এলাকা।”

লেখিকার ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পটির সমাপ্তি ঘটেছে নিম্নরূপ ভাবে,

“শোভনের স্তব্দ চোখের সামনে পূর্ব রাত্রির মূর্তিটি ভাসিয়া উঠে।

কানে তখনও বাজিতেছে - ঘৃণামিশ্রিত তাক্সিল্যের সুর

- ‘ও আর নতুন কিছু নয়।’

শরৎচন্দ্রের ‘ছিনিয়ে খাইনি কেন’ গল্পের মতো সাবিত্রী রায়ের ‘নতুন কিছু নয়’ গল্পটির শুরু ও সমাপ্তি অংশটিও যথার্থই শিল্পগুণ সমন্বিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবাদী গল্পগুলি যথাক্রমে - ‘মাটির মাগুন’, ‘ছিনিয়ে খায়নি কেন’, ‘অসহযোগী’, ‘দুঃশাসনীয়’, ‘রাঘব মালাকার’, ‘হারানের নাতজামাই’ প্রভৃতি। তিনি অর্থনৈতিক শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সমাজ-পরিবর্তন আনতে চেয়েছেন।

সাবিত্রী রায়ের প্রতিবাদী ছোটগল্পগুলি যথাক্রমে - ‘নূতন কিছু নয়’, ‘ওরা সব পারে’, ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’, ‘রাধারাণী’, ‘সমঝদার’, ‘সাময়িকী’, প্রভৃতি।

সাবিত্রী রায়ের গল্পের সঙ্গে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির ছোটগল্প রচয়িতা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের কিছু কিছু মিল আমরা খুঁজে পাই। দু’জনেই ৪০ ও ৫০ দশকের বাংলাদেশের বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। উভয়ের গল্পে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, সমাজের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক ভঙ্গিমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।

উদ্ভাস্ত সমস্যা নিয়ে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের মতো সাবিত্রী রায়-ও গল্প লিখেছেন। সাবিত্রী রায়ের ‘সমঝদার’ ও ‘হাসিনা’ তার সার্থক দৃষ্টান্ত। নরেন্দ্রনাথের ‘আলপিন’, ‘পালঙ্ক’, ‘হেডমাস্টার’, ‘পূর্ণ’ প্রভৃতি গল্পগুলি তার সাক্ষ্য বহন করে। অস্থির সময়ের টুকরো-টুকরো ছবি সার্থক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। যৌথ পরিবারের ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, জীবন-জীবিকার অস্থিরতাকে গল্পে রূপ দিয়েছেন। উভয়েই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়েছেন। শুধুমাত্র বিষয়গত নয়, আঙ্গিকগত দিক থেকে-ও সাবিত্রী রায় ও নরেন্দ্রনাথের গল্পের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা সাহিত্যের মহিলা গল্পকারদের মধ্যে ছবি বসু একটি পরিচিত নাম। মনন ও হৃদয়বত্তার মেলবন্ধনে তিনি বাংলা সাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর ‘আগুন রাঙা’, ‘প্রবাহমান’, ‘ছায়াঅরণ্য’, ‘বসন্ত’ প্রভৃতি গল্পগ্রন্থে সমাজ বাস্তবতার পরিচয় মেলে। রাজনীতি সচেতন ছবি বসু সাম্যবাদের ভিত্তিতে সমাজে পরিবর্তন আসবে এটা বিশ্বাস করতেন। ‘বাংলার নারী আন্দোলন’ গ্রন্থে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সাধারণ নর-নারীর সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধনাকে গল্পে রূপায়িত করেছেন যেগুলি কোনটিই গতানুগতিক নয় প্রত্যেকটিই শিল্পোত্তীর্ণ।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে ছবি বসু বাংলা সাহিত্য রচনা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর থেকেই তাঁর সাহিত্য জগতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। স্বাভাবিক কারণে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী গল্প লিখেছেন। তাঁর ছোটগল্পের বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের মতো যুগোত্তীর্ণ গল্প হয়ত তিনি সৃষ্টি করতে পানেনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমাজ

সমস্যামূলক গল্পের সঙ্গে ছবি বসুর গল্পের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীমুক্তি, সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিকার করেছে। ‘দেনাপাওনা’, ‘শাস্তি’, ‘অপরিচিতা’, ‘হৈমন্তী’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘নষ্টনীড়’, ‘পয়লা নম্বর’, ‘ত্যাগ’, ‘পাত্র পাত্রী’, ‘মহামায়া’, ‘মানভঞ্জন’, ‘দুরাশা’, ‘যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ’, ‘পুত্র যজ্ঞ’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘হালদার গোষ্ঠী’, ‘চিত্রকর বদনাম’, ‘দুর্বুদ্ধি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘নামঞ্জুর’, ‘চোরাই ধন’, ‘উলুখড়ের বিপদ’, ‘তোতা কাহিনী’, ‘ভুল স্বর্গ’, ‘গিল্লী’, ‘পরীর পরিচয়’, ‘প্রতিহিংসা’, ‘ব্যবধান’, ‘দান প্রতিদান’, ‘বড় খবর’, ‘রাজ টিকা’, ‘সংস্কার’, ‘সে’, ‘পণরক্ষা’, ‘বিদূষক’, ‘অনধিকার প্রবেশ’, ‘বোষ্টমী’, ‘কর্তার ভূত’, ‘সুভা’, ‘সমস্যা পুরণ’, প্রভৃতি গল্পে নারীর মর্যাদা, সমাজ প্রথার অবাস্তব হ্রাসকরতা, বংশমর্যাদা বনাম ব্যক্তি, সামাজিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তির আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সমষ্টির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির বিদ্রোহ, মূল্যবোধের অপচয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, অন্ধকুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রপ, রাজনৈতিক ভদ্রামির বিরুদ্ধে ক্রোধ ও ব্যঙ্গ বলসে উঠেছে।

ছবি বসু তাঁর স্বরচিত তিনটি গল্প সংকলন গ্রন্থে সমাজ সমস্যা, দারিদ্র, নিপীড়ন, বঞ্চনা, নারীর অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গ আমাদের রুঢ় বাস্তবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি জীবনবাদী শিল্পী, তাঁর প্রতিটি গল্পের প্রতিটি চরিত্র ও বিষয় জীবন থেকে নেওয়া। এরূপ গল্পের নিদর্শন হিসেবে আমরা বলতে পারি - ‘কান্না’, ‘দাগ’, ‘আগুন রাঙা’, ‘রাধামাসী’, ‘অন্তরাল’, ‘বিভাবৌদি’, ‘সরীসৃপ’, ‘দাহ’, ‘উত্তরাধিকার’, ‘জীবন জীবিকা’, ‘পায়ের তলায় মাটি’, ‘হরমোহনের সমাজচেতনা’, ‘কাপুরুষ’, ‘সখী-সংবাদ’, ‘স্মৃতি-বাতায়ন’ প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সমাজ বাস্তবতার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো - ‘শাস্তি’ ছোটগল্পে দুঃখিরাম তার স্ত্রী রাধাকে খিদে মেটানোর জন্য ভাত দিতে বলল —

“বারুদের বস্তায় আগুন পড়ার মতই রাধা কণ্ঠস্বরকে সর্বোচ্চ স্তরে তুলে চিৎকার করে বলল,

“ভাত কোথায় যে ভাত দিব ? তুইকি চাল দিয়া গিয়াছিলি

আমিকি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।”

স্ত্রীর এরূপ উক্তি শুনে দুঃখিরামের মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। এতকিছু না ভেবে ক্রুদ্ধ বাঘের মত লাফিয়ে উঠে হাতের দা রাধার মাথায় বসিয়ে দিলো। রাধা চন্দরার কুলেরগাছে পড়েগেল এবং সাথে সাথেই তার মৃত্যু হলো।

পাশাপাশি ছবি বসুর ‘পথ চলতে’ গল্পে সমাজবাস্তবতার একটি দিক নিয়ে প্রদত্ত হল —

“রতনবালা বোঝে তার চেয়েও দুঃখী জন আছে জগতে।
সমসারে তার কিছু না রইলেও গতর রয়েছে। সেই গতর
চরিয়ে সে এই রাস্তায় দিব্যি খুরতে পারে। কালীঘাট অঞ্চলে,
চেতলার গলিতে অনেকেই দেখেছে পড়ন্ত বেলায় এক কালামুখী
কন্যে, তার বয়স কত বোঝা মুশকিল - খ্যানখ্যান গলায় চ্যাঁচাচ্ছে -
মাগো, বৌদিগো, জ্বালানি নিবেন নাকি ? মাটি চাইগো মাঠাকুরণ ?”

পদ্মমণি বলে - ‘মাটি তো নয়, ধরিণ্ডি মা,

মাথায় ধারন করা ভাগ্যিমানের কতা। মাটিতেই মোদর জন্ম নৃত্য।”

‘মা-লক্ষ্মীর কিরপা হবে তোর পরে রে অতন বালা’। দূর দূর কিরপা না ছাই। ঘেসো
কয়লা, মাটি আর আবর্জনা ঘেটে বিরথাই তার জীবন যায়। এর চেয়ে সড়ক বানানো অনেক ভাল,
নগদ পয়সা-গন্ডার ভাবনা নেই।’

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করেননি। ছবি বসু তাঁর
একাধিক গল্পে চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে গল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন। ‘হরমোহনের
সমাজচেতনা’ গল্পে বারো বছরের অস্থায়ী কাজের মেয়ে বীণার মুখের আঞ্চলিক ভাষা সার্থকভাবে
প্রয়োগ করেছেন —

“দেখোনা দাদু ভোররাত থাকতি নাইন দিছিলাম,

তাইতো পাঁচ পাঁচ দশ নিটার তেল পেইছি।”

আরেকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল - ‘সেদিনের গল্প’ ছোটগল্প থেকে —

“সারেং ডাকে - ‘আহেন গো দিনিগিরা,

তিন বুনের পীরিত দ্যাহেন। তিন বুনতো

নয় তিন কন্যে- মেঘনা, ধলেশ্বরী আর পদ্মা।”

মানবচরিত্রের ওপর প্রকৃতির প্রভাব কতটা গভীর সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ছবি
বসুর তুলনা করা যেতে পারে। ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’ ছোটগল্পে রাইচরণ পদ্মার ভাহনে খোকাবাবুকে
হারিয়ে বুকফাটা আত্ননাদের সময় পদ্মা খল-খল, ছল-ছল করে বয়ে গেছে,

“..... যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য

ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন একমুহূর্ত সময় নাই।”

-রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ ছোটগল্পে পোস্টমাস্টার ও রতনের পরিচয় ঘটেছিল
উলাপুর গ্রামে। তার প্রাক্কালে প্রকৃতি পোস্টমাস্টারকে কতটা বিচলিত করেছিল তার সার্থক চিত্র
খুঁজে পাই নিম্ন-উক্ত অংশে,

“একদিন বর্ষকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাম এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উথিত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরনীর উষ্ণ নিশ্বাস গাচের উপরে আসিয়া লাগিতেছে এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটাকা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণ স্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিলনা - সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূতবর্ষার ভগ্না বিশিষ্ট কৌদ্রশুভ্র স্তপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময় কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত - হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ক্রমে মনে হইতে লাগল, সেই পাখি ওই কথাই বার বার বলিতেছে এবং এই জনহীন তরুচ্ছায়া নিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লব মর্মরের অর্থও কতকটা ওই রূপ।”

ছবি বসুর ‘একপ্রজন্ম’ গল্পের নায়কের সঙ্গে নায়িকার প্রথম দর্শনে মনস্তাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা তুলে ধরেছেন প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে,

“তাঁর একচোখে আঙুন, আর একচোখে জয়ের হাসি। জানেন, আমি যদি শিল্পী হতুম সে ছবি আমি তুলির আঁচড়ে শাস্ত্রত করে রাখতুম। আমি তা পারিনি।”

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ছোটগল্পকার শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ছবি বসুর গল্পের তুলনা করা যায়। শরৎচন্দ্রের বেশিরভাগ গল্পের বিষয় পরিবার কেন্দ্রীক, মাতৃহৃদয়ের স্নেহ পরায়ণতা, প্রেমের বিচিত্র জটিল রহস্য উদ্ঘাটন। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার ছবি তুলে ধরতে শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত। গল্পের প্লট গঠনে, বিভিন্ন চরিত্রে মানবিক অনুভূতির প্রকাশে, ভাষার জাদুকরী স্পর্শে, করুণ রস প্রয়োগে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলি শিল্পসফল সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্র নানা দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে দেখেছেন। তিনি নানা পরিমাপের গল্প লিখেছেন। ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের সুমতি’, ‘বিলাসী’, ‘মামলার ফল’, ‘অনুপমার প্রেম’, ‘স্বামী’, ‘মেজদিদি’, ‘নিস্কৃতি’, ‘নববিধান’, ‘একাদশী-বৈরাগী’ প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে কোন কোন গল্প আকারে বড়। তাঁর পারিবারিক বিরোধ ও প্রতিবাদী ছোটগল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘মহেশ’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘পরেণ’ প্রভৃতি।

‘একাদশী-বৈরাগী’ গল্পে অপূর্ব ও বিপিন সুদের ব্যবসা করে। একাদশী মহাজন হলেও সততাকে হারায়নি। সে রামলোচন চাটুজ্যের সুদের সুদ আংশিক হলেও মুকুব করে দিয়েছে। একাদশী বলেছে-

“বেশ দিতে হবেনা। টাকাটা এতদিন খেটেছেতো ? বসেতো থাকেনি ?

আট বছরের সুদ। এই ক'মাস সুদ বাদ পড়বে।”

‘মহেশ’ গল্পটিতে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে গফুর ও আমিনার জীবনে মর্মস্পর্শী রূপ নিয়েছে শরৎচন্দ্র তা শিল্প সম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। এই গল্পে মানুষ ও পশুর মধ্যে যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বিশ্ব সাহিত্যে দুর্লভ। মহেশের মৃত্যু দৃশ্যটিও শিল্পোৎকর্ষের উজ্জ্বল নিদর্শন —

“একটিবার মাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণদেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোন্ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তারপর সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটো তাহার যতদূর যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।”

ছবি বসুর ‘প্রবাহমান’, ‘দাহ’, ‘হরমোহনের সমাজচেতনা’, ‘কান্না’, ‘কাপুরুষ’, ‘গায়েরবে’, ‘সেইমেয়ে’, ‘গায়েন বৌ’ প্রভৃতি গল্পে সমাজ সমস্যা ; দারিদ্র্য, নিপীড়ন, বঞ্চনা ও প্রতিবাদের পরিচয় মেলে। ছবি বসুর ‘কাপুরুষ’ গল্পে সামাজিক অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে —

‘তবে তোমার টেবিলে, ফাইলের আনাচে-কানাচে কত টাকা ছড়ানো।

মুঠো মুঠো, একটু খুঁটে নিলেই হয়। নিতে কি খুব কষ্ট ?

সুট করে এই বুক পকেটে’.....

- ‘না, আমি নেব না।’

- ‘সাহস নয়, বিবেক। এটা ভাঙিয়েই তো এত বছর টিকে রয়েছি !’

- ‘ওটার আবার এ পাড়ায় যাতায়াত করা কেন ? কলূপ এঁটে রাখ। দেখ

ওটা নিয়ে

এখন কেউ মাথা ঘামায় না’.....

- ‘মাথা খারাপ। তাহলে কি নিয়ে বাঁচবে ?’

- ‘কেন ? তোমাকে নিয়ে।’

- ‘শালা, তুমি আমাকে ঘুষ নিতে বলছ ?’

- ‘মানে ঠিক তা নয়। তুমি তো আর কারো ঘরে সিঁধ কাটতে

যাচ্ছনা।’

- ‘ওটা বুঝি চুরি নয় ! কথার খুব বোলচাল শিখেছতো।’

- ‘ছিঃ, ওরকম ইতরের মতো কথা বোলো না। ভদ্রভাবে বল।’

- ‘তোমার ঐ ভদ্রতার মুখে আমি লাথি মারি।’

আধুনিক মহিলা গল্পকারদের মধ্যে প্রতিভা বসুর গল্পগুলি আপন বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। বিষয়বস্তু নির্বাচন ও আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য প্রতিভা বসুর শিল্পকর্ম অভিনব বলা যেতে পারে। কাব্যগুণ, নাট্যগুণ, যাদুকরী ভাষা চরিত্র সৃজনে অভিনব তাঁর গল্পগুলিকে স্বাতন্ত্র্য রূপে চিহ্নিত। অভিজ্ঞতার শিল্পী প্রতিভা বসু আবেগহীন ভাবে মানব জীবনকথা ব্যক্ত করেছেন।

প্রতিভা বসুর গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা নিয়ে প্রদত্ত হল —

রবীন্দ্রনাথ যে গল্পগুলি লিখেছেন তার মানবিক আবেদন চিরন্তন। হৃদয় নির্ভর অনুভূতিপ্রবণ গল্পগুলির পাশাপাশি বুদ্ধিগ্রাহ্য, তত্ত্বপ্রধান এই দুই শ্রেণির গল্প রচনা করে পাঠক মনে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। মানবীয় সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত তথা অন্তর্দন্দ্ব তিনি শিল্পসম্মতভাবে রূপ দিয়েছেন। বাস্তব ও কবি কল্পনার অপূর্ব মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন অসামান্য ভাষারীতির প্রয়োগে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী গল্পের সংখ্যাও কম নয়। সামাজিক অর্থনৈতিক, ধর্মাত্মতা, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক অন্যায়ে বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদী চরিত্রগুলি যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, যা পরবর্তী গল্পকারদের প্রভাবিত করেছে।

প্রতিভা বসুর প্রতিবাদী গল্পের সংখ্যা সীমিত। তাঁর ‘স্বামী-স্ত্রী’, ‘অন্ধকারে’, ‘ভালোবাসার জন্ম’, ‘গর্ভধারিনী’, ‘ন্যায়-অন্যায়’, ‘স্বপ্নভেঙ্গে যায়’, ‘রূপান্তর’ প্রভৃতি গল্পে রয়েছে প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রকরণহত অভিনবত্ব অসামান্য। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংহত চিত্রকল্প ও সূক্ষ্মব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। গল্পের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ গল্পের যে প্লট বিন্যস্ত করেছেন তা কোনটাই শিথিল হয়নি। ‘গুপ্তধন’ গল্পের সূচনা অংশে আমরা দেখি —

“অমাবস্যার নিশীথ রাত্রি। মৃত্যুঞ্জয় তাত্ত্বিক মতে তাহাদের

বহুকালের গৃহদেবতা জয়কালীর পূজায় বসিয়াছে।

পূজা সমাধা করিয়া যখন উঠিল, তখন নিকটস্থ আমবাগান

হইতে প্রতুষের প্রথম কাক ডাকিল।”

- মৃত্যুঞ্জয়ের গুপ্তধন প্রাপ্ত এবং গুপ্তধনে অনীহা গল্পের ক্লাইমাক্স সৃষ্টি করে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। গল্পশেষে আমরা দেখি,

“মৃত্যুঞ্জয় যে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া

কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।”

রবীন্দ্রনাথের ‘জীবিত ও মৃত’ গল্পের শেষ বাক্য,

“কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।”

- মর্মস্পর্শী ভাষায় শেষবাক্যটি রবীন্দ্রনাথ পরিবেশন করেছেন, যা অর্থবহ।

‘পয়লা নম্বর’ গল্পের সমাপ্তিতে সিতাংশ একটি চিঠি লিখেছে অনিলকে, “আমি চললুম। “আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করো না। করলেও খুঁজে পাবে না।”

প্রতিভা বসুর গল্পের শুরু ও সমাপ্তি অংশ যে শিল্পরূপের পরিচয় হবন করে, ‘প্রতিভা’ গল্প থেকে তার একটি নিদর্শন নিয়ে প্রদত্ত হল —

“একদিন সন্ধ্যাবেলা এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এলেন আমাদের বাড়ি। মাথার চুল এত সাদা হয়ে গেছে যে প্রথমটায় চিনতে পারিনি। একটু পরে, ও আপনি ? বলে তাড়াতাড়ি আদর যত্ন করে বসলাম।”

- প্রারম্ভিক অংশ পাঠ করেই আমরা বুঝতে পারি, গল্পের নায়ক দীর্ঘবছর বাদে তার অতীতের প্রণয়িনীকে দেখেছে।

আবার ‘বিকেবেলা’ ছোটগল্পের সমাপ্তি অংশটিতে রয়েছে করুণ সুরের আবেস,

“অমু বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকল সুমন্তর দিকে।

আস্তে আস্তে সমস্তটা চোখ চামচে ভরা জলের মতো টলটল করে উঠল।”

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রকৃত ও মানব জীবনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। রবীন্দ্রনাথের ‘অতিথি’ গল্পের শুরুতে ও সমাপ্তিতে নদীর উল্লেখ রয়েছে। এক চঞ্চল ভবঘুরে পথিক প্রাণ তারাপদের গতিময় জীবনের সঙ্গে চলমান নদীর স্রোত যেন একাকার হয়ে গেছে। ‘একরাত্রি’ গল্পে বন্যা প্লাবিত দুর্যোগময়ী রাত্রির পটভূমিকায়। গল্পের নায়ক-নায়িকার জীবনে এক সুদূরপ্রসারী জীবনবোধ গড়ে উঠেছে। ‘ঘাটের কথা’ গল্পে বিধবা কুসুম গঙ্গার ঘাটে বসে স্মৃতিচারণা করেছে —

“আমার দিনগুলি কিনা গঙ্গার স্রোতের উপর খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায়,

আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন

গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের ছবি রাখিয়া যায়না।”

- রবীন্দ্রনাথ এভাবেই বর্ষে বর্ষে ঋতু পরিবর্তনের চলমান আলেখ্য অঙ্কন করেছেন।

গল্পের নায়িকা কুসুম তার জীবনাকাক্ষা চরিতার্থ না হওয়ায় গঙ্গার স্রোতে আত্মসমর্পণ করে। তখন নদীর ঘাটের এক দার্শনিক উক্তি প্রকাশ পায় —

“আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল, জানিতে পারিলাম না।”

‘পোস্টমাস্টার’ গল্পে গ্রাম্য বালিকা রতনকে ছেড়ে পোস্টমাস্টার যেই নৌকায় উঠে সেই মুহূর্তে প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ককে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় রূপ দিয়েছেন —

“একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, ‘ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি’ - কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে। গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকুলের শ্মশান দেখা গিয়াছে - এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া ফল কি। পৃথিবীতে কে কাহার।”

— নদীর এই গতিধর্মতার সঙ্গে মানব মনের গতি প্রকৃতি যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে ও মানব মনস্তত্ত্বের দিকটিকেও প্রতিভা বসু তাঁর ছোটগল্পে তুলে ধরতে ভোলেননি। ‘বিকেলবেলা’ গল্পে আমরা দেখি প্রকৃতির পটভূমিকায় সুমন্তর মনোজাত্ত্বিক দিকটি লেখিকা আলোকপাত করেছেন —

“সুমন্ত হাউহাউ করে লাফিয়ে জাঁপিয়ে একাকার। আর মাঠের আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে হাসতে হাসতে অম্মু উধাও। গাঢ় অন্ধকার বেয়ে সে যে কোথায় ছুট লাহালোকে জানে।

বড় বড় গাছে ছাওয়া মস্ত মাঠ, প্রায় বারোটীর রান্তিরে কত রকম পোকামাকড় ডাকছে, পাখি কাঁদছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে, জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে, সুমন্তর সারা শরীর কেমন শিরশির করতে লাগলো একা দাঁড়িয়ে। প্রত্যেক মুহূর্তে একটা অজানা ভয় ছেয়ে ফেললো তাকে। পা বাড়ালেই মনে হতে লাগলো এই বুঝি সত্যি সে মাড়িয়ে দিলো একটা সাপ, এই বুঝি সাপটা ফৌস করে মাথা আছড়ে লিকলিকে জিবে ছোবল মারলে একটা।”

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে। তিনি বিভিন্ন গল্পে সাধু ও চলতি ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। ‘ঘাটের কথা’, ‘জীবিত ও মৃত’, ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘স্ত্রীর পত্র’, ‘পয়লানম্বর’ প্রভৃতি ছোটগল্পের সংলাপ অংশের ভাষা চলিত। ‘রামকানাইয়ের নিরুদ্ভিতা’ গল্পের গৃহিনীর উক্তি চলিত ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে —

“ওগো, আমার কী সর্বনাশ হল গো, কী সর্বনাশ হল। আচ্ছা, ঠাকুরপো, লেখাটা কার। তোমার বুঝি ? ওগো, তেমন যত্ন করে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো।

- তোরা একটুকু থাম, মেলা চেষ্টাস নে, কথাটা শুনতে দে। ওগো, আমি কেন আগে গেলুম না গো - আমি কেন বেঁচে রইলুম।”

‘দুরাশা’ গল্পে নবাব পুত্রী তার প্রিয়তম কেশরলালে বিদায়ের কথা বলতে গিয়ে সাধু ভাষার প্রয়োগ করেছেন —

“আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল.....এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জন করি। কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনা পারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের উর্ধ্বে আমাদের জ্যোৎস্নাচিকন কেল্লার চূড়াগ্রভাগ, সকলেই নিঃশব্দ গভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল।”

প্রতিভা বসুর গল্পের ভাষাবৈচিত্র্যও পাঠকের দৃষ্টি আতর্ষণ করে। তিনি সংলাপ অংশে চলিতভাষা ও বর্ণনা অংশে কোথাও সাধু কোথাও চলিত ভাষার সুস্বম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে মহিলা গল্পকারদের মধ্যে আশাপূর্ণা দেবী অতি পরিচিত নাম। মধ্যবিত্তজীবন অবলম্বনে তিনি দেড় হাজারের বেশি গল্প রচনা করেছেন। তিনি সমাজ সচেতন শিল্পী। নারী সমাজের আলেখ্য তিনি রচনা করেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। সূক্ষ্ম, জটিল, অন্তর্দ্বন্দ্ব যুক্ত নারীরা তার গল্পে বেশিরভাগ স্থান দখল করে আছে। সুস্মিতা ঠাকুর লিখেছেন,

“আশাপূর্ণা সমাজ তাত্ত্বিকের বেশে নয়, কিন্তু বৃহৎ অর্থে ছোট্ট সংসারের গভীবদ্ধ বনের মধ্যেই শোষক-শোষিতের দুটি ভূমিকা খুঁজে পান। কখনো শোষকের ভূমিকায় গৃহকর্তা বা সমস্থানীয় পুরুষ শোষিতের স্থানে নারী ; কখনো আশ্চর্যভাবে শোষক শোষিত দুটি ভূমিকাতেই নারী এসে দাঁড়ায়।” ৫

বাস্তববাদী গল্পকার আশাপূর্ণা দেবী সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ভাষায় নারী জীবনের ব্যাথা-বেদনার কাহিনীকে অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। ডঃ সরোজমোহন মিত্র আশাপূর্ণা দেবীর কথাসাহিত্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন,

“স্বাধিকারের কথা, নানা বেদনা ব্যর্থতার কাহিনী-প্রাত্যহিক জীবনে যা অতি প্রত্যক্ষ অথচ অননুভূত তাকেই তিনি লোক চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন সেখানে আধুনিক মননশীলতার পরিচয় আছে। সংস্কারমুক্তির নামে উদ্দেশ্যগত ভাবে যৌনতার বাড়াবাড়ি নেই। জীবনের সমস্যা যে কত বিরাট, কত বিচিত্র বিশেষ করে যে সমাজ প্রতিক্ষণ নতুন নতুন তরঙ্গে আন্দোলিত, নতুন নতুন চিন্তায় ও আবেশে উত্তাল, মুহূর্তে মুহূর্তে যার রূপ ও রং পরিবর্তিত হচ্ছে সেখানে সমস্যাতো অন্তহীন। সেই সব সমস্যাকেই আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। আধুনিক কালের লেখিকা হলেও তাঁর গল্পে বক্তব্য-প্রধান, সমস্যা-প্রধান, আবেগ-প্রধান। ভালোমন্দ মিশে যে জীবন তাকেই তিনি অনবদ্য ভাবে রূপায়িত করে তোলেন।” ৬

বাংলা সাহিত্যের যুগপুরুষ শরৎচন্দ্র সেই সমস্ত নারীদের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর সাহিত্যে, সমাজে যারা শুধুই দিয়ে গেছে, বিনিময়ে পায়নি কিছুই। এক বিশুদ্ধ আবেগ ও সংবেদনা বশত শরৎচন্দ্র নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর নারীরা প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু এই প্রতিবাদ

আবেগ ও ভাবালুতার জন্য রোম্যান্টিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। তবে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে প্রতিবাদ থাকলেও তা রোম্যান্টিকতার স্তরে পৌঁছয়নি।

অন্যদিকে আশাপূর্ণার গল্পগুলি বক্তব্য প্রধান, সমস্যা বহুল ও আবেগধর্মী। সমস্যাবহুল বক্তব্যকে আশাপূর্ণা আবেগপূর্ণ ভাবেই উপস্থাপন করেছেন। তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল ‘সংস্কার’, ‘মাটির পৃথিবী’, ‘পাকা ঘর’, ‘ক্ষণ-গোধূলির’, ‘কক্ষন’, ‘রানু’, ‘অপরাধ’, ‘আত্মহত্যা’, ‘অঙ্গার’, ‘বিপন্ন সুখ’, ‘ইজ্জত’, ‘জালিয়াত’, ‘একটি সত্যি গল্প’, ‘নিজের জন্য শোক’, ‘শেষ’, ‘বৃত্ত’, ‘প্রাণাধিকার’, ‘মাথাধরা’ প্রভৃতি গল্প।

শরৎচন্দ্রের ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘সতী’, ‘বিলাসী’, ‘হরিলক্ষ্মী’, ‘দর্পচূর্ণ’, ‘বাল্য স্মৃতি’, ‘অনুরাধা’, ‘আলো ও ছায়া’ প্রভৃতি গল্পে আবেগের অতিশয় লক্ষ্য করা যায়।

আশাপূর্ণা দেবীর অধিকাংশ গল্পই আকারে ছোট। এই ছোট আকারের গল্পগুলি যথাক্রমে ‘অনাচার’, ‘পাখির বাসা’, ‘শোক’, ‘মলাটের মুখ’, ‘ধার শোধ’, ‘মাথা ধরা’, ‘আহতফণা’, ‘আদর্শবাদ’, ‘কুয়াশা’, ‘ফাঁস’, ‘রেহাই’ প্রভৃতি।

শরৎচন্দ্রের ছোট আকারের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ‘হরিচরণ’, ‘ছবি’, ‘অভাগীর স্বর্গ’, ‘অনুপমার প্রেম’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বড় আকারের গল্পগুলি যথাক্রমে - ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দেশ’, ‘মেজদিদি’ প্রভৃতি। ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত ‘শরৎচন্দ্র’ গ্রন্থে লিখেছেন —

“কখনো কখনো ছোটগল্পের আশ্রয় লইয়া তথায় এমন সমস্ত কাহিনীর অবতাড়না করিয়াছেন, যাহা উপন্যাসের পক্ষে সমধিক উপযোগী। এই সকল গল্পে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা আছে, কিন্তু তাহার বৈশিষ্ট্য নাই। ইহারা ক্ষুদ্রাবয়ব কিন্তু তাহার কারণ এই যে গ্রন্থকার একটি সুদীর্ঘ উপন্যাসকে সংকীর্ণ সঙ্কুচিত করিতে চাহেন।” ৭

আশাপূর্ণা দেবীর গল্পে আঙ্গিক সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। গল্পের আঙ্গিকার বিগুহতার ওপর তিনি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁর গল্পে বর্ণনার কোনো বাহুল্য নেই। ‘স্মৃতির অতলে’ গল্প থেকে তার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হলো —

“সুরেশ ছিল যেমনি সৎ তেমনি কর্মনিষ্ঠ, আর তেমনি নির্ভীক। স্মৃতিকণার মনে হত, একেই বলে ‘জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিন্তে ভাবনাহীনা।’ কিন্তু ছেলেটার বাইরের চেহারাটা ছিল একেবারে অন্যরকম। যেমনি হালকা, তেমনি ফাজিল। এমনভাবে কথাবার্তা কইত, যেন সে একটা পাগলাখানায় আছে, এখানের সবাই পাগল, আর ও নিজে পাগল সেজে মজা দেখছে।..... রবিরঞ্জন মাঝে মাঝে ওর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বলত, ‘আমরা আড্ডা খানায় আড্ডা দিতে আসি নি সুরেশ, এ কাজকে দস্তুরমত সিরিয়াসভাবে নেওয়া দরকার।’”

শরৎচন্দ্রের গল্পে বর্ণনার বাহুল্য আছে, অতিকথন দোষও লক্ষ্য করা যায়। তার একটি উদাহরণ ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প থেকে প্রদত্ত হলো —

“অভাগী রাজপুত্র, কোটালপুত্র আর পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা দিয়া গল্প আরম্ভ করিল। এসকল তাহার পরের কাছে কতদিনের শোনা এবং কতদিনের বলা উপকথা। কিন্তু মুহূর্ত কয়েক পরে কোথায় গেল তাহার রাজপুত্র, আর কোথায় গেল তাহার কোটালপুত্র - সে এমন উপকথা গুরু করিল যাহা পরের কাছে তাহার শেখা নয় - নিজের সৃষ্টি। জ্বর তাহার যত বাড়িতে লাগিল, উষ্ণরক্তস্রোত যত দ্রুতবেগে মস্তিষ্কে বহিতে লাগিল; ততই বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই - কাঙালীর স্বপ্ন দেহ বার বার রোমাঙ্কিত হইতে লাগিল। ভয়ে, বিস্ময়ে, পুলকে সে সজোরে মায়ের গলা জড়াইয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন মিশিয়া যাইতে চাহিল।”

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের সমাপ্তি অংশটি তাৎপর্যপূর্ণ। ‘মহেশ’ গল্পের সমাপ্তি অংশটি কতটা শিল্পসফল গফুরের উক্তি-তে সেটি প্রকাশ পেয়েছে —

“নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা ! আমাকে যত খুশি সাজা দিও, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্ঠা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্ঠার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করোনা।”

পাশাপাশি আশাপূর্ণা দেবীর ‘ছিন্নমস্তা’ গল্পটির শেষে এক চরম সত্য উন্মোচিত হয়েছে —

“যে মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের শেষ বিন্দুও অপসৃত, সেই মানুষটিকে কোনো অভিধায় সীমায়িত করা যাব।”

- এই শেষ বাক্যটিতে গল্পের নামকরণের ইঙ্গিত দিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী।

মহাশ্বেতা দেবীর প্রতিবাদী গল্পের সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সাধর্ম রয়েছে। নিম্নে বিশিষ্ট এই দুই বাংলা সাহিত্যের দিকপালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করা হল —

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে লেখা গল্প ‘হারানের নাত জামাই’ ও ‘ছোট বকুল পুরের যাত্রী’ ছোটগল্প। ‘হারানের নাত জামাই’ গল্পে রয়েছে জোদ্ধার শ্রেণি ও শাসক শ্রেণির অন্যায়ের বিরুদ্ধে বর্গাদার চাষীদের সঙ্গবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন। গল্পটিতে আন্দোলনের নেতা ভুবনকে ময়নার মা জামাই সাজিয়ে তাকে রক্ষা করেছিল। ময়নার মার প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারিত হয়েছে পুলিশের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে। গ্রামবাসীদের ময়নার মা বলেছে,

“রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইর না। মোর ঘরে কোনো আসামী নাই, চোর-ডাকাত নাকি যে ঘরে আসামী রাখুম ? বিকালে জামাই আইচে, শোয়াইছি মাইয়া-জামাইরে। দারোগাবাবু তল্লাশ করতে চান, তল্লাশ করেন।”

‘ছোটবকুলপুরের যাত্রী’ গল্পে কলকারখানার শ্রমিক রুখে দাঁড়িয়েছেন, কারখানার মালিকের বিরুদ্ধে ন্যায্য মজুরির দাবিতে। দিবাকর শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি মালিক পক্ষের শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে গগণকে বলেছে,

“মোরা কলির পাপী লোক ; এ লড়াইয়ে মোরা মরব। মোদের ছেলে -পুলেরা ফের সত্যযুগ করবে।”

দিবাকরের কালে হয়ত শ্রমিকরা বঞ্চনার হাত থেকে রেহাই পাবে না। কিন্তু আগামী প্রজন্ম সমাজতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করে শোষণহীন সমাজ গড়ে তুলবে। গল্পটিতে রাজনৈতিক পথনির্দেশ রয়েছে।

সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন —

“ছোট বকুলপুর কোনো গ্রাম নয়, শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ও আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক মুক্তি, সমাজিক দাসত্ব হতে মুক্তির নাম ছোটবকুলপুর। শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম চলছে। সেই অর্থে মেহনতী শ্রেণি সকলেই ছোটবকুলপুরের যাত্রী।” ৮

এরূপ তেভাগা আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী একাধিক গল্প লিখেছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে ‘মায়ের মূর্তি’ ও ‘জাহ্নবী মা’ গল্পদ্বয় উল্লেখযোগ্য। ‘মায়ের মূর্তি’ গল্পের নিম্নলিখিত অংশে তেভাগা আন্দোলনের প্রসঙ্গ রয়েছে,

“আমাদের গদিনি’ মন্ত্রীগিরি নি’, পেলেন চাপা নি’, ভোটগুড়োনো তো নি’, ওই তেভাগাটা আছে শুধু। হ্যাঁ আমাদেরি সে তেভাগা, তোমরা জমি নে’ বাঁচ না বাবু সেঃ দুক্ক বুজ না। রাখাল ? বলবেনা কেন? আজই তো দেখে গেল ঘরে চাল আছে, না নি।”

দেবকুমার ঘোষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের লক্ষ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

“মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুটি ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত। মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বারবার তিনি নেমে এসেছেন দরিদ্র ও অমার্জিত মানুষের জীবনবৃত্তে, আবার ফিরে এসেছেন মধ্যবিত্ত জীবনে। তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা গেছে ভাববাদও বস্তুবাদের সংঘাত। এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি পৌঁচেছেন ফ্রয়েড থেকে মার্কসবাদে। এই পথেই তিনি জীবনের সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে খুঁজেছেন শিল্পকে।” ৯

তাঁর ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে’, ‘সাড়ে সাত সের চাল’, ‘হিনিয়ে খায়নি কেন’, ‘ধান’, ‘বাগদী পাড়া দিয়ে’, ‘যাকে ঘুষ দিতে হয়’, ‘টিচার’, ‘চক্রান্ত’, ‘ছাটাই রহস্য’, ‘দুঃশাসনীয়’ ও

‘নমুনা’ গল্পে প্রতিবাদী চেতনা এসেছে। ‘দুঃশাসনীয়’ ছোটগল্পে রাবেয়া লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্র পায়নি। এজন্য তার স্বামী আনোয়ারকে অভিযুক্ত করেছে। তবে সে অভিযোগের ইঙ্গিত রয়েছে তৎকালীন সমাজে প্রশাসকদের বিরুদ্ধে। মধ্যরাতে রাবেয়া ছেঁড়া চট্ অঙ্গ থেকে খুলে ফেলে দিয়ে পুকুরে জল আনতে যাবার নাম করে জলে ডুবে আত্মহত্যা করে। রাবেয়ার ট্রাজেডিকে তুলে ধরতে মানিক প্রতিবাদের ভাষা দিয়েছেন, নিম্নোক্ত বর্ণনা অংশে —

“কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবেনা বলে রাবেয়া একটা বস্ত্রায় কতকগুলি ইট পাথর ভরে মাথাটা ভেতরে ঢুকিয়ে গলায় বস্ত্রার মুখটা দড়ি জড়িয়ে এঁটে বেঁধে পুকুরের জলের নীচে, পাকৈ গিয়ে শুয়ে রইল।”

শুধু বস্ত্র সংকটই নয়, খাদ্য সংকটের পটভূমিকায় লেখা ‘কে বাঁচায় কে বাঁচে’ ছোটগল্পে অসহায় মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন গল্পকার নিম্নোক্তভাবে —

“ফুটপাতের ওই বীভৎসতা ক্ষুধা অথবা মৃত্যুর রূপ ? না খেয়ে মরা, কি ও কেমন? কত কষ্ট হয় - না খেয়ে মরতে, কি রকম কষ্ট ? ক্ষুধার যাতনা বেশি, না মৃত্যুর যন্ত্রণা বেশি - ভয়ঙ্কর ?”

নারীকেন্দ্রিক ফলাও ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গল্পকার ‘নমুনা’ গল্পটি লিখেছেন। কালাচাঁদ ব্রাহ্মণ কেশব কন্যা শৈলকে পতিতা বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে সমাজের অবহেলিত, উপেক্ষিত, নির্যত মানুষের দিকে তাকিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলিতে আপন অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ভারতের আদিবাসী দলিত সমাজ ও অন্নদাস শ্রমিকদের নিয়ে অজস্র গল্প লিখেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সম্প্রদায় এবং উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থানের পিছিয়েপড়া মানুষদের ব্যথাবেদনা ও যন্ত্রণার চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে। প্রশাসন যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিত্তবানের হাতে বিত্তহীনদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ততার বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার লেখনী ছিল সচল। তাঁর খাদ্য সংকটের পটভূমিতে লেখা উল্লেখযোগ্য গল্প - ‘ভাত’, ‘জাতুধান’, ‘সাঁঝ সকালের মা’, ‘জন্মতিথি’, ‘রাক্ষস’, ‘বাণ’ প্রভৃতি।

অসহায় মানুষ পেটের জ্বালায় কিভাবে অকালে ঝড়ে গেছে অথচ এই ব্রাত্যজীবনের বিরুদ্ধে তথাকথিত সমাজের ধারক ও বাহকেরা কতটা উদাসীন ছিলেন এই সত্যই মহাশ্বেতার কলমে প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজে নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে মহাশ্বেতার গল্পসংখ্যা কম নয়। ‘রুদালী’, ‘স্তনদায়িনী’, ‘ধৌলি’, ‘যশোমতি’ প্রভৃতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু

তাঁর ছোটগল্পে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম। তবুও একাধিক গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে ‘হারানের নাতজামাই’ গল্পে আঞ্চলিক ভাষার দৃষ্টান্ত রয়েছে —

“মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীত কাঁপুনি ধরেছে শো না গিয়া বাছা ! তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে, - ময়নার মার গলা ধরে যায়, আপনাকে কি কমু দারোগাবাবু। আর দুবার ময়নার মা সঙ্গেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবে ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনদের কথা শোন, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কি করবা ? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।”

চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে মানিক চরিত্রগুলিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

“কাঁধটা দেখাইয়া বলিয়াছিল, যাতেখান সহজ লয় স্যাঙ্গাত। উঠি পাকব। গা ফুলব জানাজানি হইয়াগেলে আমি কনে যামু ? খুনটে যদি না করতিস’ - ‘তরেই খুন করতে মন লইতেছে পেছাদ’। ‘এই জনমে না স্যাঙ্গাত।”

ভিখুর কাধে বর্ষার খোঁচা লেগেছিল, বৈকুণ্ঠ সাহার গদিতে ডাকাতি করতে গিয়ে। শারীরিক ক্ষত নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে তার অতিপরিচিত পেছাদ বাগদীর কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। তখন ভিখু পেছাদকে যে ভাষায় কথা বলেছিল তার মধ্যে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য শিল্প সম্মত ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী চরিত্রের মুখে যে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন তা যথাযথ হয়েছে। তাঁর বহু গল্পে আঞ্চলিক ভাষার সুষম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন —

শবরের ভাষা —

“জল দিছে বটেক আকাশ ! এমন জল্যে খাবি বা কুথাক ? লদীতে হড়পা ডাক্যে ? হামাক্ বল্ হামি জানায়ে দিভ্য।”

উদ্বাস্তু মানুষের সংলাপ —

“ঘরের বাসন তৈজস তো দেখত্যাছি। ঠাইরারনে ঘরেও চোর পড়েনা, আমার ঘরেও না। অহনতো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানায়ন্ত কই তরের খাঁচা। আমি কাম পাই না।”

নিম্নে ‘ওরা’ গল্প থেকে আঞ্চলিক ভাষা সজ্জার একটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল -

“ফিরে যাব। ধান কাটার মরশুমে।”

“আর বলতে হবেনি। তা দেখ বাচা ! এই টেম্পোরি ভিকমাঙারা তো আমাদের ভাত মেরে চলে যায়। তা ঝাতদিন থাকবে ইনি, এই কানী বুড়ি এই ফুটপাতরের মালিক,

সেটি ঝেঁবে রেকো। ইন্স্টেশানে নানা কাভ হয়, পুলিশ পেচনে লেগে থাকে। রোজ আমাদের ওটাচে।’

‘এথেনেও পুলিশ ?’

পুলিশের মামাবাড়ি এটা। সড়ে পড়ো দিকিনি ?’ - কানী বুড়ি উকুন বাছতে-বাছতে বলেছিল।

নুলো বলেছিল ‘উনি পুলিশের সুমলেরাকে, ক্যাতাকর্তা ঝা রেকে ঝাই তা দেকে।

তাছাড়া হোথা ডোবায় চ্যাকলে, রেললাইনকে পাইখানা বানাতে, এমন সুবিদে কোতা?

চার আনা কেন, উনি আট আনা চাইতে পারে।’ তাই দোব গো। তাইড়ে দিওনি।” ১০৪

এভাবেই মহাশ্বেতা দেবী জনজাতি গোষ্ঠীর ভাষা ও বিশেষ আঞ্চলিক ভাষাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। তারাশঙ্কর ছিলেন রাঢ়বঙ্গের অদ্বিতীয় কথক। রাঢ় অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের দ্রষ্টা ও ভাষ্যকার। তবে রাঢ়বঙ্গের বীরভূম জেলাকেই তিনি সবচেয়ে বেশি বেছে নিয়েছেন। বীরভূম ও রাঢ়বঙ্গের অন্যান্য এলাকার অন্ত্যজ যাযাবর সম্প্রদায় তারাশঙ্করের গল্পে উপস্থিত। হিন্দু, মুসলমান, সাপুড়ে, বেদে, ডাকাত, চাষি, ঠ্যাঙাড়ে, কাহার, বাগ্দি, ডোম, বাউড়ী, বীরবংশী, শ্রমিক, কারিগর, পাইক, মাঝি, বাদ্যকর, ব্রাহ্মণ, তান্ত্রিক, সাঁওতাল, তর্কলঙ্কার সকল শ্রেণির মানুষকে তিনি গভীর মমতায় স্থান দিয়েছেন। ‘নারী ও নাগিনী’, ‘বেদেনী’ গল্পগুলি তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। রাঢ়দেশের বেদে সম্প্রদায় বাজিকর হিসেবে পরিচিত। তারা সাপ ধরে, সাপ নিয়ে খেলা দেখায়। বাদড় ও বাঘ নিয়েও খেলা দেখাতেও অভ্যস্ত। এই গল্পগুলিতে মানুষের মনের জৈব পিপাসা ও অন্তঃশ্রেণির লোক জীবনের সহজাত প্রবৃত্তির রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্রকে সজীব করে তোলার জন্য তিনি চরিত্রের মুখে যে সংলাপ প্রয়োগ করেছেন তা নিঃসন্দেহ প্রসংশনীয়। ‘বেদেনী’র রাধিকা কঠোর বলিষ্ঠ দেহ শব্দ বাজিকরকে বিয়ে করে কাটিয়েছিল কয়েক বছর। এখন সে বৃদ্ধ। কঙ্কালীতলার মেলার বাইশ বছরের চির যৌবনা রাধিকার দেখা হয়ে গেল। কিশ্টোবেদের সঙ্গে। তার স্বামীকে ফেলে উন্মত্তা বেদেনী কিশ্টোর প্রশস্ত বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিশ্টোর সঙ্গে সম্ভোগতৃপ্তি মিটিয়ে —

“রাধিকা বলল, এখানে নয়, চল পালাই। কিন্তু তাবুটারু ? রাধিকা বলল; পড়ে থাক ওগুলো, ‘তুমি উয়ার রাধিকাকে লিবা, উয়াকে দাম দিবা না’ ? কিশ্টোরাজি হয়ে যাওয়ার পর রাধিকা বলল, দাঁড়া। কেরাসিনের টিনটা শব্দুর তাবুর ওপর ঢেলে দেশলাই জ্বেলে কেরাসিন ভেজা ঘাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল ‘মরুক বুড়া পড়া।’”

তারাশঙ্কর অন্তঃশ্রেণির মানুষের গল্পরচনায় কতটা সফল সেই প্রসঙ্গে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ‘কালের পুত্তলিকা’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন —

সমাজের নীচুতলার মানুষদের গল্পরচনায় তারাশংকরের কুশলতা এই প্রথম পর্বেই দেখা গিয়েছে তার উদাহরণ অবিরল - বাজিকর শম্ভু, কিষ্টো, রাধিকা (বেদেনী), খোঁড়া শেখ, জোবেদা সাপুড়ে (নারী ও নাগিনী), দীনু ডোম (ডাক হরকরা), রতন হাড়ি (ব্যগ্র চর্ম), কালী বাগদী (আখড়াইয়ের দীঘি), বিলাসপুরী কামিনী চুড়কী (ঘাসের ফুল), ট্যারা বাউরী (ট্যারা), সর্পবিষ চিকিৎসক বাবাজী (বাউল)। এখানেই সূত্রপাত হয়েছে চরিত্র মিছিলের।” ১০

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে রয়েছে অন্ত্যজশ্রেণির প্রাধান্য। ‘নুন’ গল্পে আদিবাসী দোসাদ ‘বিছন’ গল্পে দুলন দোসাদ, ‘ধৌলি’ গল্পে ধৌলি দোসাদ, ‘রুদালী’ গল্পের শনিচারী, ‘স্তনদায়িনী’ গল্পের যশোদা, লখিন্দর চরিত্র, ‘দ্রৌপদী’ গল্পের দ্রৌপদী, ‘জাতুধান’ গল্পে সাজুয়াতি ওরস, ‘সাঁঝ-সকালের মা’ গল্পের সাধন এরা প্রত্যেকেই অন্ত্যশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে।

তারাশঙ্করের ‘অগ্রদানী’ গল্পের সঙ্গে মহাশ্বেতার ‘জাতুধান’ গল্পের তুলনা করা যায়। এ প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন,

“তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অগ্রদানী’ গল্পটির বয়ন খানিকটা মনে আসতে পারে মহাশ্বেতা দেবীর এ জাতীয় গল্পের প্রসঙ্গে। কিন্তু দুই লেখকের লক্ষ মূলতই আলাদা। তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন মানুষ এর খাদ্যলোভের বিকার - যা ঘটনাচক্রে পুত্রের পিণ্ড ভক্ষণের মতো এক মর্মান্তিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, কিন্তু মহাশ্বেতার গল্পে মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক ক্ষুধার প্রতিষ্ঠা। যে ক্ষুধার নিরসনই সভ্যতার আদর্শ।” ১১

তারাশঙ্করের গল্পে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ভয় জড়িয়ে রয়েছে। ডাইনীকে সাধারণ মানুষ ভুল বোঝে, ভয় করে, ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখে। ডাইনীর বাণ মারা, রক্ত গুষে খাওয়া, পেটের যন্ত্রণা সবকিছুর মূলে রয়েছে ডাইনীর অদৃশ্য হাত। তারাশঙ্কর ‘ডাইনী’ গল্পে ডাইনী সম্পর্কে একটি বদ্ধমূল ধারণা প্রকাশ করেছেন,

“ভয়ে ছেলেটি ছুটিয়া পলইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাক্ষসী তাহাকে বাণ মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতি তীক্ষ্ণ একখানা হাড়ের টুকরো সে মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতেই সেটা আসিয়া তাহার পায়ে গভীর হইয়া বসিয়া গিয়াছে।”

এই ডাইনীই নিজেরই সংস্কারের বিশ্বাসে মনে মনে বলে,

“খেয়ে ফেললাম ! ছেলেটাকে খেয়ে ফেললাম রে ! পালা, পালা

- তুই ছেলে নিয়ে পালা বলছি।”

ডাইনী কখনো কখনো নিজেই পরিপার্শ্বের চালে অশুভ এক লোভ বলে মনে করো।

“কিন্তু সে কি করিবে ? আপনার বুকখানাকে তাহার নিজের জীর্ণ আঙুলের নখ দিয়া চিরিয়া ওই লোভটাকে বাহির করিয়া দিতে ইচ্ছে করে। জিভটাকে কাটিয়া ফেলিতে

পারিলে সে পরিভ্রমণ পায়। ছি ছি ছি !”

ডাইনী নিজস্ব সংস্কার বশত আত্মবিকারের জন্মদিয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে অন্ধকুসংস্কারের ও আদিম বিশ্বাসের প্রসঙ্গ আছে। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ডাইনী’ গল্পে বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের পরিবেশে মানবিক রূপ ও নিষ্ফলত্বকে ডাইনী চরিত্রে দেখিয়েছেন।

মহাশ্বেতা দেবী বহুগল্পে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে স্থান দিয়েছেন। আবার এ সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা উচ্চারণ করেছেন। ‘জাহ্নবীমা’ গল্পে দৈবলীলা ও দৈবশক্তির প্রতি অন্ধবিশ্বাস ভেঙে সত্যের মুখোমুখি হয়েছেন। দেবীর কাছে প্রার্থনা ও পূজা করে যখন পুত্রকে বাঁচাতে পারেনি, তখন সে ঈশ্বর এর প্রতি আর আস্থা রাখেনি। বৃদ্ধা জননীর উক্তিতে তা ধরা পড়েছে —

“মর তুমি মর, তোমার মন্দির নিপাত যাক।”

‘মানত’ গল্পে আমরা দেখি, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব, —

“ঠাকুর দেবতা যে এমন ভাবে ফাঁসাবে তা কি সে জানত ?”

‘একটি অলৌকিক কাহিনি’ গল্পে ধর্মের নামে শোষণের বিরুদ্ধে মহাশ্বেতা দেবী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুমিতা চক্রবর্তী এই বিষয়টিকে গভীরভাবে আলোকপাত করেছেন —

“অর্থ পিশাচ করালী তার পুত্রবধূ ও পুত্রকে হত্যা করে পুত্রবধূ ময়না

কে সতী বলে প্রচার করে। তার পরিকল্পনা সফলও হয়। মহাসতী ময়না লোকমানসে দেবী হয়ে ওঠে। লাখ লাখ টাকা ওঠে পুজোয়, মন্দিরে, মেলায়।” ১২

তারাক্ষর তাঁর গল্পে রাঢ়বঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করেছেন, ‘বেদেনী’ গল্পের আমরা তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই —

“কি নাম গো তোমার বাজিকর ?”

নাম শুনলি গালি দিবা আমাকে বেদেনী

তা গালি দেব কেনে ?

তুমার যে নাম রাধিকা বেদেনী তাই বুলছি।”

মহাশ্বেতার গল্পেও আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার রয়েছে। ‘অপারেশন বাকুলি’ গল্পে আঞ্চলিক ভাষা সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে —

“সূর্য সাউয়ের ভাই রোতোনি সাউও সভয়ে বলে ‘দোপদি’ মেঝান ? দুলনা মাঝি ? তারা কুথাকে ?”

‘আঁ ? কা বোলতা ?’

‘তারা কুথাক ?’

‘থা, ক্যা নেই থা ?’

‘ছিল্য হে ছিল্য। তারা মাতৃবর, তারা থাকবে নাই ? রোতোর্নি সাউ খুব বিবশ হয়।’

নবনীতা দেবসেন বাংলা সাহিত্যের অতি পরিচিত নাম। তিনি বহুভাষাবিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসূত্রে আবদ্ধ থেকে অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে প্রসারিত করেছেন। দেশি-বিদেশি বহু সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। সেখান থেকে বিষয় ও আঙ্গিক নির্বাচন করে তিনি সাজিয়েছেন তাঁর সৃষ্টি সম্ভার। তিনি শুধু হাস্যরসেরই স্রষ্টা নন সামাজিক, রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন ছোটগল্পেরও স্রষ্টা। বাঙালির যৌথপরিবারের ভাঙন, মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতি সমাজ জীবনকেন্দ্রিক গল্পের পাশাপাশি নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গল্পরচনা করেছেন। মানব জীবনের গভীরে তিনি প্রবেশ করতে পেরেছেন। এরূপ ছোটগল্পের সংখ্যাও কম নয়। নবনীতা দেবসেনের তিন খণ্ডে লেখা অসংখ্য গল্পে কাহিনি, চরিত্র, সুখ পাঠ্যভাষা, গল্পের ক্লাইমেক্স জীবন-দর্শন সবকিছুই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত।

আধুনিক গল্প বলতে যা বোঝায় নবনীতা দেবসেনের গল্পে সেই বৈশিষ্ট্যই খুঁজে পাওয়া যায়। বিষয় ও আঙ্গিক প্রকরণের দিক থেকে হয়ত রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ প্রমুখ বিশিষ্ট গল্পকারদের সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের সাদৃশ্য হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবেনা, তবুও এই গল্পকারদের প্রতিবাদী চেতনামূলক গল্পে নারী জাগরণের যে ইঙ্গিত রয়েছে নবনীতা দেবসেনের গল্পে তারই সন্ধান মেলে।

তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের সঙ্গে নবনীতার ছোটগল্পের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য থাকলেও একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে আঞ্চলিক ভাষার সুসম প্রয়োগের দিক থেকে তুলনা করা চলে। ‘বসনমামা ও অন্যান্য গল্পগ্রন্থের ‘মেসোমশায়ের কন্যাদায়’ গল্প থেকে পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হল —

- (ক) “তোমাগো প্যাটে প্যাটে প্যাঁচ। জিলাবীর প্যাঁচ বোঝালা ? ওইটারে তো ভদ্রতা কয়না, কয় কুটিলতা।’ চান্স পেলেই তিনিই শৃগুরবাড়িকে ডাউন দ্যান।”
- (খ) “কে কইল ? আরে - সমস্ত বাজে কথা। কী কইতে কী যে কয়। বাদ দ্যাও। আমি তুইল্য দিমু ক্যান আমি তো ক্যাবল কইলাম কাস্সাবাস্সা গিশগিশ কর -সে, কওন তো যায় না? প্রসসাব কইরা দিতে কতক্ষণ ? ফরাসটা শ্যাস কইরা দিত কিনা, তুমিই কও ? অ্যাকসিডে নটালি, পোলাপানগো কথা কত্তন তো যায় না ?

— অন্যান্য বিশিষ্ট গল্পকারদের মতো তিনি গল্পের রসসৃষ্টির জন্য হিন্দি, ইংরাজি

ভাষা ব্যবহার করেছেন, তবে নবনীতা দেবসেন ব্যতীত অপর কোন ছোটগল্পে উড়িয়া ভাষার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়না। ‘সীতা থেকে গুরু’ গল্পগ্রন্থে উড়িয়া ভাষার সার্থক ব্যবহার রয়েছে —

(ক) - “ছি, ছি, মা। লব মেরিজ রেজিস্টরি বাহা, ভল নুয়ে ! এক পাভাপুঅ এক মেথরানীরে রেজেস্টারি লব মেরিজ করিলো, সব্বু পাভা মিলিকিরি তাক্কু একবরিকিয়া করি দেলে। দেলে কঁড় হব ? তাক্কুর কিচ্ছি হেলা নাহি, দুইজনা নুআ দ্বিতল ঘরঅ বনাই কিরি দিব্বি ফুর্তিরে রহিলে’ আউ কী?

- সে কি, একঘরে হয়ে দোতলা বাড়ি তৈরী করে ফেলে হেব্ব না কাঁহিকি ? মেথরানীটা ভল নুয়ে। গুটে মেথরানী হেই কিরি তু এত্তে বড়িয়া রূপসী কাঁহিকি সরকারি নুগা দুকানে ভল সার্বিস করুচি। দিনকে দিন হিন্দু ধরম ভাসি যাউছি মা ! তাক্কুর এবে বচ্চা হেলে, সে বচ্চার জাতি কঁড় হব ? পভাপুঅর মেথর পিলাপন হব ?

(খ) - “সে যে পভা অছি, মা। পাত্ররঅ বাপা।

(গ) - “অছি ! তিনোটি ঝিঅ। পঢ়ালিখ্যা করুচি।

(ঘ) - “আউ মুচা-পানি কিচ্ছি খাইবিনি, মা, মু একে ঘরকু যাউছি। পরসাদ নেই কিরি মতে দাড়ি দিয়ন্ত।”

গুধু চরিত্রের মুখের ভাষাই নয় বহমান জীবন স্রোতে সমাজ ও মানুষের পরিবর্তমান ছবি খোলা মনে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর গল্পের উপস্থাপন ও ভাষারীতি সম্পূর্ণরূপে নূতন, এমনকি ব্যতিক্রমীও বলা যায়। গল্পের রীতিও স্বতন্ত্র। গল্পের নামকরণ কাব্যগুণ, নাট্যগুণ, চিত্রকল্প, ক্লাইমেক্স ও একমুখীন গতিতে নবনীতা দেবসেনের গল্পগুলি শিল্পোৎকর্ষের পরিচয় বহন করে।

পরিশেষে বলা যায় গবেষণা গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, সরসীবালা, পূর্ণশশী, শৈলবালা, জ্যোতির্ময়ী, রাধারাণী দেবী, সাবিত্রী রায়, ছবি বসু, প্রতিভা বসু, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেনের গল্পগুলির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোটগল্পের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলো। আরও অন্যান্য বিশিষ্ট, গল্পকারদের সঙ্গেও তাঁদের গল্পের সাদৃশ্য থাকতে পারে সন্দেহ নেই। সংক্ষিপ্ত পরিসরে শতবর্ষের মহিলা গল্পকারদের ছোটগল্পগুলির তুলনা করে তাদের মিল ও স্বাতন্ত্র্য কতটুকু তা এই অধ্যায়ে প্রদত্ত হলো। বাংলা ছোটগল্পের জগতে এই মহিলা গল্পকারদের অবদান বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

উল্লেখপঞ্জী

- ১। রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প — গোপিকানাথ রায় চৌধুরী — পৃঃ ৫৮
- ২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প — জগদীশ ভট্টাচার্য/ ভূমিকা — পৃঃ ৬
- ৩। রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন — ‘নারী’ প্রবন্ধ — পৃঃ ৩৭৬
- ৪। রাধারাণী দেবীর রচনা সংকলন (২য় খন্ড) — ভূমিকা অংশ — পৃঃ ২
- ৫। গল্পচর্চা-উজ্জ্বল কুমার মজুমদার — পৃঃ ৭০৭
- ৬। বাংলা গল্প ও ছোটগল্প : ড. সরোজমোহন মিত্র — পৃঃ ৩৪১
- ৭। শরৎচন্দ্র সুবোধ সেনগুপ্ত — পৃঃ ৩৫
- ৮। বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ — সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় — পৃঃ ৫২২
- ৯। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ছোটগল্প পাঠঃ দেবকুমার ঘোষ — পৃঃ ৯৭
- ১০। কালের পুত্তলিকা — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — পৃঃ ২৫২
- ১১। ছোটগল্পের বিষয়-আশয় — সুমিতা চক্রবর্তী — পৃঃ ২৮২
- ১২। ছোটগল্পের বিষয়-আশয় — সুমিতা চক্রবর্তী — পৃঃ ২৮৬

ଷଠି ଅଧ୍ୟାୟ

উপসংহার

প্রতিবাদী চেতনার আলোকে একশ' বছরের সময় সীমার মধ্যে রচিত বাংলা মহিলা গল্পকারদের গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সংখ্যার দিক থেকে তা দেড় হাজারের কাছাকাছি। তবে প্রতিনিধিত্বানীয় গল্পগুলি পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি এর মধ্যে বহু গল্প বিষয়বৈচিত্র্যে ছিল অনন্য, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। যে মহিলা গল্পকারদের নিয়ে ইতিপূর্বে পাঁচটি অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, সেই গল্পকারদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিতা। তন্মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী ও নবনীতা দেবসেন হলেন উচ্চশিক্ষিতা। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দি, সংস্কৃত ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত আবার অনেকে প্রথাগত শিক্ষা লাভ না করেও স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রচনা করে গিয়েছিলেন শত শত গল্প। এ প্রসঙ্গে পূর্ণশশী দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রাধারাণী দেবী, সাবিত্রী রায়, আশাপূর্ণা দেবী, ছবি বসু, সরসীবালা দেবীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই বৃহত্তর সময় সীমার মধ্যে আলোচ্য মহিলা গল্পকারদের গল্পগুলি বিষয়বৈচিত্র্য ও আঙ্গিক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। কেউবা বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথের কিরণে সাজিয়েছেন অজস্র গল্প সম্ভার। বলতে গেলে একাধিক প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষায় দক্ষ মহিলা গল্পকাররা তাঁদের গল্পগুলিতে হিন্দি, বাংলা, আঞ্চলিক ভাষার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। প্রতিভা বসু, নবনীতা দেবসেন ও মহাশ্বেতা দেবী অনেক গল্পে ইংরেজী ভাষার সংলাপ ব্যবহার করে গল্পগুলিকে আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন।

তবে একথা সত্য যে সব গল্পই যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে একথা বলার সৎ সাহস হয়তো আমার নেই। তথাপি বহু শিল্পসফল গল্পগুলি শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যে এমনকি আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বাংলা ভাষার শক্তিমত্তা ও শিল্পশ্রীর পরিচয় দিতে পেরেছেন, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

সাহিত্য যেহেতু সমাজ জীবনের দর্পণ, সেহেতু সমকালীন সমাজের গল্প রচনা করতে গিয়ে বহু গল্প সমকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কালকে অতিক্রম করে কালের অতীত হয়েছে এমন গল্পের সংখ্যাও কোন অংশে কম নয়।

সর্বাপ্তে আমরা স্মরণ করছি স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম। তাঁর গল্পে পারিবারিক সমস্যা, স্বদেশচেতনা, নারীমনস্তত্ত্ব অত্যন্ত শিল্প সম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ব্যঙ্গ এবং বিদ্রোহাত্মক

গল্পগুলিও ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। গল্পের শুরু ও সমাপ্তির নাটকীয়তা, কাব্যব্যাঞ্জনা, ট্রাজিক আবেদন, প্লটের নৈপুণ্য, চরিত্রচিত্রণে দক্ষতা, ক্লাইম্যাক্স, বর্ণনা অংশের অনবদ্যতা, একমুখীগতি, কোথাও মধুরাস্তিক পরিণতি গল্পগুলিকে সার্থক করে তুলেছে। ‘গহনা’, ‘লজ্জাবতী’, ‘যমুনা’, ‘প্রতিশোধ’, ‘কেন’, ‘নবডাকাতের ডায়েরি’, ‘তিনটি দৃশ্য’, ‘পূজারতত্ত্ব’, ‘কান্তিবাবু খোসনামা’, ‘বিজয়ার আশীর্বাদ’ প্রভৃতি গল্পের বিষয় যেমন অভিনব, সংলাপগুলিও তেমনি জীবন্ত। প্রকৃতি বর্ণনা ও চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর অনেক গল্পকবিত্বের বর্ণাধারা আমাদের পৌঁছে দেয় এক অনুভবের জগতে। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রকে নিয়ে জীবনের এক একটি খণ্ডাংশ অবলম্বন করে তিনি যে প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলি রচনা করেছেন তারমধ্যে হয়তো জোরালো প্রতিবাদ নেই ; প্রতিবাদের বলিষ্ঠ ভাষাও সেখানে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। তথাপি প্রথমপর্বের গল্পকার হিসেবে এই গল্পগুলি বিশেষ মর্যাদা পাবার অধিকারী।

সরসীবালা দেবীর গল্পগুলিও নানাকারণে উল্লেখের দাবী রাখে। তাঁর গল্পগুলিতে রয়েছে নাটকীয় ব্যাঞ্জনা এছাড়া বর্ণনাংশ সাবলীল, চরিত্রগুলিও জীবন্ত। বলিষ্ঠ প্রতিবাদ না থাকলেও তাঁর গল্পগুলির পরিণামী ব্যাঞ্জনা চমকপ্রদ সন্দেহ নেই।

পূর্ণশশী দেবীর গল্পগুলি অনবদ্য। কথ্যভাষার সাবলীল গতি রয়েছে তাঁর প্রতিটি গল্পে। ‘অভিসারে’, ‘দুই দিক’, ‘আলো ও ছায়া’ প্রভৃতি গল্পে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ রয়েছে একথা সহজভাবে মেনে নিতেই হয়।

তাঁর ‘মায়ার বন্ধন’ গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে প্রৌঢ় কাত্যায়নীর মুখে। নবম বর্ষীয়া উমার মাতৃস্থানীয়া জ্যাঠাইমা সে। কাত্যায়নী ছোট্ট উমার প্রতি বিমাতার হৃদয়হীন আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছে উমা নিজের মেয়ে না হলেও, মেয়ে । তাই তার প্রতি মা এর মতো স্নেহ ভালোবাসা দিতে হবে। এই কথা স্মরণ করিয়ে প্রতিবাদ জানান -

“ছোট বৌ! উমা তোমার পেটে না হলেও তো সে তোমার মেয়ে; তোমার মিনি যেমন, উমাকেও সেইরকম ভাবা উচিত, কি জানি কেন তুমি উমাকে মোটেই দেখতে পার না। সে কি তোমার কেউ নয় ? ছেলে-মানুষ, যদি একটা দোষই করে থাকে, তা বলে কি.....”

পূর্ণশশী দেবীর ‘ববুয়া’ নামক গল্পে পিতৃহীন ববুয়া তার মার সঙ্গে গিরধারী চাচার অবৈধ সম্পর্ককে মেনে নিতে পারেনি। এমনকি মায়ের পুনরায় বিবাহের সংবাদও তার মনে প্রবল অশান্তির বাড় তুলেছিল। তাই সে গিরধারী চাচাকে খুন করব তীব্র প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছে। কিন্তু খুন করতে ব্যর্থ হয়েও হার মেনে নেয় নি। তাই গল্পের শেষেও তার কথা প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে, গিরধারীর সাহায্যে খালাস হবার প্রস্তাব শুনে -

“চোপরও শালা, হারামজাদা! শূওরিয়াকা বাচ্ছা। - খবরদার, ফের যদি কোনওদিন আমার সামনে এসেছিস - তাহলে এই, - এমনি করে তোর মুণ্ডটা দুখান করে ভেঙ্গে দেবো।”

‘নিরুদ্দেশের যাত্রী’ গল্পের নায়ক বিজিত কুমার নীলিমার নিষ্ঠুর আচরণের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছে। নীলিমার দেওয়া খাতাখানা গায়ের কাছে ফেলে দিয়ে সেই স্থান থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

শৈলবালা ঘোষ জায়ার গল্পগুলিতে প্রতিবাদ রয়েছে। তাঁর গল্পের বিশেষত্ব এই তিনি বর্ণনাংশে সাধুভাষা এবং সংলাপ অংশে চলতি ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাঁর ‘দীপ্তি’, ‘বুনোওল ও বাঘা তেঁতুল’ প্রভৃতি গল্পের নায়িকা চরিত্রগুলি প্রতিবাদী।

শৈলবালা ঘোষজায়ার ‘ভণ্ডের সার্থকতা’ গল্পে এটর্নি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় কে ভণ্ড প্রকৃতির মানুষ হিসেবে দেখা যায়। তিনি সবলকে ভয় করেন, দুর্বলকে ভয় দেখান। নিতান্তই স্বার্থপর এই মানুষ মিহিরের মার কাছ থেকে বিপদের সময় দশহাজার টাকা নিয়েছিল, কিন্তু তাদের বিপদের দিনে বিন্দুমাত্র সাহায্য করতেও ইচ্ছুক নন। তার এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে গৃহিণী বিষণ্ণ স্বরে বলেছেন —

“বুঝতে ত পারছি। কিন্তু একদিন যে বড় বিশ্বাস করেই শুধু আত্মীয় বলেই বিধবার সর্বস্ব ঝুলি ঝেড়ে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন, সেদিনের কথা।”

অসুস্থ মিহিরের অসহায় বিধবা মা ও ছোটভাই অনিলকে ভণ্ড মহাদেব জানায় তার প্রচুর দেনাদার, তাছাড়া দু হাজার টাকা - ও গুন্ডারা কেড়ে নিয়েছে। এই বিশ্বাস ঘাতকের কথা গুলিতে শেষ অতিষ্ঠ হয়ে অনিল প্রতিবাদের সুরে জানায় —

“বেশ, তাহলে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। দেনার ওপর যদি এত বাড়ী-গাড়ী, ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান, টেলিফোন করতে পেরেছেন, তাহলে আর কিছু দেনা করে গরীবদের দুঃসময়ে সাহায্য করুন দাদা।”

লেখিকার ‘শমিতার জয়’ গল্পে চাঁদজোড় কোলিয়ারীর দ্বিতীয় ম্যানেজার অটলবাবুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারই এক সহকর্মীর বিরুদ্ধে অদ্ভুত এক পছন্দ অবলম্বন করে। তীর দ্বারা আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার এই তীরবিদ্ধ হওয়া কোন দুর্ঘটনা নয়, শত্রুতা। এটা তিনি ভালো করেই জানেন, অথচ শত্রুকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেননি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়েছেন, ক্ষমার মাধ্যমে। তার মুখেই শোনা যায় —

“মানুষ মাত্রেরই অনেক ভুল করে থাকে! নির্বোধের ভুলের জন্য ভগবানের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করাই আমাদের কর্তব্য।”

‘মণীষা’ নামক গল্পটিতে মণীষা প্রতিবাদ জানিয়েছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। বিমলা দুঃখী মানুষের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি সম্পন্ন। কিন্তু দরিদ্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা তার স্বামীর অপছন্দের। তিনি স্বামীর এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্পের সীমানা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি সমাজজীবনের অসঙ্গতি গুলিকে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। বহু অনালোকিত বিষয়গুলিকে তিনি পাঠকের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ‘আরাবল্লীর আড়ালে’, ‘পিঁজরাপোল’, ‘মর্ত্যের অঙ্গুরা’, ‘শেঠানীজী’, ‘সতী’, ‘পুত্রেষ্টি’, ‘বেটি কা বাপ’, ‘সেই ছেলেটা’, ‘এপার গঙ্গা -ওপার গঙ্গা’ প্রভৃতি গল্প প্রতিবাদী গল্পের মর্যাদা পেয়েছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘ডাইনী’ গল্পের চরিত্র লছমীকে সকলে ডাইনী বলে সন্দেহ করে। কিন্তু হিস্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত এই লছমীকে যৎপরনাস্তি অত্যাচার ও অপমানের হাত থেকে রক্ষা করতে প্রতিবাদ করে প্রবীর। সে লছমীকে নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে এনে তার স্বামীর সাথে সাক্ষাত করাতেও সক্ষম হয়, লছমীরও ভয় কেটে যায়। সে ভাবে যে হাবিলদারের বউ লছমী, তাই তাকে ডাইনী বলতে কারও সাহস হবে না। নিতান্ত গ্রাম্য কুসংস্কারের বশে একটি মেয়েকে ডাইনী সন্দেহে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে যে প্রতিবাদ প্রবণতা থাকা উচিত ছিল তা এখানে বর্তমান।

‘রূপ’ গল্পটিতে রয়েছে নীরব প্রতিবাদ, অনুকূল বাবু দুবার বিবাহ করেছেন। পিতার আদেশ পালন করতে গিয়ে প্রথমে বিয়ে করলেও রক্ষেকালীর মত স্ত্রী তার পছন্দ ছিল না। তাই বন্ধুর বোনকে সে বিয়ে করে, এবং সেই স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সে আলাদা থাকে। তার প্রথমা স্ত্রী সবকিছু জেনে শুনেও নিশ্চূপ রয়েছে। কিন্তু তার মৃত্যু হলে হঠাৎ অনুকূল বাবুর কাছে একটা চিঠি আসে যে, তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এবং গয়নাগাটি সে তার স্বামীর সন্তানের জন্য রেখে গেছে, অর্থাৎ এরূপ নীরব নিরন্তর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই গল্পটিতে। চিরদিনের অবহেলিত, অপমানিত স্ত্রীর এইরূপ দান অনুকূল বাবু ও তার পরিবারের জন্য ধার্য হল। সেই মুহূর্তে অনুকূল বাবুর মনে হল তার রূপহীনা কন্যার জন্য কত কথাই না তাকে শুনতে হয়েছে। তাই শেষে মনে হয়েছে যে তার স্ত্রী অসুন্দর তাতে তার স্ত্রীর দোষ নেই, দোষ তার নিজেরই। অকাল বৈধব্যের ফলে ছোট ছোট মেয়েগুলোর কঠিন বিধি, একাদশী পালনের কথাই প্রতিবাদের সুরে ধ্বনিত হয়েছে ‘একাদশী’ গল্পটিতে। গল্পের চরিত্র ভগবতী জানতে চেয়েছেন একি সত্যিই শাস্ত্রের বিধান? তাকে তার পতি ও পুত্র দুঃখ করে বলেছিলেন এ কখনো শাস্ত্রের বিধান হতে পারেনা -এ দেশাচার, লোকাচার অর্থাৎ নিষ্ঠুর দেশাচার-লোকাচার। এর প্রতি সূক্ষ্ম এক প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে ‘একাদশী’ গল্পে।

‘রাঘোমণির ছেলে’ গল্পটিতে ভদ্রলোকের দ্বারা নিম্নবর্ণেরা কিভাবে শোষিত হয় তারই এক তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ রয়েছে। সেই সঙ্গে মায়ের কষ্ট করে ছেলেকে মানুষ করার কথাও এখানে

দেখানো হয়েছে। যে মা সকল চেষ্টা করে ছেলেকে মানুষ করতে চায় কিন্তু সমাজ - দেশ তা মানে না। তাই নিম্নবর্ণের ছেলেরা হয় বিপথগামী। কিন্তু বউ কোন খোঁজ রাখে না। তাই এই গল্পটিতে প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে সমাজকে ঘিরেও।

রাধারাণী দেবী অভিজ্ঞতার শিল্পী। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর গল্পগুলিতে মানবিক আবেদন বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর শিল্প সফল গল্পগুলির মধ্যে নারী জীবনের বিড়ম্বনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর ‘যমের অরুচি’, ‘হায়রে হৃদয় তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়’, ‘গতানুগতিক’, ‘দাবীহারা’, বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বৃদবৃদ’, ‘শূন্যমনাকালিনী মেয়ে’, ‘আলো কোথায় ওরে আলো’, ‘বিমাতা’, ‘পাতানো মা’, ‘মা’, ‘অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে’ ও ‘পরম তৃষ্ণা’ গল্পগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে ও শিল্প নৈপুণ্যে অনন্য। তিনি চরিত্রগুলির মুখে যথাযথ ভাষা জুগিয়েছেন। চূড়ান্ত নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে তীব্র গতিময়তায়, প্রতিবাদমুখর ভাষায় যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

রাধারাণী দেবীর ‘যমের অরুচি’ গল্পে পণপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। পণপ্রথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। সমাজে তার কোন সমাধান নেই। এছাড়াও রয়েছে অসহায় ও দুর্বলের উপর আমাদের সমাজে যে অন্যায় অত্যাচার চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যারা সমাজ শিক্ষিত, উন্নত, ভদ্র বলে বিবেচিত হয় তারাই এই অমানবিক প্রথায় যুক্ত ফলত যারা সমাজের মূল সেখানেই যখন গলদ সেক্ষেত্রে সমাজে এই পণপ্রথার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। চারু নামক চরিত্রটি আরও জানিয়েছে - যে পণ নেবার সময় বাবা মায়ের একান্ত বাধ্য হয়ে ওঠে ছেলেরা। তারা অন্যায় জেনেও তার প্রতিবাদ করেনা, তাই তারা গল্পের নায়িকা চারুর কাছে কুসন্তান বলে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়াও বয়সের প্রচুর পার্থক্য থাকায় বিবাহ ফলত অল্প দিনের মধ্যেই বৈধব্যে পরিণত হত। সমাজের এই প্রবল দুর্গতির কথাও এখানে প্রতিবাদের সুরে ধ্বনিত হয়েছে - যে এমন পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় পাথর বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে মারাও অনেক ভালো।

‘— হায়রে হৃদয়, তোমার সঞ্চয় দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ - প্রান্তে ফেলে যেতে হয়’ গল্পে কাজের ভিত্তিতে মানুষের মর্যাদা নয়, যে কোন কাজই মর্যাদার একথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বিশ্বনাথ রাঁধুনীর মেয়েকে বিয়ে করবে বলে প্রকাশ করেছে। রাণী রাঁধুনীর মেয়ে হওয়ায় বিরুদ্ধাচরণ করেছে বাবা ও মা। কিন্তু বিশ্বনাথ প্রতিবাদের সুরে জানিয়েছে ঘরের বউ যদি রান্না করতে পারে তবে রান্নার বউ এর মেয়েকে বিয়ে করা কোন দোষের নয়। এছাড়াও পুরুষের অন্যায় অবিচার ও উশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রাণী প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ করেছিল স্বামী ভূপতির অসুস্থ জীবনযাত্রা দেখে।

‘আলো - কোথায় ওরে আলো’ গল্পে সন্তান পালনের ক্ষেত্রে মায়ের যে কত বড়

ভূমিকা থাকে সেখানে পিতার স্থান যে কতটা নগন্য বা তাদের ভালো - মন্দ যে পিতার গায়ে কতটা লাগে সেই কথা গুলোই যেন প্রতিবাদের সুরে গল্পের চরিত্র, প্রভা বলেছে। এখানে পিতার সাথে মাতার সন্তানকে নিয়ে যে টানা পোড়েন তাই লেখিকা দেখিয়েছেন। অমলা তার সন্তানদের যেন দুশ্চরিত্র কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীর প্রভাব একে একে রক্ষা করে চলেছে। তাই তার স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সন্তান স্নেহে মা অমলা নিজেও অন্ধ হতে চায় কিন্তু পিতা তখন দিল্লিতে কর্মরত।

‘পরমতৃষা’ গল্পে স্ত্রী সুভা পুত্র সন্তানের আশায় স্বামী নন্দলালকে চিত্রের কাছে ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী নন্দলাল তা পূর্ণ সমর্থন করেন সে প্রতিবাদ জানিয়েছে এই পুত্র সন্তানের আশাকে ভেঙে দেবার জন্য সে স্ত্রীকে তিরস্কার করেছে। সমাজের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখিকা এইভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘বিস্তীর্ণ বারিধির একটি বুদ্বুদ’ গল্পে নিজের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সকালের চাপে কিভাবে বিবাহ করতে মেয়েরা বাধ্য হয় সমস্ত ইচ্ছাকে বিসর্জন দিয়ে, তারই একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বিন্দুর মিনতি স্বরূপ ছোট প্রতিবাদ কেউ গ্রাহ্য করেনি। সমস্ত কিছুই তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘটেছে এমন কি বৈধব্য পর্যন্ত। তাই তার মাত্র পনেরো বছর বয়সেই বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে উঠেছে সমাজ - সংসার - মানুষ - এমনকি ভগবানেরও বিরুদ্ধে।

সাবিত্রী রায় একজন সফল প্রতিবাদী গল্পকার। তিনি সমাজ সচেতন শিল্পী। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাঁর গল্পগুলি প্রতিবাদী চেতনায় উদ্দীপ্ত। তাঁর প্রতিটি গল্পের মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বলা যায় তাঁর গল্পগুলির আবেদন চিরন্তন। সংখ্যার দিক থেকে বেশি না হলেও তিনি যে গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাঁর মধ্যে প্রতিবাদী নারী চরিত্রগুলি বাস্তবধর্মী। তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক সম্প্রীতিবোধের অন্যতম রূপকার। তৎকালীন যুগযজ্ঞের ছবিকে তিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে উপস্থাপন করেছেন। সংলাপ নৈপুণ্যে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী ভাষায়, চরিত্রচিত্রণের দক্ষতায়, নাটকীয়তায়, গল্পের গুরু ও সমাপ্তির অনবদ্যতায় গল্পগুলি প্রথম শ্রেণির শিল্পসফল গল্পের মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর ‘নূতন কিছু নয়’, ‘মাটির মানুষ’, ‘রাধারাণী’, ‘ওরা সব পারে’, ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’, ‘হাসিনা’, ‘সাময়িকী’, ‘প্যারামবুলেটার’ ও ‘অন্তঃসলিলা’ প্রভৃতি প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাবিত্রী রায়ের ‘মাটির মানুষ’ গল্পে প্রতিবাদ জানিয়েছে যমুনা। পঞ্চাশ বছর বয়সী শশীভূমালীকে যমুনা স্বামী হিসেবে নিতে পারেনি। তাই এক ঝড় জলের রাতে স্বামী গৃহ ত্যাগ করেছে। এই ভাবে লেখিকা কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

‘হাসিনা’ গল্পটিতে হাসিনার মতো ভিখিরিদের সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ত হয়েছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে লেখিকা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন।

‘অন্তঃ সলিলা’ নামক গল্পটিতে মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই চোখে পড়ে।
এর মধ্যে দিয়ে সাবিত্রী রায়ের প্রতিবাদী মানসিকতার তার পরিচয় পাতয়া যায়।

‘প্যারামবুলেটার’ গল্পটির সমাপ্তিতে রয়েছে এক নিদারুণ করুণ দৃশ্য সুশান্তর কোলের শিশু সন্তানটি সমাজিক হিংসার শিকার হয়েছে। শেষ পর্যন্ত নিষ্পাপ শিশুটির রক্তাক্ত দেহ, সামাজিক দাঙ্গা ও সম্পাদকের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ ঘোষিত হয়েছে।

প্রতিবাদী গল্পকার ছবি বসুর গল্পে স্বদেশ প্রেমের সার্থক পরিচয় মেলে। পরাধীন ভারতের ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে তিনি যেমন প্রতিবাদী আন্দোলনের কলম ধরেছিলেন, তেমনি নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে নারীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর গল্পের ছত্রে ছত্রে। সেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর ‘পিতৃঘাতিনী’, ‘নির্বাক যৌবন’, ‘বিভা বৌদি’, ‘প্রবহমান’ ও ‘কান্না’ গল্পে। তাঁর গল্পে শ্লোগানধর্মী ও প্রচার সর্বস্বতার পরিচয় থাকলেও, শিল্পগুণে সমৃদ্ধ এতে সন্দেহ নেই।

ছবি বসুর ‘বিভা বৌদি’ গল্পের শচীন চরিত্রটি এখানে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভিন্ন ভাবে। সামাজিক সংস্কারে আবদ্ধ শচীন ঘরের মেয়ে, বউদের ভিড় করে লোকের সামনে দাঁড়িয়ে থাকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রতিবাদ জানিয়েছেন মেয়েদের ড্যাংড্যাঙিয়ে চাকরি করতে যাত্যাকে কেন্দ্র করেও।

‘হরমোহনের সমাজচেতনা’ গল্পে হরমোহন সমাজ সচেতন হয়ে ওঠেন হঠাৎ করে। চাইল্ড - লেবার নিয়ে সরকার নানান ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সামাজিক মানুষ হিসেবে হরমোহনেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তাই তার প্রতিবাদ চাইল্ড লেবারের বিরুদ্ধে।

‘স্মৃতি বাতায়ন’ গল্পে শোভেন মেয়েদের জীবনে অবহেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা ব্যবহার করেছে। কোথাও বা বুর্জোয়া সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

‘ডাক্তার পিসিমা’ গল্পে পুত্র জঙ্কে হারিয়েও পুত্রবধূর তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ ডাক্তার পিসিমা নিজগৃহ পরিত্যাগ করে আশ্রয় নিতে চায় বস্তিতে। আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তার এই প্রতিবাদ গৃহত্যাগের মধ্যদিয়ে দেখিয়েছেন লেখিকা।

প্রতিভা বসু বাংলা গল্পের জগতের পরিচিত নাম। তাঁর ছোটগল্পগুলিতে রয়েছে বৈচিত্র্য। তাঁর প্রতিবাদী গল্পগুলি শিল্পসার্থক। চরিত্র নির্মাণে, গঠন পরিকল্পনায় একমুখীন গতিতে, নারী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, নাট্যগুণের সার্থক সমাবেশে তাঁর গল্পগুলি ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। তাঁর স্বদেশপ্রেমের ছোটগল্পগুলিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাঁর গল্পের প্রতিবাদী ভাষা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তিনি তাঁর গল্পগুলিতে পুলিশ প্রশাসনের নিপিক্রয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। নিপীড়িত, বঞ্চিত, নারীদের জীবন কথাকে তিনি অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি

ছিলেন মানবতাবাদী গল্পকার। দরিদ্র পরিবারের কথা বলতে গিয়ে তাদের প্রতি সহানুভূতি বোধের পরিচয় রেখেছেন। তাঁর গল্পের নামকরণগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। গল্পের শুরু ও সমাপ্ত অংশটি তাঁর কলমে শিল্পসফল হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি মূলত বর্ণনা অংশ ও সংলাপ অংশে কথ্যরীতির সার্থক ব্যবহার করেছেন। স্থানে স্থানে তিনি বাংলা ও ইংরেজী ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তাঁর ‘সুমিত্রার অপমৃত্যু’, ‘মাধবীর জন্য’, ‘অন্ধকারে’, ‘সকালবেলা’, ‘ভেজানো দরজা’, ‘স্বপ্ন ভেঙে যায়’, ‘ঘাস মাটি’ ‘স্বর্গের শেষধাপ’, ‘আয়না’ প্রভৃতি গল্পে রয়েছে প্রতিবাদের সুর। শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষদের প্রতি প্রতিভা বসুর গভীর সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিভা বসুর ‘ভালোবাসার জন্ম’ ছোটগল্পে পুষ্প প্রতিবাদ জানিয়েছে তার স্বামী ব্রজেশের বিরুদ্ধে। পুষ্পের বিয়ের ছ বছর হলেও মা হতে পারেনি। তাই স্বামীও শাশুড়ির কাছে সে স্নেহের পাত্রী হতে পারে নি। ব্রজেশ দ্বিতীয় বিয়ে করতে ইচ্ছুক। এতে পুষ্পের কোন আপত্তি নেই। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর স্বামীর সঙ্গে তার ভালোবাসা সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু রাজা কথাটি তার সহ্য হয়না। সে এক ডাক্তারকে দেখিয়ে জানতে পারে সে ও মা হতে পারে। এই ডাক্তারের সঙ্গেই এক সময় ধীরে ধীরে পুষ্পের প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাই রুচিহীন, অভদ্র স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ সে গৃহত্যাগ করে ডাক্তারের কাছে আশ্রয় নেয়।

‘স্বামী-স্ত্রী’ গল্পে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে সীতার মুখে। মাতৃহীন সীতা গৃহতাড়িত হয়েছে। এক প্রাথমিক স্কুলে। শিক্ষকতা করবার সময় সে দু’জন পুরুষের লালসার শিকার হয়। কিন্তু একথা শোনবার পর তার বিমাতা ও পিতার দ্বারা সহানুভূতি পায়নি, বরং বাড়ি ছাড়তে হয়েছে। দুটো পথই তার কাছে খোলা ছিল, এক মৃত্যু আর সমাজসেবক চিরঞ্জীব মুখার্জীর আশ্রয়। সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানতে গিয়ে তাই সমাজসেবক চিরঞ্জীব বাবুর স্ত্রী হতে চেয়েছে।

লেখিকার ‘অন্ধকারে’ গল্পটিতে বীরেশ্বর বৈষ্ণব সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেও তার কিছু সহকর্মীরা চায় প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে। তাই হিংসার পথকে বেছে নিয়ে বোমা, বন্দুকের ব্যবহার করেছে। পরীক্ষার দিন কলেজের চেয়ার টেবিল ভেঙ্গে, উপাচার্যকে শাসিয়ে, অধ্যাপকদের অপমান করেছে। রামেন্দুর কথায় “.....ভদ্রলোক হয়ে তো বহু বছর কাটালে কাল, এবার না হয় একটু ছোটলোক হয়েই দেখা যাক না, বিষ্ঠাসংকুল ভরাপুরা নর্দমার স্থির ডাকল কম্পন তোলা যায় কি না।”

গল্পের শেষে দেখা যায় প্রতিবাদ জানাতে গিয়েই বীরেশ্বরের হাজত বাস গ্রহণ করতে হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবী সার্থক প্রতিবাদী গল্পকার। তিনি সমাজ জীবনের একাধিক সমস্যানিয়ে অজস্র ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর শিল্পসফল প্রতিবাদী গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য

হল ‘হিন্মস্তা’, ‘ইজ্জত’, ‘বিপন্ন সুখ’, ‘শান্তি’, ‘সর্পশিশু’, ‘আত্মহত্যা’, ‘আহতফনা’, ‘অনাচার’, ‘অভিনেত্রী’, ‘সীমারেখার সীমা’, ‘নিখাদ’, ‘জালিয়াত’, ‘অপরাধ’, ‘দুঃসাহস ও তাসের ঘর’ উল্লেখযোগ্য। নারী চরিত্র চিত্রণে তিনি যথার্থ মুন্সীমানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত ছোটগল্পগুলি সময়ের সীমা অতিক্রম করে কালজয়ী হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদী চরিত্রের মুখে তিনি যে ভাষা জুগিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ। অত্যাচারী পুরুষ চরিত্রগুলি তাঁর কাছে ধিক্বারের যোগ্য। তিনি তাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন। তাঁর ‘অনাচার’ গল্পের সুহাস কাকিমা, ‘শান্তি’ গল্পের মহালক্ষ্মী, ‘হিন্মস্তা’ গল্পের জয়াবতী, ‘সত্যবতী’ গল্পের সত্যবতী, ‘আত্মহত্যা’ গল্পের জয়ন্তীর প্রতিবাদী চেতনা তীব্র। তাঁর গল্পে রয়েছে নাটকীয়তা। আশাপূর্ণা দেবীর সব গল্পই শিল্পসফল হয়নি একথা সত্য তবুও তাঁর প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পগুলি সমকালীন যুগ পরিবেশ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে কালজয়ী সাহিত্যে উন্নীত হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প ‘ইজ্জত’-এ প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয়েছে বাসন্তীর মেয়েকে নিয়ে সুমিত্রার কঠে। মহীতোষ এর সাথে সুমিত্রার বচসা শুরু হয়। একটি মেয়ের ইজ্জত রক্ষা নিয়ে। সুমিত্রার এই প্রতিবাদ মানবিক প্রতিবাদ কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়নি। কিন্তু তার এই প্রতিবাদ সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিবাদ।

‘নিজের জন্য শোক’ গল্পে বৃদ্ধ স্বামী ও পিতা অবিনাশ বৃদ্ধ হওয়ার দরুন সকলের যেন অবহেলার পাত্র। তাই সে নিজের মৃত্যু চেয়েছে এবং নিজের মৃত্যু চাওয়ার মধ্যদিয়ে যেন সংসারের কাছে, স্ত্রী, সন্তানদের কাছে সমাজের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

‘বরফজল’ গল্পের চরিত্র বুঝু ও টুটু, মা দীপিকার সাজসজ্জা ও তার উদ্ভট সাহিত্যচর্চার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। গল্পের শেষে আমরা আরও দেখতে পাই যে টুটু ভদ্র বাবার উপর প্রতিবাদমুখী হয়েছে যে তাদের বাবা যদি দায়িত্বজ্ঞান না হারিয়ে শুরু থেকেই মাকে শাসন করতেন তাহলে আজ এমনটা হতনা, সংসার সুখের হয়ে উঠত, সাংসারিক জীবনের এই তুচ্ছ ভুলের প্রতিবাদ বর্ষিত হয়েছে এই গল্পটিতে।

একই বাড়িতে থাকতে গেলে মানুষকে মানিয়ে গুছিয়ে চলতে হয়। কিন্তু বারংবার কেউ যদি সেই মানিয়ে নেওয়াকে বিধ্বস্ত করতে চায় তাহলে গর্জে ওঠে প্রতিবাদ। এমনই সমস্যা কেন্দ্রিক একটি গল্প আশাপূর্ণা দেবীর ‘ক্যাকটাস’। ভারতী এক ভাড়া বাড়িতেই শিশিরের বউ হিসেবে প্রথম আসে। সেই বাড়ির মালিক মাসিমার সঙ্গে সে সর্বদা ভালো ব্যবহার রেখে চলে। যাবতীয় সমস্যা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে মাসিমার অভিযোগ শুনেও। কিন্তু শেষে একদিন মাসিমা তাদের চলে যেতে বললে সে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। ভারতী তার স্বামী শিশিরের আগেই মাসিমাকে বলেবসে নিয়মিত ভাড়া দিয়ে গেলে নোটস বলে কিছু থাকেনা। মাসিমা চমকে ওঠে। এরপর শুরু

হয় ভারতীও শিশিরের মধ্যে বচসা। শেষ পর্যন্ত তারা পৃথক হয়ে যায়। ভারতী শিশিরের অহংকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। তারা দুজনেই উপার্জনশীল তথাপিও যেন শিশিরের আধিপত্যই বেশি সবসময় তাকে মেনে চলতে হয় ভারতীয় এই চিরন্তন প্রথাকে। এই প্রথাকে অস্বীকার করে ভারতী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন নারী স্বাধীনতা। তাই তার সোচ্চার প্রতিবাদ শিশিরের বিরুদ্ধেও, সমাজের পুরুষদের একগুচ্ছ ক্ষমতার বিরুদ্ধে বা প্রভুত্বের বিরুদ্ধে।

অকারণে দারিদ্র্য ঢাকার জন্য নন্দিতা বোস কত কি না করতো, তাই তার বড়মেয়ে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় ‘প্রহরী’ গল্পটিতে। তাই নন্দিতা বোস তার বড়মেয়েকে পছন্দ করত না। ছোটমেয়েই ছিল তার প্রিয়। কিন্তু গল্পের শেষে ছোটমেয়ে পম্পা যখন বিধবাদের আমিষ খাওয়ার প্রসঙ্গে হাসতে হাসতে তার মায়ের মুরগী খাওয়ার প্রসঙ্গ আনে এবং নিরামিষ খাওয়ার বিরোধিতা করে, তখন তার কণ্ঠেও আমরা প্রতিবাদী ভাষা খুঁজে পাই সমাজের নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে।

মহাশ্বেতা দেবী বাংলা সাহিত্যের প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত গল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গল্পগুলিতে অন্ত্যজশ্রেণির শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। যেখানে যেখানে অন্যায়, অত্যাচার ও নিপীড়ন চলেছে তারই নিখুঁত ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। মহাজন, জোতদার, জমিদার, মজুতদার, কালোবাজারী, মুনাফাখোর, লম্পট, চরিত্রগুলির বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর ‘রোম্‌থা’, ‘দ্রৌপদী’, ‘রুদালী’, ‘বায়েন’, ‘স্তনদায়িনী’, ‘বিছন’, ‘রাবণ’, ‘হিরামতী’, ‘ভূমিদাত্রী’, ‘জাতুধান’, ‘রাক্ষস’, ‘বান’, ‘সাঁঝ সকালের মা’, ‘ভাতুয়া’, ‘মানত’, ‘সংরক্ষণ’, ‘এজাহার’, ‘হরুনসালেমের মাসি’, ‘ডাইনি’, ‘ধৌলী’, ‘শিকার’, ‘শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা’, ‘নুন’, ‘কুসুমা’ প্রভৃতি তাঁর শিল্পসফল গল্প। এই গল্পগুলিতে পুরুষ ও নারী চরিত্রগুলির বিশিষ্টতা লাভ করেছে। আপন অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি সমাজে যেখানে যেখানে অসংগতিগুলি দেখেছেন তার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার বিদ্রোহিণী নারীরা অনেক ক্ষেত্রে সংযম সীমা লঙ্ঘন করে গেলেও সমাজ বাস্তবতার নিরিখে সেই চরিত্রগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় ভাস্বর। মহাশ্বেতা দেবীর কালজয়ী দ্রৌপদী মেঝেন চরিত্রটি শিল্পগুণ সম্পন্ন। বৈচিত্র্যময় গল্পের শ্রষ্টা ছিলেন তিনি। তাঁর গল্পগুলি যেন এক একটা সংগ্রামের হাতিয়ার। দেশের নানাবিধ সমস্যা, সংকটকে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন সেই সংকট ও সমস্যাকে। তিনি তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ বিষয়টিও তাঁর গল্পের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গল্পের পরিবেশ সৃষ্টির অসাধারণ কৌশল তাঁর জানা ছিল। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পে রয়েছে সার্থক চিত্রকল্পের ব্যবহার যে চিত্রকল্পগুলিতে সরলতা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। সমাজের জ্বলন্ত রূপকে চিত্রকল্পের মাধ্যমে তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন এবং যে প্রাণের আবেদন

সৃষ্টি করেছেন তার সাহিত্যমূল্য অসাধারণ। বস্তুত ব্রাত্যজীবনের যথার্থ রূপকার মহাশ্বেতা দেবী সামাজিক দায়বদ্ধতা যথার্থভাবে পালন করেছেন। বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের যে জীবনভাষ্য তিনি দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তার ফলস্বরূপ তিনি জনপ্রিয় লেখিকা হয়ে উঠেছেন। মাটির কাছাকাছি জীবনের কথা মহাশ্বেতার মত কোন লেখিকাই সার্থকভাবে তুলে ধরতে পারেন নি।

গল্পকার নবনীতা দেবসেন যে গল্পগুলি আমাদের উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে প্রতিবাদী চেতনায়ুক্ত ছোটগল্প সংখ্যায় স্বল্প। তাঁর ‘ধর্মভাই’, ‘দেশে যাওয়া’, প্রভৃতি গল্পের প্রতিবাদ তেমন জোরালো নয়।

নবনীতা দেবসেনের রচিত ‘বামুন-মুচি-রাজা’ গল্পটি পত্রাকারে রচিত হয়েছে। এই গল্পে অভিষেক প্রতিবাদ জানিয়েছে। তবে এই প্রতিবাদ অন্য কারোর বিরুদ্ধে নয়, তার দুর্বল চরিত্র ও অস্থির মনের বিরুদ্ধে। তমসা নামক একটি মেয়েকে অভিষেক ভালোবেসেছে। তাকে লেখা চিঠি থেকে অভিষেকের পূর্বজীবন সম্পর্কিত অনেক ঘটনা জানা যায়। তার জীবনে একটি নয়, একাধিক নারীর সমাবেশ ঘটেছিল - জয়ারআন্টি থেকে শুরু করে জয়া, হাশমভ, জুড়ি শেষে তমসা। জয়া তার বিবাহিত স্ত্রী। কিন্তু আদর্শ স্বামীর ধর্ম কখনই পালন করতে পারেনি। একের পর এক নারীর মোহে নিজেকে জর্জড়িত করেছে। কিন্তু জীবনের মাঝামাঝি এসে সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে। তখন কোন এক বামনের গল্পের বামনের মতো নিজেকে মনে হয়েছে বড়ই অচেনা। তাই শেষ পর্যন্ত তমসাকে প্রকৃত ভালোবেসেও শুধু বন্ধুত্বই কামনা করেছে। এভাবে তমসাকে সে নিজের থেকে মুক্তি দিয়ে, নিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

‘বনলতার পুষ্টি’ গল্পে স্বর্ণলতার মুখে প্রতিবাদ শোনা যায়। তার একমাত্র কন্যা বনলতা জীব - জন্তুকে বড় ভালোবাসে। সে আশৈশব দেখেছে তার বাবা দেওয়ালকে প্রায়ই বলেন - মানুষের চেয়ে জন্তু জানোয়ার ঢের ভালো। তারা ভালোবাসতে জানো।

তাই বনলতা নিজের মাকে সাহায্য করার চাইতে পশু-পাখিদের নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকে। তাকে যখন কলেজের ম্যাটিনি আইডল ইন্দ্রনীল রিয়ার প্রস্তাব দিল, তখন বনলতার জীবনে একটা প্রবল সমস্যার সৃষ্টি হল। কারণ তার বাড়িতে জন্তু - জানোয়ারকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। এই নিয়ে বনলতাও কবি মানবেন্দ্রর সঙ্গে স্বর্ণলতার বিরোধ হয়। তিনি ইন্দ্রনীলের সপক্ষে বলেন —

“সে ছেলে হয়তো জীবজন্তু ভালোবাসে না। সবাই কি আর তোমার মতো বিদ্যুটে প্রকৃতির।”

বনলতার বাবা মানবেন্দ্র মনে করেন জীবজন্তু যারা ভালোবাসেনা, তারা আসলে মানুষকে - ও ভালোবাসে না, তার মতে এরা আসলে হার্টলেস। একথার, প্রতিবাদ জানিয়ে স্বর্ণলতা বলেন -

“আমি কি জীবনে কখনও কুকুর - বেড়াল ভালোবাসি ? তার মানেই কি আমি হার্টলেস ? যত হার্ট সব কি শুধু তোমার আর কুকুরদের বুকে ? আমার দয়ামায়া নেই।

পরিশেষে বলা যায় সুদীর্ঘ একশ’ বছরের অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে মহাশ্বেতা ও নবনীতা দেবসেন পর্যন্ত লেখিকাদের বাংলা গল্পে প্রতিবাদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে বাংলা সাহিত্যে তাঁদের স্থান গৌণ নয়। পূর্বে আলোচিত গল্পকারদের মধ্যে অনেকেই অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেই রেখে গেছেন নূতন সম্পদ যা কালজয়ী হতে পেরেছে ও শিল্পরূপের দিক থেকে অসংখ্য গল্পই রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে। তারা উত্তরসূরীদের জন্য যে প্রেরণা দিয়ে গেলেন তার সামাজিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্বকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেই হবে।

গ্রন্থ পঞ্জী

(Select Bibliography)

ক. আকর গ্রন্থ :-

- ১। দেবী আশাপূর্ণা :- গল্প সমগ্র
প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৮৬ সন
মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা
- ২। দেবী আশাপূর্ণা :- বাছাই গল্প
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ন, ১৪০৯ সন
মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা
- ৩। দেবী আশাপূর্ণা :- নক্ষত্রের আকাশ
তৃতীয় মুদ্রণ : মহালয়া ১৪০৩ সন
সাহিত্যম, কলকাতা
- ৪। দেবী জ্যোতির্ময়ী : রচনা সংকলন :- প্রথম খন্ড
আশ্বিন, ১৪০৮ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৫। দেবী জ্যোতির্ময়ী : রচনা সংকলন :- দ্বিতীয় খন্ড
জানুয়ারী, ১৯৯৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৬। দেবী জ্যোতির্ময়ী : রচনা সংকলন :- তৃতীয় খন্ড
নববর্ষ, ১৪০১ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৭। দেবী জ্যোতির্ময়ী : রচনা সংকলন :- চতুর্থ খন্ড
নভেম্বর, ১৯৯৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৮। দেবী পূর্ণশশী :- নির্বাচিত রচনা
মাঘ, ১৪০৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

- ৯। দেবী মহাশ্বেতা : রচনা সমগ্র - ১ম থেকে ১৫তম খন্ড
জুন, ২০০১ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১০। দেবী রাধারাণী : রচনা সংকলন :- ১ম খন্ড
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৪০৫ সন, ইং - নভেম্বর, ১৯৯৯ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১১। দেবী রাধারাণী : রচনা সংকলন - ২য় খন্ড
প্রথম প্রকাশ : মাঘ, ১৪০৬ সন, ইং - জানুয়ারী, ২০০০ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১২। দেবী স্বর্ণকুমারী : রচনা সংকলন
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৪০৭ সন, ইং - সেপ্টেম্বর ২০০০ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৩। ঘোষজায়া শৈলবালা :- গল্প সংকলন
প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৪০৭ সন, ইং - সেপ্টেম্বর, ২০০০ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৪। চৌধুরানী সরলাদেবী : নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, মাঘ, ১৪১০ সন, ইং - জানুয়ারী ২০০৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৫। দেবসেন নবনীতা :- গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪০৩ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৬। দেবসেন নবনীতা :- গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৯৭ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৭। দেবসেন নবনীতা :- গল্প সমগ্র, তৃতীয় খন্ড
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৪১১সন, ইং - এপ্রিল, ২০০৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৮। বসু ছবি : রচনা সংকলন
প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ, ১৪০২, ইং - এপ্রিল, ১৯৯৫ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

- ১৯। বসু প্রতিভা :- গল্প সমগ্র, প্রথম খন্ড
প্রথম প্রকাশকাল : বৈশাখ, ১৪০৩ সন, ইং - এপ্রিল, ১৯৯৬ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২০। বসু প্রতিভা :- গল্প সমগ্র, দ্বিতীয় খন্ড
প্রথম প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৩ সন, ইং - জুন, ১৯৯৬ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২১। বসু সরসী বালা : নির্বাচিত গল্প
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, মাঘ ১৪১০ সন, ইং - সেপ্টেম্বর ২০০০ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২২। রায় সাবিত্রী : নির্বাচিত রচনা সংকলন
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৬ সন, ইং - ডিসেম্বর ১৯৯৯
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

খ. সহায়ক গ্রন্থ :-

- ১। আচার্য নিরুপম : সাহিত্য সমাজ ও ভাষা প্রসঙ্গ
১ম সংস্করণ ১৯৯৭
ভোলানাথ প্রকাশনী
- ২। আচার্য পরমেশ : ছোটগল্পে মুসলমান সমাজ সমীক্ষা
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা - ২০০১
করণা প্রকাশনী, কলিকাতা
- ৩। আচার্য পি. : বাংলা বানান বিচিন্তা (১ম)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৭
বিকাশ গ্রন্থ ভবন
- ৪। আচার্য সতী : ছোটগল্পের অঙ্গনে প্রমথনাথ বিশী
প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী - ২০০৪
অর্পিতা প্রকাশনী
- ৫। ইমাম জাহানারা :- বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প,
প্রথম প্রকাশ : বইমেলা ১৯৯৬ সন
অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী, ২ই নবীন কুদ্দুলেন

- ৬। কুন্ডু অপূর্ব :- বাংলা ও বাঙালীর দিনপঞ্জী (১৪৮৬-১৯৯৮)
প্রথম প্রকাশ : ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৮
প্রভা প্রকাশনী
- ৭। কুন্ডু অশোক, সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮২
পঞ্চম বর্ষ/ সপ্তম খন্ড-শরৎ জন্ম শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ
১৩শে ভাদ্র, ১৩৮২
প্রকাশিকা - স্বপ্না কুন্ডু, পুস্তক বিপণি
- ৮। কুন্ডু অপূর্ব - দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
জীবন ও সাহিত্য - প্রথম প্রকাশ : ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৯৯
ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা
- ৯। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, বাংলা গল্প বিচিত্রা
প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৪
বেঙ্গল পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড
- ১০। গোস্বামী জয়ন্ত : সাহিত্য গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ
১ম সংস্করণ - ১৯৮৯
পুস্তক বিপণি
- ১১। গোস্বামী কৃষ্ণপদ, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস
ইন্ডিয়ান ইনিস্টিটিউট অব এডুকেশন
- ১২। গুপ্ত জগদীশ, জগদীশ গুপ্ত গল্পসমগ্র (২য় খন্ড)
গ্রন্থালয়
- ১৩। গুপ্ত যোগেন্দ্রনাথ :- বঙ্গের মহিলা কবি
বৈশাখ ১৪১১, ইং - এপ্রিল, ২০০৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ১৪। গঙ্গোপাধ্যায় মানব : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় - আধুনিক মননে সাহিত্য ভাবনা
১ম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৯৯
ঘোষ পাবলিশিং কনসার্ন, সাহিত্যশ্রী
- ১৫। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৮
- ১৬। ঘোষ বিজিত , বাংলা ছোটগল্পের প্রতীবাদী চেতনা
১ম প্রকাশ বইমেলা ১৯৯৪
পুনশ্চ

- ১৭। ঘোষাল জয়ন্তকুমার : বাংলা উপন্যাসের সমাজ বাস্তবতা
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯২
- ১৮। ঘোষাল গুরুা :- বঙ্গনারীর গল্পশতক
২০০৫ সন
আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
- ১৯। ঘোষ প্রবীর :- যুক্তিবাদের চোখে নারী মুক্তি
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, মাঘ ১৪০০ সন, ইং - জানুয়ারী ১৯৯৪ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২০। চক্রবর্তী কৃষ্ণরূপ, বাংলা উপন্যাসের মনোবিশ্লেষণ
প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৯
- ২১। চক্রবর্তী সুমিতা :- ছোটগল্পের বিষয়-আশয়
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪ সন
পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা
- ২২। চক্রবর্তী ইন্দ্রাণী : বাংলা ছোট গল্প রীতি - প্রকরণ ও নিবিড়পাঠ
১ম খন্ড, আগস্ট ১৯৯৪
রত্নাবলী
- ২৩। চক্রবর্তী বিপ্লব : তারাক্ষর ও ভারতীয় কথাসাহিত্য
১ম সংস্করণ ১৯৯৯
পুস্তক বিপনি
- ২৪। চক্রবর্তী লাহিড়ী ভাস্বতী , সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে
বাংলা ছোটগল্প (১৯০৪-১৯৫০)
প্রথম দে'জ সংস্করণ : পুস্তক
কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী - ২০০৩
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২৫। চট্টোপাধ্যায় মীনা :- স্বর্ণকুমারী দেবী
অনুভব
কলকাতা বইমেলা ২০০০ সন
২৮ এস. আর. দাস রোড, কলকাতা
- ২৬। চট্টোপাধ্যায় অমল : আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা ও একটি বিকল্পের অনুসন্ধান
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৯৫

- ২৭। চট্টোপাধ্যায় চন্ডীদাস, অপরাজিত বিভূতিভূষণ
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯১
- ২৮। চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত
বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০২
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ২৯। চট্টোপাধ্যায় প্রবীরকুমার : জগদীশ গুপ্তের কথাসাহিত্য
ফ্রয়েডীয় মনোবিশ্লেষণের আলোকে
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৯২
বেস্ট বুকস
- ৩০। চট্টোপাধ্যায় বিমলভূষণ : সাহিত্য তত্ত্বের রূপরেখা
প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৭৯
বাক সাহিত্য প্রাঃ লিঃ
- ৩১। চৌধুরাণী সরলাদেবী :- জীবনের ঝরাপাতা
মাঘ ১৪১৩ সন, ইং - জানুয়ারী ২০০৯ সন
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৩২। চৌধুরী নারায়ণ , আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়ন
প্রথম প্রকাশ - ভাদ্র - ১৩৬৫
জিড্ডাসা
- ৩৩। চৌধুরী নারায়ণ : বরণীয় লেখক স্মরণীয় সৃষ্টি,
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮২
অনন্যা প্রকাশনী
- ৩৪। চৌধুরী নারায়ণ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য মূল্যায়ন
বেঙ্গল পাবলিশার্স
- ৩৫। চৌধুরী নীরদ চন্দ্র : নির্বাচিত প্রবন্ধ
১ম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৭
প্রকাশক : গ্রন্থ নারায়ণ চৌধুরী
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
- ৩৬। চৌধুরী নীরদ চন্দ্র : বাঙালী জীবনে রমণী
ভাদ্র ১৪০৫
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

- ৩৭। চৌধুরী প্রমথ : গল্পসংগ্রহ : প্রথম সংস্করণ - ১৯৭০
বিশ্বভারতী
- ৩৮। চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার
প্রথম প্রকাশ - ১৯৬২, প্রকাশক রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
- ৩৯। চৌধুরী নাজমা জেসমিন - বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮০ ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রথম ভারতীয় সংস্করণ - ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, প্রকাশক : শিবব্রত মুখোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশ প্রাঃ লিঃ
- ৪০। চৌধুরী মঞ্জুরী, ছোটগল্পে নরেন্দ্রনাথ মিত্র
বেঙ্গল পাবলিশার্স
- ৪১। ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ : অবনীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড)
দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯৯
প্রকাশ ভবন
- ৪২। দত্ত সঞ্চারী (মিত্র) :- রবীন্দ্রগল্পে আধুনিক নারী
সোনার তরী
নভেম্বর ২০০৬ সন
৪-এ নর্থ নওদাপাড়া রোড, কলকাতা
- ৪৩। দত্ত বিজিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক উপন্যাস
চতুর্থ সংস্করণ, মাঘ ১৪০২
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
- ৪৪। দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ
প্রথম প্রকাশ - আগস্ট ১৯৮৫
এস. পি. পাবলিশিং
- ৪৫। দাস নির্মল, ভাষা পরিচ্ছদ
প্রথম প্রকাশ - ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৫
সাহিত্যলোক
- ৪৬। দাস সীমারেখা :- নারীবাদী ভাবনায় বঙ্কিমের নারী
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ
১লা বৈশাখ ১৪১৩ সন
দগুর্ ভারতী বুক এজেন্সী, কলকাতা

- ৪৭। দে অশোককুমার - বাংলা উদ্ধৃতিকোষ
প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪৫২
চন্ডীচরণ দাস এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ
- ৪৮। দে আশিসকুমার : মানিকের ছোটগল্প : শিল্পীর নবজন্ম
প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
সাহিত্য প্রকাশ
- ৪৯। দে আশিসকুমার, উপন্যাসের শৈলী : তারাকঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশকাল - সেপ্টেম্বর ১৯৮৩
প্যাপিরাস
- ৫০। দে আশিসকুমার, সাহিত্যলোচনা ও শৈলী বিজ্ঞান
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯২
সাহিত্য প্রকাশ
- ৫১। দে সরকার দিগ্বিজয় - রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ
চতুর্থ পরিবর্ধিত সংস্করণ - জানুয়ারী ২০০৪
এন. ই. পাবলিশার্স, কলিকাতা - ৭০০ ০৩৫
- ৫২। দে বিশ্বনাথ, মানিক বিচিত্রা
প্রথম প্রকাশ, মে দিবস ১৯৭১
সাহিত্যম
- ৫৩। দেবী আশাপূর্ণা : নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ
সংস্করণ - ১৯৮৯
প্রকাশক - আনন্দম
- ৫৪। ধর কৃষ্ণ, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে বাংলা
প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৯৭
তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
- ৫৫। নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, নির্বাচিত গল্প
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৯
দে'জ পাবলিশার্স
- ৫৬। পাল প্রমথনাথ - শরৎ সাহিত্যে নারী
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬৪
ক্যালকাটা পাবলিশার্স

- ৫৭। পাল বিশ্বনাথ , বিভূতিভূষণ রূপে ও অরূপে
প্রথম প্রকাশ - ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩
নব চলচ্চিত্রিকা
- ৫৮। পত্নী পূর্ণেন্দু , ছড়ায় মোড়া কলকাতা
প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৭৩
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
- ৫৯। বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) চিত্রা :- সময়ের উপকরণ মেয়েদের স্মৃতিকথা
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০০৪ সন
পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯
- ৬০। বনফুল : বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প
প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯
বাণীশিল্প
- ৬১। বসু নিতাই, তারাক্ষরের শিল্পী মানস
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩
দে'জ পাবলিশিং
- ৬২। বিশী প্রমথনাথ : রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন
প্রকাশ : আষাঢ় ১৩৫১
বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ।
- ৬৩। বিশী প্রমথনাথ ও বিজিতকুমার দত্ত সম্পাদিত বাংলা গদ্যের পদাঙ্ক
প্রথম প্রকাশ - ১৯৬৯
- ৬৪। বিশী প্রমথনাথ : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প
প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৫১
- ৬৫। বিশী প্রমথনাথ : পুরানো সেই দিনের কথা
প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন - ১৩৯১
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
- ৬৬। বিশী প্রমথনাথ : বাংলা সাহিত্যের নরনারী
মৈত্রী, কলিকাতা ১৯৬৬
- ৬৭। বিশ্বাস কৃষ্ণকলি :- স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে ভারতের নারী
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা, ১৯৮৭ সন
ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

- ৬৮। বাগচী যশোধরা : নারী ও নারী সমস্যা
প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০২ সন
অনুষ্ঠাপ প্রকাশনী, ২য় নবীন কুন্ডু লেন, কলকাতা
- ৬৯। বন্দ্যোপাধ্যায় রণজিৎ :- উনিশ শতকে নারী মুক্তি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৯ সন
পুস্তক বিপনি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা
- ৭০। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, প্রণয়কুমার কুন্ডু
প্রথম প্রকাশ - ৩০শে আগস্ট ২০০২
প্রমথনাথ বিশী স্মারকগ্রন্থ
মিত্র ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা
- ৭১। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতা
- ৭২। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত
মডার্ন বুক
- ৭৩। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার : সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ (অখন্ড)
করণা প্রকাশনী
- ৭৪। বন্দ্যোপাধ্যায় চিত্তরঞ্জন : বঙ্গ প্রসঙ্গ
প্রথম প্রকাশ : ১৯শে জুলাই ১৯৮৭
পুস্তক বিপনি
- ৭৫। বন্দ্যোপাধ্যায় চৈতালী : উপন্যাসে আঙ্গিক বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৫,
পুস্তক বিপনি
- ৭৬। বন্দ্যোপাধ্যায় পার্থ প্রতিম : উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯৪
র্যাডিকেল ইম্প্রেশন
- ৭৭। ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন - তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য
প্রথম প্রকাশ : ২০০১, সাহিত্য অকাদেমী
রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নতুন দিল্লি
- ৭৮। ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু, ছোটগল্পে ত্রয়ী
তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রথম প্রকাশ - সেপ্টেম্বর ১৯৮০
পপুলার লাইব্রেরী

- ৭৯। ভট্টাচার্য বুদ্ধদেব, সজল বসু, পবিত্রকুমার গুপ্ত
প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৭
বাংলা আগস্ট বিপ্লব
সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন সমিতি
- ৮০। ভট্টাচার্য সুচিত্রা ও উজ্জ্বল কুমার দাস :- একশো বছরের সেরা লেখিকাদের প্রিয় গল্প
কলকাতা বইমেলা, ২০০৪ সন
অন্নপূর্ণা প্রকাশনি, ৩৬এ, কলেজ রোড, কলকাতা
- ৮১। মন্ডল রায় প্রথমা :- বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্ব,
প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬ সন
প্রতীক বুকস
- ৮২। মজুমদার প্রতীপ : পরিমল গোস্বামীর জীবন ও সাহিত্য : ১ম সংস্করণ - ১৯৯৯
পুস্তক বিপণি।
- ৮৩। মজুমদার নেপাল : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ
প্রথম খন্ড ১৯৬৯
- ৮৪। মজুমদার উজ্জ্বলকুমার , সাহিত্যের রূপরীতি,
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
কলিকাতা, ১৯৮০
- ৮৫। মান্না গুণময় , গদ্যের সৌন্দর্য
এ. কে. সরকার অ্যান্ড কোং
- ৮৬। মান্না গুণময় : বাংলা উপন্যাসের শিল্পাত্মিক
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৫
- ৮৭। মুরশিদ গোলাম - নারীপ্রগতি :- আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী
প্রথম প্রকাশ কাল : জানুয়ারী, ২০০১ সন
নয়া উদ্যোগ, কলকাতা
- ৮৮। মিত্র অরুণ : সাহিত্যের নানা দিগন্ত
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৭
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
- ৮৯। মিত্র গজেন্দ্রকুমার ও সুমথনাথ ঘোষ : ঐতিহাসিক গল্প সংকলন
প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬
মিত্র ও ঘোষ প্রকাশনী

- ৯০। মিত্র নরেন্দ্রনাথ : গল্পমালা (৩য় খন্ড)
প্রথম সংস্করণ ১৯৯২
আনন্দ পাবলিশার্স
- ৯১। মিত্র নরেন্দ্রনাথ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র রচনালী (৫ম)
প্রথম সংস্করণ - ১৯৮৮
গ্রন্থালয়
- ৯২। মুখোপাধ্যায় কনক :- নারীমুক্তি আন্দোলন ও আমরা,
১৯৯৩ সন
একসাথে, কলকাতা
- ৯৩। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার , কালের প্রতিমা
বাংলা উপন্যাসের ষাট বছর : ১৯২৩-১৯৮২
দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল - ১৯৯৯
দে'জ পাবলিশিং
- ৯৪। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার : কালের পুত্রলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর /
১৮৯১ - ১৯৯০
প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট, ১৯৮২
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৯৫। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৪
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
- ৯৬। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার : শরৎচন্দ্রঃ পুনর্বিচার
পরিবর্ধিত প্রথম দে'জ সংস্করণ : কলিকাতা পুস্তক মেলা, জানুয়ারী ২০০১
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
- ৯৭। মুখোপাধ্যায় অশোক : সংসদ সমার্থ শব্দকোষ
দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ১৯৮৭
- ৯৮। মুখোপাধ্যায় নিশীথ : কথাকোবিদ বনফুল
২৫শে বৈশাখ, ১২৯৫
- ৯৯। মুখোপাধ্যায় প্রশান্ত - কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০০১
এডুকেশন ফোরাম, ভবানী দত্ত লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা

- ১০০। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার : গল্পসমগ্র
প্রথম সংস্করণ ১৯৭২
- ১০১। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার - শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী
বুকল্যান্ড প্রাঃ লিঃ
- ১০২। মুখোপাধ্যায় প্রণবরঞ্জন - ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর মনন ও সাহিত্য
প্রথম সংস্করণ ১৩৭৫
লেখাপড়া, কলিকাতা
- ১০৩। মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পসমগ্র
৭ম সংস্করণ ১৯৮৭
প্রকাশ ভবন
- ১০৪। মুখোপাধ্যায় বিবেকানন্দ : যখন সম্পাদক ছিলাম - শশধর প্রকাশনী
প্রথম প্রকাশ - কলিকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯১
১০/২/বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা
- ১০৫। রায় জীবেন্দু :- নারী বাঙালির সাহিত্যে সত্যজিতির ছবিতে
কলকাতা বইমেলা, ২০০৭ সন
বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা
দণ্ডুর ভারতী বুক এজেন্সী, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা
- ১০৬। রায় অর্জুন : ভাঙা কাঁচের শিল্প
বাংলা ছোটগল্পের শিল্পীদল, প্রথম পর্ব
প্রথম প্রকাশ : সবিতা রায়
প্রয়াস প্রকাশনী, কলিকাতা
- ১০৭। রায় অমল শঙ্কর : মনীষা ও মন : সমীক্ষণ
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪
পুস্তক বিপণি, কলিকাতা
- ১০৮। রায় অনন্যদাশঙ্কর : অনন্যদাশঙ্কর রায়ের রচনাবলী
দ্বাদশ সংস্করণ,
বাণীশিল্প, কলিকাতা
- ১০৯। রায় অজয়কুমার : সাহিত্য জিজ্ঞাসা : বস্তুবাদী বিচার
প্রথম প্রকাশ : জিসেফর ১৯৯৯
ভাষা ও সাহিত্য, কলিকাতা

- ১১০। রায় অলোক : সাহিত্য কোষ, কথা সাহিত্য
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩
সাহিত্যলোক, কলিকাতা
- ১১১। রায় অলোক - তারাশঙ্কর : দেশকাল
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৮
নিউলাইট, কলিকাতা
- ১১২। রায় কামিনীকুমার , লোকদেবতা ও লোকাচার
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৮০
বাসন্তী লাইব্রেরী, কলিকাতা
- ১১৩। রায় গৌরমোহন , তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯৪
সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা
- ১১৪। রায় জীবেন্দ্র সিংহ : কল্লোলের কাল
কল্লোল কালিকলম প্রগতির দিন
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৩
দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা
- ১১৫। রায় নিশীথরঞ্জন ও অশোক উপাধ্যায় : প্রাচীন কলিকাতা
প্রথম প্রকাশ : কার্তিক - ১৩৯০
জিঙ্কাসা
- ১১৬। রায় প্রশান্ত কুমার : সাহিত্য দৃষ্টি
প্রথম সংস্করণ ১৯৬০
জিঙ্কাসা
- ১১৭। রায় বিনয়ভূষণ : বাংলায় সতীদাহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন
প্রথম প্রকাশ - জুলাই ১৯৮৬, প্রকাশক - তপন কুমার ঘোষ
সাহিত্যশ্রী
- ১১৮। রুদ্র অশোক : সমাজ নারী পুরুষ ও অন্যান্য প্রবন্ধ
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯০
পুস্তক বিপণি
- ১১৯। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ , দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য
পুস্তক বিপণি
- ১২০। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ , বাংলা কথা সাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৯১
মহিন্দর পুস্তক বিপণি

- ১২১। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ , বিভূতিভূষণ মন ও শিল্প
তৃতীয় সংস্করণ - এপ্রিল ১৯৯৬
দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা
- ১২২। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
জি. এ. আই. পাবলিশার্স
- ১২৩। রায়চৌধুরী গোপিকানাথ , রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প
প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৭
- ১২৪। রহমান অবিন্মন - আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতার স্বরূপ
প্রথম প্রকাশ - ১৪ই আষাঢ়, ১৪০০
বাংলা অ্যাকাডেমী, ঢাকা
- ১২৫। সমাদ্দার ভাস্বতী : বাংলা উপন্যাসের পালা বদল (১৯৬৬-৭৮)
প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারী ১৯৯৪
পুস্তক বিপণি, কলিকাতা
- ১২৬। সরকার প্রফুল্ল : গুরুদেবের শান্তিনিকেতন
প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৯
বুকল্যান্ড
- ১২৭। সান্যাল প্রবোধ কুমার : প্রবোধ কুমার সান্যালের গল্পসমগ্র
সাহিত্য সংস্থা
- ১২৮। সান্যাল অরুণ (সম্পাদক), প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস,
প্রথম প্রকাশ - ১৯৯১
ওয়েষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা
- ১২৯। সিকদার অশ্রুকুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৮৮
অরুণা প্রকাশনী
- ১৩০। সুর অতুল : শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
- ১৩১। সুর অতুল : ৩০০ বছরের কলকাতা : পটভূমি ও ইতিকথা
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ১৯৮১
- ১৩২। সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার : কল্লোলযুগ
প্রথম প্রকাশ - ১৯৭১

১৩৩। সেনগুপ্ত নন্দগোপাল : রবীন্দ্রনাথ ও সাম্যচিন্তা
নভেম্বর ১৯৮৪
পুস্তক বিপণি, ২২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা

গ) পত্র-পত্রিকা :-

- ১। অমৃত পত্রিকা ১লা বৈশাখ ১৩৯২
- ২। আনন্দবাজার পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮২
- ৩। কথাসাহিত্য সংখ্যা মাঘ, ১৪০২, ৪৭ বর্ষ বইমেলা সংখ্যা
- ৪। কথাসাহিত্য বৈশাখ ১৩৬৯
- ৫। কথাসাহিত্য বৈশাখ ১৩৮২
- ৬। কালি কলম, কয়েক প্রহরের স্মৃতি — গৌরাঙ্গ ভৌমিক
- ৭। প্রবাসী ১লা আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যা

